প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৫০

প্রকাশক : অমল গুপ্ত অয়ন ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর : রবীন্দ্রনাথ দাশ মুদ্রাকর প্রেস

১০/১সি মারহাট্টা ডিচ্ লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৩

আলোকচিত্রশিল্পী : প্রিয়রঞ্জন রক্ষিত

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত



যোগেন্দ্রকুমার প্রসঙ্গে

ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে, নেড়োরবনের সুপ্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বংশে ২১ ভাদ্র ১২৭৪ ব. যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। প্রপিতামহ শিবানন্দ চট্টোপাধ্যায় চন্দননগরে ফরাসি কুঠির দেওয়ান ছিলেন। বাবা ইন্দ্রকুমার ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য ব্যক্তি। হুগলিতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্থাপিত নর্মাল স্কুলের (১৯৫৬) তিনিই প্রথম ছাত্র। তিন বছর পর ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেলে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইন্দ্রকুমারকে হুগলি নর্মাল স্কুলেই শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সম্পর্ক যোগেন্দ্রকুমারের সময়েও সজীব ছিল। সরকারি শিক্ষাবিভাগে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পর ১৮৯১ খ্রি. ইন্দ্রকুমার অবসর নেন। চন্দননগরে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে ইন্দ্রকুমার বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন। চন্দননগরের প্রথম ইংরেজি স্কুল 'গড়বাটি বিদ্যালয়' (ডিসেম্বর ১৮৬০) স্থাপনে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে ইন্দ্রকুমার ছিলেন অন্যতম। তাঁর পাঁচ ছেলের মধ্যে মধ্যম হলেন যোগেন্দ্রকুমার।

ইন্দ্রকুমার চাকরিসূত্রে নানা জায়গায় বদলি হতেন। ১৮৬৮ খ্রি. তিনি কটকে নিযুক্ত হন। এখানেই ওড়িয়া বর্ণমালায় যোগেন্দ্রকুমারের হাতেখড়ি। কটকে কিছুদিন থাকার পর ১৮৭৩ খ্রি. ছ-বছর বয়সে বাবার সঙ্গে যোগেন্দ্রকুমার বীরভূমের সিউড়িতে আসেন। এখানে কিছুদিন থেকে ১৮৭৬ খ্রি. নাগাদ চন্দননগরে তাঁদের পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা হয়। ফরাসি মিশনারি স্কুল ফাদার ম্যাগলোয়ার বার্থে প্রতিষ্ঠিত সেন্ট মেরিজ ইনস্টিটিউশনের (১৮৬২) পাঠশালা বিভাগে যোগেন্দ্রকুমার ভর্তি হন। এরপর গড়বাটি স্কুলে ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ১৮৮২ খ্রি. হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে পড়তে আসেন। এখানে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন শিবচন্দ্র সোম এবং রায়বাহাদুর রসময় মিত্রের মতো মানুষকে। ১৮৮৭ খ্রি. তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে হুগলি কলেজে ভর্তি হন। পড়ার ইচ্ছা থাকলেও বাদ সাধল দারিদ্র্য। পয়সাকড়ি রোজগারের ধান্দায় তাঁকে চন্দননগর ছাড়তে হল। ১৮৯১ খ্রি. যোগেন্দ্রকুমার এলেন কলকাতায়।

চন্দননগরে থাকার সময়ে যোগেন্দ্রকুমারের চারপাশে একটা সাহিত্যিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট' (জুলাই ১৮৫৬), কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' (বৈশাখ ১২৯০), যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' (ডিসেম্বর ১৮৮১) পত্রিকা সে সময়ে চন্দননগরের শিক্ষিত সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তিনকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চন্দননগরের গোন্দলপাড়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রজাবন্ধু' (আশ্বিন ১২৮৯)। যোগেন্দ্রকুমারের ছাত্রজীবনে প্রজাবন্ধুতেই প্রথম লেখাটি ছাপা হয়। চন্দননগর তখন ফরাসি উপনিবেশ। কাজেই ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করলেও এখানে সিডিশনের ভয় ছিল না। যোগেন্দ্রকুমারের সম্পাদনায় বের হল ইংরেজ বিরোধী সাপ্তাহিক কাগজ 'বঙ্গবন্ধু'। বন্ধু চারুচন্দ্র রায় হলেন সহ-সম্পাদক। বঙ্গবন্ধু ছাপা হত চন্দননগরের তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের 'তারা প্রেস'-এ। কিছুদিন চলার পর তারাপ্রসন্নের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় যোগেন্দ্রকুমার বঙ্গবন্ধু-র সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

কলকাতায় আসার পর যোগেন্দ্রকুমার একটা কাজের চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন। যেমন তেমন কাজও জুটল। দূর সম্পর্কের এক মামার ছিল পাটের ব্যবসা। সেখানেই ঢুকলেন। সামান্য মাইনে। ১৮৯৬ খ্রি. নাগাদ 'আর অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি'তে পেলেন বুক-কিপারের কাজ। কাজকর্মের ফাঁকেই এবার সাহিত্য সাধনা চলল। এ সময় 'তত্ত্ববোধিনী' এবং 'ভারতী' পত্রিকায় বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ও গল্প প্রকাশিত হল। তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত পারসিকদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের সঙ্গে এই সম্পর্ক অনেকদিন বজায় ছিল। ১৯০১-এ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' বিদ্যালয় গড়ে উঠলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে যোগেন্দ্রকুমার বড় ছেলে ধীরেন্দ্রকুমারকে (জন্ম ১৮৯২) সেখানে ভর্তি করান। বুক-কিপারের কাজে যোগেন্দ্রকুমার সন্তুষ্ট ছিলেন না। সে সময়ের বিখ্যাত কাগজ দৈনিক 'হিতবাদী'তে (মে ১৮৯১) একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে যোগেন্দ্রকুমার সরাসরি পত্রিকার অফিসে যোগাযোগ করেন। তখন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আর সহ-সম্পাদক সখারাম গণেশ দেউস্কর। দেউস্করের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। কাজেই কাজটি পেতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। 'হিতবাদী'তে যোগ দিলেন যোগেন্দ্রকুমার, সময়টা ১৯০৫-এর জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাস। এরপর একটানা ১৯৩৪ খ্রি. পর্যন্ত তিনি 'হিতবাদী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯১৯-১৯৪৮ পর্যন্ত 'হিতবাদী'র সহ-সম্পাদনার কাজটি করেছিলেন।

'হিতবাদী' কাগজে প্রতি বৃহস্পতিবার 'শ্রীবৃদ্ধ' ছদ্মনামে 'বৃদ্ধের বচন' শিরোনামে সমসাময়িক বিষয়ের ওপর ব্যঙ্গরচনা, সমালোচনা লিখতেন যোগেন্দ্রকুমার। কলামটি সেকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ২০ পৌষ ১৩১৪ ব. 'বৃদ্ধের বচন' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ খ্রি. পর্যন্ত 'হিতবাদী'তে 'বৃদ্ধের বচন' বাদ যায়নি একবারও। মাত্র একবার লিখতে পারেননি যোগেন্দ্রকুমার। সেবার 'বৃদ্ধের বচন' লিখলেন সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নীচে লিখলেন 'ব-কলম শ্রীবৃদ্ধ'।

'তত্ত্ববোধিনী' আর 'ভারতী' পত্রিকায় লেখার সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য', চন্দননগর থেকে প্রকাশিত 'প্রবর্ত্তক', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী',

নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন', 'বঙ্গশ্রী', 'বাসনা' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হতে থাকল যোগেন্দ্রকুমারের গল্প, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা। পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ছয়টি গল্প নিয়ে ১৩১৩ ব. ছাপা হল প্রথম বই 'আগন্তুক ও অন্যান্য গল্প'। ২৯ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের হরিমোহন লাইব্রেরি প্রকাশিত এই বইটির আখ্যাপত্র ছিল এইরকম : ''আগন্তুক/ও/অন্যান্য গল্প/ শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়/বিরচিত।/চন্দননগর/সন ১৩১৩ সাল।/মূল্য বার আনা।'' বইটির প্রথম গল্প 'আগন্তুক' ১৩০৭ ব. আশ্বিন মাসে সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিশেষ প্রশংসা পায়। গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ যোগেন্দ্রকুমারকে লিখলেন, ''সাহিত্যে তোমার 'আগন্তুক' গল্পটি আমার বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। তাহা কৌতুকে সরস ও পল্লী-বর্ণনা-মাধুর্য্যে মনোরম হইয়াছে। গল্পের আখ্যান ভাগ সরল অথচ ঔৎসুক্যজনক। ভাষাটিও স্বচ্ছ।'' অনেক পরে, ১৩৩৮ ব. পৌষ মাসে 'প্রবাসী'তে লেখা 'গল্প' প্রবন্ধে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি গল্পটির কথাবস্তু আলোচনা করে লিখেছেন, ''আমার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছে।''

বাবা ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত বইটিতে 'আগন্তুক' ছাড়াও 'কিঙ্কর সেনের গড়', 'গৃহত্যাগ', 'তৈলবট', 'কাশীনাথ প্রতিষ্ঠা' ও 'আনারকলি' স্থান পেয়েছে। যোগেন্দ্রকুমার চন্দননগরের প্রবাদ ও আখ্যায়িকা নিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। 'কিঙ্কর সেনের গড়', 'তৈলবট' ও 'কাশীনাথ প্রতিষ্ঠা' সেই জাতের। 'তৈলবট' গল্পটি চন্দননগরের ফরাসি কুঠির দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী-কে (মৃত্যু ১৭৫৬) নিয়ে লেখা। 'কাশীনাথ প্রতিষ্ঠা'য় ইন্দ্রনারায়ণের পৌত্র কাশীনাথ চৌধুরীর সমাজে ওঠবার কথা বলা হয়েছে। বইটির ভূমিকা লিখেছেন কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ।

যোগেন্দ্রকুমারের দ্বিতীয় প্রকাশিত গল্পের সংগ্রহ 'জামাই-জাঙ্গাল ও অন্যান্য গল্প'-তে ছয়টি গল্প রয়েছে। চন্দননগর ও অন্যান্য অঞ্চলের লোকমুখে প্রচলিত কথা নিয়েই এই গল্পগুলি লেখা। বইয়ের প্রথম গল্প 'জামাই জাঙ্গাল' আশ্বিন ১৩০৪ ব. 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে প্রশংসিত হয়। কলকাতার 'বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি' থেকে ১৩১৬ ব. বইটি প্রকাশিত হয়েছিল।

দুটি গল্পের বই ছাড়াও যোগেন্দ্রকুমারের আরও তিনটি অন্য স্বাদের বইয়ের সন্ধান মেলে। প্রথমটি 'শ্রীমন্ত সওদাগর' কলকাতার ২৯ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের হরিমোহন লাইব্রেরি থেকে ১৩১৭ ব. প্রকাশিত হয়। বইটি যোগেন্দ্রকুমার লেখেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথায়। বইটি ১৯১৪ খ্রি. বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট আর্টসের পাঠ্যবই হিসেবে নির্ধারিত হয়। বইটির পরিশিষ্ট লিখেছেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

'হিতবাদী' কাগজে লেখার সংকলন 'বৃদ্ধের বচন' ১৩২৫ ব. প্রকাশিত হয়। ৭০ কলুটোলা স্ট্রিটের 'হিতবাদী'র অফিস থেকে বইটি ছাপা হয়। ১৩১৪ ব. ২০ পৌষ থেকে ১৩১৬ ব. ১০ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত বচনই এতে রয়েছে। ২৮৫ পাতার বইটি হিতবাদীর স্বত্বাধিকারী মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত।

যোগেন্দ্রকুমারের সর্বশেষ বই 'অমিয়-উৎস' ১৩২৬ ব. প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ২০১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স'। এ সময় গুরুদাস

চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশনা থেকে বিলেতের ছ পেনি/সাত পেনি সুলভ সংস্করণের আকারে ছোট সস্তার বই ছাপা হত। যোগেন্দ্রকুমারের এই উপন্যাসটি গুরুদাসের 'আট-আনা সংস্করণ-গ্রন্থমালা'র তেতাল্লিশতম বই।

বর্তমান সংকলনে গ্রন্থিত স্মৃতিমূলক রচনাগুলি ছাড়াও যোগেন্দ্রকুমারের গল্প, প্রবন্ধ ও রম্যরচনা প্রবাসী, ভারতী, সাহিত্য, বাসনা, বঙ্গশ্রী, প্রবর্তক প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় ছড়ানো রয়েছে, যা আজও অগ্রন্থিত।

যোগেন্দ্রকুমার বেশিরভাগ সময় কলকাতায় থাকলেও চন্দননগরের সঙ্গে যোগাযোগ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। ১৮৭৩ খ্রি. স্থাপিত 'চন্দননগর পুস্তকাগার'এর সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। পুস্তকাগারের ১৯৭৩ খ্রি. প্রকাশিত স্মরণিকা পুস্তিকা থেকে জানা যায় ১৯০১ খ্রি. কার্যনির্বাহী সমিতির সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগেন্দ্রকুমার, সাহিত্যিক সরলা দেবী, স্বর্ণকুমার দেবী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ বসু, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখের কাছে বই জোগাড়ের জন্য ছুটে গেছেন। চন্দননগরের সামাজিক অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত থেকেছেন। ১৯২১ খ্রি. যোগেন্দ্রকুমারের সভাপতিত্বে মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত 'প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ'এর উদ্বোধন হয়।

আজীবন যোগেন্দ্রকুমার সাহিত্যসাধনা করে গেছেন। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের জন্য তাঁর এই ভালোবাসার প্রাপ্য সম্মান থেকে একেবারে তিনি বঞ্চিত হননি। মৃণালকান্তি বসুর উৎসাহে প্রথম সাংবাদিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে যোগেন্দ্রকুমার একজিকিউটিভ কমিটির একজন সহকারি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৩-এ সরলাবালা সরকারের সভানেতৃত্বে 'ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘ' আয়োজিত সভায় যে প্রথম তিনজন সাংবাদিক ও সম্পাদককে মানপত্র দেওয়া হয় যোগেন্দ্রকুমার ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অন্য দুজন কৃষ্ণকুমার মিত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সূচি

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

অনেকেই অবগত আছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় [১৮২০-১৮৯১] তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় চন্দননগরে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।[১] গঙ্গার তীরে একটি সুন্দর দ্বিতল গৃহে বাস করিতেন; গৃহের পূর্ব্বদিকে ফুলবাগান এবং তাহার পরেই ভাগিরথী; তিনি প্রত্যহ অপরাহ্নে সেই ফুলবাগানে গঙ্গার উপরেই বসিয়া থাকিতেন। বসিবার জন্য তিনি জলের উপরে কতকটা স্থান সান বাঁধাইয়া লইয়াছিলেন। সানের উপর তিন চারিখানা লৌহের বেঞ্চ পাতা থাকিত। কি ইতর, কি ভদ্র, কি দীন, কি ধনী সকলকেই তিনি সমান সমাদরে নিজের নিকটে বেঞ্চে উপবেশন করাইতেন। প্রত্যহ অনেকগুলি ভদ্রলোক তাঁহার নিকট গিয়া অপরাহ্ন অতিবাহিত করিতেন।

আমি সে সময় পীড়াবশতঃ চন্দননগরে আমাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিলাম। আমার পিতাঠাকুর একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া উক্ত মহাপুরুষের সহিত পরিচিত করিয়া দেন এবং তদবধি আমি প্রায় প্রত্যহই প্রাতে ও বৈকালে তাঁহার নিকট যাইতাম। প্রথম প্রথম, সেই দেবোপম লোকের আমার প্রতি ঘনিষ্ঠ ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইতাম; পরে ক্রমে ক্রমে জানিলাম কেবল আমার উপর নহে, যাঁহার সহিত তাঁহার আলাপ আছে, তাঁহার সহিতই তিনি ঐ প্রকার ঘনিষ্ঠতা করিতেন। অনেকেই আমাকে দেখিয়া তাঁহার পরিবারভুক্ত মনে করিতেন, আমিও কখন কখন অপরকে তাঁহার আত্মীয়স্বজন মনে করিয়া ভ্রমে পড়িতাম।

একদিন প্রাতে, কোন কারণবশতঃ আমি তাঁহার নিকট যাইতে পারি নাই; অপরাহ্নে যাইতেছি, অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিতে না করিতেই দেখি যে ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেই পথে আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই আনন্দ সহকারে বলিলেন, "এই যে তুমি আস্‌ছ! সকালে আস নাই, মনে করলাম হয়ত তোমার অসুখ করেছে, তাই তোমাকে দেখতে যাচ্ছিলাম।" আমি প্রণাম করিয়া বলিলাম আপনি ত আমাদের বাড়ী জানেন না, তিনি সহাস্যে বলিলেন, "কেন তুমি একদিনও আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যাও নাই বলে কি আমি জিজ্ঞাসা করেও তোমার বাড়ী যেতে পারতাম না?" যিনি বিসূচিকা রোগগ্রস্ত অস্পৃশ্য মেথরকে ক্রোড়ে করিয়া সেবা করিতে পারেন, তাহার পক্ষে এ প্রকার ব্যবহার বড় বেশী কথা নহে। কিন্তু "বসুধৈব কুটুম্বকম্" বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে যে কথা আছে, তাহা যথার্থ বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই ছিল। আর কাহারও সে গুণ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় সুরসিক ছিলেন। তাঁহার কথা শুনিলে সময় সময় হাস্য সম্বরণ করা যাইত না। একদিন কোন নেশাখোর লোকের কথা হইতেছিল। বিদ্যাসাগর

মহাশয় অনেকক্ষণ সেই নেশাখোরের কথা শুনিয়া বলিলেন, "অত কথা বলছ কেন, এক কথায় বল না সে আমার প্রথম ভাগের গোপাল।" আমরা প্রথমে তাহার কথা বুঝিতে পারিলাম না দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এটা আর বুঝতে পারলে না? প্রথম ভাগে পড় নাই 'গোপাল বড় সুবোধ ছেলে, যা পায় তাই পরে, যা পায় তাই খায়।' ইনিও তাই যা পান তাই খান। মদ মদই সই, গুলি গুলিই সই, গাঁজা গাঁজাই সই, এটা খাব না, ওটা খাব না, বলে উৎপাত করেন না।" আমরা তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া আকুল হইলাম কিন্তু তাঁহার মুখে হাসির নামমাত্রও দেখিতে পাইলাম না।

তাঁহার "বেত খাওয়ার" গল্প বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি অনেক স্থলেই সেই গল্পের উল্লেখ করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহার কোন না কোন জীবনচরিতে তাহার উল্লেখ থাকিতে পারে। যাহা হউক, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একদিন কোন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় মুক্তি হয় কিসে?" বিদ্যাসাগর মহাশয় সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক আবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেবারও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তৃতীয় বার ঐ প্রশ্ন করাতে বলিলেন, "তুমি আমাকে বেত খাওয়াবে তবে ছাড়বে।" ভদ্রলোকটি মহাবিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি মহাশয়, আপনাকে বেত খাওয়াব?" "তা না ত কি? কিসে মুক্তি কিসে অমুক্তি তা নিজেই জানি না তোমাকে কি বলব? আমার মনে একটা বিশ্বাস আছে হয়ত সেটা ভুল। আমি সে ভুল বিশ্বাসের জন্য মৃত্যুর পর যমালয়ে গেলাম; সেখানে চিত্রগুপ্ত আমার ভুল বিশ্বাসের কথা শুনে বলবে 'বটে তোমার এই বিশ্বাস ছিল? কে আছিস্ রে লাগা ত বুড়কে ২৫ বেত।' আমি তখন নিজের বেতের জ্বালায় অস্থির ইতিমধ্যে হয়ত তুমিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত, চিত্রগুপ্ত তোমার বিশ্বাসের কথা শুনে জিজ্ঞাসা করবে, 'এ মত তুমি কোথায় পেলে?' তখন অগত্যা তুমি আমাকে দেখিয়ে দেবে। চিত্রগুপ্ত তখন আমাকে বলবে 'বিট্‌লে বামুন নিজে ত মজেছ, আবার পরকেও বুঝি নিজের মতে মজিয়েছ? লাগাও বামুনকে আর ২৫ ঘা।' বাপু নিজের বেতের জ্বালায় অস্থির আবার তোমার দায়ে পড়ে যে তার উপর বেত খাব তা আর পারব না; কেন আর সাধ করে বুড় বামুনকে মার খাওয়াবে? একটা কথা এই মনে রেখ যদি তুমি চিরকাল কাপড়ের ব্যবসা করে থাক, তবে বুড় বয়সে বেশী লাভ হবে শুনে চালের ব্যবসায় হাত দিলে লাভ দূরে থাক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। যা চিরকাল করে এসেছ তাই কর। বুড় বয়সে মত বদল করে লাভে মূলে যাবে।"

উল্লিখিত গল্প হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্মমতের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। আবার আর একটি ঘটনা হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত আরও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। কোন সময়ে তিনি পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে করিতে এক গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল। ব্রাহ্মেরা বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন শুনিয়া অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি

প্রথমে অনেক আপত্তি করিলেন কিন্তু তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া অগত্যা ব্রাহ্মসমাজে যাইতে সম্মত হইলেন। সেদিন ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব ছিল। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়াছেন শুনিয়া অনেকেই সেদিন ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইলেন। সুতরাং জনতা কিছু অধিক হইল। ব্রাহ্মমন্দির-মধ্যে বেঞ্চ চেয়ার ছিল না। মেঝেতে ঢালা বিছানা পাতা, সুতরাং সকলেই বাহিরে জুতা রাখিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। উপাসনা শেষ হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্ধকারে ও জনতায় নিজের চটিজুতা জোড়াটি আর খুঁজিয়া পান না। বার বার অন্বেষণে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "তোমরা ত ঘরে ঢুকলে আর চোখ বুজে নিরাকার ঈশ্বর দেখে এলে, কিন্তু আমি যে আমার তালতলার সাকার চটিজুতা জোড়াটি দেখিতে পাই না।"

বিদ্যাসাগর কথা (১)

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল ফরাসী চন্দননগরে গিয়া বাস করেন। বার্দ্ধক্যে অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হইয়া নানাপ্রকার চিকিৎসাতে যখন তিনি কোন উপকার পাইলেন না, তখন চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি কলিকাতার বাহিরে গঙ্গার উপর কোন বাড়ীতে বাস করিয়া কিছু উপকার হয় কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সঙ্কল্প করেন। সেই সঙ্কল্পের ফলেই তাঁহার চন্দননগরে গমন।

চন্দননগরে ইতঃপূর্ব্বে তিনি আর একবার গিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তখন তিনি যৌবন অতিক্রম করেন নাই, বোধহয় তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করে নাই। শুনিয়াছি, সেইসময় একজন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর স্থানীয় কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর অত্যাচার দর্শনে ব্যথিত হইয়া সেই নিরপরাধ ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের নিকট অভিযোগ করেন এবং সেই অত্যাচারপরায়ণ পুলিশ কর্ম্মচারীর যথোচিত শাস্তি-প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সে ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করি নাই কারণ আমার জন্মগ্রহণের অনেক পূর্ব্বে উহা ঘটিয়াছিল, আমি আমার পিতার নিকট এই ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয়বার অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন চন্দননগরে গিয়া বাস করেন, তখন আমি প্রায় প্রত্যহই তাঁহার নিকট যাইতাম। সেইসময় আমি তাঁহার স্বমুখে যে সকল কথা শুনিয়াছি এবং তাঁহার যে সকল কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়াছি, আজ তাহারই আলোচনা করিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চন্দননগরে গঙ্গার ধারে ষ্ট্রাণ্ডের দক্ষিণে দুইটি পাশাপাশি বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। ঐ দুইটি বাড়ীর মধ্যে একটি এখনও বিদ্যমান আছে। ঐ বাড়ীর নিম্নতল গঙ্গার গর্ভে নির্ম্মিত, উহার ছাদ ষ্ট্রাণ্ডের ফুটপাথের সহিত এক সমতলে অবস্থিত। বর্ষাকালে সেই বাড়ীর নিম্নতলের কক্ষগুলির মধ্যে জল প্রবেশ

করে। উহার দ্বিতলের কক্ষগুলি দূর হইতে দেখিলে একতলা বাড়ী বলিয়া মনে হয় ঐ বাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুরমহিলারা বসবাস করিতেন। উহার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং সেই বাড়ীতে বাস করিতেন এবং আগন্তুক অভ্যাগতগণ সেইখানে গিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এই দ্বিতীয় অট্টালিকাখানি এখন আর নাই। তাঁহার এই বাসাবাড়ীর সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, কারণ যদি কেহ আমার এই নিবন্ধ পাঠ করিয়া স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ জীবনের বাসাবাড়ী দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চন্দননগর গমনের তিন চারিদিন পরে আমার পিতা আমাকে বলিলেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয় এখানে এসেছেন, কাল ষ্ট্রাণ্ডে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আজ বৈকালে তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব।" পিতার মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব যে কিরূপ হইল, তাহা এতদিন পরে প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহার বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ[২] পড়িয়া আমার বর্ণমালা শিক্ষা হইয়াছে, যাঁহার বোধোদয়,[৩] কথামালা,[৪] চরিতাবলী,[৫] সীতার বনবাস,[৬] পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছি, যাঁহার ব্যাকরণ কৌমুদী[৭] ও ঋজুপাঠ[৮] প্রভৃতি পাঠ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদনে অধিকারী হইয়াছি, যিনি বিধবা-বিবাহের পুনঃপ্রবর্ত্তন[৯] করিয়া সমাজে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, সেই পুরুষসিংহকে আজ দেখিতে যাইব। এই আনন্দে আমি বিভোর হইলাম।

বৈকালে বাবার সঙ্গে বিদ্যাসাগর দর্শনে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই, সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। ফটক পার হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম, খর্ব্বাকৃতি, অনাবৃতদেহ এক ব্রাহ্মণ একটি হুঁকা হাতে করিয়া বাড়ীর একটা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার ধারে যাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া বাবা মৃদুস্বরে বলিলেন—"উনিই বিদ্যাসাগর।" আমি বাবার কথা শুনিয়া অবাক হইলাম। আমার ধারণা ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইলেও যখন এক সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই আকৃতিতে একজন হোম্‌ড়া চোম্‌ড়া ব্যক্তি হইবেন। শৈশবকাল হইতেই স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮২৭-১৮৯৪] মহাশয়কে দেখিয়াছি, তিনিও একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান এবং স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন, বোধহয় সেইজন্যই আমার ধারণা হইয়াছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ভূদেববাবুর মত একজন, গৌরবর্ণ না হইলেও হয়ত তাঁহারই মত দীর্ঘাকৃতি, গম্ভীরপ্রকৃতি রাসভারী লোক হইবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া আমার সে ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। যখন তাঁহার সম্মুখে গিয়া ভাল করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলাম, তখন সহসা আমার মনে হইল আমাদের বাড়ীতে যে উৎকলবাসী ক্ষেতা মালী আছে, তাহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেন অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইনিই সেই ভারতবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!

আমার পিতা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে আমিও তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিলাম। আমরা দণ্ডায়মান হইলে তিনি আমার পিতাকে বলিলেন,—"ইন্দ্রকুমার, এইটি বুঝি তোমার বড় ছেলে?" পরে আমাকে বলিলেন—"তোর নাম কি?" তিনি আমাকে "তুই" বলিয়া সম্বোধন করাতে আমি বিস্মিত হইলাম, কারণ, বাড়ীতে পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজন ব্যতীত আমাকে কেহই "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিত না। সুতরাং প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাকে ঐরূপ সম্বোধন করাতে যে আমি বিস্ময় বোধ করিব তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

বাগানের পূর্ব্বপ্রান্তে, রেলিং-এর ধারে একখানা চেয়ার ছিল, বুঝিলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেইখানে উপবেশন করিবেন বলিয়াই তথায় চেয়ার আনীত হইয়াছিল। তিনি একজন ভৃত্যকে আরও দুইখানা চেয়ার আনিতে বলিয়া বাবাকে বলিলেন,—"আজ বড় মেঘ করেছে বলে আর গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলাম না, এস এইখানে বসেই কথাবার্তা কওয়া যাক্।" চেয়ার আনীত হইলে আমরা তিনজনেই উপবেশন করিলাম। তিনি কথা কহিতে কহিতে বাবার হাতে হুঁকাটি দিলে বাবা সসম্ভ্রমে উহা লইয়া একটি গাছের গোড়ায় রাখিয়া দিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"ওকি, তুমি তামাক খাও না? তবে ত তোমার হাতে হুঁকা দিয়ে ভাল কাজ করিনি। তুমি কি তামাক খাও না?" বাবা তামাক খাইতেন, কিন্তু কুণ্ঠাবশতঃ তাঁহার সম্মুখে সে কথা স্বীকার করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"এই দ্যাখ, তুমি আবার জ্যাঠামি আরম্ভ করলে? তামাক খাও কিনা, এক কথায় তার উত্তর দিতে পার না?" তখন পিতা অগত্যা নতমস্তকে বলিলেন,—"আজ্ঞে খাই, কিন্তু আপনার সুমুখে—" বাধা দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "কেন আমার সুমুখে খেতে দোষটা কি! আমি কি তোমাকে মারব? তামাক খাওয়াটা যদি দুষ্কার্য্য বলে মনে কর, তা'হলে তামাক খেও না, আর যদি মনে কর যে অন্যায় কাজ নয়, তা'হলে আমার সুমুখে তামাক খাবে না কেন? নাও হুঁকো তুলে নিয়ে তামাক খাও। তুমি খাবে বলেই আমি তোমার হাতে হুঁকো দিয়েছিলাম। ঐ যে আমাদের সমাজে কেমন ন্যাকামি আর ভণ্ডামি ঢুকেছে ওসব আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না।" আমার পিতা অগত্যা হুঁকা লইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। প্রায় আধঘণ্টা অতীত হইবার পর দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে চৌকীগুলি তুলে রাখ, বৃষ্টি পড়ছে। চল ইন্দ্রকুমার আমরা ভেতরে গিয়ে বসিগে।"

আমরা তাঁহার সহিত উপরে গেলাম। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি ত' বিস্ময়ে আভভূত হইলাম। একি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বসিবার ঘর না কোন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের ড্রয়িংরুম? প্রকাণ্ড হল, তিন দিকে দেওয়ালের গায়ে পুস্তক-পরিপূর্ণ সারি সারি আল্‌মারি। সকল পুস্তকই অতি সুন্দর, বাঁধান চক্‌চক্ করিতেছে। হলের ঠিক মাঝখানে একটা বড় টেবিল, উহার চারিদিকে অনেকগুলি চেয়ার। উত্তর দিকের

প্রাচীরগাত্রে একখানি ছোটখাট বিছানা পাতা, সেইখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় শয়ন করেন। পশ্চিমের দেওয়াল আল্‌মারির উপরে পাশাপাশি দুইখানি তৈলচিত্র। পরে শুনিয়াছিলাম, একখানি তাঁহার জননীর ও আর একখানি তাঁহার জনকের প্রতিকৃতি। আমাদের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক সেই চিত্র দুখানি দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ঐ ছবি দুইখানি কার?" তাঁহার কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্নিমেষ নয়নে সেই ছবি দুইটির প্রতি চাহিয়া অতি সুন্দর স্বরে বলিয়াছিলেন—"আমার দেবতার—বাবার আর মায়ের ছবি।" দেখিলাম তাঁহার নেত্র বাষ্পভারাক্রান্ত। বহুকাল পূর্ব্বে মৃত পিতামাতার চিত্র দেখিয়া বৃদ্ধকে অশ্রুমোচন করিতে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির এরূপ নিদর্শন আর কখনও দেখি নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহসজ্জার কথা বলিতেছিলাম। সেই হলের মধ্যে চেয়ার, টেবিল, আল্‌মারি, খাট প্রভৃতি যে সকল আসবাব ছিল, তাহা এতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল যে দেখিলে মনে হইত উহা সংপ্রতি ক্রয় করা হইয়াছে, এখনও ব্যবহার করা হয় নাই। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে বাঙালীর বাড়ীতে চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ বা ঘড়িতে ময়লা জমিয়া থাকে। কারণ অনেক সময় আমরা অনাবৃত শরীরে চেয়ারে হেলান দিয়া বসি, সেজন্য আমাদের তেল, ঘাম এবং ময়লা চেয়ারে লাগিয়া চেয়ারের বার্ণিশকে মলিন ও বিবর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যে চেয়ারে প্রত্যহ উপবেশন করিতেন সেই চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে কোথাও একটু ময়লা ছিল না, অথচ তিনি শীতকাল ব্যতীত সকল ঋতুতেই অনাবৃত শরীরে থাকিতেন, এবং প্রত্যহ যথেষ্ট তৈল মাখিয়া স্নান করিতেন। আমি একদিন বালসুলভ চপলতাবশতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তাঁহার চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ এরূপ পরিষ্কার আছে কিরূপে? আমার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আমি কখনও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসিনে তা' চেয়ারে ময়লা লাগ্‌বে কেমন করে? তুই ত এতদিন আস্‌ছিস্ আমাকে কখনও হেলান দিয়ে বস্‌তে দেখিস্ কি? হেলান দিয়ে বসলে শিরদাড়া বেঁকে যায়, লোক আয়েসী হয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ হেলান দিয়ে বস্‌লেই ইচ্ছে হয় টেবিলের উপর পা দুটো তুলে দিই। আমি ঠিক সোজা হয়ে বসি, কখনও হেলান দিই না বা সামনে ঝুঁকে বসি না।"

প্রথম সাক্ষাতের দিন, আমরা সেই হলে বসিয়া আছি, এমন সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় কথা কহিতে কহিতে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই খাটের নিকট গিয়া মেঝেতে উবু হইয়া বসিলেন, দেখিলাম তিনি খাটের নীচ হইতে দুইখানা রেকাবি ও দুইটি গেলাস বাহির করিয়া একখানা তোয়ালে দ্বারা একবার মুছিয়া লইলেন, তাহার পর একটা হাঁড়ি হইতে কিছু মিষ্টান্ন বাহির করিয়া সেই রেকাবিতে রাখিলেন এবং একটা কুঁজো হইতে গেলাস দুইটাতে জল ঢালিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিয়া সহাস্যে বলিলেন—"একটু মিষ্টি মুখ কর।"

আমরা জলযোগে প্রবৃত্ত হইলে তিনি আবার সেই খাটের নিকট গিয়া তলা হইতে

একটি পানের বাটা বাহির করিয়া পান সাজিতে লাগিলেন। দেখিলাম বাটার মধ্যে অনেকগুলি পান রহিয়াছে; তিনি একটা কাঠি লইয়া পানে চুন লাগাইয়া তাহাতে একটু খয়ের ও সুপারি দিয়া খিলি মুড়িয়া আমাদের হাতে দিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন— "আমার পান সাজা দেখে হাসি পাচ্ছে? আমি যে মেদিনীপুর জেলার উড়ে বামুন। দেখ নাই উড়েরা কোমরে একটা থলির ভিতর পান, চুন, খয়ের, সুপারি সব রেখে দেয়, আর কথা কইতে কইতে সেই পান সেজে খায় আর জাতভাইকে খাওয়ায়? আমিও উড়ে কিনা, তাই নিজের হাতে পান সেজে লোককে খাওয়াই।" তাঁহার এইরূপ স্বহস্তে জলখাবার সাজাইয়া দেওয়া ও পান সাজিয়া দেওয়া আমি প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দুইটি বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহা শ্বেতাঙ্গ পল্লীতে অবস্থিত বলিয়া সাধারণতঃ ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরাই সেই বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেন, সেইজন্য সেই বাড়ীতে বাঙালীর উপযোগী পায়খানা ছিল না, সাহেবদের ব্যবহার্য্য 'বাথরুম' ছিল। বাঙালী ভদ্রলোকের পক্ষে বাথরুমে কমোড ব্যবহার করা সুবিধাজনক নহে। সেইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসাবাড়ীতে দেশীয় ধরণের পায়খানা নির্ম্মাণ করাইবার সঙ্কল্প করিয়া আমাকে একদিন বলিলেন, "ওরে যোগীন, তোদের দেশে এসে বড় মুস্কিলে পড়েছি। আমাকে যে একটি পায়খানা তৈরী করাতে হবে। রাজমিস্ত্রি কোথায় থাকে, আমি ত' জানি নে, আমার কাছে একজন মিস্ত্রিকে পাঠিয়ে দিতে পারিস্?"

আমাদের বাড়ীতে সেই সময় একজন মিস্ত্রি কাজ করিতেছিল, সেইজন্য আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, পরদিন সকালেই আমি মিস্ত্রিকে সঙ্গে করিয়া আনিব। পরদিন প্রাতে মিস্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গমন করিলে তিনি মিস্ত্রিকে সেই দিনই কার্য্য আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন এবং আমাকে ইট, চুন, সুরকি, বালি প্রভৃতি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। আমি সেই দিনই চুন, সুরকি পাঠাইয়া দিলাম এবং পরদিন ইট আসিবে জানাইলাম।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি যখনই তাহাঁর কাছে যাইতাম তখন গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতাম। চুন, সুরকি পাঠাইয়া দিব বলিয়া আমি চলিয়া আসিবার পাঁচ সাত মিনিট পরে একজন ভৃত্য দ্রুতগতিতে আমার কাছে আসিয়া বলিল— "কর্ত্তা আপনাকে একবার ডাকছেন।" আমি তাহার কথা শুনিয়া পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমি তাঁহার আবাসে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন,— "ওরে একজন ছুতোর মিস্ত্রিও চাই যে, পাইখানা কপাট তৈয়ারী কর্ত্তে হবে। ফরাসডাঙ্গায় এসে তোকেই আমি মুরুব্বি ধরেছি, তুই না থাকলে যে, আমার কি দুর্দ্দশা হ'ত বলতে পারি না।"

আমাদের একজন সূত্রধর প্রজা ছিল সে ম্যাজরাস কোন্নগর কারখানার একজন বড় মিস্ত্রি ছিল; আমি সেই দিন বৈকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিব বলিয়া বিদায়সূচক যেমন তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য নতমস্তক হইয়াছি, অমনি তিনি সহসা দুই তিন হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন— "হ্যাঁ দেখ, মিন্সে যে আমাকে

দেখ্‌মার কর্ত্তে আরম্ভ করলে। তুই যতবার আমার কাছে আস্‌বি ততবারই আমার পায়ে মাথা খুঁড়বি? তা'হলে তোকে আর আমার কাছে আস্‌তে হবে না। আমি তোকে ঘরের ছেলে ক'রে তুল্‌ছি আর তুই বুড়কে ঠেলে তফাৎ করে দিচ্ছিস্‌? রোজ রোজ কি ওরকম নৌকতা ভাল দেখায়?

বিদ্যাসাগর মহাশয় চন্দননগর আসিয়া বাস করিতেছেন এবং আমি প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাই এইকথা অল্পদিনের মধ্যে আমার বন্ধুবান্ধব ও সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য আমাকে আসিয়া সুপারিস ধরিতেন। সুতরাং প্রায় প্রত্যহই একজন বা দুইজন বন্ধু আমার সঙ্গে তাঁহার বাসাতে যাইতেন। তিনি প্রত্যহই সকলকে স্বহস্তে জলখাবার দিতেন ও পান সাজিয়া খাওয়াইতেন। চারি পাঁচ দিন পরে আমি একদিন বৈকালে দুইটি বন্ধুসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— "কিরে তুই জলখাবারের লোভে রোজই নূতন নূতন বন্ধু আমদানি কর্ত্তে আরম্ভ কল্লি নাকি?" এই বলিয়া আমার বন্ধুদের পরিচয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি উঠিয়া বলিলেন— "তোরা এসেছিস মিষ্টি মুখ করে যা। নইলে বলবি বামুন জাত কেবল খেতেই জানে খাওয়াতে জানে না।" এই বলিয়া তিনখানি রেকাবিতে করিয়া কিছু মিষ্টান্ন লইয়া আমাদের তিনজনের সম্মুখে রাখিলেন। আমার সম্মুখে মিষ্টান্ন রাখিতে আমি বলিলাম, 'আমি আজ অনেক বেলাতে ভাত খেয়েছি, এখন আর কিছু খাব না।"

আমার কথা শুনিবামাত্র তিনি বলিলেন— "ওঃ সেই খাবার লোভে বলেছিলেম বলে রাগ হ'ল নাকি? নে রাগ কর্ত্তে হবে না।" সুতরাং আমি বিনা বাক্যব্যয়ে সেই মিষ্টান্নগুলির সদ্ব্যবহার করিলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় চন্দননগরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় আমার প্রতিবেশী ও সতীর্থ রায়সাহেব স্বর্গীয় ভোলানাথ দে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সেইজন্য তাঁহার সর্ব্বদা বাড়ীতে আসা ঘটিত না। সরস্বতী পূজার ছুটিতে বাড়ীতে আসিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "আজ যখন বিদ্যাসাগরের কাছে যাবে তখন আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তাঁকে কখনও দেখি নাই, আজ দেখে জন্ম সার্থক করব।"

বৈকালে আমরা দুই বন্ধুতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসাতে গমন করিলাম। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন— "তোর আর একটি বন্ধু নাকি? এতে ত' এতদিন দেখি নাই।" আমার বন্ধু বলিলেন,— "আমি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়ি, সেইখানেই থাকতে হয়। কাল সরস্বতী পূজার ছুটিতে বাড়ীতে এসেছি। আর যোগীনের সঙ্গে আপনার চরণ দর্শন কর্ত্তে এসেছি।"

তাঁহার কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন— "হ্যাঁ, আমার চরণ দর্শন কর্ত্তে এসেছিল? ত' দেখ, আমার চরণ দর্শন করেই বাড়ী যা।" এই বলিয়াই তাঁহার সেই সর্ব্বজনপূজ্য চরণযুগল তুলিয়া আমার বন্ধুর মুখের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—

"যা, এবার বাড়ী চলে যা। চরণ দর্শন কর্ত্তে এসেছিলি তা' ত' হল তবে আর কি? এইসব জ্যাঠামিগুলি আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে। সোজা কথা বল্লেই ত' হ'ত যে, বুড় তোমার প্রথম ভাগ বর্ণ-পরিচয় থেকে আরম্ভ করে কথামালা, বোধোদয়, উপক্রমণিকা,[১০] ব্যাকরণ-কৌমুদী পর্যন্ত পড়েনি, কিন্তু তোমাকে কখনও চোখে দেখিনি। তুমি এখানে এসেছ শুনে তোমাকে দেখতে এসেছি। এই ত' সোজা কথা, ত' নয়, তোমার চরণ দর্শন কর্ত্তে এসেছি সবতাতেই জ্যাঠামি।"

তিনি আমাকে প্রথম দিনে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করাতে অমি বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু পরে বুঝিলাম যে তাঁহার মুখে এই 'তুই' শব্দ যত মিষ্ট লাগে, 'তুমি' শব্দ সেরূপ মিষ্ট লাগে না। অবশ্য অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোকদিগকে তিনি 'তুমি' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। নিজের অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণতঃ তিনি কাহাকেও 'আপনি' সম্বোধন করিতেন না। এই ব্যাপার লইয়া একদিন বেশ রঙ্গ হইয়াছিল। আমাদের প্রতিবেশী স্বর্গীয় গঙ্গাধর সরকার নামক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আমাদের প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। তিনি আমার পিতার অপেক্ষা সাত আট বৎসরের বড় ছিলেন। অকালবার্দ্ধক্যে তাঁহার চুল, গোঁফ, দাড়ী সমস্তই শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড় হইলেও সরকার মহাশয়কেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও এই ভ্রম হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি সরকার মহাশয়কে সম্ভ্রমসূচক 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সরকার মহাশয় আমার পিতার সঙ্গে প্রায় সর্ব্বদাই বিদ্যাসাগর আবাসে গমন করিতেন, ফলে অল্পদিনের মধ্যে উভয়ের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি হইয়াছিল।

একদিন আমার পিতা, সরকার মহাশয় এবং আরও তিন চারিজন ভদ্রলোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সকলে গঙ্গার ধারে, বাগানে গাছতলায় চেয়ারে বসিয়াছিলেন, আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া সুরেশের সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বৃষ্টি পড়িতে দেখিয়া বলিলেন—"গতিক ভাল নয়, চলুন ঘরের ভেতর গিয়া বসা যাক।" এই বলিয়া দণ্ডায়মান হইলে সকলেই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সরকার মহাশয়কে অগ্রগামী হইতে বলিলে তিনি বলিলেন—"সে কি কথা? আপনি আগে চলুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"আপনি বয়সে বড়, আপনি আগে চলুন।" সরকার মহাশয় বলিলেন, "আমি আপনার চেয়ে বোধহয় বয়সে বড় নই, আপনিই বয়সে বড়।" তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন,—"আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়? আপনার বয়স কত?" সরকার মহাশয় বলিলেন—"আমার বয়স উনসত্তর।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—"ওঃ তবে ত' তুমি আমার কোলের ছেলে হে, আমার বয়স একাত্তর।"

চন্দননগরে অবস্থানকালে বিদ্যাসাগর মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। আমার পিতাকে একদিন তিনি বলিলেন—"ইন্দ্রকুমার, তোমরা বাপবেটায় ত' রোজ আমাদের বাড়ীতে আসছ, কিন্তু আমাকে ত' তোমাদের বাড়ীতে একদিনও নিয়ে গেলে না?"

বাবা বলিলেন—"আপনাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব, আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে?" তিনি বাধা দিয়ে বলিলেন, "বিলক্ষণ: তুমি আমার কাছে আসবে, আমি তোমার কাছে যাব এতে আর সৌভাগ্য অসৌভাগ্য কি আছে? আমি কাল তোমাদের ওখানে যাব।"

পরদিন অপরাহ্নকালে আমার পিতা গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ীতে আনিলেন। আমাদের প্রতিবেশী কয়েকজন ভদ্রলোককে পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা যথাসময়ে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৈঠকখানাতে ঢালা বিছানা পাতা ছিল, সেই বিছানার ঠিক মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য একখানা গালিচার আসন ও দুইটা তাকিয়া রাখা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আমরা কলিকাতা আর্ট ষ্টুডিও[১১] হইতে প্রকাশিত বঙ্গের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি কিনিয়া বৈঠকখানায় সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র অভ্যাগতগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"আমি কি বিয়ে কর্ত্তে আসছি যে আমার জন্য বরাসন পেতে রেখেছ?" এই বলিয়াই তিনি বৈঠকখানার এককোণে গিয়া উপবেশন করিলেন। একজন ভদ্রলোক একটা তাকিয়া লইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া দিলে তিনি বলিলেন—"তাকিয়া কি হবে? আমি ত' কখনও হেলান দিয়ে বসি না।" সেদিন তিনি প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, এই আড়াই ঘণ্টা তিনি ঠিক একভাবেই বসিয়াছিলেন, একবারও দেওয়াল বা কোন পার্শ্বে হেলান দেন নাই। ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার নিজের প্রতিকৃতি তাঁহার নয়নপথে পড়িবামাত্র তিনি বলিলেন—"এই যে, আমাকেও এনে হাজির করেছ।"

আগন্তুকগণের মধ্যে এক ভদ্রলোকের একটি বালবিধবা কন্যা ছিল। নয় বৎসর বয়সে সেই হতভাগিনীর বিবাহ হয়, এগার বৎসর বয়সে সে বিধবা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন আমাদের বাড়ীতে যান তখন মেয়েটির বয়স তের বৎসর। আমার পিতার মুখে সেই দুর্ভাগিনীর কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পিতাকে বলিলেন—"তোমার মেয়ের আবার বিয়ে দাও।" তিনি বলিলেন—"আমি ত' বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আমাদের সমাজে যে কেহ বিধবা বিবাহ কর্ত্তে চায় না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় সজল নয়নে বলিলেন—"তবে চুলয় দাও।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। সমবেত ভদ্রলোকগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। আমাদের বাড়ীর নিকটে পথের পার্শ্বে এক দরিদ্রা বিধবার কুটীর ছিল। তাহার কুটীরের খড়ের চাল হইতে

একটি নধর কচি লাউডগা পথের উপর ঝুলিতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সযত্নে সেই লাউডগাটি চালের উপর তুলিয়া দিলেন। পথে অনেক লোকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটি পথে বাহির হইয়া ব্যাপার কি, দেখিতে আসিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"হ্যাঁগা, এই ঘরখানি কি তোমার?" সেই স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"বাছা, সংসার কর্ত্তে গেলে সবদিকে নজর রাখতে হয়। অমন কচি লাউডগাটি পথের ধারে ঝুলছিল, কেউ এখনই কুচ করে কেটে নিয়ে যাবে।" শত শত লোক প্রত্যহ সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিত, কিন্তু সেই দরিদ্রা বিধবার ক্ষতির আশঙ্কা কাহার মনে উদয় হইত?

বিদ্যাসাগর মহাশয় চন্দননগরে যখন ছিলেন, তখন তাঁহার দৌহিত্র, সুবিখ্যাত সাহিত্যিক 'সাহিত্য'[১২] পত্রের সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি [১৮৭০-১৯২১] এবং তৎসহোদর যতীশচন্দ্র বালক মাত্র। সুরেশের বয়স তখন বোধহয় ষোল কি সতর বৎসর হইবে। সুরেশ তখন মাতামহের কাছে সংস্কৃত পড়িতেন এবং মাষ্টারের নিকট 'ইজি সিলেক্‌শনস্' পড়িতেন। কলিকাতা হইতে যে মাষ্টার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে চন্দননগরে আসিয়াছিলেন, তিনি কয়েকদিন পর চন্দননগর হইতে চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দৌহিত্রদিগকে পড়াইবার জন্য আমার পিতাকে একজন শিক্ষক মনোনীত করিতে বলেন; ফলে আমাদের প্রতিবেশী স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ রক্ষিত বি-এ সুরেশ ও যতীশের প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যোগীন্দ্রবাবুও তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় গমন করেন। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অধ্যাপনা-কৌশল দেখিয়া তাঁহাকে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে[১৩] সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর যোগীন্দ্রবাবু ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। চন্দননগরে সুরেশের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়, সেই সময়ে আমি কোন কোন মাসিক পত্রে ছোট গল্প লিখিতাম। পরে সুরেশ 'সাহিত্য' প্রকাশ করিয়া আমাকে 'সাহিত্য'এ ছোট গল্প লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ অনুসারে আমি 'সাহিত্য'এ প্রায়ই ছোট গল্প লিখিতাম। এইরূপে 'সাহিত্য'এর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আমি উহার সহিত সংযুক্ত ছিলাম।

সুরেশ ও যতীশ আমাকে ঠিক অগ্রজের মত মনে করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চন্দননগর ত্যাগ করিলেও সুরেশ চন্দননগরের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই, সুবিধা পাইলেই তিনি চন্দননগরে আমাদের বাটীতে যাইতেন।

বিদ্যাসাগর কথা (২)

বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরসিক এবং মজলিসী লোক ছিলেন। অনেক সময় তাঁহার কথা শুনিয়া সমবেত লোকেরা হাস্য করিয়া উঠিতেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় গম্ভীরভাবে

বসিয়া থাকিতেন, যেন হাস্যোদ্দীপক কোন কথাই হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় এক বৎসর কাল চন্দননগরে বাস করিয়াছিলেন। সেই এক বৎসর আমি প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাইতাম। আমার পিতা তখন বৰ্দ্ধমানে কাজ করিতেন, প্রতি শনিবার রাত্রিতে বাটী আসিতেন এবং সোমবার প্রাতে কৰ্ম্মস্থলে চলিয়া যাইতেন, সুতরাং তিনি মাসে তিন চারি বারের অধিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারিতেন না। আমি কলিকাতায় কার্য্য করিলেও প্রত্যহ বাটী হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিতাম, সুতরাং আমার পক্ষে সর্ব্বদা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে যাইবার সুবিধা ছিল। একবার, কি কার্য্যোপলক্ষে মনে নাই, উপর্য্যুপরি চারি পাঁচ দিন আমি তাঁহার কাছে যাইতে পারি নাই। চারি পাঁচ দিন পরে আমার অবসর হইবা মাত্র আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইলাম। পথিমধ্যে দেখি, তিনি আমাদের বাটীর দিকেই আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। আমি দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিবা মাত্র তিনি বলিলেন—"তুই আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছিলি, চার পাঁচ দিন তোর দেখা নেই, আমি মনে কল্লেম হয়ত তোর অসুখ করেছে। ভাল আছিস ত'? আমি তোর খবর জানবার জন্যে তোদের বাড়ীতেই যাচ্ছিলাম।"

প্রায় এক বৎসর কাল ধরিয়া যে মহাপুরুষের স্নেহ-সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাঁহার সম্বন্ধে কয়টা কথা আমি বলিতে পারিব? বিশেষতঃ সে প্রায় তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। এই বৃদ্ধ বয়সে ততদিন পূর্ব্বের কি সকল কথা মনে পড়ে?

মনে আছে, একদিন স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কথায় কথায়, আমরা ইংরেজের নিকট হইতে কি পাইয়াছি এবং ইংরেজের সংস্রবে আসিয়া আমাদের কি ক্ষতি হইয়াছে তাহারই আলোচনা হইতেছিল। সমবেত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেহ বা লাভের অঙ্কে—রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতির উল্লেখ করিলেন; কেহ বা লোকসানের অঙ্কে আমাদের স্বাস্থ্য, শান্তি প্রভৃতির উল্লেখ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নীরবে তাঁহাদের আলোচনা শুনিতেছিলেন, নিজে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। অবশেষে দুই একজন তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "লাভ লোকসান ত' কখনও খতিয়ে দেখিনে, তবে মোটের উপর আমার মনে হয়, আমরা ইংরেজের কাছ থেকে তিনটি ভাল জিনিষ পেয়েছি।" সেই তিনটি কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"প্রথম, ইংরেজী সাহিত্য। ওদের সেক্সপীয়র, মিল্টন, বেকন, সার ওয়াল্টার স্কট্ প্রভৃতি যে সাহিত্য আমরা পেয়েছি, তা বড় সামান্য লাভ বলে মনে ক'র না। তারপর দ্বিতীয় লাভ—বরফ। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে এক ঘটি জল এক টুক্‌রো বরফ দিয়ে খেলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আর তৃতীয়—পাঁউরুটি।" সাহিত্য, বরফ ও পাঁউরুটিকে এক তালিকাভুক্ত করাতে সকলে হাসিয়া উঠিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমরা আমার কথা শুনে হাসছ? কিন্তু বল দেখি পাঁউরুটির মত পথ্য আমাদের দেশে কিছু ছিল কি? এক বাটী দুধে এক খানা

পাঁউরুটি ফেলে খেলে পেট ভরে যায়, কোন অসুখ করে না। আমার ত' মনে হয়, ওরা আমাদিগকে যে সব নূতন খাবার খেতে শিখিয়েছে, তার মধ্যে পাঁউরুটি সকলের সেরা।" সে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় চিকিৎসকের পরামর্শে রাত্রিতে দুধ ও পাঁউরুটি খাইতেন।

আর একদিন বাঙ্গালীর পোষাকের কথা হইতেছিল। সকলেই জানেন যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান বিদ্যাসাগর সকল সময়েই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপযোগী পরিধেয়ই ব্যবহার করিতেন। সাদা ধুতি, সাদা চাদর এবং চটিজুতা ইহাই ছিল তাঁহার পোষাক। বাঙ্গালীর পোষাকের কথায় তিনি বলিলেন—

"একবার বড় মজা হয়েছিল। সার এশ্‌লি ইডেন তখন ছোটলাট। জার্ম্মানী থেকে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি ছোটলাটের বাড়ীতেই অতিথি হ'য়ে বাস করছিলেন। তিনি শুনেছিলেন যে আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ সহজ করে লিখেছি, অনেক শাস্ত্র ঘেঁটে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছি। তাই তিনি ছোটলাটকে একদিন বলেন—বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন। ছোটলাট তাঁর কথা শুনে বলেছিলেন—বিদ্যাসাগর আমার বন্ধু, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, কিন্তু আপনি গিয়ে দেখবেন, তিনি প্রায় উলঙ্গ (he is almost naked)। ছোটলাটের ঐ মন্তব্যটা আমি শুনেছিলাম। এর কয়েক মাস পরে, একদিন বৈশাখ মাসের দুপুর বেলা সার এশ্‌লি ইডেন কোন পরামর্শের জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। তখন দার্জ্জিলিং শিমলাতে লাট সাহেবদের যাতায়াত ছিল না। গ্রীষ্মকালে বড়লাট কল্‌কেতা ছেড়ে যেতেন বারাকপুরে আর ছোটলাটেরা কি শীত কি গ্রীষ্ম, আলিপুরে বেলভিডিয়ারে থাকতেন। আমি ছোটলাটের বাড়ীতে গিয়ে দেখি তিনি একটা অন্ধকার ঘরে, লংক্লথের ঢিলে পাজামা পরে বসে আছেন। জানলায় খসখসের পর্দ্দা, টানাপাখা চলছে, সাহেব গরমে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। ঘরে ঢুকে আমার গা যেন জুড়িয়ে গেল। যাক্, প্রথমে আমাদের কাজের কথা হ'ল, তারপর কিছু কাল এটা-ওটা বাজে কথা হ'তে লাগল। দারুণ গ্রীষ্মের কথা তুলে সাহেব হঠাৎ বল্লেন—I envy your dress (অর্থাৎ তোমার পোষাক দেখে আমার ঈর্ষা হয়)। সাহেবের কথা শুনে আমি বল্লেম, সাহেব আপনার envyর ত' কোন কারণ নেই! আমার পোষাকের দাম তিন টাকাও নয়। এক টাকার কাপড়, বার আনার চাদর আর আট আনার জুতা। এতে আর envy করবার কি আছে? যেটা আমার আয়ত্তের অতীত, সেইটার জন্যই আমার envy হতে পারে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করলেই যা সংগ্রহ কর্ত্তে পারি তার জন্য আর envy কেন? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে you envy the dress of a naked man ! আমার কথা শুনে সাহেবের সেই মন্তব্য মনে পড়ে গেল, তিনি লজ্জিত হ'য়ে বল্লেন—আমাকে ক্ষমা কর, আর কখনও তোমার সম্বন্ধে ওরকম মন্তব্য করব না। অবশ্য তোমার মত পোষাক আমিও ব্যবহার করতে পারি কিন্তু তাতে আমার লজ্জা করে। সাহেবের কথা শুনে আমি বললাম—সাহেব, লজ্জা জিনিষটা আপনাদেরই একচেটে নয়, ও জিনিষটা আমাদেরও আছে। আপনি ইংরেজ

হয়ে বাঙ্গালীর পোষাক পর্ত্তে যেমন লজ্জিত হন, আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে হয়ে, ইংরেজের পোষাক পর্ত্তে তার চেয়ে বেশী লজ্জিত হই।"

সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন— "এক সময় আমি বর্দ্ধমানে গিয়েছি শুনে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আসেন। তাঁর আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন—'বাবা, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এসেছি।' হঠাৎ আমার উপর তাঁর এই বাৎসল্যের কারণ কি বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেম। তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বল্লেন—বাবা তুমি সংস্কৃত ব্যাকরণের রেলগাড়ী তৈরী করেছ, তাই তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এসেছি। আগে, যখন রেলগাড়ী ছিল না, তখন এই বর্দ্ধমান হ'তে কল্‌কাতা যেতে তিন দিন লাগত। আর এখন ইংরেজের কৃপায় সকালে বাড়ীতে ভাত খেয়ে রেলগাড়ীতে করে কল্‌কাতায় গিয়ে সন্ধ্যার আগেই বাড়ীতে ফিরে আসতে পারা যায়। তোমার ঐ 'উপক্রমণিকা' আর চার খানা 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ঠিক যেন ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রবেশ করবার রেলগাড়ী। আমরা চতুষ্পাঠীতে দশ বার বছর ধরে পরিশ্রম করে যা আয়ত্ত কর্ত্তে পারতুম না, এখন দেখি তোমার ব্যাকরণ পড়ে এক বছরে তাই—বরং তার চেয়ে বেশী শেখা যায়। বোপদেব মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচনা করে বলেছিলেন—'পরোপকৃতয়ে ময়া।' তার কথা তুমি সার্থক করেছ। এই বলেই বৃদ্ধ তাঁর পায়ের ধূলি নিয়ে আমার মাথায় বুলিয়ে দিলেন। কতরকমই যে মানুষ আছে!"

একদিন একজন ভদ্রলোক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা আপনি এই যে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছেন, তাতে অনেকে আপনাকে ভালও বলেছেন, আবার অনেকে মন্দও বলেছেন ত'? যারা মন্দ বলছেন, তাদের কথাও আপনার কানে গেছে ত'?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"তা' অনেক গালাগাল শুনেছি বৈ কি। একদিন এক মজার ঘটনা হয়েছিল। আমি তখন ইনস্পেক্টর। হুগলী জেলাতে একটা গ্রামে স্কুল দেখে কলকেতায় ফিরে আসব বলে তাড়াতাড়ি পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে এলাম। আমি ষ্টেশনে উপস্থিত হলেম আর গাড়ীখানাও ছেড়ে চলে গেল। শুনলেম তিন চার ঘণ্টার মধ্যে আর গাড়ী নাই। (তখন এত ঘন ঘন গাড়ী ছিল না) সুতরাং ষ্টেশনের বাইরে একটা মুদীর দোকানে গিয়ে আশ্রয় নিলেম। মুদী আমাকে বসবার জন্য একখানা টুল দিল এবং তামাক খাই জেনে এক কলকে তামাক সেজে দিলে। আমি তামাক খেয়ে পাশের ময়রার দোকান থেকে কিছু সন্দেশ এনে জলযোগ সেরে নিলেম। আমি যখন জল খাচ্ছি, সেই সময় আর একজন গেরুয়া-পরা ব্রাহ্মণ সেই দোকানে এলেন। তাঁকে দেখে মুদী তাড়াতাড়ি দোকানে মাচা থেকে নেমে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে এবং খুব খাতির করে এক কলকে তামাক সেজে দিলে। সেই ব্রাহ্মণ নিজের জামার পকেট থেকে একটা ছোট হুঁকো বের করে গম্ভীরভাবে তামাক টানতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের কাপড়, জামা, চাদর সব গেরুয়া, পায়ে খড়ম,

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কপালে একটা রক্তচন্দনের ফোঁটা, বুকে জামার উপর একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা। ব্রাহ্মণ তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় মুদী কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলে---আচ্ছা দাদাঠাকুর, এই যে শুনেছি আজকাল রাঁড়ের বিয়ে হচ্ছে, এ ব্যাপারখানা কি? প্রশ্ন শুনেই দাদাঠাকুর একেবারে গরম হয়ে উঠলেন। বল্লেন—ওসব খিষ্টানী মত, হিঁদুর মেয়ের কি আর দুবার বিয়ে হয়? দেখনি, মোছলমানদের নিকে হয়, হিঁদুর ঘরেও দুলে বাগ্দীর ঘরে নিকে হয়? ও সেই রকমই, ভদ্দরলোকের মেয়ের কি আর দুবার বিয়ে হয়? মুদী বল্লে—শুনেছি, কলকেতার একজন মস্ত বড় পণ্ডিত নাকি শাস্তর দেখিয়ে রাঁড়ের বিয়ের ব্যবস্থা দিয়েছেন? দাদাঠাকুর গরম হয়ে বল্লেন—ও সেই বিদ্যাসাগরের কথা বল্‌ছ? সে বেটা আবার পণ্ডিত হল কবে? টাকা খাইয়ে গোটাকতক ফিরিঙ্গীকে আর কতকগুলো কলেজের ছেলেকে হাত করে, কোম্পানীকে বলে কয়ে বিধবা-বিবাহের আইন পাশ করেছে। সে বেটা যদি পণ্ডিত হয় তবে মূর্খ কে? মুদী নাছোড়বান্দা, সে বল্ল—আমি শুনেছি বিদ্যাসাগর নাকি বামুন পণ্ডিতের ছেলে, নিজেও বামুন পণ্ডিত? দাদাঠাকুর বল্লেন—বামুন পণ্ডিত? সে হোটেলে সাহেবদের সঙ্গে বসে খানা খায়, মাথায় টুপি, জামা ইজের বুটজুতো পরে চুরুট মুখে দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চলে, তাকে কি বামুন পণ্ডিত বলতে হবে নাকি? ব্রাহ্মণের মুখে আমার বর্ণনা শুনে আমি মনে মনে হেসে তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেম—আপনি বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন? দাদাঠাকুর বল্লেন—দেখিনি? দুবেলা আমার বাদুড়বাগানের বাসার সুমুখ দিয়ে যাতায়াত করে, আমি তাকে দেখিনি? কল্‌কেতায় তাকে না দেখছে কে? ব্যাটা হিঁদু কি ফিরিঙ্গী তা বোঝা যায় না; ইয়া লম্বা গোঁফ, চোখে চসমা। দাদাঠাকুর তো আমার রূপ বর্ণনা করে বিধবা-বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় তাই প্রচার করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যা নয় তাই বলে গাল দিতে লাগলেন। খানিক পরে, দাদাঠাকুরের মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হলে আমি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেম। তিনি নিজের নাম ও পাণ্ডুয়ার কাছাকাছি কি একটা গ্রামে তাঁর আস্তানা বল্লেন। কথায় কথায় তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। পাঁচ কথার পর তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করাতে আমি আমার নাম বল্লেম। নাম শুনেই ব্রাহ্মণ একেবারে থ হয়ে গেলেন, চক্ষু ছানাবড়ার মত ঠেলে বেরিয়ে এল, বল্লেন, আপনার নিবাস? আমি বল্লেম—কল্‌কেতা বাদুড়বাগান। শুনে ত' ব্রাহ্মণ একেবারে অবাক, মুখে আর কথা নেই। খানিক বাদে আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লেন—আপনি আপনি কোন বিদ্যেসাগর? আমি হেসে বল্লেম—যে বিদ্যেসাগর রাঁড়ের বিয়ের ব্যবস্থা দেয়, আমি সেই বিদ্যেসাগর। তবে আপনি যে বিদ্যেসাগরের কথা বল্লেন, বুটজুতো পরে ইজের জামা টুপি পরে দিন রাত চুরুট খায়, লম্বা গোঁফ, আমি সে বিদ্যেসাগর নই, সে বোধহয় আর কেউ হবে। আমি ত জীবনে কখন বুটজুতো পরিনে, চুরুট খাইনে, আর গোঁফও নেই, তা ত' দেখতেই পাচ্ছেন। আমার কথা শুনে ব্রাহ্মণ উঠে একেবারে লম্বা ভোঁ ভোঁ করে দৌড়। আমি দাদাঠাকুরকে কত ডাক দিলেম, কে শোনে? দাদাঠাকুর আর পিছনে চেয়ে দেখলেন না। মুদী আমার নাম শুনে আর দাদাঠাকুরের বাহাদুরী দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।"

আর এক দিনের ঘটনার কথায় বলিয়াছিলেন, "আমি যখন মফঃস্বলে স্কুল দেখতে যেতাম, তখন গ্রামের ভিতরে কখনও পাল্কী চড়ে যেতাম না, কেমন লজ্জা করত। গ্রামের বাইরে পাল্কী থেকে নেমে চলে গ্রামে ঢুকতেম, আমার চাপরাসিকে ও বেহারাদিগকে হয় আগে পাঠিয়ে দিতেম, নয়ত আমার অনেক পরে আসতে বলতেম। সেকালে মফস্বলে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে ইনস্পেক্টরদের স্কুল দেখতে যাওয়া যেন একটা সমারোহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। কোন দিন কোন স্কুল দেখতে যাব তা পূর্ব্বে খবর দিয়ে জানিয়ে রাখ্‌তে হ'ত। আমি ইনস্পেক্টর তার উপর বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থাদাতা বিদ্যাসাগর, তাই আমার অভ্যর্থনাটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের হ'ত। সে সময় দাশু রায়ের পাঁচালীতে[১৪] বিধবা-বিবাহের ছড়া বেরিয়েছে, শান্তিপুরে "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে" পাড় কাপড় বেরিয়েছে, সুতরাং আমি তখন একটা কেষ্টবিষ্টুগোছ হয়ে উঠেছি। মফঃস্বলে স্কুল দেখতে গেলে এই অপরূপ জানোয়ারকে দেখবার জন্য গ্রামান্তর থেকে লোক আস্‌ত। সেই সময় আমি এক বার হুগলী জেলার খানাকুল* গ্রামে স্কুল দেখতে যাই। আমার যেদিন যাবার কথা ছিল, সেদিন গিয়ে পৌঁছতে পারিনি, তার পরদিন বৈকালে গিয়ে পৌঁছলেম। গ্রাম হ'তে প্রায় পোয়াটাক দূরে পাল্কী ছেড়ে দিলেম আর বেয়ারাগুলোকে পাল্কী নিয়ে পরে আসতে বল্লেম। আমার চাপরাসীকে আগে গিয়ে স্কুলে খবর দিতে বল্লেম। দূর থেকে দেখি, গ্রামে ঢোকবার পথের উপর বাঁশ আর ডালপালা দিয়ে একটা ফটক বাঁধা হয়েছে, বুঝলেম আমারই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হয়েছে। চাপরাসী আগে যাচ্ছে, আমি তার প্রায় পঞ্চাশ হাত পিছনে চলেছি, এমন সময় দেখি একপাল মেয়েছেলে—ছেলে, যুবা, বুড়ী সব কাপড় কেচে দল বেঁধে যাচ্ছে। আমার চাপরাসীকে দেখে একজন আধাবয়েসী মেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে—তুমি কে গা? চাপরাসী বল্ল—আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চাপরাসী। শুনে সেই স্ত্রীলোকটি বল্ল—তুমি এলে তা' বিদ্যাসাগর মশাই কোথায়? সে পশ্চাতে আমাকে নির্দ্দেশ করে বল্ল—ঐ যে পিছনে আসছেন। তার কথা শুনে সেই মেয়ের দল আমার দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল। একটু পরে একজন মুখরা গোছের বুড়ী বল্লে, ঐ বিদ্যাসাগর? ঐ পোড়ার মুখ দেখবার জন্য আমরা কাল থেকে ঘর বার করছি? তার কথাগুলো আমি শুনতে পেলাম, কিন্তু সে তা বুঝতে পারেনি। আমি একটু জোরে চলে তার কাছে গিয়ে বল্লেম—হ্যাঁ মা, এই পোড়ারমুখোই বিদ্যাসাগর। কি করব বল, কার্ত্তিকের মত চাঁদমুখ নিয়ে ত' জন্মাইনি যে রূপ দেখে তোমাদের আহ্লাদ হবে। আমার কথা শুনে মাগী একগলা ঘোমটা দিয়ে দে দৌড়!"

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় চন্দননগরে বাস করিতেছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে সহবাস-সম্মতি আইন[১৫] উপলক্ষে হিন্দুসমাজে, বিশেষতঃ কলিকাতার হিন্দু-সমাজে তুমুল আন্দোলন হইতেছিল। হিন্দুসমাজের সনাতনী দল ঐ আইনের বিরুদ্ধে এবং সমাজ-সংস্কারক ও ব্রাহ্মদল আইনের সমর্থনে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া সভাতে

* বিদ্যাসাগর মহাশয় খানাকুল বলিয়াছিলেন কি সেয়াখালা বলিয়াছিলেন আমার ঠিক মনে নাই।—লেখক।

বক্তৃতা করিয়া সহর সরগরম করিয়া রাখিয়াছিলেন। কলিকাতায় পণ্ডিত স্বর্গীয় শশধর তর্কচূড়ামণি[১৬] এবং পরিব্রাজক স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন[১৭] (পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী) প্রভৃতি সম্মতি-আইনের বিরুদ্ধে প্রত্যহ বক্তৃতা করিতেন, অন্য পক্ষে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী[১৮], স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়[১৯] প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ বক্তৃতা করিতেন। তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হইত। 'বঙ্গবাসী'[২০] তখন সনাতনী দলের এবং 'সঞ্জীবনী'[২১] সংস্কারপন্থীদিগের মুখপত্র রূপে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অভিমত প্রকাশ করিতেন। সামাজিক ব্যাপার লইয়া সেরূপ ঘোরতর আন্দোলন তাহার পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। যেদিন ঐ আইন পাশ হইল, তাহার পরদিন কলিকাতায় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিকটে এক বিরাট সভা হইল, সেই সভাতে বোধ হয় এক লক্ষ লোক হইয়াছিল। প্রধানতঃ 'বঙ্গবাসী'র চেষ্টাতেই সেই বিরাট সভা হয়। সম্মতি আইন উপলক্ষে যখন কলিকাতা এইরূপ ভীষণ আন্দোলনে আন্দোলিত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন রুগ্ন দেহে চন্দননগরে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রত্যহ তাঁহার নিকটে বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইত বটে কিন্তু তিনি নিজে কোন দিন ঐ আইন উপলক্ষে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। একদিন একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে ঐ আইন সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"দু'দল বানরে দাঁত খিঁচুচ্ছে, ওতে বলবার কথা কি আছে? গোঁড়া হিন্দুর দল কচি কচি মেয়েগুলোর গলায় পা দিয়ে পরকালের পথ পরিষ্কার কচ্ছে আর কেউ যদি সেই মেয়েগুলোকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে, অমনি—'সর্ব্বনাশ হ'ল, ধৰ্ম্ম গেল' ব'লে চেঁচাতে থাকে। অন্য দিকে যারা এই আইন পাশ করাবার জন্য লাফালাফি কচ্ছে, তাদের বানুরে বুদ্ধি বলব না ত' কি বলব? তারা যেন আইন করে বার বছর পর্য্যন্ত মেয়েগুলোকে রক্ষা কর্ব্বে। কিন্তু মেয়ের বয়স বার বছর একদিন হবেই, তখন তাকে রক্ষা কর্ব্বে কি করে? আইনের সাহায্যে এইসব ব্যাপার সমাজে চালাতে চেষ্টা করা বাঁদরামি নয়ত কি? আমি অবাক হই যে লোকে একটু চেয়ে দেখে না। সমাজে শিক্ষার বিস্তার হলে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ আপনা হ'তেই সমাজ থেকে লোপ পাবে। আজকাল ত' দেখছ যে ভদ্দরলোকের বাড়ীতে বার বছরের আইবুড় মেয়ে থাকলে মেয়ের মা-বাপের আহার নিদ্রা ঘুচে যায়। যদি বেঁচে থাক ত' দেখবে, এর পরে বার বছর তের বছরের মেয়ের বিয়ের কথা বড় কেউ শুনতেই পাবে না। পনের ষোল বছরের না হ'লে কেউ মেয়ের জন্য বর খুঁজতে বেরুবে না। সমাজের গতি যে কোন্ দিকে তা কেউ চোখ চেয়ে দেখবে না, কেবল চোখ বুজে 'গেল, গেল' বলে চেঁচাবে। সব বাঁদরের দল।"

পাঠকগণ দেখিবেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দূরদৃষ্টি কিরূপ প্রখর ছিল। তিনি হিন্দু ভদ্রলোকের কন্যাদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, আজ তাহা সর্ব্বত্র বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। মহাপুরুষদিগের লক্ষণ-ই এই যে, তাঁহারা সমাজের ভবিষ্যৎ অবস্থা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়া সমাজকে সেই অবস্থার উপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু অদূরদর্শী লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চেষ্টা পণ্ড করিবার প্রয়াস পায়।

কোন সাংসারিক সমস্যা উপস্থিত হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সুন্দর রূপে সেই সমস্যার নিরাকরণ করিয়া দিতেন। একদিন বৈকালে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময় কলিকাতা হইতে তাঁহার পরিচিত কোন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আগন্তুক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নিকটে কত লোকের শারীরিক ও পারিবারিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে কথায় কথায় সেই ভদ্রলোক তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের অকৃতজ্ঞতা ও অন্যায় ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"আপনি ত' সবই জানেন, বাবা যখন মারা যান, তখন, কত কষ্ট করে আমার ভাইকে মানুষ করেছিলেম। নিজে পেটে না খেয়ে তাকে খাইয়ে ছিলেম, স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে তাকে কলেজে পড়ালেম, তার বিবাহ দিলেম। এখন সে বেশ দশটাকা উপার্জ্জন কচ্ছে, কিন্তু আমাকে একেবারে ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। বড় আশা করেছিলেম যে সে মানুষ হ'লে আমার সাংসারিক কষ্ট ঘুচবে, আমি শেষ বয়সে সুখের মুখ দেখতে পাব। কিন্তু এমনই আমার কপাল যে, এখন সে আমায় দশটা টাকা দিয়েও সাহায্য করে না, সাহায্য করা ত' দূরের কথা একখানা পত্র দিয়েও খবর নেয় না যে দাদা আছে কি মরেছে।" ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নীরবে সেই ভদ্রলোকের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া শেষে বলিলেন, "দুনিয়ার নিয়মই এই। ব্যবসা কর্ত্তে গেলে লাভও হয় লোকসানও হয়। তোমার ব্যবসাতে লাভ আর হ'ল না, লোকসানই হ'ল।"

তাঁহার কথা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,"ব্যবসার কথা কি বলছেন, আমি ত' বুঝতে পাল্লাম না। কোন্ ব্যবসায়ে আমার লোকসান হ'ল?"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"ব্যবসা নয়ত কি? তুমি ত' কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ভাইকে মানুষ করনি, ভাই বড় হয়ে টাকা রোজগার করে তোমাকে মুঠো মুঠো টাকা দেবে, এই আশাতে স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে মূলধন হিসাবে টাকা খরচ করেছিলে। এখন দেখ্‌ছ সেই ব্যবসাতে লোকসান হ'ল। তুমি বড় ভাই, পিতৃহীন ছোটভাইকে মানুষ করা তোমার কর্ত্তব্য. এই বুদ্ধিতে যদি তুমি ভাইকে মানুষ কর্ত্তে, তা'হলে আজ আর তোমাকে হতাশ হয়ে আফশোস কর্ত্তে হত না। এই যে আমার কত আত্মীয়স্বজন আমার কাছ থেকে কত রকম সাহায্য পেয়ে, এখন আমাকে গ্রাহ্যই করে না, বরং অনেক সময় আমার অনিষ্ট চেষ্টাই করে, সেজন্য ত' আমার কোন দুঃখ হয় না। কারণ আমি যখন তাহাদিগকে সাহায্য করেছিলেম তখনও কোন প্রতিদান পাবার আশায় সাহায্য করিনি, আমার কর্ত্তব্য ভেবেই আমি সাহায্য করেছি। তুমি ত' সে পথে যাওনি, তুমি যে লাভের আশায় মূলধন বের করেছিলে। তা' সব ব্যবসাতে কি আর লাভ হয়?" ভদ্রলোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শুনিয়া লজ্জায় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেত খাওয়া'র গল্প বোধহয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। চন্দননগরের তদানীন্তন দানবীর স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের দাতব্য

কবিরাজী চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক কবিরাজ স্বর্গীয় রামহরি পাল প্রায় প্রত্যহই বৈকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময় নিজের পীড়া সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয়ের অভিমত ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন। চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রেও কবিরাজ মহাশয়ের জ্ঞান ছিল। কিন্তু তাঁহার একটা রোগ ছিল, কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাইলেই তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বভাব ছিল ঠিক তাহার বিপরীত। তিনি সহজে কাহারও সহিত কোন বিষয়ে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরিচিত হইবার কয়েক দিন পরে, একদিন কবিরাজ মহাশয় কথায় কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা মহাশয় এই যে সব শাস্ত্রেই মুক্তির কথা দেখতে পাই, সে মুক্তিটা কি রকম?" বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কবিরাজ মহাশয় আবার সেই প্রশ্ন করিলেন, সেবারও বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। এইরূপে তিনি চারিবার জিজ্ঞাসিত হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"কেন বাবু আর এই বুড়ো বামুনকে বেত খাওয়াবে?" ঐকথা শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—"সে কি মহাশয়, আমি আপনাকে বেত খাওয়াব কিরূপে?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"তা' নয়ত কি? ও মুক্তি, নির্ব্বাণ, পরলোক, স্বর্গ, নরক সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা আছে, তুমি তাই নিয়ে থাক—আমার যা ধারণা আছে, আমি তাই নিয়ে থাকি। মুক্তি সম্বন্ধে আমার যা' বিশ্বাস আছে, সেটা হয়ত ভুল বিশ্বাস। এই ভুল বিশ্বাসের ফলে ম'লে পর যখন যমের বাড়ী যাব, তখন চিত্রগুপ্ত বলবে—'বুড়ো বিট্‌লে, মুক্তি সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা? দাঁড়াও তোমার ধারণা ঘোচাচ্ছি।' এই বলেই একটা যমদূতকে হুকুম কর্ব্বে 'লাগাও বুড়োকে বিশ বেত।' যমদূত এসে আমাকে শপাশপ বেত লাগাবে। এমন সময় হয়ত তুমি সেখানে গিয়ে হাজির হ'লে, চিত্রগুপ্ত যখন তোমাকে মুক্তির তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করবে তখন তুমি আমার মুখে যা শুনবে তাই বলবে। চিত্রগুপ্ত যখন জিজ্ঞাসা কর্ব্বে 'এ তত্ত্ব কার কাছে শুনেছিলি?' তখন তুমি আমাকে দেখিয়ে বলবে 'উনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন।' চিত্রগুপ্ত তাই শুনে আমাকে বলবে 'বটেরে বিট্‌লে বামুন, নিজেও মজেছ আবার পরকেও মজিয়েছ?' এই বলেই যমদূতকে হুকুম কর্ব্বে 'লাগাও বুড়োকে আর বিশ ঘা।' তা' বাপু, আমি একে নিজের বেতের ঘায়ে জ্বলে মরছি, তার উপর তুমি আবার কেন বেত খাওয়াবে? ওসব নিজে বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যা ভাল বোঝ তাই কর, অন্য লোককে ওসব কথা জিজ্ঞাসা করে আর ফ্যাসাদে ফেল না।"

এইরূপ কতদিন কত কথা সেই মহাপুরুষের মুখে শুনিয়াছি এবং যুবজনসুলভ চপলতায় তাহার কেবল হাস্যরসটুকুই উপভোগ করিয়াছি, তাহার অন্তরালে যে কত বড় সত্য নিহিত আছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এখনই কি পারি?

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ[২২]

আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্রবে আসিবার অল্পদিন পরেই তিনি লোকান্তরে গমন করেন। আমি 'হিতবাদী'র[২৩] সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্যগ্রহণের প্রায় আড়াই বৎসর পরে বিশারদ মহাশয়ের মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁহাকে জানিবার ও তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় পাইবার যথেষ্ট সুবিধা আমি পাই নাই। তথাপি, যতটুকু সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম, তাহাতেই বুঝিয়াছি যে প্রাণহীন, কর্মহীন, আত্মমর্যাদাহীন বাঙালী জাতির মধ্যে তিনি একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তিনি অনন্যসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন না, অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন না, অতুল ধনবান ছিলেন না, তথাপি তিনি যাহা ছিলেন তাহা বঙ্গদেশে দুর্লভ। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, তাঁহার ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহার ন্যায় উদার, তাঁহার ন্যায় নির্ভীক বাঙলীর মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

কাব্যবিশারদ মহাশয়ের যে কোন দোষ ছিল না, তাহা আমি বলি না। অতি অল্প সময়ের জন্যও যিনি তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন, তিনিই লক্ষ্য করিয়াছেন যে তিনি 'বদরাগী' ছিলেন। কণামাত্র অন্যায় তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। যেরূপ অন্যায় কার্য্য আমরা অপরকে করিতে দেখিলে উপেক্ষা করি। অথবা সামান্য বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হই, বিশারদ মহাশয় সেরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিলে তিনি ক্রোধে অন্ধ হইতেন। কিন্তু সে ক্রোধ অধিকক্ষণ থাকিত না; তালপত্রের অগ্নির ন্যায় তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াই তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইত। যখন তিনি কোন কারণে, কোন ব্যক্তির উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন, তখন যদি কোনরূপে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারা যাইত যে, তিনি অকারণে ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা হইলে, তিনি, ক্রোধের কারণ অন্যায় বুঝিবামাত্র ক্রোধ ত্যাগ করিতেন এবং অনুতপ্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার এই ক্রোধ ও অনুতাপের একটা দৃষ্টান্ত দিই। একদিন বিশারদ মহাশয় মধ্যাহ্নকালে হিতবাদী অফিসে আসিয়াই প্রায় একমাস পূর্ব্বেকার একখানা মফঃস্বলের বাঙ্গলা সংবাদপত্র দেখিতে চাহিলেন। তিনি কাহারও নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, সেই কাগজে হিতবাদী সম্বন্ধে কি একটা অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক অনেক অনুসন্ধান করিয়াই যখন সেই কাগজ পাওয়া গেল না, তখন তিনি অফিসের তদানীন্তন সরকারকে ডাকিয়া যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন এবং সরকারের দুই টাকা জরিমানা করিলেন। আমি তখন হিতবাদী অফিসে নূতন লোক। আমি দেখিলাম যে সরকার বেচারার কোন দোষ নাই। সুতরাং সেই গরীবের অর্থদণ্ডের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "আপনি সরকারের জরিমানা করিলেন, কিন্তু তাঁহার দোষ কি? সংবাদপত্রের অফিস দিনরাত্রি খোলা থাকে, বাহিরের কত লোক কত সংবাদ লইয়া সর্ব্বদা অফিসে যাতায়াত করিতেছে, হয়ত কেহ সেই কাগজখানা হাতে করিয়া অফিস হইতে চলিয়া গিয়া থাকিবে। সরকারবাবু সকল সময় অফিসে উপস্থিত থাকেন না। সুতরাং তিনি কিরূপে দায়ী হইবেন?"

আমার কথা শুনিবামাত্র বিশারদ মহাশয়ের ক্রোধ দূর হইল। তিনি কেবল যে সরকারবাবুর জরিমানা মাফ করিলেন তাহা নহে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা

করিলেন। এই ঘটনার পরে বহুবার আমি বিশারদ মহাশয়কে এইরূপ ক্রটি স্বীকার করিতে দেখিয়াছি। এইরূপ ক্রটি স্বীকারে বড় সামান্য মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না। মহাত্মা গান্ধী আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিবামাত্র সে ভ্রম স্বীকার করেন এবং ভ্রমের জন্য যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। বিশারদ মহাশয় এইরূপ 'বদরাগী' ছিলেন বলিয়া তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে 'কালী-কেউটে' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন।

. বিশারদ মহাশয়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমি হিতবাদী অফিসের পুরাতন কর্ম্মচারীদের মুখে যে সকল কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাই, তাহাতে তাঁহার তেজস্বিতা ও মহানুভবতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কিরূপ তেজস্বী ছিলেন তাহার একটি উদাহরণ দিই। হিতবাদী অফিসের সম্পাদকীয় বিভাগে বাহিরের লোকের সহজে প্রবেশাধিকার ছিল না, দ্বারবানের নিকটে কাগজ পেন্সিল থাকিত। তাহাতে আগন্তুকের নাম, কি প্রয়োজনে, কাহার কাছে আসিয়াছেন, তাহা লিখিয়া দ্বারবানের দ্বারা পাঠাইয়া দিতে হইত। পরে, দ্বারবান অনুমতি পাইলে আগন্তুককে সঙ্গে করিয়া অফিসের মধ্যে লইয়া আসিত। যে কক্ষে সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পন্ন হইত, সেই কক্ষের দ্বারে পরদা ছিল, পরদার বাহিরে দ্বারবান বসিয়া থাকিত। একদিন কলিকাতার কোন থানার একজন শ্বেতাঙ্গ ইন্‌স্পেক্টর বিশারদ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হিতবাদী অফিসে আগমন করিলেন এবং দ্বারবানকে বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর সাহেব কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন, লিখিয়া দিতে বল।" দ্বারবান সাহেবকে প্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বলিলেন, "আমি তাহার সহিত দেখা করিতে চাই, কিছু লিখিয়া দিব না।" দ্বারবান বিশারদ মহাশয়ের নিকট আসিয়া সেই কথা বলিবামাত্র তিনি সক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "নিকাল দেও উস্কো।" সাহেব পরদার বাহির হইতে সেই কথা শুনিয়া অধোবদনে প্রস্থান করিলেন।

শ্বেতাঙ্গগণ সাধারণতঃ দেশীয়দিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, বিশারদ মহাশয় সুযোগ পাইলে শ্বেতাঙ্গদের সহিত ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। অথচ তাঁহার অধীন দেশীয় কর্মচারীদের সহিত তাঁহার ভদ্র ব্যবহার দেখিলে চমৎকৃত হইতে হইত। ৮/১০ টাকা বেতনের সামান্য অল্পবয়স্ক কম্পোজিটারকে তিনি কখনও 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন না। সকলকেই 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অফিসের বাইরে প্রত্যেক কর্ম্মচারীকেই তিনি আপনার বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। অফিসের কোন কর্ম্মচারীকে কোন বিষয় আদেশ করিতে হইলে "অনুগ্রহ করে এই কাজটা করুন" সর্ব্বদাই এইরূপ বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। এবং কার্য্য শেষ হইবামাত্র তাহার জন্য ধন্যবাদ করিতেন। আমরা কতবার দেখিয়াছি, এক কলম কালি, কি একখানা কাগজ চাইতে হইলে তিনি "অনুগ্রহ করে এক কলম কালি দিবেন?" এই কথা বলিতেন।

বিশারদ মহাশয়ের তেজস্বিতা কেবল যে শ্বেতাঙ্গের নিকটেই প্রকাশিত হইত তাহা নহে। তিনি যাঁহাকে গুরু বলিয়া মান্য করিতেন, তাঁহার কোন বিষয়ে ক্রটি দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উল্লেখ করিতেন। বিশারদ মহাশয়, তদানীন্তন

জননায়ক দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৪৮-১৯২৫] মহাশয়কে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বাস্তবিকই রাজনীতিক বিষয়ে সুরেন্দ্রবাবু বিশারদ মহাশয়ের গুরু ছিলেন। কিন্তু এই গুরুজীও অনেকসময় বিশারদের এই বিষম বাক্যবাণ হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ[২৪] অবধারিত জানিয়া, যেদিন কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভা[২৫] আহ্বানপূর্ব্বক বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের সঙ্কল্প প্রচার করা হয়, সেই দিন সুরেন্দ্রবাবু স্বদেশজাত বস্ত্রের চোগা, চাপকান প্রভৃতি পরিধান করিয়া সভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু বোধহয় ভুলক্রমে বিলাতী 'ক্রিস্টিজ ক্যাপ' মাথায় দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করিয়া উপবেশন করিবামাত্র বিশারদ মহাশয় বলিলেন, "গুরুজী, নিজে বিলাতী টুপি মাথায় দিয়া বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব করিতেছেন?" সুরেন্দ্রবাবু ঐ কথা শুনিবামাত্র মাথা হইতে টুপি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই ঘটনা সেদিন টাউন হলের সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের জন্য যে স্বদেশী আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলনের প্রথম প্রবর্ত্তক কে, ইহা লইয়া অনেকের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ আছে। অনেকেই সুরেন্দ্রবাবুকে ঐ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে আমি বলিতে পারি যে, সুরেন্দ্রবাবু উহার প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন, প্রধান প্রচারক মাত্র। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের উর্ব্বর মস্তিষ্কেই স্বদেশী আন্দোলনের বিষয় প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যখন গভর্ণমেণ্ট বঙ্গের জনসাধারণের প্রবল প্রতিবাদ ও তুমুল আন্দোলন উপেক্ষা করিয়া, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ অবধারিত বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন সুরেন্দ্রবাবু, কৃষ্ণকুমার বাবু,[২৬] কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। বিশারদ মহাশয় অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে অবনত মস্তকে আসিয়া আমাদের অফিসে উপবেশন করিলেন। স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর[২৭] তখন হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক। সখারামবাবু বিশারদ মহাশয়কে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন "গুরুজীর মুখে শুনিলাম, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ হইবেই। দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই গেজেট হইবে।" তাহার পর এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ নানা প্রকার আলোচনা চলিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বিশারদ মহাশয় সহসা বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন সখারামবাবু, আমার বোধ হয় এখনও একটা উপায় আমাদের হাতে আছে। যদি আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের গলা টিপিয়া ধরিতে পারি তাহা হইলে পার্লামেণ্ট ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুরোধে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বাধ্য হইবে।"*

সখারামবাবু বলিলেন, "ম্যাঞ্চেষ্টারের গলা টিপিব কি প্রকারে?"

বিশারদ বলিলেন, "যদি আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের ধুতি, শাড়ী ও উড়ানি ব্যবহার না

* ইহা একরূপ ইতিহাস প্রসিদ্ধ যে, বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব প্রথমে ময়মনসিংহ জেলায় ঘোষিত হয় এবং কলিকাতায় নেতারা পরে তাহা গ্রহণ করেন। যোগীন্দ্রবাবুর উল্লিখিত ঘটনা হইতে মনে হয় বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হইলে ইংল্যাণ্ড ও ইংরাজ জাতিকে সাক্ষাতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে একটি কার্য্যকরী প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা বাংলার নেতাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই সমানভাবে অধিকার করিয়াছিল।—প্রঃ খঃ

করি, তাহা হইলেই ম্যাঞ্চেষ্টারের চক্ষুঃ স্থির হইবে। বেশী কিছু করিতে হইবে না, কেবল ম্যাঞ্চেষ্টারের ধুতি, উড়ানি ও শাড়ী ত্যাগ করিতে পারিলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে।"

সখারামবাবু প্রথমে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহার সে ধারণা দূর হইল। তখন বিশারদ বলিলেন, "একবার গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করি, দেখি কি বলেন।"

তখন 'হিতবাদী' অফিস ও 'বেঙ্গলী'[২৮] অফিস খুব কাছাকাছি ছিল। বিশারদ মহাশয় 'বেঙ্গলী' অফিসে সুরেন্দ্রবাবুর নিকট গমন করিলেন, আমি সঙ্গে গেলাম। বিশারদ মহাশয় সুরেন্দ্রবাবুর নিকটে ম্যাঞ্চেষ্টারকে বয়কট করিবার প্রস্তাব করিবামাত্র সুরেন্দ্রবাবু প্রথমে "Impossible" (অসম্ভব) বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু বিশারদ মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি তাঁহার গুরুজীর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে সুরেন্দ্রবাবু স্বীকার করিলেন যে, ম্যাঞ্চেষ্টারকে বয়কট করিতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। ইহার পর কৃষ্ণকুমার মিত্র, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ,[২৯] আবুল হোসেন[৩০] প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারকে বয়কট করিবার জন্য স্বদেশী আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করাই স্থির হইল। ইহার কয়েকদিন পরে টাউন হলের বিরাট সভাতে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন প্রচারিত হইল। সে সভার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

স্বদেশী আন্দোলনকে সার্থক করিবার জন্য কাব্যবিশারদ যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, আমি সেরূপ করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। এই সময় তিনি অনেকগুলি স্বদেশী সংগীত রচনা করিয়া, সেই সকল সংগীত প্রচারের জন্য একটি গায়কদল গঠন করেন। তিনজন সুকণ্ঠ ও সংগীতজ্ঞ গায়ককে বেতন দিয়া প্রায় দুই বৎসরকাল প্রতিপালন করিয়াছিলেন। গায়ক তিনজনের মাসিক বেতন প্রায় একশত টাকা এবং তাহাদের নানা স্থানের যাতায়াতের ব্যয়ভার বিশারদ মহাশয় একাকী বহন করিতেন। গায়কগণ ভবানীপুরে বিশারদ মহাশয়ের বাটীতেই অবস্থান করিতেন। সেইখানেই আহারাদি করিতেন। এই গায়কের জন্য সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার মাসিক দুইশত টাকারও অধিক ব্যয় হইত।

বিশারদ মহাশয় স্বদেশী আন্দোলনকে সার্থক করিবার জন্য কেবল যে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন তাহা নহে, দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজের স্বাস্থ্য এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য বঙ্গের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। প্রথমে জ্বর তাহার পর শোথ দেখা দিল। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন, 'ব্রাইট্‌স ডিজিস্'। চিকিৎসা চলিতে লাগিল, চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বিশারদ সে পরামর্শে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। যখন জ্বর হয়, তখন বাধ্য হইয়া সভাসমিতিতে গমন বন্ধ রাখেন, জ্বর ত্যাগ করিলেই দূর-দূরান্তরে সভা করিতে যান। এবং প্রবল জ্বর লইয়া বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইরূপে তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সময় আমি একদিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভবানীপুরে তাঁহার বাটীতে গমন করি। আমি

কথায় কথায় তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি অসুস্থ শরীরে এইরূপ সভাসমিতি করিলে কতদিন বাঁচিবেন? দেখিতেছি আপনি আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।"

আমার কথা শুনিয়া তিনি প্রায় ২/৩ মিনিট স্থিরভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "দেখুন যোগীনবাবু, পৃথিবীর সকল দেশের লোকেরই স্বদেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জনের অধিকার আছে, সেই অধিকার নাই কেবল আমাদের। আমরা স্বদেশের জন্য লড়াই করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত, আমার বিশ্বাস যে স্বদেশী আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিলে দেশের অনেক মঙ্গল হইবে। যদি আমি এই আন্দোলনকে সার্থক করিবার জন্য আমার প্রাণ বিসর্জ্জন করি, তাহা হইলে, যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত বীরের মত আমারও প্রাণে এই শান্তি পাইব যে দেশের জন্য আমি প্রাণ দিলাম।"

বিশারদের এই মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি দেশের চিন্তা, জননী জন্মভূমির চিন্তা করিতে করিতেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। জাপান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভারত মহাসাগরে ষ্টীমারে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ষ্টীমারের চিকিৎসক—বিশারদের প্রতিবেশী ও স্নেহভাজন প্রবোধবাবু বিশারদের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে তিনি একটি কবিতা লিখিতেছেন। ইহার পরে প্রবোধবাবু গিয়া দেখিলেন যে টেবিলের উপর অসমাপ্ত কবিতা পড়িয়া রহিয়াছে, আর বিশারদের আত্মা তাঁহার ক্ষণভঙ্গুর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিত এই অসম্পূর্ণ কবিতাও জন্মভূমির উদ্দেশ্যেই লিখিত। এমন স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশবাসীও ধন্য।

কাব্যবিশারদ মহাশয় মৃত্যুর পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিয়া এই কবিতাটি লিখিতেছিলেন।

(১)

এই কি জীবন শেষ? জীবনরঞ্জিনি!
কোথা প্রিয় জন্মভূমি?
কোথা তুমি? কোথা তুমি?
পড়িল কি যবনিকা সহসা এখনি?
উচ্চ আশা উপদেশ
সকলেরই এই শেষ?
শীর্ণ, ক্লিষ্ট চিন্তাকুল রোগীর শয্যায়
সমুদ্রে, বাষ্পীয় পোতে, বারিচর প্রায়।

(২)

তোমার মহিমা গা'ব ওগো বঙ্গভূমি!
লাঞ্ছিত তোমার নাম
দেখে তবু চলিলাম
এ দীর্ঘ জীবন বৃথা দেখিলেও তুমি

এ দুঃখ রহিল মনে
তোমার সন্তানগণে
না দেখিয়া সমাদৃত, শমন-সদনে
যেতে হলো, মন-সাধ রহিল মা মনে।

মৃত্যুর পূর্ব্বে যতক্ষণ তাঁহার জ্ঞান ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে তিনি তাঁহার প্রিয়তম স্বদেশ ও স্বদেশবাসীদিগের শোচনীয় অধঃপতনের জন্য প্রাণে কিরূপ বিষাদ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত কবিতা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ভক্ত সাধু মৃত্যুকালে ইষ্ট দেবতাকেই স্মরণ করিতে করিতে লোকান্তরে গমন করেন, কাব্যবিশারদও তাঁহার একমাত্র উপাস্য জন্মভূমির কথা চিন্তা করিতে করিতে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। তাহার বড় সাধ ছিল—

"যায় যেন জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতারম্' বলে।"

তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি জননী জন্মভূমির বন্দনা গান করিতে করিতেই জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিশারদের স্বদেশানুরাগ, স্বদেশপ্রীতি অতুলনীয়। ধন্য সেই মহাপুরুষ যিনি জন্মভূমির কল্যাণ চিন্তা করিতে করিতে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

কাব্যবিশারদ মহাশয়ের চরিত্রের অসাধারণত্ব বিশদভাবে দেখাইতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে। তাঁহার সাহস, তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা, তাঁহার উদারতা, তাঁহার স্বদেশানুরাগ সমস্তই অনন্যসাধারণ। তাঁহার ঘোর শত্রুও স্বীকার করে যে বিশারদের ন্যায় নির্ম্মল চরিত্রের লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। আর তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে যে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা যিনি তাঁহার বন্ধুত্ব লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তিনিই জানেন। তাঁহার ন্যায় সদানন্দ, রঙ্গপ্রিয়, সদাপ্রফুল্ল বন্ধুলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বিশারদকে যাঁহারা জানিতেন, চিনিতেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন সে কি অপূর্ব্ব চরিত্র অসামান্য উদ্যম, দুর্দ্ধর্ষ তেজ লইয়া কালীপ্রসন্ন বাঙালীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভূদেব প্রসঙ্গ

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সান্নিধ্যলাভ করিবার সৌভাগ্য আমার যেরূপ হইয়াছিল, স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সান্নিধ্যলাভের সেরূপ সৌভাগ্য আমার হয় নাই, অথচ ভূদেববাবুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বৎসরাধিক কাল আমাদের প্রতিবেশীরূপে চন্দননগরে বাস করিয়াছিলেন এবং তখন আমি বালক ছিলাম না, তখন আমি কলেজ ছাড়িয়া কলিকাতায় জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভূদেববাবুর যখন মৃত্যু হয়

তখন আমি কলেজের ছাত্র; চুঁচুড়ায় ভূদেববাবুর বাটী আমাদের কলেজ হইতে বিশেষ দূরে অবস্থিত না হইলেও তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাইবার সুবিধা পাইতাম না। ভূদেববাবুও রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ সময় কাশীধামে বাস করিতেন, মধ্যে মধ্যে চুঁচুড়ায় আসিতেন, সুতরাং কখন তিনি চুঁচুড়ায় আসিতেন, তাহা সকল সময় আমি জানিতে পারিতাম না।

আমি বলিয়াছি যে, ভূদেববাবুর সহিত আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; সেই সম্বন্ধ কিরূপ, তাহার উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে নর্ম্ম্যালি স্কুল স্থাপিত হয়। ভূদেববাবু হাওড়া জিলা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ ইয়ং ভূদেববাবুকে চুঁচুড়ায় নর্ম্ম্যালি স্কুল স্থাপনের ভার প্রদান করিলে ভূদেববাবু চুঁচুড়ায় আগমন করেন। আমার পিতার বয়স তখন উনিশ-কুড়ি বৎসর। চুঁচুড়াতে একটি নূতন স্কুল হইবে এবং সে স্কুলে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিবে, তাহারা মাসিক চারি পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবে এবং পরে তাহাদের গভর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগে কার্য্য পাইবার আশা আছে, লোকমুখে এইকথা শুনিয়া আমার পিতা চুঁচুড়াতে গিয়া ভূদেববাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পিতার মুখে, আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া ভূদেববাবু তাঁহাকে বলেন যে, কয়েক দিন পরে বিদ্যার্থী ছাত্রদিগের একটা পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, যে সকল ছাত্র সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, কেবল তাহাদিগকেই বৃত্তি প্রদান করা হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে পিতৃদেব পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলেন এবং নর্ম্ম্যালি স্কুলে ছাত্ররূপে গৃহীত হইলেন। পিতার মুখে শুনিয়াছি যে, স্কুলের রেজিষ্ট্রি-বহিতে তাঁহার নাম লিখিবার সময় ভূদেববাবু আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন—"নূতন স্কুলের প্রথম রেজিষ্ট্রি-পুস্তকে প্রথমে তোমার নাম লিখিয়া 'বউনি' করিলাম, দেখা যাক্ তোমার 'পয়্' কেমন।" আমার পিতাই হুগলী নর্ম্ম্যালি স্কুলের প্রথম ছাত্র ছিলেন।

হুগলীতে নর্ম্ম্যালি স্কুল স্থাপনের পূর্ব্বে মাত্র কলিকাতাতে একটি নর্ম্ম্যালি স্কুল ছিল; পরে ঢাকা, হুগলী ও কটকে নর্ম্ম্যালি স্কুল স্থাপিত হয়। এই চারিটি নর্ম্ম্যালি স্কুলের পরীক্ষা একসঙ্গে হইত, অর্থাৎ একইদিনে একই রূপ প্রশ্ন-পত্র দ্বারা চারিটি স্কুলে ছাত্রদিগের পরীক্ষা করা হইত। নর্ম্ম্যালি স্কুলে তিন বৎসর অধ্যয়নের পর শেষ পরীক্ষাটাই একযোগে হইত, সেই পরীক্ষাকে সকলে 'ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা' বলিত; এখনও নর্ম্ম্যালি স্কুলে ঐ ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা প্রচলিত আছে। পিতৃদেব ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করাতে ভূদেববাবু অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং পরীক্ষার পরই আমার পিতাকে হুগলী নর্ম্ম্যালি স্কুলেই শিক্ষকতা প্রদান করেন।

এইরূপে ভূদেববাবুর সহিত আমার পিতার শিক্ষক ও ছাত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাহার পর যত দিন ভূদেববাবু কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, আমার পিতা ততদিন তাঁহারই অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর সরকারী শিক্ষা বিভাগে কার্য্য করিয়া তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিলে ভূদেববাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ কি?" দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দীক্ষা লইতে

আদেশ করিলে বাবা বলেন, "যদি আপনি আমাকে দীক্ষা দেন তবেই দীক্ষা গ্রহণ করিব, অন্য কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিব না, কারণ আপনার প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি হয় অন্য কাহারও প্রতি সেরূপ হয় না।" পিতার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া ভূদেববাবু তাঁহাকে দীক্ষাপ্রদানে সম্মত হইলেন এবং কয়েকদিন পরে দীক্ষা প্রদান করিলেন। এইরূপে ভূদেববাবু আমার পিতার শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু হওয়াতে তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

আমার পিতা কি বৈষয়িক, কি সাংসারিক এবং কি পারলৌকিক সকল বিষয়েই ভূদেববাবুর উপদেশ গ্রহণ করিতেন। পিতার মুখে শুনিয়াছি যে ভূদেববাবুই আমাদের কয় সহোদরের নামকরণ করিয়াছিলেন। আমার পিতা ভূদেববাবুর পত্নীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং সেই মহীয়সী মহিলাও বাবাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি অনেক সময় আমার জননীকে তাঁহাদের চুঁচুড়ার বাটীতে লইয়া গিয়া একাদিক্রমে একমাস দেড়মাস রাখিতেন; সে সময় আমার মাতামহী যদি আমার জননীকে বাটীতে আনিবাব প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলে ভূদেববাবুর পত্নী বলিতেন, "আমার বৌকে আমি এখন পাঠাইব না, যখন ইচ্ছা হইবে পাঠাইব, বেয়ান রাগ করেন, ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইবেন।"

আমি বাল্যাবস্থায় বহুবার আমার মাতার সঙ্গে ভূদেববাবুর বাটীতে গিয়াছি, কিন্তু তখন আমি বালক মাত্র, সদর বাটীতে ভূদেববাবুর কাছে বড় যাইতাম না, অন্দরে মাতার নিকটেই অধিকাংশ সময় থাকিতাম। ভূদেববাবুর পত্নীকে আমি দেখি নাই, কারণ আমার জ্ঞানসঞ্চারের পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পত্নীবিয়োগের পর হইতে ভূদেববাবুও আহারের সময় এবং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে অন্তঃপুরে গমন করিতেন না। সেইজন্য ভূদেববাবুর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার বড় অধিক হয় নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং ভূদেববাবু উভয়ে আকৃতি ও প্রকৃতিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন শ্যামবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, সাদাসিধা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোছের লোক, আর ভূদেববাবু ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি, রাসভারী লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন মজলিসী—নানা প্রকার গল্প করিতেন, সকলকে হাসাইতেন; ভূদেববাবু ছিলেন গম্ভীর-প্রকৃতি, অল্পভাষী; বিদ্যাসাগর মহাশয় মোটা থান ধুতি পরিধান করিতেন, ভূদেববাবু বাটীতে সর্ব্বদা ফরাসডাঙ্গার চওড়া-পাড় সূক্ষ্ম ধুতি (তাহাকে ধুতি না বলিয়া শাড়ী বলাই সঙ্গত) ব্যবহার করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গোঁফ, দাড়ি ও মাথার সম্মুখ ভাগ কামাইতেন, মাথার পশ্চাৎ দিকে একটি ক্ষুদ্র শিখাও ছিল, আর ভূদেববাবুর তুষারধবল আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু অথচ মাথায় যুবজনোচিত কৃষ্ণ কেশ। উভয়েই ব্রাহ্মণ অধ্যাপক পণ্ডিতের সন্তান, উভয়েরই সনাতন হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ় আস্থা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় ভূদেববাবুও সর্ব্বদা ধূমপান করিতেন, সর্ব্বদা ধূমপান হেতু ভূদেববাবুর সুশুভ্র গুম্ফ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অল্প দামের একটা হুঁকাতে ধূমপান করিতেন আর ভূদেববাবু

সুদীর্ঘ-নল আলবোলাতে ধূমপান করিতেন। ভূদেববাবু লাট-দরবারে বা ব্যবস্থাপক-সভা প্রভৃতিতে যাইবার সময় চোগা চাপকান পাগড়ী ব্যবহার করিতেন; সে সময় তাঁহাকে দেখিলে একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ইহুদী বা মোগল বলিয়া মনে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভোজনকালে আমি কখনও উপস্থিত ছিলাম না, সুতরাং তাঁহার ভোজনের প্রক্রিয়া কিরূপ ছিল তাহা জানি না; ভূদেববাবুকে অনেকদিন ভোজন করিতে দেখিয়াছি, তিনি ভোজনকালে চামচ ও কাঁটা ব্যবহার করিতেন, কখনও তাঁহাকে হাতে করিয়া খাইতে দেখি নাই। ভূদেববাবু প্রত্যেক দিন মাংস খাইতেন।

ভূদেববাবুর সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমার মনে একটা আশঙ্কার উদয় হয়। আমার মনে হয় যে ভূদেববাবুর নাম ছাড়া আর কিছু একালের অনেকে অবগত নহেন। কিন্তু সেকালে ভূদেববাবু বঙ্গদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং শিক্ষা বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসীই স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন নাই। কিছুদিনের জন্য তিনি শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। সেকালের শিক্ষা-বিভাগে তাঁহার ন্যায় উচ্চ বেতনভোগী দেশী কর্ম্মচারী কেহই ছিলেন না।

কিন্তু ভূদেববাবুর এই কর্ম্মজীবনের জন্য তাঁহার বিষয় আলোচ্য নহে, অন্য বিষয়ে তিনি সেকালে এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন। আজকাল বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত সমগ্র ভারতবর্ষে কোটীকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, সেই সঙ্গীতের প্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন ভূদেববাবুর নিকট হইতে। ভূদেববাবুর "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস"[৩১] পাঠ করিয়াই বঙ্কিমবাবুর হৃদয়ে জন্মভূমির প্রতি অনুরাগের সূত্রপাত হয়। বঙ্কিমবাবু ভূদেববাবুর নিকটে স্বদেশানুরাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিতেন যে ভূদেববাবুর ঐ পুস্তক পাঠ না করিলে তিনি 'আনন্দমঠ'[৩২] লিখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালার যে যুবক সম্প্রদায় আজ জন্মভূমির দুঃখমোচনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, সেই যুবকগণের মধ্যে কয়জন জানেন যে, ভূদেববাবুই প্রথমে জন্মভূমির সেই দুঃখ নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন এবং কি উপায়ে সেই দুঃখ দূর হইতে পারে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও 'পুষ্পাঞ্জলি'তে[৩৩] তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকেই ভূদেববাবুর পুস্তক পাঠ তো দূরের কথা তাহাদের নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পারিবারিক ব্যাপারের সহিত আমি পরিচিত ছিলাম না, তাঁহার শুধু ব্যক্তিগত পরিচয়ই আমি পাইয়াছিলাম। কিন্তু ভূদেববাবুর বাটীতে অতি বাল্যকাল হইতে আমার যাতায়াত থাকাতে ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা তাঁহার পারিবারিক জীবনের সহিতই আমি সমধিক পরিচিত ছিলাম। পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন যে, যে অনুরূপা দেবীর [১৮৮২-১৯৫৮] 'পোষ্য-পুত্র'[৩৪], 'মন্ত্রশক্তি'[৩৫] প্রভৃতি আজকাল কলিকাতার রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতেছে, সেই অনুরূপা দেবী এবং তাঁহার স্বর্গীয়া অগ্রজা ইন্দিরা দেবী [১৮৭৯-১৯২২] ভূদেববাবুর পৌত্রী, ভূদেববাবুর কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দবাবুর [?-১৩২৯ব.]

কন্যা। আমি যখন ভূদেববাবুর বাটীতে যাইতাম, তখন অনুরূপা, ইন্দিরা প্রভৃতির বয়স বোধহয় সাত আট বৎসর হইবে।

ভূদেববাবুর পত্নীর নাম ছিল কালী। ভূদেববাবু যেরূপ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার পত্নী সেরূপ ছিলেন না, তিনি শ্যামাঙ্গী ছিলেন। আমার জননীর মুখে শুনিয়াছি, ভূদেববাবু মধ্যে মধ্যে পত্নীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "আমি তোমাকে বিবাহ না করিলে তোমার গতি কি হইত? কে তোমার মত কালো মেয়েকে বিবাহ করিত?" তাঁহার পত্নী উত্তর করিতেন, "আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হইলে তোমার গতি কি হইত? ঠাকুরের (শ্বশুরকে সেকালের বধূরা 'ঠাকুর' বলিয়া উল্লেখ করিতেন) মুখে শুনিয়াছি—স্ত্রীভাগ্যে ধন। আমার ভাগ্যবলেই তোমার আর্থিক উন্নতি হইয়াছে। আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হইলে তোমাকে টোল খুলিয়া বসিতে হইত আর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শিষ্য যজমানের নিকট বৃত্তি আদায় করিতে হইত।"

ভূদেববাবুর পিতা অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন, একথা বলিয়াছি। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। ভূদেববাবু সেই সকল শিষ্য তাঁহার জ্ঞাতিদিগকে দিয়াছিলেন। আমার পিতাই তাঁহার একমাত্র মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ভূদেববাবুর সনাতন হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার গোঁড়ামি একেবারে ছিল না। বরং কেহ তাঁহার নিকট ধর্ম্মের গোঁড়ামি করিলে তিনি প্রতিকূল যুক্তি-তর্ক দ্বারা উহার অসারতা প্রতিপাদন করিতেন। আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি যে, নর্ম্যাল স্কুলে যাঁহারা আমার পিতার সহিত অধ্যয়ন করিতেন, উত্তরকালে তাঁহাদের মধ্যে কেহ উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্ম, কেহ বা খৃষ্টান হইয়াছিলেন। ছাত্রগণের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কথায় একদিন ভূদেববাবুর পত্নী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার ছাত্রদের মধ্যে কেহ ব্রাহ্ম, কেহ খৃষ্টান, কেহ বৈষ্ণব, কেহ বা শাক্ত এমন হইল কেন?" উত্তরে ভূদেববাবু বলিয়াছিলেন, "আমার দোষেই হইয়াছে। উহারা যখন আমার কাছে পড়িত তখন উহাদের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া তর্ক-বিতর্ক হইত। কেহ বা খৃষ্টধর্ম্মের নিন্দা করিত, কেহ বা বৈষ্ণবধর্ম্মের নিন্দা করিত, কেহ বা শাক্ত সম্প্রদায়ের নিন্দা করিত। উহাদের তর্কের কথা আমার কর্ণগোচর হইলে আমি উহাদের গোঁড়ামি দূর করিবার জন্য হিন্দুর নিকট খৃষ্টধর্ম্মের, শাক্তের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের, বৈষ্ণবের নিকট শাক্তধর্ম্মের গুণগুলি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতাম। কোন ধর্ম্মই হেয় বা নিকৃষ্ট নহে, সকল ধর্ম্মই ভাল, কেবল ধর্ম্মের গোঁড়ামিই খারাপ, ইহা বুঝাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে আমার যুক্তি-তর্ক তাহাদের কোমল হৃদয়ে কিরূপ গভীর রেখাপাত করিবে। সুতরাং আমার কোন ছাত্র যদি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তরগ্রহণ করে, তাহার জন্য আমিই দায়ী।"

ভূদেববাবু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। প্রতি বৎসর পিতা মাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিতেন। দেবপূজা বা অন্য যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে বস্ত্রদানের বিধান আছে, সেই সকল কার্য্যে তিনি কখনই বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে চন্দননগরের তাঁতের ধুতি বা শাড়ী ক্রয় করিবার জন্য আমার পিতার উপর ভার পড়িত। আমিও অনেকবার

চন্দননগরের তাঁতীদের নিকট হইতে বস্ত্র ক্রয় করিয়া চুঁচুড়ায় ভূদেববাবুর বাটীতে দিয়া আসিয়াছি।

আমার পিতা যেদিন দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেদিন আমি বাবার সঙ্গে ভূদেববাবুর বাটীতে গিয়াছিলাম। দীক্ষাদানের সময় গুরুকে বস্ত্র, উত্তরীয়, পাদুকা ও ছত্র দান করিতে হয়। আমার পিতা তাঁহার গুরুদেবের জন্য গরদের জোড় লইয়া গিয়াছিলেন। দীক্ষাদানের পর ভূদেববাবু সেই 'জোড়' পরিধান করিয়াই বহির্বাটীতে গমন করিলেন। তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন যে, হালিসহরনিবাসী বাবু বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। বিষ্ণুবাবু ভূদেববাবুরই অধীনে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মাঝে মাঝে রহস্যালাপও হইত। ভূদেববাবু অধস্তন কর্ম্মচারীদের দোষ বা ত্রুটি দেখিলে কদাচ তাহা উপেক্ষা করিতেন না বা কাহাকেও প্রশয় দিতেন না। কিন্তু অফিসের কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে যদি তাঁহার অধীন কোন কর্ম্মচারী তাঁহার বাটীতে যাইতেন, তাহা হইলে ভূদেববাবু তাঁহার সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ভূদেববাবুকে গরদের জোড় পরিহিত দেখিয়া বিষ্ণুবাবু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি বেশ?" ভূদেববাবু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "আজ ইন্দ্রকুমারকে দীক্ষা দান করিলাম, ইন্দ্রকুমার গুরুকে এই বস্ত্র দান করিয়াছে।" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "আমি জানিতাম আপনি চিরকাল গুরুমহাশয়গিরিই করিয়া আসিতেছেন, গুরুগিরিও করেন, তাহা জানিতাম না।" ভূদেববাবু বলিলেন, "কেন? আমার মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্রের পক্ষে গুরুগিরি করা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? তুমি জান আমি প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক করি।" বিষ্ণুবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি বলিলেন, "সন্ধ্যাহ্নিক তো করেন, কিন্তু ভোজনকালে গণ্ডূষ করেন কিরূপে? কাঁটা চাম্‌চেতে গণ্ডূষ হয় নাকি?" ভূদেববাবু বিষ্ণুবাবুর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ভূদেববাবুর প্রথম পুত্রের বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দদেব এবং কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দদেবকে রাখিয়া ভূদেববাবু দেহত্যাগ করেন। গোবিন্দদেব মুন্সেফ এবং মুকুন্দদেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। গোবিন্দবাবু পিতার ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও মুকুন্দদেব জননীর ন্যায় শ্যামবর্ণ ছিলেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণের মধ্যে কেহ বা গৌরবর্ণ কেহ বা শ্যামবর্ণ। ভূদেববাবু একদিন তাঁহার দুইটি পৌত্রীর বর্ণ-বৈষম্যের সাহায্যে একখানি পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন। শান্তিপুরনিবাসী পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি [১৮৪৫-১৯১৬] মহাশয় "সম্বন্ধ-নির্ণয়"[৩৬] নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সেই পুস্তকের এক এক খণ্ড ভূদেববাবুকে, বঙ্কিমবাবুকে, আমার পিতাকে এবং অন্যান্য অনেককে উপহার দিয়াছিলেন। একদিন আমার পিতা এবং বঙ্কিমবাবু ভূদেববাবুর নিকট বসিয়া ছিলেন, এমন সময় বিদ্যানিধি মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ভূদেববাবুর দুইটি পৌত্রী একখানা বড় আরসির নিকট খেলা করিতেছিল। পৌত্রী দুইটির মধ্যে একটি গৌরাঙ্গী, অন্যটি শ্যামাঙ্গী। গৌরাঙ্গীটি দর্পণের নিকটে দাঁড়াইয়া যত্নসহকারে দর্পণের কাঁচ মুছিতেছিল

আর নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতেছিল। শ্যামাঙ্গীটি ভগিনীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে মুখভঙ্গী করিতেছিল, কিল দেখাইতেছিল। ভূদেববাবু তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। এমন সময় বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সম্বন্ধ-নির্ণয় পড়িয়াছেন কি? কেমন দেখিলেন?" বঙ্কিমবাবু বলিলেন, আপনি অনেক পরিশ্রম করিয়া পুস্তকখানা প্রণয়ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু মোটের উপর উহা ঘটকের কুলজী ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সমাজের বিবরণ মাত্র।" বিদ্যানিধি মহাশয় আমার পিতার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে বাবা বলিলেন—"আমার ত বেশ ভাল লাগিয়াছে। আজকাল ঘটকের ব্যবসায় লোপ পাইতে বসিয়াছে, এ সময় আপনি এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের একটা লুপ্তপ্রায় অধ্যায়কে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণসমূহের কৌলীন্য-মর্য্যাদা ও শ্রেণীবিভাগের ইতিহাস পাঠ করিলে, সেকালের আমাদের সমাজের একটা ধারণা করিতে পারা যায়।"

অবশেষে বিদ্যানিধি মহাশয় ভূদেববাবুর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমার পৌত্রীরা তোমার কেতাবের সমালোচনা করিতেছে। যেটি গৌরাঙ্গী, সে যত্ন করিয়া আরসি মুছিতেছে, আর যে শ্যামাঙ্গী সে মুখভঙ্গী করিতেছে, কিল দেখাইতেছে। ইন্দ্রকুমার নিকষ কুলীন, তাই তোমার কেতাবের সুখ্যাতি করিল, আর বঙ্কিম ভঙ্গকুলীন, তাই তোমার কেতাবে কৌলীন্য-মর্য্যাদার কথা তাহার ভাল লাগে নাই।" এই বলিয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, "বঙ্কিম, কেবল রাজরাজড়ার কথা আর লড়াই-ঝগড়ার কথা লইয়াই একটা দেশের ইতিহাস নয়, সমাজ-গঠন, সামাজিক উন্নতি-অবনতির কারণ, শ্রেণীবিভাগও ইতিহাসের একটা প্রধান অঙ্গ। যে শ্রেণীবিভাগ পাঁচ সাত শত বছর ধরিয়া আমাদের দেশে রহিয়াছে, তাকে উপেক্ষা করিলে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে না, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"

কোন ব্রাহ্মণ সন্তান উপবীত ত্যাগ করিলে ভূদেববাবু তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তিনি বলিতেন যে, উপবীত আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন, উপবীত আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে এককালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, সৌজন্য, ত্যাগ প্রভৃতি সদ্গুণের জন্যই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, রাজার মুকুটও তাঁহাদের চরণতলে লুণ্ঠিত হইত। আমরা তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হীন, নীচ হইতে পারি না। উপবীত ত্যাগ করিলে সেই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ত্যাগ করা হয়, আত্মমর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিতে হয়। যে আত্মমর্য্যাদা ত্যাগ করিতে পারে সে সকল প্রকার দুষ্কার্য্যই করিতে পারে। উপবীত-ত্যাগীদিগকে তিনি কিরূপ ঘৃণা করিতেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। একদিন কলেজের ছুটির পর আমি কোন প্রয়োজনে ভূদেববাবুর বাটীতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে তিনি আমাদের বাটীর প্রত্যেকের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সহিত আর একজন অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক আসিয়া ভূদেববাবুকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক উপবেশন

করিলেন। ভূদেববাবু সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়া সানন্দে বলিলেন, "কালীময় যে? কেমন আছ? কবে আসিলে? বাড়ীর খবর সব ভাল?" আগন্তুকের নাম কালীময় শুনিয়া আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, কারণ আমি পিতার মুখে অনেকবার তাঁহার সতীর্থ ও প্রিয় বন্ধু কালীময় ঘটকের[৩৭] নাম শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। কালীময় ঘটক প্রণীত 'চরিতাষ্টক'[৩৮] প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ সেকালে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ছিল; তাঁহার রচিত 'ছিন্নমস্তা' উপন্যাসও তখন বেশ ভাল উপন্যাস বলিয়া সমাদৃত ছিল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে ভূদেববাবু বলিলেন, "এটি ইন্দ্রকুমারের ছেলে।" কালীময়বাবুর সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি আসিয়াছিলেন, কথায় কথায় প্রকাশ পাইল যে, তিনি উপবীত ত্যাগ করিয়া উন্নত ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন। প্রায় আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তার পর ভূদেববাবু কালীময়বাবুকে বলিলেন, "দেখ কালীময়, আমরা সেকেলে লোক, আমাদের এখনও অনেক কুসংস্কার আছে। সেগুলি কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। আমার ত কেমন মনে হয় যে, যাহার শরীরে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে, সে উপবীত ত্যাগ করিলেও উপবীত তাহাকে ছাড়ে না, প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া আবার তাহার স্কন্ধে আশ্রয় লয়, আর যাহার শোণিত সম্বন্ধে গোলযোগ আছে উপবীত তাহার স্কন্ধে থাকে না, তাহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া যায়।" বলা বাহুল্য যে ভূদেববাবুর এই কুসংস্কারের কথা শুনিয়া সেই বাবুটি অধোবদন হইলেন। পরে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানি না। ভূদেববাবুর ঐ মন্তব্য অনেকের নিকটে রূঢ় এবং অপ্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা জানিয়াও, তিনি উপবীত-ত্যাগীদিগকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা দেখাইবার জন্য আমি ঐ ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

ভূদেববাবু কাহারও নিকটে সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তবে সত্য কথা, অপ্রিয় হইলে তিনি কৌশল সহকারে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতেন। সেকালে শিক্ষাবিভাগের একজন কর্ম্মচারীর একখানা জ্যামিতি অনেক স্কুলে পড়ান হইত। সেই পুস্তকে এক স্থানে একটা ভুল ছিল। ভূদেববাবু একবার কোন বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে সেই পুস্তক খানি লইয়া ছাত্রদের কতদূর পড়ান হইয়াছে, তাহা দেখিতেছিলেন, এমন সময় সেই ভুল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি স্বহস্তে সেই ভুল সংশোধন করিয়া ক্লাসের শিক্ষককে বলিলেন, "ছাত্রদিগকে এই ভুলটা সংশোধন করিয়া লইতে বলিবেন।" যিনি সেই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তিনি ভূদেববাবুরই অধীনে একজন সাব-ইন্‌স্পেক্টর এবং উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের আত্মীয় ছিলেন। কিছুদিন পর সেই গ্রন্থকার ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইয়া শিক্ষক মহাশয়ের মুখে শুনিলেন, ভূদেববাবু তাঁহার পুস্তকে একটা ভুল দেখিয়া তাহা কাটিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল, তিনি বলিলেন, "ভূদেববাবু আমার বই কলম দিয়া কাটিয়াছেন, আমি তাঁর বই কোদাল দিয়া কাটিব।" গ্রন্থকারের এই মন্তব্য কিছু দিন পরে কোনরূপে ভূদেববাবুর কর্ণগোচর হইলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "সকলেই নিজ নিজ হাতের যন্ত্র ব্যবহার করে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয়

কি আছে?" সেই গ্রন্থকার জাতিতে উগ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, অধিকাংশ উগ্র ক্ষত্রিয়ই কৃষিজীবী।

ভূদেববাবুর সহিত স্যর আশ্‌লি ইডেনের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। স্যর আশ্‌লি ছোটলাট হইবার কিছু পরেই ভূদেববাবুর পদোন্নতি হয়। ভূদেববাবু বুঝিতে পারিলেন যে প্রধানতঃ ছোটলাট বাহাদুরের চেষ্টাতেই কোন ইংরেজকে ঐ পদ না দিয়া তাঁহাকেই ঐ পদ প্রদান করা হইয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে একদিন স্যর আশ্‌লি কথায় কথায় ভূদেববাবুকে বলেন, "গভর্ণমেণ্ট যে আপনাকে শিক্ষাবিভাগে এই উন্নত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেজন্য বোধহয় আপনি গভর্ণমেণ্টের উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন?"

ভূদেববাবু বলিলেন, "আমার পদোন্নতির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।" ছোটলাট বলিলেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা ছাড়িয়া দিন, গভর্ণমেণ্টের উদারতা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" ভূদেববাবু বলিলেন "আপনি ইংরেজের আমলে না জন্মাইয়া যদি মুসলমান বা হিন্দু রাজত্বকালে জন্মাইতাম, তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী হইতে পারিতাম।"

সেকালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[৩১] মহাশয়ের প্রতাপ পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অলোক-সামান্য প্রতিভা, অদম্য উৎসাহ এবং সুতীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিপ্রভাবে সামান্য অবস্থা হইতে বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদার হইয়াছিলেন। ভূদেববাবুর সহিত জয়কৃষ্ণবাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভূদেববাবু বলিতেন যে জয়কৃষ্ণবাবু যদি মুসলমান আমলে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রতাপাদিত্য বা সীতারাম রায়ের ন্যায় একটা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে পারিতেন।

ভূদেববাবু আদর্শ পিতৃভক্ত ছিলেন। আমার পিতার নিকট শুনিয়াছি একবার পিতার পীড়ার সময় ভূদেববাবু তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় আমার পিতা তথায় উপস্থিত হইলে ভূদেববাবু আমার পিতাকে রোগীর ঘরেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভূদেববাবুর পিতা ভূদেববাবুর সকল ছাত্রকেই পৌত্র সম্পর্ক ধরিয়া রহস্যালাপ করিতেন। আমার পিতা সেই কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক উভয়কে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূদেববাবুর পিতা কাশিতে কাশিতে গয়ের ফেলিবার জন্য পিকদানী লইবার অভিপ্রায়ে হাত বাড়াইলেন, পিকদানী সে স্থানে ছিল না, বোধহয় ইহা পরিষ্কার করিবার জন্য ভৃত্য বাহিরে লইয়া গিয়াছিল। ভূদেববাবু যখন দেখিলেন যে ঘরের মধ্যে পিকদানী নাই, অথচ পিতা গয়ের ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন তিনি পিতার মুখের নিকট আপনার দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া দিলেন। পিতা পুত্রের হাত সরাইয়া দিয়া মেঝেতে গয়ের নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "ভূদেব, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুই বড়লোক হবি।" ভূদেববাবু তখন মাসিক দেড়শত টাকা বেতনভোগী শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার পিতার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হয় নাই, উত্তরকালে তিনি মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন।

ভূদেববাবুর সুবিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে সুতরাং যদি কেহ ভূদেববাবুর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই জীবনীপাঠে তাঁহার কৌতূহল নিরাকৃত হইবে। তাঁহার জীবনীতে যে সকল ঘটনার উল্লেখ নাই, অথচ যাহা আমি নিজে দেখিয়াছি বা আমার জনক-জননীর কাছে শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া আমার এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

আমার দেখা লোক (১)

সেকালের শিক্ষা বিভাগের শীর্ষস্থানীয় সর্ব্বজনপরিচিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার পিতার শিক্ষাগুরু এবং পরে দীক্ষাগুরুও হইয়াছিলেন। আমার পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি যে স্বর্গীয় ভূদেববাবু হুগলীতে একটি নর্ম্ম্যাল স্কুল স্থাপন করিতে আসিয়াছেন এবং যে সকল ছাত্র নর্ম্ম্যাল স্কুলে অধ্যয়ন করিবে, তাহারা মাসিক চারি পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবে, এই সংবাদ পাইয়া আমার পিতা ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য ভূদেববাবুর নিকট গমন করিলে ভূদেববাবু বলেন যে কয়েকদিন পরে একটি পরীক্ষার দ্বারা ছাত্র নির্ব্বাচন করা হইবে। আমার পিতা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করাতে ভূদেববাবু তাঁহাকে নর্ম্ম্যাল স্কুলের ছাত্ররূপে গ্রহণ করেন। নব প্রতিষ্ঠিত নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রথম রেজিষ্টার বা হাজিরা বহিতে বাবার নাম লিখিবার সময় ভূদেববাবু বলিয়াছিলেন, "ইন্দ্রকুমার, তোমার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" ভূদেববাবুর সহিত আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতার ইহাই সূত্রপাত। সে আজ আশী বৎসরেও অধিক কালের কথা কিন্তু সেই সময় হইতে এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্টতা অক্ষুন্নই আছে। আমার পিতা ভূদেববাবুর পত্নীকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন, সেই মহীয়সী মহিলাও আমার জননীকে পুত্রবধূ বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি অনেক সময় আমার মাকে চুঁচুড়ার বাটীতে লইয়া গিয়া দশ-পনর দিন এমনকি এক মাস দেড় মাসও রাখিয়া দিতেন। আমার মাতামহী মাকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলে "আমার ছেলের বউকে যদি আমি না পাঠাই তবে বেয়ানের কিছু জোর আছে?" এই বলিয়া সেই লোককে ফিরাইয়া দিতেন।

আমিও বাল্যকালে বহুবার আমার জননীর সহিত চুঁচুড়ায় গিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছি, কিন্তু ভূদেববাবুর পত্নীকে আমার মনে নাই, কারণ তাঁহার স্বর্গারোহণের সময় আমার বয়স দুই বৎসর বা আড়াই বৎসর মাত্র। সুতরাং ভূদেববাবুর পত্নীকে আমি না দেখিলেও ভূদেববাবুকে বাল্যকাল হইতে বহুবার দেখিয়াছি। বাটীতে সামান্য ক্রিয়াকর্ম্ম হইলেও 'ফরাসডাঙ্গার বৌমাকে' (আমার জননীকে) লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইতেন। ভূদেববাবু আমাদিগকে পৌত্র সম্বোধন করিয়া নানা প্রকার আমোদ করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে আমার বড় ভয় হইত। সেই সাহেবের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, পাকা গোঁফ এবং উজ্জ্বল চক্ষু, গম্ভীর প্রকৃতির বৃদ্ধের নিকটে আমি সহজে যাইতাম না, তাঁহার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতাম। আমার মনে আছে, একদিন

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ (গোবিন্দবাবুর পত্নী। গোবিন্দবাবু ভূদেববাবুর মধ্যম পুত্র ছিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্রদেবের বাল্যকালেই মৃত্যু হইয়াছিল, সেইজন্য গোবিন্দবাবুর পত্নীকেই জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ বলিলাম) আমাদের তিন সহোদরকে একখানা থালাতে করিয়া জলখাবার দিলে ভূদেববাবু একগাছা লাঠি লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "শালারা যদি খাবার নিয়ে কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করিস তাহলে লাঠি পেটা করব।" আমার বয়স তখন সাত কি আট বৎসর হইবে। একে তো তাঁহাকে দেখিলে আমার ভয় হইত, তাহার পর 'লাঠি পেটার' ভয়ে আর তাঁহার ত্রিসীমানায় যাইতাম না।

ইহার অনেকদিন পরে, ভূদেববাবু পেন্সন লইয়া চুঁচুড়ায় বাস করিতেন, তখন আমি হুগলী কলেজে পড়িতাম। সেইসময় আমি সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে যাইতাম। তিনি কখনও বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার পরিবারভুক্ত সকলের জন্যই, ঢাকা, শান্তিপুর, চন্দননগরের কাপড় ক্রয় করা হইত। চন্দননগর বা ফরাসডাঙার কাপড় আবশ্যক হইলে আমাকে বলিতেন। আমি সংবাদ পাইলেই, আমাদের প্রতিবেশী হরিশ ভড়কে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতাম। হরিশ ভড়ই তাঁহার বাটীতে ফরাসডাঙার কাপড় যোগাইত। ভূদেববাবু কখনও সাদা ধুতি বা সরু পাড়ের কাপড় পরিতেন না। তিন আঙ্গুল চারি আঙ্গুল চওড়া কালো রেল পাড়, মতি পাড় বা কাশীপাড় শাড়ী পরিতেন। তিনি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন, সাধারণতঃ আটচল্লিশ ইঞ্চি চওড়া কাপড় ব্যবহার করিতেন; কিন্তু অধিক বহরের শাড়ী সহজে পাওয়া যাইত না, তাই হরিশ ভড় তাঁহার আদেশমত কাপড় বুনিয়া দিত।

ভূদেববাবু আহারকালে কাঁটা ও চামচ ব্যবহার করিতেন। আসনে বসিয়া থালাতে খাইতেন, কাঁটা-চামচ ব্যবহার করিতেন বলিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিলে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া খাইতেন না। ধূমপানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, আলবোলার নল সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। অত্যধিক ধূমপান করিতেন বলিয়া তাঁহার শুভ্র গুম্ফ পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার শ্মশ্রু ছিল না, বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া তিনি শ্মশ্রু রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকের কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কিন্তু গুম্ফ ও শ্মশ্রু সম্পূর্ণ শ্বেত ছিল। আমার বাল্যকাল হইতে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত যাঁহাকে বহুবার দেখিয়াছি, যাঁহার উপদেশ শ্রবণে ধন্য হইয়াছি তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারি কথায় কিছু লেখা অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না লিখিয়া তাঁহারই সমসাময়িক আর এক মহাপুরুষের কথা বলিব। ইনি ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও শেষ জীবনে, বোধহয় বৎসরাধিক কাল চিকিৎসকগণের পরামর্শে চন্দননগরে গঙ্গার তীরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। চন্দননগরে ষ্ট্রাণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তে গঙ্গাগর্ভে যে বাটী আছে, তিনি সেই বাটী এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণে আর একটি বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত বাটীটি তাঁহার অন্তঃপুর এবং শেষোক্ত বাটীটি তাঁহার সদরবাটী বা বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হইত। চন্দননগরে ইহা দ্বিতীয়বার বা শেষবারের অবস্থান। আমার পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম

যে আমার জন্মের পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক মাসের জন্য চন্দননগরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেইসময় আমার পিতা তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। শেষবার বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন চন্দননগরে যান, আমার পিতা তখন বর্দ্ধমানে কার্য্য করিতেন, প্রতি শনিবার বাটীতে আসিতেন। সেইসময় একদিন বাবা বলিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় এখানে আসিয়াছেন, আজ বৈকালে তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইব।" স্কুলে যাঁহার 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' হইতে 'সীতার বনবাস' পর্য্যন্ত এবং 'উপক্রমণিকা' হইতে 'ঋজুপাঠ তৃতীয় ভাগ' পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম, যাঁহার অসাধারণ দয়া ও দানের কথা ভারতবিদিত, যিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক, বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের জনক সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে যাইব শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম, বৈকালে বাবার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একজন খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণ, অনাবৃত শরীরে, একটা হুঁকা লইয়া বাগানের ভিতর দিয়া গঙ্গার ধারের দিকে যাইতেছেন। বাবা মৃদুস্বরে বলিলেন, "উনিই বিদ্যাসাগর।"

আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম ও পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি সহাস্যে বলিলেন, "ইন্দ্রকুমার এসেছ? এটি কে?" বাবা বলিলেন, "আমার ছেলে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"তোর নাম কি?" আমি তাঁহার মুখে 'তুই' সম্বোধন শুনিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলাম। আমি তখন কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতায় অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, লোকে 'যোগিনবাবু' বলিয়া সম্বোধন করে, আর এই বৃদ্ধ প্রথম দর্শনেই আমাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তখন বুঝিতে পারি নাই যে তিনি আমাকে 'তুই' বলিয়া একেবারে ঘরের ছেলে করিয়া লইয়াছিলেন।

এই প্রথম পরিচয়ের পর হইতেই আমি সর্ব্বদা তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতাম। বাবা সপ্তাহে একদিন, রবিবারে তাঁহার কাছে যাইতেন, কিন্তু আমি প্রায় প্রত্যহই যাইতাম। সে বৎসর আমার ম্যালেরিয়া হওয়াতে কয়েকমাসের জন্য বাটীতেই বসিয়াছিলাম, কলিকাতায় যাইতাম না। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রত্যহ যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহা বাঙালীর বাসার জন্য নির্ম্মিত নহে, সাহেবদিগের জন্য নির্ম্মিত। সেইজন্য বিদ্যাসাগর নিজ ব্যয়ে কিছু পরিবর্তন ও একটি নূতন পায়খানা প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। এজন্য রাজমিস্ত্রি ও ছুতারমিস্ত্রি প্রয়োজন হওয়াতে তিনি একদিন আমাকে বলিলেন,—"যোগিন, ভাল রাজমিস্ত্রি দিতে পারিস?" আমাদের বাটীতে সেইসময় রাজের কাজ হইতেছিল, আমি মিস্ত্রিকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলাম। তাহার পর ছুতারমিস্ত্রি, ইট, চুন, সুরকি, বালি, কাঠ প্রভৃতি আবশ্যক হইলেই আমাকে বলিতেন, আমিও আনাইয়া দিতাম। সেজন্য তিনি আমার নাম রাখিয়াছিলেন—"মুরুব্বি।" তিনি বলিতেন, "তোকে মুরুব্বি না পেলে আমার যে কি দশা হত তা জানি না।"

তাঁহার কাছে গেলে তিনি জলযোগ না করাইয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার শয়নকক্ষে

খাটের নীচে একটা হাঁড়িতে মিষ্টান্ন থাকিত, পাঁচ সাতখানা রেকাবি ও গ্লাস থাকিত। তিনি স্বহস্তে রেকাবীতে খাবার সাজাইয়া হাতে দিতেন, কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া দিতেন এবং স্বহস্তে পান সাজাইয়া দিতেন। একদিন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি নিজে পান সাজেন কেন?" তিনি বলিলেন, "আমি যে উড়ে রে, মেদিনীপুরের উড়ে। দেখিস নি, উড়েরা নিজের হাতে পান সেজে খায়।" তিনি একদিন আমাদের বাটীতে আসিয়া তিন চারি ঘণ্টা বসিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। তিনি খুব 'মজলিসী' লোক ছিলেন। নানা প্রকার গল্প করিয়া খুব হাসাইতে পারিতেন। তাঁহার গল্প শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিত, কিন্তু তিনি হাসিতেন না।

স্বর্গীয় ভূদেববাবুর সহিত অনেক বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেমন মিল ছিল, তেমনি আবার অনেক বিষয়ে পার্থক্যও ছিল। উভয়েই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান, হিন্দুর আচার ব্যবহারে নিষ্ঠাবান, অগাধ পণ্ডিত ও অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন, উভয়েই শিক্ষা বিভাগে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বাহ্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে আকাশপাতাল পার্থক্য ছিল। ভূদেববাবু ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, শুভ্র শ্মশ্রু ও গুম্ফধারী, দেখিলে সহসা বৃদ্ধ ইহুদী বলিয়া মনে হইত, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন শ্যামবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, শ্মশ্রু-গুম্ফ এবং মস্তকের চারিদিক মুণ্ডিত, সেকালের সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতই বেশভূষা ও আকৃতি। ভূদেববাবু ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি এবং অল্পভাষী, এক কথায় 'রাশভারী' লোক, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন খুব মজলিসী, আমুদে, সর্ব্বদাই নানা প্রকার গল্প করিতেন, সকলকেই একেবারে ঘরের ছেলে করিয়া লইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কেহ অনাবশ্যক অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। যেদিন আমি বাবার সঙ্গে প্রথমে তাঁহার কাছে যাই, সেদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় ধূমপান করিয়া বাবার হাতে হুঁকা দিলেন। বাবা হুঁকাটি লইয়া রাখিয়া দিলে তিনি বলিলেন, "সে কি? তুমি তামাক খাও না?" বাবা ধূমপান করিতেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মুখে ধূমপান করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাবাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, তুমি তামাক খাও, আমাকে দেখে সমীহ করা হচ্ছে? আমি ওসব জ্যাঠামি ভালবাসি না। তামাক খাওয়া যদি অন্যায় বলে মনে কর, তবে খাও কেন? যদি অন্যায় বলে মনে না কর তবে আমার সামনে খাবে না কেন?" এই বলিয়া বাবার হাতে হুঁকা তুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে ধূমপান করাইলেন।

প্রায় এক বৎসরকাল যে মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাঁহার সম্বন্ধে দু'এক-কথায় কি বলিব? সেকালের আর একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিককেও আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি। তাঁহার নাম বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁহাকে আমার শৈশবে দেখিয়াছি, সেজন্য তাঁহার আকৃতি আমার সুস্পষ্ট মনে নাই। আমার পিতা যখন কটক নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন

রাজকৃষ্ণবাবু কটকে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। তখন কটকে কলেজ ছিল না। এখন যাহা 'র‍্যাভেন্সা কলেজ' নামে পরিচিত, তখন তাহার নাম ছিল কটক হাইস্কুল। ঐ হাইস্কুলে এল. এ. (এখনকার ইন্টারমিডিয়েট) পর্য্যন্ত পড়ান হইত। বোধহয় হাইস্কুলেই আইন পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। আমরা যখন কটকে ছিলাম তখন র‍্যাভেন্সা সাহেব উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার ছিলেন। পরে তাঁহার নামানুসারে হাইস্কুলকে র‍্যাভেন্সা কলেজ করা হয়। শুনিয়াছি পরে রাজকৃষ্ণবাবু বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের হেড ট্রান্সলেটর হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু কবি ও সুরসিক ছিলেন, নর্ম্যালি স্কুলের তদানীন্তন সুপারিণ্টেডেণ্ট বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীকে তিনি একবার নিমন্ত্রণ করিবার সময় নিমন্ত্রণ পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"সবিনয় নিবেদন, আপনি সামান্য নন
লোকে বলে সুপারি তিনটে।"

শুনিয়াছিলাম যে, কটকে রাজকৃষ্ণবাবুর পত্নীর সহিত যখন দ্বারকাবাবুর পত্নীর নাম পরিচয় হয় তখন নাকি দ্বারকাবাবুর স্ত্রী স্বামীর পরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার স্বামী নর্ম্যালি স্কুলের সুপারিণ্টেডেণ্ট। দ্বারকাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াই তিনি লোকান্তরে প্রস্থান করেন। সেকালের আর এক জন কবি বাবু রাজকৃষ্ণ রায়[৪০] আমাদের যৌবনকালে খুব বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রহ্লাদ চরিত্র'[৪১] 'প্রভাস'[৪২] 'লায়লা মজনু'[৪৩] প্রভৃতি নাটক ও গীতিনাট্য এক সময় 'বেঙ্গল থিয়েটার'[৪৪] প্রভৃতি থিয়েটারে অভিনীত হইত। রাজকৃষ্ণ রায় স্বয়ং মেছোবাজার স্ট্রীটে 'বীণা থিয়েটার'[৪৫] নামে একটি থিয়েটার করিয়াছিলেন। সেই থিয়েটারে কোন অভিনেত্রী ছিল না, পুরুষেরাই স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। চন্দননগরে দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সময় তাঁহার বাটীতে বীণা থিয়েটারের 'প্রহ্লাদ চরিত্রের' অভিনয় হইয়াছিল—তাহাতে রাজকৃষ্ণবাবু হিরণ্যকশিপু সাজিয়াছিলেন।[৪৬] রাজকৃষ্ণবাবুকে সেই সময় দেখিয়াছিলাম।

'হিতবাদী'র সম্পাদক পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সময়েই আমি 'হিতবাদীর' সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করি। আমার নিয়োগের প্রায় আড়াই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। হিতবাদীর সেবায় নিযুক্ত থাকিবার সময়, আমি বহুবার, তাঁহার মৃত্যু তারিখে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। সুতরাং এখন আর সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। তাঁহার সম্বন্ধে আমি এক কথায় এই বলিতে পারি যে তাঁহাকে দেখিলে ভষ্মাচ্ছাদিত অগ্নি বলিয়া মনে হইত। তাঁহার মত তেজস্বী পুরুষ অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতে গেলে আমাকে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। তাঁহার সম্বন্ধে একটা কথা বলিলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে যে, ইংল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত নৌসেনাপতি নেলসনের ন্যায় কাব্যবিশারদ মহাশয়ও was a brave as a lion and as tame as a lamb. 'হিতবাদী'তে তাঁহা দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়

চন্দননগরে আমার বাল্যবন্ধু ও প্রতিবেশী বন্ধু চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে। একদিন চারুবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর আমার বাটীতে আসিয়া আমাকে বলেন, "আমাদের বাটীতে সখারাম বসু এসেছেন, দাদা বাড়ীতে নাই, তিনি একলা বসে আছেন, আপনি আমাদের বাড়ীতে আসুন।" সখারাম বাবুর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় ছিল না। 'সাহিত্য' কাগজে তিনিও লিখিতেন, আমিও লিখিতাম, পরস্পরের পরিচয় ঐ পর্য্যন্ত ছিল। আমি তাঁহার নাম জানিতাম, তিনিও আমার নাম জানিতেন, চারুবাবুর বৈঠকখানাতে প্রবেশ করিবামাত্র সখারামবাবু আমাকে নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আমি বর্গী। চারুবাবু পলাইয়া থাকিলেও নিস্তার পাইবেন না, আমি তাঁহার আতিথ্যের উপর অত্যাচার না করিয়া উঠিব না।" সখারামবাবুর সহিত সেই আমার প্রথম বাক্যালাপ। আমি তখন কলিকাতাতে একটি অফিসে কেরাণীগিরি করিতাম। তাহার পর যখন কেরাণীগিরি ছাড়িয়া 'হিতবাদী'তে যাই, তখন তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। এই ঘনিষ্ঠতা পরে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। সখারামবাবু আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। যাঁহার সহিত এক টেবিলে বসিয়া ছয়-সাত বৎসর প্রত্যহ কাজ করিয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করা অসম্ভব। তাঁহার স্বদেশানুরাগ তাঁহার 'দেশের কথা'তেই[৪৭] প্রকাশ। 'দেশের কথা'র ন্যায় পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। সকলেই অবগত আছেন যে, গবর্ণমেণ্টের আদেশে ঐ পুস্তক বাজেয়াপ্ত[৪৮] হইয়াছে। 'দেশের কথা' ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে 'ঝান্সির রাজকুমার'[৪৯] নামক পুস্তকখানিও বোধহয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত হইয়াছে। সখারামবাবু গম্ভীর প্রকৃতি, রাশভারী লোক ছিলেন, কিন্তু হাস্য কৌতুকে যোগ দিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন। বন্ধুবান্ধবের সহিত রসিকতা করিতে তিনি অপটু ছিলেন না। আমাদের নিকট মধ্যে মধ্যে এমন দুই একটা সংস্কৃত কবিতা বলিতেন, যাহা ভারতচন্দ্রের[৫০] যুগেই ভদ্রসমাজে শোভন, বর্ত্তমান যুগে একেবারে অচল। একদিন আমি চারুবাবুর অনুরোধে তাঁহার পত্নীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিয়া বাহির-সিমলায় তাঁহার শ্বশুরমহাশয়ের বাসাতে পঁহুছিয়া দিয়া আপিসে যাই, সুতরাং সেদিন আমার আপিস যাইতে একটু বেলা হইল। বেলা হইবার কারণ শুনিয়া সখারামবাবু বলিলেন, "আপনার কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। আমি হইলে চারুবাবুর স্ত্রীকে লইয়া একেবারে শিয়ালদহের কুলিডিপোতে লইয়া যাইতাম। কিছু নগদ বিদায়ও পাইতাম আর বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যপালনও হইত। এমন সুযোগ ছাড়িতে আছে?" এইরূপ কথা সখারামবাবু অনেক সময়েই বলিতেন। সখারামবাবু অনেক বার আমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন এবং আহারও করিয়াছিলেন। তাঁহার আহার সম্বন্ধে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। সে বৈশিষ্ট্য তাঁহার ব্যক্তিগত নহে সমাজগত। সখারামবাবু নিরামিষভোজী মারাঠা ব্রাহ্মণ। সুতরাং তিনি আমাদের বাটীতে যে আমিষ 'হেঁশেলে'র ব্যঞ্জনাদি খাইবেন না, তাহা জানিতাম, অন্নভোজনও করিবেন না, সুতরাং লুচির ব্যবস্থা করিলাম। সখারামবাবু বলিলেন, "আপনাদের বাঙ্গালার চাউল যতক্ষণ সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ উহা 'সকড়ি' বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু আমাদের সমাজে চাউল

বা ময়দায় জল লাগিলেই উহা 'সকড়ি' হয়। স্বশ্রেণী ব্যতীত অন্য শ্রেণীর বাটীতে আমরা 'সকড়ি' খাই না। সুতরাং আপনারা যেরূপ জল দিয়া ময়দা মাখিয়া লুচি ভাজেন, সেরূপ না করিয়া যদি দুধ দিয়া ময়দা মাখিয়া লুচি ভাজেন, তাহা খাইতে আমার আপত্তি নাই। মারাঠা দেশে ময়রার দোকানে লুচি পুরী প্রভৃতি দুধে মাখা ময়দায় প্রস্তুত হয়।" আমি সখারামবাবুর কথায় দুধে ময়দা মাখিয়াই লুচি ভাজিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তিনি যতবার আমাদের বাটীতে গিয়াছেন, ততবারই দুধে ময়দা মাখিয়া লুচি হইত। মারাঠা ব্রাহ্মণগণ নিরামিষাশী, কিন্তু পেঁয়াজ খাইতে তাহাদের আপত্তি নাই। সখারামবাবু আমাদের বাটীতে পেঁয়াজের তরকারী খাইতেন, একবার আমার এক পুত্রের উপনয়নের পর, আপিসে বন্ধুদের জন্য 'আনন্দ নাড়ু' লইয়া গিয়াছিলাম। সখারামবাবু প্রথমে খাইতে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন শুনিলেন যে উহাতে চাউলের গুঁড়া, নারিকেল, তিল ও গুড় ছাড়া আর কিছু নাই, চাউলের গুঁড়াতে জল দেওয়া হয় না, গুড় দিয়াই মাখা হয়, তখন বিনা আপত্তিতেই ভোজন করিলেন। তিনি একদিন আমাদিগকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যেন সম্পূর্ণ মারাঠা প্রণালীতে আমাদিগকে খাওয়ান হয়। ভোজনের সময় ভোজনগৃহে গিয়া দেখিলাম, আমাদের প্রত্যেকের জন্য একখানি করিয়া 'কাঠের পিঁড়া' পাতা হইয়াছে। পিঁড়ার সম্মুখে কলাপাতা। আমরা চওড়া কলাপাতা চিরিয়া দুই ভাগ করিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া লই, এবং পাতার ডগার দিকটা অখণ্ড ত্রিভুজাকার থাকে, সখারামবাবুর বাটীতে দেখিলাম আমাদের প্রত্যেকের পাতাই সেইরূপ ত্রিভুজাকৃতি, কাহারও পাতা চেরা বা চৌকো নহে। ত্রিভুজাকৃতি পাতাতে খাইবার সময় আমরা সাধারণতঃ উহার সূক্ষ্ম কোণটা আমাদের বামদিকে রাখি, সেই দিকে অন্ন বা লুচি থাকে, আর দক্ষিণ দিকে ব্যঞ্জনাদি থাকে। মারাঠা প্রথা দেখিলাম যে, ত্রিভুজ পাতার baseটা অর্থাৎ ত্রিভুজের যে বাহুটা আমরা দক্ষিণ দিকে রাখি, সেই দিকটা আমাদের আসনের দিকে আর তাহার বিপরীত কোণ— অর্থাৎ যে কোণে পাতার শেষ, সেই কোণটা পিঁড়া হইতে দূরে আছে। পাতার তিন দিক ঘরের মেঝেতে 'আলিপনা' দেওয়া। তারপর ভোজ্যের কথা। খিচুড়ি বা পোলাওর মত একটা পদার্থ—সেইটাই ভাত বা লুচির ন্যায় প্রধান ভোজ্য— সখারামবাবু বলিলেন, উহার নাম 'ডালতাঁদুড়', উহা ডাল ও তণ্ডুল শব্দের অপভ্রংশ, বুঝিলাম যাকে আমরা খিচুড়ি বলি। ব্যঞ্জনাদি সমস্তই আমাদের অপরিচিত। সাগুদানার মিঠাই ও ছোট ছোট জিলাপী, জিলাপীটা সাগুদানার কি এরারুটের তাহা মনে নাই— ইহাই আমরা ভোজন করিলাম। সমস্তই সখারামবাবুর পত্নী স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন। মারাঠা দেশে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা নাই। কিন্তু সখারামবাবুর স্ত্রী কখনও আমাদের সম্মুখে বাহির হইতেন না, তবে তাঁহাকে আমি দু-একবার দেখিয়াছি। সখারামবাবু কাশীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী অনেক সময় একটানা কলিকাতা হইতে কাশীতে যাইতেন বা কাশী হইতে আসিতেন। সখারামবাবু হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া শ্বশুরবাটীতে টেলিগ্রাম করিতেন, সেখানে কেহ ষ্টেসনে

আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেন, কাশী হইতে আসিবার সময়ও এরূপ ব্যবস্থা হইত। ট্রেনে একাকিনী যাতায়াত করিবার সময় তাঁহার পত্নী কোমরে একখানা বড় ছোরা বাঁধিয়া রাখিতেন। সখারামবাবু মহামতি রানাডে ও লোকমান্য তিলকের একান্ত ভক্ত ছিলেন। সুরাটের কংগ্রেস[৫১] দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইলে সুরেন্দ্রবাবু প্রমুখ মধ্যপন্থীরা বলেন যে, লোকমান্য তিলকের অনুচরদের গুণ্ডামির জন্যই কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন পণ্ড হইয়াছে, সুতরাং তিলককে নিন্দা করিয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতে হইবে। কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন সুরেন্দ্রবাবুর মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা 'হিতবাদী'তে তিলকের নিন্দাসূচক প্রবন্ধ লিখিবার জন্য সখারাম-বাবুকে আদেশ করিলে সখারামবাবু হিতবাদীর সংস্রব ত্যাগ করেন। হিতবাদী ত্যাগের পর, তদানীন্তন ন্যাশনাল কলেজ বা জাতীয় বিদ্যালয়ে[৫২] বাঙ্গালা ভাষা ও ইতিহাসের অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র—পঞ্চমবর্ষীয় শিশু বালাজী কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। পুত্রবিয়োগের প্রায় দুই বৎসর কি আড়াই বৎসরের মধ্যেই সখারামবাবুর পত্নীবিয়োগ হয়। শেষজীবনে সখারামবাবু বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিলেন। পুত্রশোক ও পত্নীশোক, নিজের দীর্ঘকালব্যাপী পীড়া, অর্থকষ্ট প্রভৃতি তাঁহাকে একেবারে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার শেষ জীবনের কথা মনে পড়িলে বড়ই কষ্ট হয়।

আমার দেখা লোক (২)

আমরা যখন বাল্যকালে স্কুলে পড়িতাম তখন চন্দননগরে পালপাড়ায় একটি হরিসভা ছিল। সেই হরিসভার সম্পাদক ছিলেন বাবু শরৎচন্দ্র পাল। শরৎবাবু যতদিন চন্দননগরে ছিলেন ততদিন সেই হরিসভাটি বেশ সুশৃঙ্খলায় চলিয়াছিল। শরৎবাবুর সময় কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু সাধক ভক্ত ও প্রেমিক সেই হরিসভাতে গিয়া বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন প্রভৃতি করিতেন। একদিন আমরা স্কুল হইতে বাটী যাইবার পথে শুনিলাম আজ কলিকাতা হইতে কেশবচন্দ্র সেন[৫৩] পালপাড়ার হরিসভায় বক্তৃতা করিতে আসিবেন। বাল্যকাল হইতে কেশববাবুর নাম শুনিয়াছিলাম, আর শুনিয়া-ছিলাম তিনি একজন বড় গোছের ব্রাহ্ম। কেশববাবু সম্পর্কে তখন আমাদের জ্ঞান ঐ পর্যন্ত। যাহা হউক, কেশববাবু চন্দননগরে আসিয়াছেন, বক্তৃতা করিবেন, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে হইবে, এই আশাতে স্কুল হইতে বাটীতে আসিয়াই বই, শ্লেট ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া ছুটিলাম পাল পাড়াতে। আমি একা ছিলাম না, আমরা একটি দল বাঁধিয়া বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। পালপাড়ার হরিসভা আমাদের বাড়ি হইতে প্রায় আধ মাইল।

পালপাড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হরিসভার সম্মুখে রাস্তার উপর খুব বড় মেরাপ বাঁধা হইয়াছে, মেরাপের উপর সামিয়ানা ঢাকা। রাস্তার উপর দরমা পাতিয়া তাহার উপর সতরঞ্চ মাদুর প্রভৃতি পাতা। একধারে স্ত্রীলোকদিগের জন্য খানিকটা স্থান

চিক দিয়া ঘেরা। আসরটি দেখিয়াই মনে হইল যেন যাত্রার আসর। হরিসভার আসর লতাপুষ্পপত্র দ্বারা সাজান; ফটকের ঠিক সম্মুখে একটা টেবিল ও একখানা চেয়ার, টেবিলের উপর একটা রূপার গ্লাস, নিকটে একটা ছোট টুলের উপর একটি জলের কুঁজা। টেবিলের ডানদিকে ও বাঁদিকে টেবিল হইতে দুই-তিন হাত দূরে দুই-তিনখানা করিয়া বেঞ্চ পাতা; সেই বেঞ্চের উপর দশ-পনের জন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ লোক বসিয়া, তিন-চারিজনের স্কন্ধে তানপুরা, কাহারও হাতে একতারা। দুই জনের কোলে খোল বা মৃদঙ্গ। বক্তার আসন শূন্য, কেশববাবু তখনও সভাতে আসেন নাই, শুনিলাম তিনি হরিসভার ভিতর বসিয়া আছেন।

আমরা যখন সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম, তখন সভা লোকে লোকারণ্য, কোথাও আর তিলধারণের স্থান নাই। যাহারা আসরে বসিবার স্থান পায় নাই, তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা বালক, আমাদের গতি কে রোধ করিবে? ভিড় ঠেলিয়া, ধাক্কা দিয়া এবং খাইয়া অবশেষে সেই বেঞ্চের কাছাকাছি গিয়া পঁহুছিলাম। তখন গায়কগণ চোখ বুজিয়া গান গাইতেছিলেন—

এস এস করি সবে নামসঙ্কীর্ত্তন।
নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভুর গুণানুকীর্ত্তন।
যে নামেতে মত্ত হয়েছিলেন সাধুগণ,
শিব, শুক নারদ আদি হে,
ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি সবে হে,
ইশা, মুশা, মহম্মদ হে,
নানক কবীর আদি সবে হে—

আমাদের বাটীতে একখানা 'ব্রাহ্মসঙ্গীত' ছিল, তাহাতে ঐ গানটি ছিল, সুতরাং গানটি আমাদের একরূপ মুখস্থ ছিল। বারংবার ঐ গানটি গীত হইতে লাগিল। শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বেই কেশববাবু চারিজন ভদ্রলোকের সঙ্গে সভায় প্রবেশ করিলেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, হাসিমুখ অথচ বেশ গম্ভীর, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু, বেশ সুন্দর গোঁফ, দাড়ি কামানো; অতি সুন্দর মূর্ত্তি। সাদা ধুতি, সাদা লংক্লথের পিরাণ, লংক্লথের চাদর। পদে কিরূপ পাদুকা ছিল তাহা দেখিতে পাই নাই, পরে দেখিয়াছিলাম নাগরাজুতা। তাঁহার সঙ্গে যে চার-পাঁচজন লোক সভাস্থলে আসিলেন, পরে শুনিয়াছিলাম তাঁহাদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী [১৮৪৭-১৯১৯] ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [১৮৪৩-১৯১৩] ছিলেন। নগেন্দ্রবাবুকে পরে আর কখনও দেখি নাই, শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত পরে পরিচয় হইয়াছিল সে কথা পরে বলিব।

কেশববাবু সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন, ধীর পদক্ষেপে আসিয়া চেয়ারের নিকট চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। গান শেষ হইল, সভা নিস্তব্ধ, সূচিপতনের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে কেশববাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া স্থিরভাবে বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আছে। কেশববাবু নতমস্তকে হাত জোড় করিয়া—জানি না কোন অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করিলেন এবং টেবিলের উপর একটা হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম

কথাগুলি এখনও আমার মনে আছে। তিনি বলিলেন, "আমার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু লোকে আমাকে বলে ব্রাহ্ম।" তাহার পর কি বলিয়াছিলেন মনে নাই। সেদিন বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিমার্গ'। তের-চৌদ্দ বৎসরের কিশোর আমরা সে বক্তৃতার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম কেশববাবুর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে লাগিল—সেই বিরাট নিস্তব্ধ সভাক্ষেত্র সেই একটি মানুষের কণ্ঠস্বরে যেন ভরিয়া গেল, কত লোকের চক্ষু হইতে বারিধারা ঝরিল, কেশববাবুর বক্তৃতার বিরাম নাই, যেন ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল। বক্তৃতা করিতে করিতে পনর-কুড়ি মিনিট অন্তর জলপান করিতে লাগিলেন। তিনি যতবার জল পান করিলেন, ততবারই এক একজন ভদ্রলোক কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া গ্লাস পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, আলো জ্বালা হইল। তখন অ্যাসিটিলিন গ্যাস ছিল না। আলো জ্বালিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করা ছিল। এক বুক উঁচু একটা বাঁশের খুঁটি, তাহার ডগাটা প্রায় এক হাত চারিখানা করিয়া চেরা। তাহার উপর একখানা সরাতে আধ সরা তেল এবং প্রত্যেক সরাতে একটি সরিষার পুঁটুলি, সেই পুঁটুলির অগ্রভাগ—যে অংশটা তৈলের উপর ছিল সেই অংশটা জ্বালিয়া দেওয়া হইল। এইরূপ দশ-বারোটা আলোতে সভাস্থল আলোকিত হইয়া উঠিল। বক্তার সম্মুখে টেবিলের উপর দুটো সেজে বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইল।

কেশববাবু বোধহয় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র সভাস্থল হরিধ্বনিতে বারংবার মুখরিত হইয়া উঠিল। বক্তৃতার পর নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল।

মন একবার হরি বল,
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধুপারে চল।
জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি
অনলে অনিলে হরি, হরি হরিময় এই ভূমণ্ডল।

এই গানটি গাহিতে গাহিতে ভক্তের দল বাজারের দিকে গমন করিলেন। আমরা রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলাম।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সাক্ষাৎ লাভের দুই বৎসর কি দেড় বৎসর পরে আর একজন মহাপুরুষের দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি জগদ্বিখ্যাত পরমহংস রামকৃষ্ণদেব [১৮৩৬-১৮৮৬]। পরমহংসদেবকে একদিন চার পাঁচ মিনিটের জন্য চোখের দেখা দেখিয়াছিলাম মাত্র। আমার পিতার এক মাতুল অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামপুরে ওকালতি করিতেন। আমি কি একটা প্রয়োজনে তাহার বাসাতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার সময় একটা বাগানের নিকটে দেখিলাম যে দলে দলে লোক বাগানে যাতায়াত করিতেছে। মনে করিলাম যে ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কিছু দর্শনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। সেজন্য তথায় অত লোক সমাগম হইয়াছে। কৌতূহলবশতঃ একজনকে সেই জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব ঐ বাগানে আসিয়াছেন। লোকে

তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছে। তখন পরমহংস কাহাকে বলে সে জ্ঞান আমার ছিল না। আমাদের বাটীতে একখানা পাতলা চটি বই ছিল, তাহার নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের রচনাবলী', সেই পরমহংসই যে এই পরমহংস তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, জনতার সহিত মিশিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। তখন বোধহয় বেলা পাঁচটা, দেখিলাম একটা গাছতলায় এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন, একটু সুখকায়, দাড়ি-ছাঁটা, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অনেক লোক বসিয়া আছে। সকলেই নীরব, তিনি মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্ত্তী লোকের সাথে দু-একটা কথা বলিতেছেন। অতি মৃদুস্বরে কথা হইতেছিল, আমি কিছুই শুনিতে পাইলাম না। যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় ভদ্রলোক। যুবক বালক একজনকেও দেখিলাম না। তাই সাহস করিয়া আর অগ্রসর না হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি আমার নিকটবর্ত্তী একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরমহংস কোথায়?" তিনি জনতার মধ্যে উপবিষ্ট দাড়ি-ছাঁটা লোকটাকে দেখাইয়া বললেন উনিই পরমহংসদেব। আমার সেই বয়সে আমি পরমহংসদেবের সহিত সাধারণ লোকের কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম না। চার-পাঁচ মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিলাম।

বাল্যকালে পরমহংসদেবকে দেখিয়া তাঁহার অসাধারণত্ব কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও পরে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য, জগদ্বিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামীকে [১৮৬৩-১৯০২] দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, একজন অসাধারণ মানুষকে দেখিলাম। স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার বৎসরেই হউক বা তাহার পর বৎসরই হউক দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার দর্শনলাভের পূর্ব্বেই শিকাগো-ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে তিনি অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিয়া সমগ্র আমেরিকাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা একাধিকবার পড়িয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমার অতি উচ্চ ধারণা হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের অপর পারে বালীতে আমার শ্বশুরালয়। একদিন শ্বশুরবাটীতে গিয়া শুনিলাম যে সেইদিন দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে স্বর্গীয় পরমহংসদেবের আবির্ভাব বা তিরোভাব উপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে। বিবেকানন্দ স্বামীর তথায় আসিবার কথা আছে। স্বামীজী কালীবাড়ীতে আসিবেন শুনিয়াই আমি তথায় যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম, আমার সমবয়স্ক পাঁচ-সাতজন সঙ্গী জুটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া একখানা নৌকা করিয়া কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম যে সুপ্রশস্ত অঙ্গন লোকে লোকারণ্য, বাঙালী অপেক্ষা মারোয়ারী অথবা হিন্দুস্থানীর সংখ্যাই অধিক বলিয়া মনে হইল। শুনিলাম যে স্বামীজী তখনও আসেন নাই, তবে আসিবেন ইহা নিশ্চিত, আমি বন্ধুবর্গসহ নাটমন্দিরে উঠিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলাম। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে একটা ছোট্ট গালিচা পাতা ছিল, বুঝিলাম যে সেই আসন স্বামীজীর জন্য রিজার্ভড রাখা হইয়াছে। আমি গালিচা হইতে কিছু দূরে বসিয়া রহিলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে বাহিরে হঠাৎ একটা হৈ হৈ শব্দ উঠিল—'পরমহংস রামকৃষ্ণজী কী জয়' স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ কী জয়, ধ্বনি সেই প্রাঙ্গণে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বুঝিলাম স্বামীজী আসিতেছেন।

মনে করিয়াছিলাম, স্বামীজী সন্ন্যাসী, হয়ত ধীর গম্ভীরভাবে মৃদু পদক্ষেপে নাটমন্দিরে আগমন করিবেন। কিন্তু আমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া যিনি নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাতে ধীরতা বা গাম্ভীর্য্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। উদাস চঞ্চল বালকের মতো যেন অস্থিরভাবে তিনি নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা বাহিরে জয়ধ্বনি শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। স্বামীজী নাটমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র আমরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইলাম, তেমন উজ্জ্বল আয়তলোচন আর কাহারও দেখি নাই। স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে সাধারণতঃ যেরূপ উষ্ণীষ আপাদলম্বিত আলখাল্লা পরিহিত মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামীজী ঠিক সেইরূপ পোযাকই পরিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আরও পাঁচ-সাতজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচ্ছদও স্বামীজীর পরিচ্ছদের অনুরূপ। তাঁহারাও বেশ সুশ্রী, উন্নত ললাট; গৌরবর্ণ। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারাও ধার্ম্মিক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান। কিন্তু স্বামীজীর পার্শ্বে তাঁহাদিগকে যেন একটু নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হইল।

নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই স্বামীজী যাহা করিলেন তাহা দেখিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইলাম, মনে মনে যে একটু গর্ব্বও অনুভব করি নাই তাহা নহে। স্বামীজীকে দেখিয়া সকলেই করজোড়ে ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল, তিনি এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীরাও প্রতিনমস্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় প্রায় আট-দশ হাত দূর হইতে তাঁহার সহিত আমার দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র তিনি আমাকে নমস্কার করিয়াই আমার নিকটে আসিলেন, আমার বন্ধুরা মনে করিলেন যে স্বামীজীর সহিত হয়ত আমার পূর্ব্বপরিচয় ছিল। কিন্তু সেই একদিন ব্যতীত আমি আর কখনও তাঁহাকে দর্শন করি নাই। তবে তাঁহাকে এক এক সময় দেখিবার জন্য আমার মনে প্রবল ইচ্ছা হইত। জানি না আমাকে দেখিবামাত্র তিনি আমার সেই প্রবল আগ্রহের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা।

তিনি উপবেশনকালে আমরাও উপবেশন করিলাম। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু কি কথা বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশেযে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আজ এখানে বক্তৃতা করিবেন কি?" তিনি বলিলেন, "এ ভীষণ ভীড়ে বক্তৃতা করা অসম্ভব। করিলেও সকলে তাহা হয়ত শুনিতে পাইবে না।" স্বামীজীর সহিত আমার এই প্রথম বাক্যালাপ এবং বোধহয় ইহাই শেষ। কারণ সেদিন তাঁহার সহিত আর কোন কথা হইয়াছিল কিনা আমার মনে নাই। স্বামীজী সেই নাটমন্দিরে বোধহয় কুড়ি মিনিট বসিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বোধহয় দুই বার কি তিন বার তিনি মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া আবার বন্ধন করিয়াছিলেন। সমস্তক্ষণ তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন এবং চঞ্চল শিশুর মত ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। তাঁহার সেই চঞ্চল ভাব দেখিলেই মনে হইত যেন একটা অদম্য শক্তিকে তিনি আপনার মধ্যে দমন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আর সেই শক্তি যেন বাহিরে ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসীরা ছিলেন ধীর, স্থির, গম্ভীর।

স্বামীজী নাটমন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া গুরুস্থান অভিমুখে অর্থাৎ পরমহংসদেবের অধ্যুষিত কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার সঙ্গে সমস্ত জনতা সেই দিকে ধাবিত হইল। আমার সঙ্গীরা আর সেই জনতার মধ্যে যাইতে সম্মত না হওয়াতে আমরা বালী প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, শ্বশুরবাটীতে (বালীতে) ফিরিয়া আসিবার পর এক মজার ব্যাপার হইয়াছিল। এস্থলে তাহা উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমার শ্বশুরমহাশয়ের মাতামহীর ভগিনী তখন জীবিত ছিলেন, তাঁহার বয়স তখন বোধহয় আশি বৎসরের কাছাকাছি হইলেও তিনি বেশ শক্ত ছিলেন। তিনি বাটীর গৃহিণী ছিলেন। রাত্রিতে আমরা আহার করিতে বসিয়াছি, এমন সময় আমায় বড় শ্যালক (তিনিও আমাদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন) বলিলেন, "বিবেকানন্দ স্বামী যোগিনকে দেখিয়াই উহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন, আমরা মনে করিয়াছিলাম বোধহয় যোগিনের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল।" সেই কথা শুনিয়াই বৃদ্ধা সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, "নমস্কার করবে না? হলেই বা বিবেকানন্দ, কুলীনের ছেলের মান রাখবে না? যোগিনকে নমস্কার করেছে একি বেশী কথা নাকি?" বলা বাহুল্য, তিনিও কুলীনের বধূ। সেকালের লোকের মনে কৌলীন্য গর্ব্ব কিরূপ প্রবল ছিল তাহা তাঁহার এ কথাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

যখন ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকদিগের কথা লইয়া আমার এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি তখন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাও বলি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কেশববাবুর সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ও পালপাড়ার হরিসভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু কেশববাবুর সহচরগণের মধ্যে কে যে শিবনাথ শাস্ত্রী তাহা তখন জানিতে পারি নাই। যখন কেশববাবুকে দেখিয়াছিলাম, তাহার বোধহয় তিন চারি বৎসর পরে শাস্ত্রী মহাশয়কে চন্দননগরে দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহার বক্তৃতাও শ্রবণ করিয়াছিলাম। চন্দননগরের ষ্টেশন রোডের উপরে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে। এখন 'আছে' না বলিয়া 'ছিল' বলাই বোধহয় সঙ্গত। কারণ এখন উহা না থাকার মধ্যে। কিন্তু আমাদের বাল্য ও যৌবনে এই ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। প্রতি রবিবার অনেকগুলি ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মমতাবলম্বী ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে সমবেত হইতেন, উপাসনা, গান, সঙ্কীর্ত্তন হইত, আমরাও মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া বসিতাম এবং সকলকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে দেখিয়া আমরাও চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিতাম, মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতাম যে, আর কেহ চাহিয়া আছেন কিনা। সেই ব্রাহ্মসমাজের একবার মাঘোৎসবের সময় শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। কেন জানি না,—বোধহয় স্থানাভাবের আশঙ্কায়, ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে বক্তৃতার ব্যবস্থা না হইয়া প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী হাসপাতালের মাঠে বক্তৃতার স্থান নির্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে বক্তৃতা হওয়াও বোধহয় বিধাতার অভিপ্রেত ছিল না, তাই সেই মাঠে বক্তৃতা আরম্ভ হইবার সাথে সাথেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন অগত্যা সকলে নিকটবর্ত্তী বাজারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ও বাজারে গিয়া আশ্রয় লইলেন। বাজারের মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় খোলার ঘর ছিল। সেগুলি ঠিক ঘর নহে খোলার দ্বারা আচ্ছাদিত চল্লিশ-

পঞ্চাশ হাত লম্বা ও দশ-পনর হাত চওড়া স্থান, প্রাতঃকালে সেইখানে তরিতরকারী বিক্রয় হইত। সেইরূপ একটি চালার মধ্যে, একটা দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লোক হইয়াছিল মন্দ নহে, বোধহয় তিন চারিশত হইবে। তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের বয়স বোধহয় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক হইবে না, কারণ তখন তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়াছিলাম।

ইহার অনেক বৎসর পরে, শাস্ত্রী মহাশয়ের দেহত্যাগের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে, শাস্ত্রী মহাশয় বোধহয় চিকিৎসকের পরামর্শে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একখানি বাটী লইয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই বাটীর কিয়দংশ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার ভাঙ্গনে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এখন সেই বাটীর অবশিষ্ট অংশ বিদ্যমান আছে কি গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে তাহা জানি না। কারণ সেই বাটীর সম্মুখস্থ পথ গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া পড়াতে সে-পথে আমি বহুকাল যাই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাটীতে বাস করিতেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের বাটী তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, হাটখোলা নামক পল্লীতে ছিল।

সে সময় একদিন দেখিলাম, আমার পিতার সহিত এক শুভ্র শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের বাটীতে আসিলেন। আমার একজন বন্ধুও সেই সময় আমাদের বাটীতে ছিলেন। বাবা আমাদিগকে ডাকিয়া সেই আগন্তুককে প্রণাম করিতে বলিলেন। আমরা উভয়ে প্রণাম করিলে বাবা বলিলেন, "তোমরা ইঁহাকে জান না? ইনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।" বহুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণ শ্মশ্রুধারী শাস্ত্রী মহাশয়কে একদিন মাত্র দেখিয়াছিলাম, সুতরাং এতদিন পরে সেই শ্বেত শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধকে চিনিতে পারি নাই, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই, বিশেষতঃ তিনি যে চন্দননগরে আসিয়াছেন বা বাবার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতাম না। পরে শুনিয়াছিলাম যে গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গিয়া বাবার সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের আলাপ হইয়াছিল। আমাদের বাটী হইতে যাইবার সময় শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে এবং আমার বন্ধুকে অবকাশ পাইলেই তাঁহার আবাসে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। আমরা তাঁহার সেই আমন্ত্রণ রক্ষার কোন ত্রুটি কখনও করি নাই। সময় পাইলেই তাঁহার কাছে যাইতাম।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে দু-একদিন গিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার ন্যায় উন্মুক্ত হৃদয়, সরলপ্রাণ এবং সর্ব্বত্র হিতকামী ব্যক্তি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি আমাদের সঙ্গে যে কত বিষয়ের কত গল্প করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে দিন যে বিষয়ের কথা প্রথমে আরম্ভ হইত সেই দিন দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া সেই বিষয়েরই গল্প চলিত। বলা বাহুল্য যে, অধিকাংশ সময় তিনিই বক্তা হইতেন, আমরা শ্রোতা হইতাম। এক দিন বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে কথা হইল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "বিদ্যানুরাগ কাহাকে বলে, তাহা আজকাল এদেশের ছেলেরা ধারণাই করিতে পারে না। আমি বিলাতে গিয়া এক অতি দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে বাসা লইয়াছিলাম। সেই বাটীতে মাত্র চারিজন বাস করিতেন। গৃহস্বামীর বয়স বোধহয় আশি বৎসর, তাঁহার

স্ত্রীর বয়সও পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর বৎসর হইবে। দুইটি কন্যা—বড়র বয়স প্রায় ষাট, ছোটর বয়সও সাতান্ন-আটান্ন বৎসর হইবে। এই চারি জন লোক লইয়া তাহাদের সংসার। অবস্থা অতি হীন বলিয়া আমাকে বোর্ডার বা ভাড়াটিয়া রাখিয়াছিলেন। আমার সমস্ত কার্য্য সেই দুই প্রৌঢ়া কুমারী করিতেন। আমার ঘর পরিষ্কার করা, বিছানা করা, পোষাক পরিষ্কার করা, মায় জুতো বুরুষ পর্যন্ত তাঁহারা দুই ভগিনীতে করিতেন। আহার্য্য তাঁহারাই দিতেন। সংসারে সেই তিন জন স্ত্রীলোক, বৃদ্ধা এবং তাঁহারই কন্যারা সমস্ত দিন 'লেস' বুনিতেন এবং সেই লেস বৃদ্ধ ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহাদের উপজীবিকা। বৃদ্ধ সমস্ত দিন প্রায় বাইরেই থাকিতেন, দিনমানে বাটীতে তাঁহাকে বড় দেখিতে পাইতাম না। ঐ তিনটি স্ত্রীলোক গৃহকার্য্য করিয়া যে সময় লেস বুনিতেন, সেই সময় কোলের উপর একখানি করিয়া বই খুলিয়া রাখিতেন। হাতে লেস তেছেন এবং আপন মনে পুস্তক পড়িতেছেন, বাজে গল্প নাই, পরচর্চ্চা নাই, ঝগড়া কলহ নাই, যেন কলের পুতুলের মত কাজ করিয়া যাইতেন। লেস বুনিতে বুনিতে মাঝে মাঝে পুস্তকের পাতা উল্টাইতেন। আমি তাঁহাদের শ্রমশীলতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতাম। আমি যে কক্ষে শয়ন করিতাম তাহার কক্ষেই বৃদ্ধ গৃহস্বামী শয়ন করিতেন। একদিন রাত্রি প্রায় একটার সময় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম যে বৃদ্ধের কক্ষে আলো জ্বলিতেছে; জানালার ফাটল দিয়া সেই আলোক আমার শয্যার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তত রাত্রিতে বৃদ্ধের কক্ষে আলো দেখিয়া আমার একটু ভয় হইল, ভাবিলাম হয়ত তাহার কোন অসুখ করিয়া থাকিবে। আমি সংবাদ লইবার জন্য তাঁহার কক্ষের কবাটে মৃদু করাঘাত করিতেই বৃদ্ধ ভিতর হইতে বলিলেন— "Come in Mr. Sastri" (শাস্ত্রী মহাশয় ভিতরে আসুন)। আমি দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ আলো জ্বালিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমি ত অবাক! অসময়ে তাঁহার কক্ষে প্রবেশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলাম, 'আপনার কক্ষে আলো জ্বলিতে দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছিল, ভাবিলাম হয়ত আপনি অসুস্থ হইয়াছেন।' বৃদ্ধ আমাকে ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন, 'না কোন অসুখ করে নাই, সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই, পড়িতে সময় পাই না, তাই রাত্রিতে একটু পড়াশুনা করি।' আশি বৎসরের বৃদ্ধ ফিরিওয়ালা রাত্রি একটা-দেড়টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিতে পারেন, ইহা তো আমার ধারণার অতীত। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কি বই পড়িতেছিলেন, জানিতে কৌতূহল হইতেছে।' তিনি বলিলেন—'History of China' (চীন দেশের ইতিহাস)।"

আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। সত্য সত্যই আমরা ধারণা করিতে পারি না যে প্রকৃত বিদ্যানুরাগ কাহাকে বলে। শুনিয়াছি 'টাইটানিক' ষ্টীমার জলমগ্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ ষ্টীমারের অন্যতম আরোহী বিখ্যাত 'Review of Reviews'[৫৪]এর সম্পাদক মিঃ স্টেড মৃত্যু আসন্ন জানিয়া একাগ্র মনে একখানা পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া ষ্টীমারের কাপ্তেন তাঁহাকে সেই আসন্ন মুহূর্ত্তে পুস্তক পাঠের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মিঃ স্টেড বলিয়াছিলেন—"মৃত্যু তো

এখনই হইবে। এই পুস্তকে কি আছে, তাহা আমি পড়ি নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে যতটুকু পারি জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া লই।" যে দেশে লোক মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াও জ্ঞান সঞ্চয়ে বিরত হয় না, সেই দেশের আশি বৎসর বয়স্ক ফিরিওয়ালা যে একটা পর্যন্ত জাগিয়া জ্ঞান সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, ইহা বিষয়ের বিস্ময় নহে। শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহাদের সমাজে মহিলাদের অবরোধ প্রথা নাই। শাস্ত্রী মহাশয় চন্দননগরে সপরিবারে বসবাস করিতেন, আমি তাঁহার আবাসে বহুবার গিয়াছি, কোন কোন দিন একাদিক্রমে দুই-তিন ঘণ্টাও বসিয়া তাঁহার গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু কোন দিন তাঁহার পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোককে আমাদের সম্মুখে বাহির হইতে দেখি নাই। শাস্ত্রী মহাশয় চন্দননগর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলে পরও আমি তাঁহার আবাসে গিয়া দেখা করিয়া আসিয়াছি। সেই সময় তাঁহার পত্নীকে দু-এক দিন দেখিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম শাস্ত্রী মহাশয়ের দুই বিবাহ ছিল, দুই পত্নীই জীবিত ছিলেন কিনা জানি না, আমি তাঁহার আবাসে একজনকেই দুই-তিনদিন দেখিয়াছিলাম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮১৭-১৯০৫] মহাশয়কে কয়েকবার দেখিয়াছিলাম। আমাদের ছাত্রাবস্থায় মহর্ষি কিছুদিন চুঁচুড়ার হুগলী কলেজের উত্তরে এবং ভূদেববাবুর বাটীর দক্ষিণে গঙ্গার উপরেই একটা খুব বড় বাগানবাড়ীতে বাস করিতেন। তাঁহার একখানি প্রকাণ্ড বজরা ছিল, সেই বজরা করিয়া তিনি প্রত্যহ বেড়াইতেন। আমরাও নৌকা করিয়া চন্দননগর হইতে চুঁচুড়ার কলেজে পড়িতে যাইতাম। সেই সময় আমরা অনেকদিন মহর্ষিকে কখন বা বজরার ভিতর কখন বা ছাদের উপর দেখিতে পাইতাম, সেই সময় একবার তাঁহার চুঁচুড়ার বাসাতে মাঘোৎসব হইয়াছিল, সেই উৎসবক্ষেত্রেও তাঁহাকে একদিন দেখিয়াছিলাম। তাহার পর কলেজ ছাড়িবার পর আমি যখন কলকাতায় আসি তখন একদিন জোড়াসাঁকোর বাটীতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমি সে সময় 'তত্ত্ববোধিনী'[৫৫] পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতাম এবং আমার পাণ্ডুলিপিগুলি আদি ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন উপাচার্য্য এবং 'তত্ত্ববোধিনী'র সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [?-১৯০৬] মহাশয়ের হাতে দিয়া আসিতাম। একবার পারসিকদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত হয়। সেই সময় একদিন উপাচার্য্য মহাশয় আমাকে বলেন যে, আমার ঐ সকল প্রবন্ধ মহর্ষির খুব ভাল লাগিয়াছে, সেই জন্য তিনি ঐ প্রবন্ধের লেখক কে তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, ঐ সংবাদ শ্রবণে আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল, আমি মহর্ষিকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে মহর্ষির নিকট লইয়া গিয়া আমার পরিচয় দিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি লইয়া উপবেশন করিলাম। কিন্তু মহর্ষির সহিত কোন কথাবার্ত্তা হইল না, কারণ সেই সময় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ-শক্তি ছিল না বলিলেই হয়। ভট্টাচার্য্য উচ্চৈঃস্বরে দুই-একটা কথায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার পর আমাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন, সুতরাং মহর্ষিকে মাত্র 'চোখের দেখা' দেখিয়াছি, তাহার সহিত কোন কথাবার্ত্তার সুযোগ আমি পাই নাই। এই 'তত্ত্ববোধিনী'

পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিবার সময়ই কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, [১৮৬১-১৯৪১] শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের [১৮৬৯-১৯৩৭] পরিবারের কয়েকজনের সহিত আমার পরিচয় হয়। ইহার কিছু পরে, যখন আমি 'ভারতী'[৫৬] পত্রিকায় ছোট গল্প ও প্রবন্ধাদি লিখিতাম সেই সময় একদিন আমি চন্দননগরে পুস্তকাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বালীগঞ্জে শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সরলা দেবীর[৫৭] সহিত তাহার পূর্ব্বেও আমার আলাপ পরিচয় ছিল। সেদিন আমি সরলাদেবীর জননী স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর[৫৮] পুস্তক সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলাম। আমি তখন একটা সওদাগরী অফিসে কেরাণীগিরি করিতাম। আপিস হইতে মধ্যাহ্নকালে বাহির হইয়া বালীগঞ্জে গিয়াছিলাম। আমি শ্রীমতী সরলাদেবীকে আমার আগমনের কারণ বলিলে তিনি উঠিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে আসিয়া বলিলেন, "আপনি বসুন, মা আসছেন।" সে সময় ভারতীতে[৫৯] সরলাদেবীর অনূদিত ওমর খৈয়ামের কবিতা[৫৯] প্রকাশিত হইতেছিল। সেই সকল কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময় স্বর্ণকুমারী দেবী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া গিয়া প্রণাম করিলে তিনি মধুর কণ্ঠে হাসিমুখে বলিলেন, 'ব'স বাবা ব'স', এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। আমিও উপবেশন করিলে তিনি আমার নাম, ধাম, বিষয় কার্য্য সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কথায় কথায় যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের [১৭৯৪-১৮৪৬] ভগিনীপতি স্বর্গীয় ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় আমার প্রপিতামহর সহোদর, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র এটর্নী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার জ্ঞাতিভ্রাতা, তখন তিনি সস্নেহে বলিলেন, "ওঃ তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে", এই বলিয়া তিনি আমাদের সাংসারিক অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি চন্দননগর হইতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে কখন কলিকাতায় আসি, সকাল কয়টার সময় আহার করিতে হয়, আপিসে কখন জলযোগ করি, বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় সন্ধ্যা হয় কিনা, আমার বাটীতে কে কে আছেন, প্রভৃতি অনেক কথাই জানিয়া লইলেন। আমরা যে সময় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, সেই সময় একবার সরলা দেবী দুই তিন মিনিটের জন্য কক্ষান্তরে গমন করিয়া পুনরায় আসিয়া আমাদের বাক্যালাপে যোগদান করিলেন। বেলা আড়াইটার সময় একজন ভৃত্য কিছু ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া আমার সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া দিলে স্বর্ণকুমারী দেবী বলিলেন, "বাবা, মুখে হাতে জল দিয়ে একটু খাবার খাও।" আমি প্রথমে একটু আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন, "না বাবা, তোমার আপত্তি শুনিব না। রোজ আড়াইটার সময় তোমার জল খাওয়া অভ্যাস, না খাইলে পিত্ত পড়িয়া অসুখ হইবে।" আমি অগত্যা সেই সকল ফল ও মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমি আপিসে কখন জলযোগ করি এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে আড়াইটার সময়, তখন সরলাদেবীকে আমার অজ্ঞাতসারে ইঙ্গিত করিয়া দিলেন এবং সরলাদেবীও আমাদের নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া ভৃত্যকে ঠিক আড়াইটার সময়

জলখাবার আনিতে আদেশ করিয়া আসিলেন। লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক প্রার্থনা করিলে স্বর্ণকুমারী দেবী বলিলেন, "সব বই ত আমার কাছে নেই, যে কয়খানি আছে, দিব।" আমার উঠিবার কিছু পূর্ব্বে তিনি তাঁহার রচিত ছয়-সাতখানি পুস্তক আমাকে আনিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪৯-১৯২৫] মহাশয়ের নিকট পুস্তক ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন বালীগঞ্জে তাঁহার মেজদাদা স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪২-১৯২৩] মহাশয়ের বাটীতে ছিলেন। আমি সেইখানে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করি। আমার নাম শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "আপনিই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিক কাগজে গল্প, প্রবন্ধ লেখেন নাকি?" আমি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, "আপনি বেশ লেখেন, আপনার কথা আমি সরলার মুখে শুনিয়াছি।" আমি তাঁহাকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য বলিলে, তিনি বলিলেন, "কোন পুস্তক ছাপাইতে আমার যে ব্যয় হয়, সেই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যতদিন সে টাকাটা আদায় না হয় তত দিন আমি সেই পুস্তক বিনামূল্যে দিই না। সুতরাং আপনাকে আমার সমস্ত পুস্তক দিব না, কয়েকখানা পাইবেন।" এই বলিয়া তিনি আমাকে তিন-চারখানা পুস্তক আনিয়া দিলেন এবং তাহার পর বোধহয় এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে দুই-একখানা পুস্তক ডাকযোগেও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তার সময় দেখিলাম যে তিনি অত্যন্ত মৃদুস্বরে কথা কহেন। দু-একটি কথার পর তিনি নিজেই আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার হাঁপানি হইয়াছিল বলিয়া চিকিৎসকগণ তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে অথবা একাদিক্রমে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি সেদিন তাঁহার কাছে বোধহয় পনের মিনিটের অধিক কাল ছিলাম না। আমার কোন বন্ধুর পুত্র শ্রীমান হৃদয়রঞ্জনের শ্বশুর বাল্যকালে জ্যোতিবাবুর শ্যালকপুত্রের সহিত এক ক্লাসে পড়িতেন, উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীকে পিসিমা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমার বন্ধুপুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইবার পর আমার বন্ধুপুত্র, সত্যেন্দ্রবাবুর বাটীতে প্রত্যেক কার্য্যে এমনকি মধ্যে মধ্যে বিনাকার্য্যেও নিমন্ত্রিত হইতেন। সত্যেন্দ্রবাবু বা জ্যোতিবাবু যখন রাঁচীতে থাকিতেন, তখন রাঁচী হইতে আমার বন্ধুপুত্রকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করিয়া রাঁচীতে লইয়া গিয়া দশ-পনের দিন রাখিয়া দিতেন। জ্যোতিবাবুর সহিত আমার সাক্ষাতের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে আমার বন্ধুর পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কুড়ি-পঁচিশ বৎসর পরেও যখন তিনি বালীগঞ্জে বা রাঁচীতে যাইতেন, তখন জ্যোতিবাবু তাঁহার নিকট আমার সংবাদ লইতেন। হৃদয়রঞ্জনের বিবাহের পর জ্যোতিবাবু যখন শুনিলেন যে হৃদয়রঞ্জনের বাটী চন্দননগরে তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দননগরের যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়কে তুমি জান?" আমি হৃদয়রঞ্জনের পিতার বাল্যবন্ধু ও প্রতিবেশী এই কথা জ্যোতিবাবু শুনিবার পর হইতে তিনি হৃদয়রঞ্জনের নিকট সর্ব্বদাই আমার

সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। ডাকযোগে আমার নিকট স্বরচিত পুস্তক প্রেরণ, এবং দীর্ঘকাল পরেও আমার সংবাদ জিজ্ঞাসা—অথচ আমার সঙ্গে তাঁহার একদিন মাত্র দশ মিনিটের জন্য আলাপ—ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে জ্যোতিবাবু কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন।

আমার দেখা লোক (৩)

জ্যোতিবাবুর মেজদাদা স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও আমি মাত্র একদিন দেখিয়াছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ান ছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সত্যেন্দ্রবাবু পেন্সন লইয়া বালীগঞ্জে বাস করিতে-ছিলেন, বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু [১৮৫৮-১৯৩৭] মহাশয় তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। আমার বন্ধু শ্রীরামপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত জগদিন্দু রায় অধ্যাপক বসুর ল্যাবরেটারী এসিষ্টান্ট ছিলেন। প্রাতে কলিকাতা আসিবার সময় আমরা জগদিন্দুবাবুর সহিত একই ট্রেনে আসিতাম। একদিন জগদিন্দুবাবু বলিলেন, "আমাদের কলেজে এক্সরে বা অদৃশ্য আলোক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। আজ বেলা তিনটার সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা দেখিতে আসিবেন। যদি আপনারা তিনটার সময় যাইতে পারেন, তবে আপনাদিগকেও দেখাইব।" তিনটার সময় একজন বন্ধুর সহিত প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়া জগদিন্দুবাবুর নিকট শুনিলাম যে, পার্শ্বের কক্ষে সত্যেন্দ্রবাবু ও ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জ্জী নামক তাঁহার এক আই. এম. এস. বন্ধু আসিয়াছেন, ডাক্তার বসু তাঁহাদিগকে অদৃশ্য আলোক দেখাইতেছেন। তাঁহারা চলিয়া গেলেই তিনি আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। আমি জগদিন্দুবাবুকে বলিলাম যে, বাল্যকালে যখন স্কুলে পড়িতাম তখন, জিম্‌ন্যাষ্টিক করিতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙিয়া ছিলাম সেই স্থানটার হাড় একটু এখনও বাঁকা আছে, আমি সেই হাড়টা অদৃশ্য আলোকে দেখিব। এই কথা শুনিয়া জগদিন্দুবাবু পার্শ্বের কক্ষে গমন করিলেন এবং তখনই ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আমি ডাক্তারকে আপনার ভাঙা হাড়ের কথা বলাতে তিনি আপনাকে লইয়া যাইতে বলিলেন।" আমি ও আমার বন্ধু জগদিন্দুবাবুর সঙ্গে সেই কক্ষে গমন করিলে অধ্যাপক বসু, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী এবং সত্যেন্দ্রবাবু তিনজনেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমার হাড়ের ভাঙা অস্থি দেখিলেন। সত্যেন্দ্রবাবু ইংরাজীতে তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "কলিকাতায় এক্সরের সাহায্যে ভগ্ন অস্থি দর্শন বোধহয় এই প্রথম," ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী হাসিয়া বলিলেন, "আমার অভিজ্ঞতাতে প্রথম বটে।" তখন কলিকাতার আর কোথাও এক্সরে যন্ত্র আসে নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই যন্ত্র ডাক্তার বসুর নির্দ্দেশক্রমে কলেজের গবেষণাগারে জগদিন্দুবাবু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রবাবু ও জ্যোতিবাবুর মতো তাঁহাদের অগ্রজ বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪০-১৯২৬] মহাশয়কেও আমার একদিন মাত্র দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের পর দিন সন্ধ্যার সময় 'হিতবাদী'র তদানীন্তন সম্পাদক

সখারাম গণেশ দেউস্কর আমাকে বলিলেন, "দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে স্নেহ করেন; তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, আপনি যাইবেন কি?" তাঁহার প্রস্তাবে আমিও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দ্বিতলে, দক্ষিণ দিকের বড় হলের এক পার্শ্বে একখানা সোফার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় দ্বিজেন্দ্রবাবুকে দেখিতে পাইলাম। গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, পক্ক কেশ, পক্ক শ্মশ্রু বৃদ্ধ বসিয়া আরও দুইজন প্রবীণ ভদ্রলোকের সহিত মৃদু স্বরে কথা কহিতেছিলেন। আমরা প্রবেশ করিবামাত্র সেই দুজন ভদ্রলোক গাত্রোত্থান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমরা কক্ষমধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইলে, দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন—"কে?" সখারামবাবু আত্মপরিচয় প্রদান করিলে তিনি বলিলেন, "সখারাম আসিয়াছ? এস। আমার বড়ই বিপদ; এতদিন কিছুই জানিতাম না, এখন যে কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এতদিন আমি পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম, এখন যেন বড় অসহায় বলিয়া নিজেকে মনে করিতেছি।" আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সখারামবাবু বলিলেন, "আমার বন্ধু, 'হিতবাদী'র সহকারী সম্পাদক।" আমি বলিলাম, "আমার আর একটু পরিচয় আছে, আপনাদের বাটীর দৌহিত্র এটর্নী অমরেন্দ্রবাবু আমার জ্ঞাতিভ্রাতা। তাঁহার প্রপিতামহ এবং আমার প্রপিতামহ সহোদর।" এই কথা শুনিবামাত্র তিনি ঠিক স্বর্ণকুমারী দেবীর কথাই যেন পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "ওঃ তবে তো তুমি আমাদের ঘরের ছেলে গো।" দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর যখন মহর্ষির সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ের উল্লেখ করিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমাদের বিষয়সম্পত্তি নাশ অবধারিত জানিয়া বাবা আমাকে একটা ছোট ডেস্ক কিনিয়া দিয়া ভাল করিয়া হাতের লেখা পাকাইতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি হাতের লেখাটা ভাল হয়, তাহা হইলে কোন সাহেব-সুবাকে ধরিয়া একটা কেরাণীগিরি করিয়া দিতে পারিব। হাতের লেখা ভাল না হইলে তাহাও জুটিবে না। বাবার আদেশে আমি হাত পাকাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।" রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমরা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। বাবার কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সত্তর বা তাহারও অধিক বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে পিতৃশোকে কাতর দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি এমনভাবে কথাগুলি বলিলেন, যেন কোন নাবালক সহসা পিতৃহীন হইয়া অকুল সাগরে পড়িয়াছেন। বুঝিলাম যে, পিতা বা মাতা জীবিত থাকিলে পুত্রের যতই বয়স হোক না কেন তাহার বালকত্ব অন্তত পিতা-মাতার কাছে বিদ্যমান থাকে। মহর্ষির কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা কালে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এক সময় বাবা যে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন খ্রীষ্টানী ভাবের বন্যায় হিন্দু সমাজ ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন বাবা রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই খ্রীষ্টানী ভাবের একটা বড় ঢেউকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি না থাকিলে আজ বাঙলার ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে খ্রীষ্টানের সংখ্যা অনেক বেশী হইত।" কথাটা যে খুব সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার পর দুই চারিবার মাঘোৎসবের সময় আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন কথা হয় নাই। সেদিন সখারামবাবুর সহিত না গেলে হয়ত তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিবার সৌভাগ্য কখনও হইত না। এই প্রসঙ্গে বাবু রাজনারায়ণ বসু[৬০] মহাশয়ের কথাও বলিব। রাজনারায়ণবাবু যখন মেদিনীপুর স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, তখন আমার পিতা বোধহয় দুই বৎসর কাল ঐ স্কুলে পড়িয়াছিলেন। বহুকাল পরে আমার পিতা পেন্সন লইয়া দেওঘরে কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণবাবুও দেওঘরে থাকিতেন। আমার পিতা সেই সময় প্রায় প্রত্যহই তাঁহার নিকটে বেড়াইতে যাইতেন। দেওঘর হইতে বাবা ফিরিয়া আসিয়া আমাদের নিকট রাজনারায়ণ বসু সম্বন্ধে গল্প করিতেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি কিছুদিনের জন্য সেই সময় মধুপুরে আমার এক বন্ধুর নিকট গিয়াছিলাম। একদিন আমাদের পরামর্শ হইল যে, রাজনারায়ণবাবুকে দেখিতে যাইব। আমি বাবাকে পত্র দিয়া আমাদের সঙ্কল্পের কথা জানাইলে তিনি পত্রোত্তরে আমাদিগকে লিখিলেন যে, তিনি আমাদের কথা রাজনারায়ণবাবুকে লিখিয়াছেন। বাবার পত্রের মধ্যে আমাদের একখানি পরিচয় পত্র ছিল। বাবার পত্র পাইয়া আমরা তৎপরদিনই দেওঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা যখন রাজনারায়ণবাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন বোধহয় বেলা আড়াইটা। তিনি বাহিরের ঘরে ছিলেন না। আমি একজন ভৃত্যের দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ দিলে তিনি সহাস্য বদনে আসিয়া বলিলেন,—'ইন্দ্রকুমারের পত্র পাইয়াছি, তোমাদের মধ্যে ইন্দ্রকুমারের ছেলে কে?'' আমি পরিচয় প্রদান করিলে তিনি আমাদের দুইজনকেই সমান স্নেহভরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন, ''আমার ছাত্রের ছেলে, আমার নাতি। কেমন তাই নয় কি?'' এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। দেখিলাম, তিনি সকল কথাতেই খুব প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিতেন। তাঁহার মত প্রাণখোলা উচ্চ হাসি আজকাল বড় দেখিতে পাই না। আমরা তাঁহার কাছে প্রায় অপরাহ্ণ পাঁচটা পর্যন্ত ছিলাম। আসিবার পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে জলযোগ করাইয়া বিদায় দিলেন। রাজনারায়ণবাবু ভূদেববাবু ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের সতীর্থ ছিলেন। মাইকেলকে আমি দেখি নাই, কিন্তু রাজনারায়ণবাবুর সহিত ভূদেববাবুর তুলনা করিলে একটা পার্থক্য সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িত। ভূদেববাবু যেমন রাশভারী, অল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, রাজনারায়ণবাবু সেরূপ ছিলেন না। তিনি সদানন্দ রঙ্গপ্রিয় লোক ছিলেন। আমরা যতক্ষণ তাঁহার নিকট ছিলাম, ততক্ষণের মধ্যে তিনি যে কতবার আমাদিগকে 'নাতি' সম্বন্ধ ধরিয়া আমোদ করিলেন তাঁহার সংখ্যা নাই। তাহার মধ্যেই আমরা কতদূর পড়াশুনা করিয়াছি, কি কাজ করি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সেকালের আরেকজন সুরসিক অথচ সুপণ্ডিত লোক ছিলেন বাবু গঙ্গাচরণ সরকার। সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার[৬১] গঙ্গাচরণবাবুর এক মাত্র পুত্র। গঙ্গাচরণ-বাবুর বাটী চুঁচুড়ার কদমতলা। আমাদের বাটী হইতে বোধহয় এক ক্রোশ হইবে। আমার এক জ্ঞাতিভ্রাতা অক্ষয়বাবুর সতীর্থ ও বন্ধু ছিলেন, তিনি অক্ষয়বাবুর

প্রতিবেশী, তাঁহার বাটীতে আমি সর্ব্বদা যাইতাম, সেই সূত্রে অক্ষয়বাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। বাঙ্গালা লেখার প্রতি আমার বাল্যকাল হইতে ঝোঁক ছিল বলিয়া অক্ষয়বাবু আমাকে স্নেহ করিতেন। আমিও আমার সেই জ্ঞাতিভ্রাতার বাটীতে গেলেই অক্ষয়বাবুর বাটীতে যাইতাম। সেই সময় আমি প্রায় গঙ্গাচরণবাবুকে দেখিতে পাইতাম। গঙ্গাচরণবাবু সাবজজ ছিলেন; আমি যখন তাঁহার বাটীতে যাইতাম, তখন তিনি পেন্সন লইয়া বাটীতে বসিয়াছিলেন। গঙ্গাচরণবাবুর দেহের বর্ণ খুব কালো ছিল আর ধবধবে বড় সাদা গোঁফ ছিল। বন্ধুমহলে খুব সুরসিক, উপস্থিত বক্তা ও আমুদে বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রসিকতা সম্বন্ধে চুঁচুড়ার প্রাচীনগণের মুখে এখনও অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। দুই একটা গল্পের কথা বলিলে পাঠকগণ তাঁহার স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে কতকটা আভাস পাইবেন। একদিন কলিকাতা হইতে এক ভদ্রলোক অক্ষয়বাবুর সহিত দেখা করিতে চুঁচুড়ায় গিয়াছিলেন। তিনি অক্ষয়বাবুর বাটী চিনিতেন না, জিজ্ঞাসা করিয়া কদমতলায় উপস্থিত হইলেন এবং একটা বাটীর বাহিরের রোয়াকে একজন কৃষ্ণকায় পক্কগুম্ফ ভদ্রলোককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাড়ী কোথায়?" সেই বৃদ্ধ বলিলেন—"কই এখানে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কোন বাড়ী আছে বলিয়া তো জানি না।" আগন্তুক তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমাকে এক জন ভদ্রলোক বলিলেন যে, এই গলির ভিতর পুকুরের পূর্ব্বপাড়ে সেই রোয়াকওয়ালা বাড়ী—তবে তিনি কি ভুল বলিলেন?" বৃদ্ধ বলিলেন, "এ বাড়ী তো আমার। আপনি সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন দেখি, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাড়ী এইটা কিনা?" বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আগন্তুক পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকের নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনি যে বাড়ীর কথা বলিলেন, সেই বাড়িতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন সেই বাড়ী তাঁহার, অক্ষয়বাবুর বাড়ী কোথায় তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না।" এই কথা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—"তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, সেটা তাঁহারই বাড়ী, তিনি অক্ষয়বাবুর পিতা গঙ্গাচরণবাবু। আপনি গিয়া গঙ্গাচরণবাবুর বাড়ীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করুন।" আগন্তুক তখন পুনরায় সেই বৃদ্ধের নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহাশয় গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের কি এই বাড়ী? আমি তাঁহার পুত্র অক্ষয়বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধ সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থিত করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন এবং একজন ভৃত্যকে অক্ষয়বাবুকে সংবাদ দিতে বলিলেন। অক্ষয়বাবু আসিলে বৃদ্ধ বলিলেন, "এই ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাড়ী কোথা? এ পাড়ায় তোমার যে কোন বাড়ী আছে, তা ত জানি না, তাই বলিলাম আমি জানি না।" পরে সেই আগন্তুককে বলিলেন—"যত দিন আমি বাঁচিয়া আছি তত দিন এ বাড়ী আমার, মৃত্যুর পর এই বাড়ী অক্ষয়ের হইবে।" একদিন গঙ্গাচরণবাবুর এক পুরাতন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্ষয়ের সন্তানাদি কি?" শুনিয়া গঙ্গাচরণবাবু

বলিলেন, "একটু পরে বলিব।" এই কথা শুনিয়া তাহার বন্ধু সবিস্ময়ে বলিলেন, "একটু পরে বলিবে? তার মানে?" গঙ্গাচরণবাবু বলিলেন, "বউমার প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে, শীঘ্রই সন্তান হইবে, হইলে বলিব কয়টি পুত্র, কয়টি কন্যা। এখনই বলিলে আবার পনের কুড়ি মিনিট পরে নতুন করিয়া সংবাদ দিতে হইবে। তাহার চেয়ে একটু অপেক্ষা করিয়া দেখিয়া বলা ভাল।" বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়াছি, গঙ্গাচরণবাবু আর একবার বড় রঙ্গ করিয়াছিলেন। একদিন চুঁচুড়ার বাজারে গিয়া দেখিলেন এক জায়গায় লটারী বা সূর্ত্তি খেলা হইতেছে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, চন্দননগর, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে শীত কালে প্রায়ই খেজুরের গুড়ের কলসীতে লটারী হইত। একজন দোকানদার দশ আনা বার আনা দিয়া এক কলসী গুড় কিনিয়া তাহার উপর একটি ঝুনা নারিকেল রাখিয়া সেই গুড় ও নারিকেল লটারী করিত। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে এক টাকা বা দেড় টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়া যাইত। তাহার পর লটারী আরম্ভ হইত। একটা ছোট বালক একটা হাঁড়ির ভিতর হইতে টিকিট এক এক খানি করিয়া টানিয়া বাহির করিত। টিকিট ক্রয়কারীদের নাম একজন লোক চীৎকার করিয়া বলিয়া যাইত, আর বালক যে টিকিট বাহির করিত, তাহা সাদা হইলে সমবেত জনতা উচ্চৈঃস্বরে 'ফরসা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। বাজারে গুড়ের লটারি হইতেছে দেখিয়া গঙ্গাচরণবাবু এক আনা দিয়া একখানা টিকিট কিনিয়া সেইখানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে লটারী আরম্ভ হইল। এক একটা নাম ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বালক টিকিট বাহির করিতে লাগিল। আর সকলে 'ফরসা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। গঙ্গাচরণবাবুর নাম ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই বালকটি একখানা সাদা টিকিট বাহির করিল। তাহা দেখিয়া সকলে চীৎকার করিয়া বলিল, 'ফরসা'। তাহা শুনিয়াই গঙ্গাচরণবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আমার একখানা পয়সা বৃথা নষ্ট হয় নাই। চিরকাল লোকে আমাকে কালো বলিয়া আসিয়াছে, আজ বাজারসুদ্ধ লোক এক বাক্যে বলিয়াছে—গঙ্গাচরণ ফরসা।"

গঙ্গাচরণবাবুর একমাত্র পুত্র, সাহিত্যাচার্য্য বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নাম বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি চুঁচুড়ায় আমার জাঠতুত দাদার বাড়িতে গেলে প্রায়ই অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে যাইতাম। আমার যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে কতবার অক্ষয়বাবুর কাছে গিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে দু-চারি কথায় কিছু বলা অসম্ভব। আমি বাল্যকাল হইতে সাহিত্যচর্চ্চা করিতাম, লিখিতাম, সেইজন্য তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। 'হিতবাদী'তে যখন আমি 'বৃদ্ধের বচন' লিখিতাম, তখন তিনি আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেন যে "হিতবাদী হাতে পাইলেই আগে দেখি যে তোমার বৃদ্ধের বচন আছে কি না?" পত্নীর চিকিৎসার জন্য তিনি কিছুদিন কলিকাতার মৃজাপুর ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিয়াছিলেন। এখন সেই বাড়ীটা নাই, তাহার উপর দিয়া হ্যারিসন রোড নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান হ্যারিসন রোড ও মৃজাপুরের সংযোগস্থলে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ঈশান কোণে সেই বাড়ী ছিল। তখন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের নাম ছিল

'ছোট গোলদীঘি'। অক্ষয়বাবুর বাটীর ঠিক পূর্ব্বদিকে রিপন কলেজ ছিল। আমি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া একবার তিন-চারিদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া অক্ষয়বাবুর সেই বাসাতে ছিলাম। সেই সময় একদিন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক অক্ষয়বাবুর বাসাতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি বোধহয় কানে কম শুনিতেন। উভয়ে বোধহয় সমবয়স্ক ছিলেন, অক্ষয়বাবু তাহার সহিত কথা কহিবার সময় বেশ উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতেই আমি মনে করিলাম যে আগন্তুক বধির। আমি খুব নিম্নস্বরে অক্ষয়বাবুকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অক্ষয়বাবু তেমনি মৃদুস্বরে বলিলেন বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত। আমি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সেই আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে, মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস[৬২] আমাদের পাঠ্য ছিল, আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যিনি বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষক ছিলেন, তিনিই এই রজনীকান্ত গুপ্ত। আমার মনে হয় রজনীবাবুর মুখে গালের কাছে একটা আঁচিল ছিল।

চুঁচুড়ার অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে আর এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখিতে পাইতাম। তিনি বোধহয় অক্ষয়বাবু অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন। সেকালে তিনি একজন অসাধারণ পরিহাস রসিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার নাম বাবু দীননাথ ধর। দীনবাবু এক সময়ে ঢাকাতে গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন। পরে অবসর গ্রহণ করিয়া বাটীতে বসিয়াছিলেন, আমার পিতার সঙ্গেও তাঁহার বেশ হৃদ্যতা ছিল। অক্ষয়বাবুর বাটীতে তিনি আমার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ইন্দ্রকুমারের ছেলে? আমি বলি বুঝি অক্ষয়ের কেউ হবে।" আমি যখন 'হিতবাদী'তে কার্য্য করিতাম, তখনও তিনি মধ্যে মধ্যে 'হিতবাদী' আপিসে যাইতেন। পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তখন 'হিতবাদী'র সম্পাদক। দীনবাবু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "যোগিন এখানে যে?" বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন, "যোগিনবাবুই 'হিতবাদী'র সম্পাদক, আমি ত নামে।" শুনিয়াই দীনবাবু বলিলেন, "বেশ, বেশ, শুনিয়া বড় আনন্দ হইল যে আমাদের ঘরের ছেলে কলিকাতায় খবরের কাগজ মহলে নাম কিনিয়াছে।" দীনবাবুর গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আর একদিন তিনি আমাদের আপিসে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময় এক জন লোকের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কথা উঠিল, সেই প্রসঙ্গে দীনবাবু বলিলেন, "আমি যখন ঢাকাতে ওকালতি করি, তখন একদিন বড় মজা হইয়াছিল। ঢাকাতে মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী নামে একটি লোক পৈতে ফেলিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিল। তার পর শুনিলাম, সে ক্রিশ্চান হইয়াছে। আবার কিছুদিন পর শুনিতে পাইলাম যে মুসলমান হইয়া সে দীন মহম্মদ নাম লইয়াছে। একবার সে তাহার একটা মামলা করবার জন্য আমাকে আসিয়া ধরিল। আমি তাহার পরিচয় লইয়া বলিলাম—আমি তোমার মোকদ্দমা লইতে পারি, যদি তুমি ইব্রাহিম নামে মোকদ্দমা কর। সে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম ইশুর (যিশুর) 'ই' ব্রাহ্মর 'ব্রা' হিন্দুর 'হি' এবং মহম্মদের 'ম'। তোমার নাম দীন মহম্মদ না হইয়া ইব্রাহিম হওয়া

।। এই দীন মহম্মদ গাঙ্গুলী সাহেবও কয়েকবার 'হিতবাদী' আপিসে আসিয়াছিলেন, আমরা তাহাকে 'গাঙ্গুলী সাহাব' বলিয়া সেলাম করিতাম। তিনি ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না, দীনবাবুর মুখেই তাহা শুনিলাম। দীনবাবু 'হিতবাদী' আপিসে আসিলে প্রায়ই ঐরূপ গল্প করিতেন। তিনি নিজে সুবর্ণবণিক ছিলেন কিন্তু সুবর্ণবণিকদিগের জাতিগত দুর্ব্বলতা লইয়াই হাস্য পরিহাস করিতেন। আমাদের আপিসে বসিয়া তিনি যে সকল সময় গল্প করিতেন তাহার অধিকাংশই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের আদেশে 'দীনবাবুর দান' নামে হিতবাদীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

আমাদের সেকালে আর একজন সুবিখ্যাত পরিহাস রসিক ব্যঙ্গবিদ্রূপে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[৬৩] মহাশয়। ইন্দ্রনাথবাবুর অধিকাংশ লেখা সেকালের 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইত—কিন্তু তাঁহার নিজের নামে নহে, 'পঞ্চানন্দ' এই ছদ্মনামে। ইন্দ্রনাথবাবু বর্দ্ধমানে ওকালতি করিতেন। আমার পিতা বর্দ্ধমানে প্রথমে নর্ম্যালি স্কুলের হেডমাষ্টার, পরে সাবইন্সপেক্টর ও শেষে ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে শিক্ষা বিভাগে প্রায় বিশ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। আমাদের বাসা ইন্দ্রনাথবাবুর বাটীর কাছেই ছিল। বাবার নামের সহিত ইন্দ্রনাথবাবুর নাম সাদৃশ্যে অনেক সময় চিঠিপত্রের গোলমাল হইত, বাবার চিঠি তাঁহার বাটীতে এবং তাঁহার চিঠি বাবার কাছে আসিত; অনেক সময় হয়ত কোন মক্কেল বাবার কাছে আসিয়া হাজির হইত। আমরা যখন বালক, ইন্দ্রনাথবাবু তখন যৌবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, যৌবনে তিনি বেশ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বর্ণও বেশ উজ্জ্বল গৌর ছিল। বর্দ্ধমানের নর্ম্যালি স্কুল উঠিয়া গেলে বাবা স্কুলের সাবইন্সপেক্টর হইলেন, আমরা বর্দ্ধমান হইতে চন্দননগরে চলিয়া আসিলাম। বাবা বর্দ্ধমানে একাকী বাসা করিয়া থাকিলেন। সেটা বোধহয় ১৮৭৭ কিংবা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। বর্দ্ধমান ছাড়িয়া আসিবার পর বোধহয় চল্লিশ বৎসর পরে ইন্দ্রনাথবাবুর আর একদিন সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, 'হিতবাদী' আপিসে, 'হিতবাদী' আপিসে তিনি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কাছে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে একেবারেই চিনিতে পারি নাই। সেই বাল্যকালে দৃষ্ট সুন্দর সুশ্রী ইন্দ্রনাথ আর এই বৃদ্ধ ইন্দ্রনাথ। প্রায় চল্লিশ বৎসর কি পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে দেখা। বলা বাহুল্য যে, তিনিও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমাকে বলিলেন, "যোগিনবাবু, ইহাকে চেনেন? ইনিই বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে পঞ্চানন্দ।" এই বলিয়াই তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি যেমন বঙ্গবাসীর পঞ্চানন্দ, ইনিও তেমনি আমাদের শ্রীবৃদ্ধ।" ইন্দ্রনাথবাবুর নাম শুনিবামাত্র আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে তিনি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র আমি বলিলাম, "আমার বাবার নাম স্বর্গীয় ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানে আমরা আপনার বাড়ীর কাছেই থাকিতাম।" এই কথা শুনিবামাত্র তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি সেই যোগিন? তোমাকে দেখিয়াছি ত ছেলেমানুষ, তখন তোমার বয়স বোধহয় আট-দশ বৎসর। তোমাকে চিনিব কি করিয়া? বেশ বাবা বেশ,

তোমাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তোমার বাবা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। যাহা হউক, আমার শুনিয়া বড় আনন্দ হইল যে 'বৃদ্ধের বচন' তোমারই লেখা। আমরা মনে করিতাম যে আমি, অক্ষয় সরকার প্রমুখ কয়েকজন বুড়া চক্ষু বুজিলেই বাংলা সাহিত্যের রস শুকাইয়া যাইবে। তোমার বৃদ্ধের বচনগুলি পড়িয়া মনে হইত বাংলা সাহিত্যের রস এত শীঘ্র শুকাইবে না, রসধারা আরও কিছুদিন বাংলা সাহিত্যকে সরল করিয়া রাখিবে।" একদিন অক্ষয় সরকার কি ইন্দ্রনাথবাবু আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আমারও ঠিক সেই কথাই বারংবার মনে হয়। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৬৩-১৯৪৯], শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু (পরশুরাম) [১৮৮০-১৯৬০] প্রমুখ কয়জন বৃদ্ধের লেখনী বন্ধ হইলে হয়ত বাংলা সাহিত্য একেবারে রসহীন হইয়া পড়িবে। অনেকটা আশা ছিল উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৮৭৯-১৯৫০] উপর—কিন্তু উপেন্দ্রনাথও তাঁহার লেখা বন্ধ করিয়াছেন। আজকাল তাঁহার সরল লেখা বড় চোখে পড়ে না।

আমাদের সেকালের সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি অনেকবার দেখিয়াছি কিন্তু একবার ব্যতীত তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার সুবিধা হয় নাই। বাল্যকালে তাঁহাকে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চুঁচুড়ার বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাইতাম, কিন্তু তখন তাঁহার কাছে বড় যাইতাম না। তখন তাঁহার গোঁফ ছিল। তারপর বহুকাল পরে একবার তাঁহাকে দেখি জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে (এখন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ)[৬৪] একটা সভাতে সভাপতি রূপে। সেই সভা বোধহয় ১৮৯৩ কি ৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরীর[৬৫] বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে হইয়াছিল। সেই সভাতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোধহয় 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ[৬৬] করিয়াছিলেন। আর একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর ঐ স্থানেই রবীন্দ্রবাবু বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুকে যখন সভাপতিরূপে দেখিয়াছিলাম, তখন আমি কলিকাতার বহুবাজারে একটি মেসে থাকিতাম। সেই মেসে আমার চারি-পাঁচ জন সতীর্থও থাকিতেন, তাঁহার মধ্যে কেহ মেডিকেল কলেজে পড়িতেন, কেহ বা আইন পড়িতেন। হাওড়ার সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার সত্যশরণ মিত্র আমার বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ ছিলেন, তাঁহারও বাটী চন্দননগরে ছিল, তিনি আমাদের মেসেই থাকিতেন। একদিন আমরা কয়জন বন্ধুতে মিলিয়া বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে গেলাম। তিনি তখন মেডিকেল কলেজের পূর্ব্বদিকে প্রতাপ চাটুয্যের লেনে[৬৭] বাস করিতেন। আমরা পাঁচ-ছয়জন মিলিয়া একদিন সকাল বেলা ৯টার সময় তাঁহার বাসাতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তিনি অনাবৃত শরীরে বসিয়া একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন এবং আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন। আমরা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যশরণ বলিল, "আমরা আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি।" তিনি আমাদিগকে বসিতে বলিলে আমরা উপবেশন করিলাম। আমাদের সকলেরই বাড়ী চন্দননগরে শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা সকলেই তো

আমার প্রতিবেশী দেখিতেছি।" তিনি প্রতিবেশী বলিলেন তার কারণ তাঁহার নিবাস কাঁঠালপাড়া, চুঁচুড়ার ঠিক পরপারে আর চন্দননগর চুঁচুড়ার সংলগ্ন ঠিক দক্ষিণে। চন্দননগরের উত্তরাংশের গঙ্গার ঘাট বোধহয় এক ক্রোশের অধিক হইবে না। আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিয়া আমাকে বলিলেন, "ও, তুমি ইন্দ্রকুমার বাবুর ছেলে? তুমি কি কর?" আমি তখন দালালি করিতাম, সে কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "অনেকের ধারণা আছে, যে ওকালতি বা দালালিতে মিথ্যা কথা না বলিলে চলে না। একথা আমি বিশ্বাস করি না। সর্ব্বদা মনে রাখিও—Honesty is the best Policy." আমার সঙ্গীরা সকলেই তখন ছাত্র—অধিকাংশ মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বোধহয় দুই-একজন আইন ক্লাসেরও ছাত্র ছিলেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমার কাছে উপদেশ লইতে আসিয়াছ? এক কথায় আমার উপদেশ—Do your duty. তোমাদের বর্ত্তমান duty লেখাপড়া করা। ছাত্রানামাধ্যয়নন্তপঃ, পড়াশুনাই তোমাদের তপস্যা, এখন তোমাদের অন্য কোন duty নাই।" এই বলিয়া নীরব হইলে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। বঙ্কিমবাবুর অগ্রজ বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৪-১৮৮৯] মহাশয়কেও আমি বাল্যকালে অনেকবার দেখিয়াছি। আমার পিতা যখন বর্দ্ধমান নর্ম্যালি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সে সময় সঞ্জীববাবু বর্দ্ধমানের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বর্দ্ধমানে তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সহিত কখনও কথা বলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

আমার দেখা লোক (৪)

'হিতবাদী' আপিস এবং 'বেঙ্গলী' আপিস একই বাড়ীতে ৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে ছিল, সেইজন্য আমি সুরেন্দ্রবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। মণিরামপুরে তাঁহার বাড়ীতে অনেকবার তাঁহার কাছে গিয়াছি। সুরেন্দ্রবাবুর আত্মজীবনী[৬৮] প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর সমস্ত সংবাদপত্রেই তাঁহার জীবনকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক লেখা অনাবশ্যক। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদের সময় তিনি বাঙালীর বিশেষতঃ তরুণ বাঙালীর নিকট দেবতার আসন পাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য মফঃস্বলে, চার পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকও সভাক্ষেত্রে সমবেত হইত। তাঁহার সঙ্গে কাব্যবিশারদ মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ [?-১৩৩৩ব.], মৌলবী আবুল হোসেন, ডাক্তার গফুর প্রভৃতি মফঃস্বলে বক্তৃতা করিতে যাইতেন। আমিও অনেকবার তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তবে দূরে কোথাও যাই নাই। হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত রেলপথের পার্শ্বে যে সকল সভা হইত, আমি সেই সকল সভাতে যাইতাম। একবার তাঁহার সঙ্গে একটা সভাতে গিয়া ভীষণ বিপদে পড়িয়াছিলাম এবং তাঁহারই কৃপায় সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলাম। সভাটা হইয়াছিল শেওড়াফুলির কালীবাড়ীতে। সভাতে বোধহয় চার-পাঁচ হাজার লোক হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রবাবু সভাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়, কৃষ্ণকুমারবাবু ও গীষ্পতিবাবু বক্তা হিসাবে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম বক্তা হিসাবে নহে, শ্রোতা বা দ্রষ্টা হিসাবে। কারণ পূর্ব্বে আমি কখনও কোন সভাতে বক্তৃতা করি নাই। সভাপতি সুরেন্দ্রবাবু আসন গ্রহণ করিলে পর, তাঁহার আদেশে একজন স্থানীয় ভদ্রলোক বক্তাদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া সভাপতির টেবিলে রাখিয়া দিলেন। তিনি যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে কাব্যবিশারদ মহাশয়, কৃষ্ণকুমারবাবু এবং গীষ্পতিবাবুর নামের পরেই আমার নামটিও লিখিয়া দিয়াছিলেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল, রামপুরহাট স্কুলের হেডমাষ্টার, সুকণ্ঠ গায়ক বাবু রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল,'[৬৭] এই গানটি গাহিলেন। তার পর সুরেন্দ্রবাবু বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতা করিবার সময় তিনি একটি বড় মজার ভুল কথা বলিয়াছিলেন; বক্তৃতার উপসংহারে তিনি "তোমরা সকলে স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার কর, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা তোমাদের মঙ্গল করিবেন" এই কথা বলিতে গিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—"দুর্গেশনন্দিনী দুর্গা তোমাদের মঙ্গল করিবেন।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিবা মাত্র—কাব্যবিশারদ মহাশয় বলিলেন, "ওকি বলিলেন? বলুন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমবাবুর একখানি নভেল।" "তাই নাকি? আমি দুর্গেশনন্দিনী বলেছি নাকি? ওটা ভুল হয়ে গেছে।" কথাবার্ত্তাটা অনুচ্চ-স্বরেই হইয়াছিল, মঞ্চের উপর উপবিষ্ট লোক ছাড়া আর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। উহার কয়েকদিন পরে তিনি চন্দননগরের সভাতেও ঐরূপ "শাস্ত্রের বিধান" বলিতে গিয়া "শাস্ত্রের ব্যবধান" বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। চন্দননগরের সভাতেও তাঁহার মুখে বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনি। সভাতে কয়েকজন সাহেব ছিলেন, তাই সুরেন্দ্রবাবু প্রথমে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়াই—অমনি সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ দুটি সভা ব্যতীত অন্য কোন সভাতে ভুল বলিতে শুনি নাই। এইবার আমার বিপদের কথা বলি। কৃষ্ণকুমারবাবু, বিশারদ মহাশয় এবং গীষ্পতিবাবুর বক্তৃতার পর সভাপতি আমার নাম ডাকিয়া আমাকে বক্তৃতা করিতে আদেশ দিলেন। সেই বিরাট সভা, তাহার উপর ভারতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী সুরেন্দ্রবাবু এবং আমার মনিব কাব্যবিশারদ মহাশয় উপস্থিত। আমি সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলাম যে, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি কখনও বক্তৃতা করি নাই। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। বলিলেন, 'হিতবাদী'তে প্রবন্ধ লেখেন, তা তাই মুখে মুখে বলুন না। যারা লিখতে পারে তাঁদের আবার বক্তৃতার ভাবনা কি? আমার সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় কালীবাড়ীতে দেবীর আরতি আরম্ভ হইল, কাঁসর ঘণ্টার শব্দে সভার কার্য্য বন্ধ রহিল। সেই সময়টা সুরেন্দ্রবাবু আমাকে বারংবার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আরতি শেষ হইলে তিনি আবার আমার নাম করিয়া বক্তৃতা করিতে আদেশ করিলেন। আমি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইলাম বটে, কিন্তু আমার কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল না। খুব আস্তে আস্তে দুই-চারিটি কথা বলিলাম। সুরেন্দ্রবাবু বারংবার বলিতে লাগিলেন, "বাঃ বেশ তো বলিতেছেন।" পাঁচ-সাত মিনিট পরে

আমার ভয়টা একটু কমিয়া গেল। গলার আওয়াজ একটু জোর হইল—ক্রমে ক্রমে কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর সুরেন্দ্রবাবু হাততালি দিতে লাগিলেন, উৎসাহে আমার মুখ খুলিয়া গেল, আমি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলাম। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, আমি সেই প্রথম দিনই পঞ্চাশ মিনিট বক্তৃতা করিয়া ছিলাম এবং সেই বিরাট জনতা নিস্তব্ধ হইয়া সেই বক্তৃতা শুনিয়াছিল। বক্তৃতা শেষ করিয়া যখন বসিলাম, তখন মনে হইল আমি যেন দশ-পনের দিন উপবাস করিয়া আছি, শরীর এতই দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। আমি বসিবামাত্র সুরেন্দ্রবাবু আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "আপনি এমন সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারেন, আর বলিতেছিলেন কখনও করি নাই?" আমি মনে মনে বেশ বুঝিলাম যে, সুরেন্দ্রবাবুই আমাকে বক্তা বানাইয়া ছাড়িলেন। তাহার পর অনেক সভাতে তাঁহাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়াছি, কিন্তু সেরূপ ভয় হয় নাই। কিরূপে বক্তা তৈয়ার করিতে হয়, তাহা সেদিন সুরেন্দ্রবাবুর কার্য্যে বুঝিতে পারিলাম। এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে কংগ্রেস[৭০] হইয়াছিল, তাহাতে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরোজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ছিলেন, সখারামবাবু 'হিতবাদী'র সম্পাদকের নাম এবং আমি রিপোর্টারের পাস লইয়া কংগ্রেসে গিয়াছিলাম। সেইখানে ভারতের "The grand old man" বর্ষীয়ান মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার লিখিত অভিভাষণ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়াছিলেন মিঃ গোখলে। আমি মহামতি গোখলেকে তাহার পূর্ব্বে একবার প্রেসিডেন্সী কলেজে দেখিয়াছিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে শেক্সপীয়রের একখানা নাটক ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। আমার এক বন্ধু তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করিতেন। তিনি আমাকে একখানা পাস দিয়াছিলেন। মিঃ গোখলে সেই সময় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া তিনিও থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি স্যার পি. সি. রায়ের পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন। পশ্চিম ভারতের আর একজন মহাত্মাকে একবার মাত্র দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তিনি লোকমান্য তিলক। সখারামবাবু লোকমান্য তিলকের আদেশে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব প্রবর্ত্তন করেন, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথম বৎসরের উৎসব টাউন হলে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসর 'পান্তীর মাঠে'[৭১] হইয়াছিল। আমি সখারামবাবুর সহিত উৎসব ক্ষেত্রে গিয়া মহামতি তিলককে দেখিয়াছিলাম। কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কংগ্রেসের সভাপতি ডবলিউ. সি. বোনার্জ্জি[৭২] মহাশয়কেও আমি একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। সে দর্শন কোন সভাতে নহে তাঁহার পার্ক ষ্ট্রীটের আবাসে। আমাদের সেই সময় হাইকোর্টে একটা মামলা হইতেছিল। আমার পিতা সেই মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ লইবার জন্য ডবলিউ. সি. বোনার্জ্জির খুল্লতাত রেভারেণ্ড শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে একখানা পরিচয় পত্র লইয়া ডবলিউ. সি. বোনার্জ্জির নিকটে গিয়াছিলেন। বাবা একজন বেহারা দ্বারা আগমন সংবাদ পাঠাইলে বোনার্জ্জী সাহেব কক্ষান্তর হইতে আমাদের কক্ষে আসিয়া বাবাকে নমস্কার করিলেন। বাবা মনে

করিয়াছিলেন যে বোনার্জ্জি বোধহয় সাহেবী কেতায় 'গুড মর্ণিং' বলিয়া সেলাম করিবেন, এবং ইংরাজীতে কথা কহিবেন। কিন্তু বোনার্জ্জি সাহেব পুরদস্তুর দেশীয় প্রথায় করজোড়ে কপাল স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিলেন এবং বাঙ্গালাতে কথা কহিয়াছিলেন। আমরা প্রায় এক ঘণ্টা তাঁহার কাছে ছিলাম, তন্মধ্যে আদালত সংক্রান্ত দু-একটি শব্দ ব্যতীত একটিও ইংরাজী শব্দ বলেন নাই। তাঁহার পোষাকটা কিন্তু সাহেবী ছিল—সাদা ফ্লানেলের প্যাণ্টুলান ও কামিজ। তিনি বাবার কাছে তাঁহার খুড়ার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। আমরা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি আবার বাবাকে নমস্কার করিলেন, আমরাও প্রতিনমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।

এখনকার বোধহয় সতের-আঠার বৎসর পূর্ব্বে চুঁচুড়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে কুমিল্লার শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত সভাপতি হইয়াছিলেন। অখিলবাবুকে সভাপতির আসন প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ নেতা রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর। তিনি ঐ প্রস্তাব উত্থাপন কালে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"আমি কিছুদিন কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে মাষ্টারী করিয়াছিলাম। আমি যশুরে বাঙ্গাল, তাই কলিকাতায় এক অকালপক্ক ছাত্র একদিন আমাকে প্রশ্ন করিল, Sir বাঙ্গাল কোন্ gender? আমি তাহাকে বলিলাম—বাঙ্গাল masculine gender, উহার feminine বাঙ্গালী; তোমরা যাহাদিগকে বাঙ্গালী বল, তাহারা তো স্ত্রীলোক। আজ আমি এই সভাতে একজন পুরুষের মত পুরুষকে সভাপতির আসন দিবার প্রস্তাব করিতেছি।" 'হিতবাদী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সংস্কৃত কলেজে যদুনাথবাবুর ছাত্র ছিলেন। যশোহরে বঙ্গীয় সম্মেলনের পর একদিন তিনি কি একটা কার্য্যে 'হিতবাদী' আপিসে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট আসিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার গোঁফ ছিল, সেদিন কিন্তু হিতবাদী আপিসে তাঁহাকে দেখিলাম গুম্ফহীন মুণ্ডিত মস্তক। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহাকে মাথার চুল ও গোঁফ ফেলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মজুমদার মহাশয় বলিলেন, "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়া ঝকমারি করিয়াছিলাম, তাই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি।" যশোহরের ঐ সম্মেলনের কয়েক দিন পূর্ব্বে পাঁচকড়িবাবু 'নায়ক'এ[৭৩] শিক্ষিতা মহিলাদিগের সম্বন্ধে কি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, সেই জন্য যশোহরের এক শ্রেণীর যুবক পাঁচকড়ি বাবুর প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া, তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে অপমান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে মজুমদার মহাশয়কে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, "সভাপতি হইয়া ঝকমারি করিয়াছিলাম।" উপরে চুঁচুড়ায় যে প্রাদেশিক সম্মেলনের উল্লেখ করিয়াছি তাহারও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চুঁচুড়ায় আর একবার প্রাদেশিক সম্মেলন হইয়াছিল। সেই সম্মেলনে বহরমপুরের রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। সেই সভাতে আমি ফরিদপুরের বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়কেও দেখিয়াছিলাম।

ইহাদিগকে আমি সভাস্থলে দেখিয়াছি এবং তাঁহাদের বক্তৃতাও শুনিয়াছি; তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছুই আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি না; তাঁহারাও "আমার দেখা লোক," তাই এই প্রবন্ধে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম। আমার পিতা যখন বর্দ্ধমান নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, তখন শ্যামসায়রের বড় ঘাটের উপরেই যে দ্বিতল বাটী আছে, সেইটাতে আমাদের বাসা ছিল। আমি তখন বালক মাত্র, আমার বয়স তখন সাত আট বৎসর। একদিন দেখিলাম যে, বাটীতে রন্ধনের ও জলখাবারের কিছু ব্যবস্থা হইতেছে। মাতা ঠাকুরাণীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে আমাদের বাড়িওয়ালা বাবু জগবন্ধু ঘোষ সপরিবারে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। কে তিনি, জিজ্ঞাসা করাতে মা বলিলেন, তিনি হাকিম, আমরা তাহার বাড়িতেই বাস করিতেছি। সে হাকিম অর্থে মুন্সেফ, জজ কি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাহা বুঝি নাই। পরে বাবার নিকট শুনিয়াছিলাম যে তিনি স্বনামধন্য হাইকোর্টের উকিল স্যার রাসবিহারী ঘোষের পিতা। তিনি যখন সপরিবারে বর্দ্ধমান জেলায় তাঁহাদের গ্রামে তোড়কানায় যাইতেন, তখন বর্দ্ধমানে নামিয়া আমাদের বাটীতে 'প্রসাদ পাইয়া' অর্থাৎ আহারাদি করিয়া যাইতেন। বর্দ্ধমান শহর হইতে তোড়কানা অনেক দূর, সেজন্য তিনি বর্দ্ধমানে 'ব্রেক জার্নি' করিতেন। দুইবার কি তিনবার আমাদের বাসাতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। সম্ভবতঃ হাইকোর্টের সুদীর্ঘ অবকাশের সময়ই তিনি দেশে যাইতেন।

স্বদেশী যুগের আরেকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় [১৮৬১-১৯০৭] মহাশয়ের সহিত নানা কারণে আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় বোলপুর শান্তিনিকেতনে ত্রিশ কি বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। যখন রবীন্দ্রবাবু শান্তিনিকেতনে আট-দশটি বালককে লইয়া 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম'[৭৪] নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তখন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্র-কুমারকে সেই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সেই আমি দুই-তিন বার বোলপুরে গিয়া শান্তিনিকেতনে আট-দশদিন ধরিয়া বাস করিয়া আসিয়াছি। উপাধ্যায় মহাশয় সেই সময় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শিক্ষকতা করিতেন। শুনিয়াছি তিনি অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন। উপাধ্যায় মহাশয় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টান ছিলেন। কিন্তু গৈরিক বস্ত্র বহির্ব্বাস পরিধান করিতেন, নিরামিষ আহার করিতেন। শান্তিনিকেতনের শালবনের অদূরে একটি তৃণাচ্ছাদিত কুটিরে তিনি বাস করিতেন, স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। তখন আমি জানিতাম না যে, আমার সতীর্থ চন্দননগরের বর্ত্তমান পণ্ডিচেরীর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় উপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনীপতি। উপাধ্যায় মহাশয় একদিন আমাকে কথায় কথায় বলিলেন যে, তাঁহার খুড়তুত ভগিনীর সহিত সাধুবাবুর বিবাহ হইয়াছে। সাধুবাবুর শ্বশুরের সহিত আমার আলাপ ছিল। তাঁহার নাম ছিল তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হুগলীতে ওকালতি করিতেন। উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, তারিণীবাবু তাঁহার ছোট কাকা, পিতার কনিষ্ঠ সহোদর। কলিকাতার রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৪৭-১৯০৭]

উপাধ্যায় মহাশয়ের পিতার সহোদর ছিলেন। উপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীচরণ ও ভবানীচরণ ব্যতীত তাঁহাদের বাটীর কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। উপাধ্যায় মহাশয় বোলপুর হইতে আসিয়া কলিকাতায় যখন 'সন্ধ্যা'[৭৫] নামক দৈনিক সংবাদপত্র বাহির করেন, তখন তাঁহার সহিত আমার সর্ব্বদাই দেখা হইত। তাঁহার বিলাত যাত্রার পাঁচ-ছয় দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে চন্দননগরে আমাদের বাটীতে লইয়া গিয়াছিলাম। সেদিন বৈকালে চন্দননগর পুস্তকাগারে[৭৬] তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। তিনি সকালে আমাদের বাটীতে আহার করিয়া অপরাহ্নকালে সভাতে বক্তৃতা করেন। বাটীর মধ্যে আহারের স্থান হইলে আমি যখন তাঁহাকে বহির্বাটীতে ডাকিতে গেলাম, তখন তিনি বলিলেন, "আমাকে এইখানে বাহিরে ভাত দিলে ভাল হইত। সন্ন্যাসীর গৃহস্থের অন্তঃপুরে গমন করা নিষিদ্ধ।" আমি তাঁহার সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলাম না, তাঁহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলে তিনি মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমি আপনার বড় ছেলে।" মা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তুমি সত্যই আমার বড় ছেলে। তোমাকে দেখে আমার দেবিনের মুখ মনে পড়ে।" দেবেন্দ্র নামে আমার এক অগ্রজ সহোদর ছিলেন, ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। মা বলিলেন, "উপাধ্যায় মহাশয়ের মুখ অনেকটা তোমার দাদার মত।" অপরাহ্নকালে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পুস্তকাগারে লইয়া গেলাম। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম'। তিনি বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমবেত সকলের অনুরোধে ইংরাজীতেই বক্তৃতা করেন। আমার মনে হয় 'সন্ধ্যা' কাগজ তিনি বিলাত হইতে আসিয়া বাহির করিয়াছিলেন। 'সন্ধ্যা' গ্রাম্য ভাষাতে লিখিত হইত, সাধু ভাষার সংস্রব মাত্র ছিল না। 'হিতবাদী'তে বিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত সাধুভাষা ব্যবহৃত হইত। সেই জন্য কাব্যবিশারদ মহাশয় 'সন্ধ্যা'র ভাষাকে মেছুনীর ভাষা বলিতেন। 'সন্ধ্যা'তে যে সকল লেখা বাহির হইত তাহা আজকালকার দিনে একেবারে অচল। ভাষা হিসাবে নহে, রাজবিদ্বেষ হিসাবে। ঐ সকল প্রবন্ধে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যেরূপ সুতীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইত, এখন তাহার শতভাগের একভাগ কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর এবং স্বত্বাধিকারীর কারাদণ্ড ও ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত একেবারে অবধারিত। 'সন্ধ্যা' প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে প্রকাশিত হইত; উহা গরম গরম লেখার জন্য এক শ্রেণীর পাঠকের বড় প্রিয় ছিল। রাজবিদ্বেষের অপরাধ হইতে 'সন্ধ্যা' নিষ্কৃতি পায় নাই। কয়েকটা লেখার জন্য 'সন্ধ্যা'র বিরুদ্ধে রাজবিদ্বেষের অভিযোগ হওয়াতে উপাধ্যায় মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইলে তিনি পুলিশ আপিসে গিয়া আত্মসমর্পণ করেন। ঐ আত্মসমর্পণের দিন তিনি চেলির কাপড় ও টোপর পড়িয়া গিয়াছিলেন। পুলিশ আদালতে মামলা চলিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন—"আমাকে আটক করিয়া রাখে, এমন জেল এখনও তৈয়ারী হয় নাই।" তাঁহার এই স্পর্ধা সত্যে পরিণত হইয়াছিল, মামলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কলিকাতার রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পিতৃব্য ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন, কিন্তু সাহেব ছিলেন না। বাটীতে কাপড় পরিতেন, সভা সমিতিতে যাইবার সময় চোগা, চাপকান, প্যাণ্টুলান পরিধান করিতেন। শুনিয়াছি তাঁহার বাটীর মহিলারা নাকি আলতা পরিতেন এবং অন্তঃপুরবাসিনী ছিলেন। কালীচরণবাবু সিমলাতে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সিমলার বাসাতে তিন-চারি দিন গিয়াছিলাম, কিন্তু একদিনও তাঁহার বাটীতে কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাই নাই। চন্দননগরে একটা সভাতে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাকে বলিতে তাঁহার বাসায় গিয়াছিলাম। এই উপলক্ষেই আমি কয়েকবার তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। সভার দিন বেলা দুইটা কি তিনটার সময় আমাদের বাড়ীতে তাঁহাকে লইয়া যাই। বাটীতে আমার পিতার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল, উভয়ের বেলা সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইল। সভাতে যাইবার পূর্ব্বে বাবা তাঁহাকে একটু জলযোগ করাইয়া সঙ্গে করিয়া সভাতে লইয়া গেলেন। তিনিও ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই সভাতে একটা বড় মজার ব্যাপার হইয়াছিল। সভার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগর গোন্দলপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এক সভা হইয়াছিল। কলিকাতার মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ মিঃ এন. ঘোষ সেই সভাতে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। চন্দননগরের বড় সাহেব বা শাসনকর্ত্তা সেই সভাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, এইরূপ কথা ছিল। পাঁচটার সময় সভা আরম্ভ হইবার কথা; ছটা বাজিয়া গেল বড়সাহেবের দেখা নাই। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও যখন বড়সাহেবের আগমনের কোন লক্ষণই লক্ষিত হইল না, তখন তদানীন্তন মেয়র দীননাথ চন্দ্রকে সভাপতি করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় বড়সাহেব আসিয়া দেখিলেন সভার কার্য্য চলিতেছে। দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "আমি সভাপতি, আমার অনুপস্থিতিতে সভা হইতেছে কিরূপে?" তখন সভার সম্পাদক বড়সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, বক্তাকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে বলিয়া, পূর্ণ এক ঘণ্টা বিলম্বে সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়, আরও বিলম্ব হইলে তাহার অত্যন্ত অসুবিধা হইত। কালীচরণবাবু যে সভাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই সভাতেও সেই বড় সাহেবই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পাঁচটার সময় সভা আরম্ভ হইবার কথা, আমরা কালীবাবুকে লইয়া সাড়ে চারিটার কিছু পরে সভাতে গিয়া দেখি, বড়সাহেব আসিয়া সভাপতির আসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন, পাঁচ-সাতটি বালক ব্যতীত, সভাতে আর কেহ নাই। বেলা পাঁচটার কিছু পূর্ব্বে সভায় সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত হইলে বড় সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "আমি বেলা চারিটার সময় আসিয়া বসিয়া আছি, তোমাদের এত বিলম্ব হইল কেন?" এই সভাতে সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে বড় সাহেব অন্য একজন ভদ্রলোককে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। গোন্দলপাড়ার সভাতে দেড় ঘণ্টা বিলম্বে আসিয়াছিলেন বলিয়াই বোধহয় তিনি এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। ফরাসী সাহেবদের Punctuality জ্ঞান এই ঘটনাতেই বুঝিতে পারা যায়।

এইবার আর একজন সেকালের খ্যাতনামা পণ্ডিত খ্রীষ্টানের কথা বলিয়া এই বর্ণনা শেষ করিব। তিনি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে[৭৭], আমরা তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলাম। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমরা হুগলী কলেজে যখন ভর্ত্তি হই, তখন লালবিহারী দে কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি চন্দননগরে বাস করিতেন, নিজের গাড়ী ছিল, প্রত্যহই সেই গাড়ী করিয়া কলেজে যাইতেন। সুতরাং আমাদের বাল্যকাল হইতেই আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি, অবশেষে তাঁহার ছাত্র হইবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছিলাম। আমরা তাঁহার কাছে সাত মাস কি আট মাস পড়িয়াছিলাম। তাহার পর তিনি পেন্সন লইলেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ছিলেন। গোঁফ দাড়ি কামান, মাথার চুল লম্বা ঘাড় পর্য্যন্ত, কিন্তু অতি পাতলা, তিনি সাদা প্যাণ্টুলান ও কাল চাপকান পরিধান করিতেন; মাথায় brimless bever hat-এর মত একটা কাল রঙের উঁচু টুপি, এই ছিল তাঁহার পরিচ্ছদ। তিনি এক পারসিকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দে সাহেব স্বয়ং ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাঁহার পুত্র-কন্যারা জননীর মত গৌরবর্ণ ছিল। তাঁহার তৃতীয় পুত্র হর্ম্মসজী টেগোর দে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িত। হর্ম্মসজীকে তাঁহার পিতামাতা বাড়িতে 'হম্‌লু' বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও তাঁহাকে ঐ নামেই ডাকিতাম। 'হম্‌লু' বাঙ্গালা বুঝিতে পারিত, কিন্তু পড়িতে বা বলিতে পারিত না। বাবুর্চি খানসামার কাছে হিন্দী শিখিয়াছিল তাই হিন্দী বলিতে পারিত। দে সাহেব তাঁহাদের পুত্রদের নাম পারসিক ও বাঙ্গালা মিশাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বড় ছেলের নাম ছিল লালু লালবিহারী দে, মধ্যম পুত্রের নামটা আমার মনে নাই, তৃতীয় পুত্রের নাম হর্ম্মসজী টেগোর দে, কন্যাদের নাম শুনি নাই। লালবিহারী দে-র *Bengal Peasant Life* বা গোবিন্দ সামন্ত[৭৮] এবং *Folktales of Bengal*[৭৯] সেকালের দুইখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল। উত্তরপাড়ার স্বনাম প্রসিদ্ধ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবার ঘোষণা করেন যে, বাঙালী কৃষক পরিবারের নিখুঁত বর্ণনা কেহ বাঙ্গালা বা ইংরাজী ভাষায় লিখিতে পারিলে লেখক এক হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। পুরস্কারের আশাতে অনেকে পুস্তক লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে লালবিহারী দে-র 'গোবিন্দ সামন্ত'ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। যখন ঐ পুস্তক প্রকাশিত হয় তখন লালবিহারী দে এবং মিঃ রো উভয়েই হুগলী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। 'গোবিন্দ সামন্ত' প্রকাশিত হইলে রো সাহেব নাকি উহার সমালোচনায় বলিয়াছিলেন "written in baboo English" অর্থাৎ বাঙ্গালীর ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ইহার কিছুদিন পরে রো এবং ওয়েব উভয় শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক মিলিত হইয়া একখানি ইংরাজী ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। সেই ব্যাকরণ সাধারণতঃ 'Row's Hints'[৮০] নামে খ্যাত। ঐ পুস্তক প্রকাশিত হইলে লালবিহারী দে তাঁহার সম্পাদিত 'বেঙ্গল মিস্রেনি'[৮১] নামক ইংরাজী পত্রে ঐ ব্যাকরণের সমালোচনায় অসংখ্য ভাষার ভুল দেখাইয়াছিলেন। সমালোচনার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন, "যাঁহারা বাঙ্গালীর লেখাকে 'বাবু ইংলিশ' বলিয়া বিদ্রূপ করেন তাঁহাদের জানা উচিত যে,

বাঙ্গালীর মধ্যে এমন বিশুদ্ধ লেখক আছেন, মেসার্স রো এণ্ড ওয়েব কোম্পানী যাঁহার জুতার ফিতা খুলিবারও অযোগ্য।"

এই ঘটনার পর একদিন নাকি হুগলী কলেজে লালবিহারী দে-র সহিত রো সাহেবের হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং রো সাহেব লালবিহারী দে-র সহিত এক কলেজে অধ্যাপনা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে চলিয়া যান। লালবিহারী দে সুবর্ণবণিকের পুত্র। তাঁহার বাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার এক পল্লীগ্রামে, আমার পিতা যখন বর্দ্ধমান স্কুলের ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন, তখন পাঠশালা পরিদর্শন করিতে সেই গ্রামে যাইতেন। সেই গ্রামের একজন ভদ্রলোক বাবাকে লালবিহারী দে-র 'ভিটা' দেখাইয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লালবিহারী দে দীর্ঘকাল চন্দননগরে বাস করিয়াছিলেন। আদালতের ঠিক পশ্চিমে যে ভগ্ন অট্টালিকা আছে, তিনি তাই ভাড়া লইয়া বাস করিতেন। আমার পিতার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল, বাবা তাঁহাদের গ্রামে মধ্যে মধ্যে যান শুনিয়া তিনি বাবাকে গ্রাম সম্বন্ধে কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। গ্রামের বাহিরে সেই বকুল গাছটা আছে কিনা, খোঁড়া গুরু মহাশয়ের কেহ আছে কিনা, সেকালের মত ঘটা করিয়া বারোয়ারী পূজা হয় কিনা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতেন। শৈশবের লীলাক্ষেত্র জন্মভূমির কথা ধর্ম্মান্তরগ্রাহী পুরাদস্তুর সাহেব হইয়াও বৃদ্ধ ভুলিতে পারেন নাই।

আমার এই বর্ণনা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, বৃদ্ধ বয়সে সুদীর্ঘ অতীত জীবনের কথা চিন্তা করিলে একটির পর একটি কত মুখই মনে পড়ে, কত বিস্মৃতপ্রায় ঘটনার চিত্র আবার মানসপটে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। লিখিতে লিখিতে কত লোকের কথা লিখিব মনে করিয়া হয়ত ভুলিয়া গিয়াছি, আবার যাঁহার কথা দুই-চারি ছত্রে সারিব বলিয়া মনে করি, তাঁহার কথা আর শেষ হইতে চায় না। হয়ত এই লেখা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইবার পর, এমন অনেকের কথা মনে পড়িবে, যাহা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা উচিত ছিল, যাহা উল্লেখ না করাতে এই প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে। কিন্তু নিরূপায়। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তির উপর জুলুম চলে না।

স্কুলের স্মৃতি

আমাদের বাড়ীর নিকট পাঁচটি স্কুল ছিল। একটি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত এণ্ট্রেন্স স্কুল। এটি ফরাসী চন্দননগরের এক ভদ্রলোকের যত্নে সংস্থাপিত হইলেও বৃটিশ চন্দননগরে অবস্থিত ছিল এবং গড়বাটী নামক স্থানে ছিল বলিয়া সকলে ইহাকে গড়ের স্কুল বলিত। দ্বিতীয় স্কুলটি ফরাসী চন্দননগরের মধ্যে সংস্থাপিত ছিল এবং রোমান্ ক্যাথলিক্ পাদ্রীরা ইহা প্রতিষ্ঠা করেন, এই জন্য সকলে ইহাকে ফরাসী স্কুল বা পাদ্রীর স্কুল বলিত। তৃতীয় হুগলী কলেজ—পরিচয় অনাবশ্যক। চতুর্থ চুঁচুড়া ফ্রীচর্চ্চ বা ডফের স্কুল, এটি কলিকাতা ফ্রীচর্চ্চের শাখা। পঞ্চম হুগলী নর্ম্যাল স্কুল। হুগলী কলেজ ও নর্ম্যাল স্কুল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের খাস। গড়ের স্কুল, পাদ্রী স্কুল ও ফ্রীচর্চ্চে

এণ্ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়াইবার বন্দোবস্ত ছিল। হুগলী কলেজে এম. এ. ও নর্ম্যালি স্কুলে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ান হইত। কলেজের অধীনে কলেজিয়েট স্কুল এবং নর্ম্যালি স্কুলের অধীনে মডেল স্কুল ছিল। মডেল স্কুলে মধ্য ইংরাজী বা মধ্য বাংলা পর্য্যন্ত পড়া চলিত।

গড়ের স্কুলটি মধ্যে একেবারে লোপ পাইয়াছিল, এখন আবার স্থানীয় লোকের যত্নে মাথা তুলিয়াছে। ফরাসী স্কুলটি এখন আর পাদ্রীদের হাতে নাই, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এখন উহা নিজের হস্তে লইয়াছেন। স্কুলটির এখন নাম হইয়াছে—'দুপ্লে কলেজ'। স্কুলটি ফরাসী অধিকারে স্থাপিত ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হইলেও, উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। উহাতে এফ. এ. পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। পূর্ব্বে স্কুলটির নাম ছিল—'সেণ্ট মেরীজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্'।[৮২] এখনও চন্দননগরের বাহিরে উহা এই নামেই পরিচিত। দুপ্লে কলেজে ফরাসী পড়িবার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। এই বিভাগে সকল বিষয়ই ফরাসীতে পড়ান হইয়া থাকে, কেবল ইংরাজী ও বাংলা দ্বিতীয় ভাষা (second language) বলিয়া পড়ান হয়। ফরাসী বিভাগের ছাত্রেরা প্রথমে একটা পরীক্ষা দেয়, তাহার নাম 'সার্তিফিকাদেত্যুদ্'। ইহার পরে যে পরীক্ষা হয়, তাহার নাম 'ব্রেভে'। ব্রেভে পরীক্ষা আবার দুই প্রকারের আছে—নিম্ন ও উচ্চ। ব্রেভে পরীক্ষা চন্দননগরে হয় না, পরীক্ষার্থীদিগকে পণ্ডিচেরীতে গিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। নিম্ন ব্রেভে অনেক বাঙালী পাস্ হইয়াছেন, কিন্তু উচ্চ ব্রেভে এ পর্য্যন্ত কোনও বাঙালী দেন নাই। উচ্চ ব্রেভে নাকি ইংরাজী বি. এ. পরীক্ষার অপেক্ষা কঠিন। অধিকন্তু ইহাতে সঙ্গীত, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদিও শিক্ষা করিতে হয়। দুপ্লে কলেজের প্রিন্সিপাল একজন ফরাসী সাহেব, সহকারী প্রিন্সিপাল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. উপাধিধারী একজন বাঙালী যুবক। সমস্ত ইংরাজী বিভাগের ইনি সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইংরাজী বিভাগের নিম্নশ্রেণীতেও ফরাসী ভাষা পড়ান হয়, কিন্তু চতুর্থ শ্রেণী হইতে উহা ছাত্রদের ইচ্ছাধীন।

ফরাসী-শিক্ষা আমাদের তত আবশ্যক ছিল না বলিয়াই হউক, অথবা তখন পাদ্রীদের আমলে ভাল ইংরাজী পড়ান হইত না বলিয়াই হউক, আমাদের বাটীর নিকট হইলেও আমরা ফরাসী স্কুলে না পড়িয়া গড়ের স্কুলে পড়িতে যাইতাম। তখন গড়ের স্কুলের পড়্‌তা ভাল ছিল। আমাদের পাড়ার অধিকাংশ ছেলেই গড়ের স্কুলে পড়িত। আমি ফরাসী স্কুলে অতি অল্পদিন মাত্রই পড়িয়াছিলাম। ফরাসী স্কুলের কতকগুলি বন্দোবস্ত বড় ভাল ছিল এবং এখনও আছে। কোন কারণে কোন বালক দণ্ডার্হ হইলে শারীরিক বা আর্থিক দণ্ড ভোগ করিতে হইত না। একমাত্র দণ্ড ছিল—হস্তাক্ষর লেখা। মারধোর ফরাসী স্কুলে একেবারেই ছিল না। কোন বালককে দণ্ড দিতে হইলে শিক্ষক বলিতেন, "তোমার দুইশত ছত্র দণ্ড হইল।" অর্থাৎ সেই বালককে তাহার নিত্যকর্ত্তব্য পাঠ ছাড়া আরও ২০০ ছত্র লিখিতে হইত। এই ছত্রেরও একটা নিয়ম ছিল। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা ফ্রান্স হইতে একপ্রকার অক্ষর লিখিবার আদর্শপুস্তক (copy book) আনাইতেন। তাহাতে অক্ষর লিখিবার বড় সুন্দর উপায় প্রদর্শিত ছিল। এক হইতে দশ

নম্বর পর্য্যন্ত কপিবই কিনিতে পাওয়া যাইত। প্রতি পৃষ্ঠার উপরে এক ছত্র, আর নিম্নে অতি সূক্ষ্ম বিন্দু দ্বারা সেই উপরিস্থ ছত্রের অক্ষরগুলিই লেখা থাকিত। পাঁচ-সাত পৃষ্ঠার পর আর পুরো অক্ষরে লেখা থাকিত না, কেবল কয়েকটি বিন্দু দ্বারা অক্ষরের আয়তন দেখান হইত। ছাত্রেরা অভ্যাসবশতঃ ঠিক ছাপার ন্যায় লিখিয়া যাইত। খাতাগুলির আয়তন ফুলস্ক্যাপ কাগজের চারিভাগের এক ভাগ। যখন এই খাতার প্রচলন ছিল, তখন ফরাসী স্কুলের ছাত্রদের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও সকলের হস্তাক্ষর প্রায় এক ছাঁচের হইত। ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন অন্যপ্রকার ধারণায় কপিবই উঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কপিবই দেখিয়া লিখিলে হস্তাক্ষর ভাল হয় বটে, কিন্তু হাতের লেখায় ছেলেদের স্বাধীনতা না থাকায় তাহাদের মনোবৃত্তির স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি ও বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক লোকের হস্তাক্ষর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হওয়া উচিত। কপিবই দেখিয়া লিখিলে তাহা হয় না। হস্তাক্ষরশিক্ষক এখন কপি লিখিয়া দেন না, প্রত্যেক ছাত্রের লেখা তাহারই ছাঁচে বজায় রাখিয়া শুদ্ধ করিয়া দেন। তিনি কেবল দেখেন, লেখাগুলি সরল রেখায় চলিতেছে কি না, সমান্তর এবং সমায়তন হইতেছে কি না। স্বাধীনতার লীলাভূমি ফ্রান্সে হস্তাক্ষরের স্বাধীনতাটুকু নষ্ট করিতেও কর্ত্তৃপক্ষ বিরক্ত।

এই সকল 'কপিবই'এর হিসাবে ছাত্রদের দণ্ড হইত। প্রত্যহ ছুটির পর অথবা টিফিনের ছুটির সময় অপরাধী বালক একাকী আবদ্ধ থাকিয়া এই হস্তলিপিরূপ দণ্ড ভোগ করিত। এই লেখা স্কুলে বসিয়া লিখিতে হইত। অন্যান্য বালকেরা খেলা করিতেছে অথবা ছুটির পর বাড়ী চলিয়া গেছে, আর একজন মাত্র বালক পাঠগৃহে আবদ্ধ থাকিয়া বসিয়া বসিয়া লিখিতেছে, ইহা বোধহয় বালকদের পক্ষে দণ্ডের চূড়ান্ত। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ মিশনারীরা বলিতেন যে, বালকদের জরিমানা করিলে সেটাতে কার্য্যত তাহাদের অভিভাবকগণেরই জরিমানা করা হয়। বালকদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলে তাহারা প্রায়ই পিতামাতার নিকট অর্থ চাহিতে সাহস করে না, অনেক স্থলে চুরি করিয়া বসে, অথবা অন্য কোন অসদুপায়ে পয়সা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে; সেইজন্য ছাত্রদের অর্থদণ্ডের অপেক্ষা জঘন্য প্রথা আর নাই। লিখনদণ্ডে ছাত্রেরাও শাসিত হয়, অথচ তাহাদের হস্তাক্ষরেরও উন্নতি হইয়া থাকে। স্কুলের ছোটসাহেব বালকগণকে বড় ভালবাসিতেন, এমনকি, ছাত্রদের পীড়া হইলে স্বয়ং তাহাদের বাড়ীতে গিয়া দেখিয়া আসিতেন। পাদ্রীরা সকলেই অল্প-অল্প বাংলা শিখিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের বাংলা শুনিয়া বালকগণ হাস্যসংবরণ করিতে পারিত না। ছোটসাহেব কোন বালকের উপর বিরক্ত হইলে অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন, "জাঁ—দূঁর—" অর্থাৎ যাঁ—দূর। এই 'যা' শব্দটা উচ্চারণ করিতেন ইংরাজী pleasure শব্দের 'S'-এ চন্দ্রবিন্দু দিলে যেমন হয়, কতকটা সেইরূপ। ফরাসীরা 'চ' 'ছ' উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহার পরিবর্ত্তে 'শ' ও 'স' ব্যবহার করে। ছোটসাহেব ছাত্রগণকে গালাগালি দিতেন 'নেরা পোশা' বলিয়া। 'নেরা পোশা' অর্থাৎ 'নেড়া পচা'। কেশশূন্য মস্তক যে একটা গালাগালি, তাহা বাঙালী ছাত্রেরা কোনপ্রকারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না।

তাঁহার আর একটা তিরস্কারসূচক কথা ছিল—"ষাঁরের দুধ খেয় বাসুরের মত হয়েসিস্।" (ষাঁড়ের দুধ খেয়ে বাছুরের মত হয়েছিস্!)

ফরাসী স্কুলে মাসে একবার করিয়া পরীক্ষা হইত। যে সকল বালক পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করিত, তাহারা প্রতিমাসে একখানা করিয়া ছাপান সার্টিফিকেট্ পাইত। ঐ সার্টিফিকেট্‌কে 'নোত্-দে-অনার' (note of honour) বলিত। ছোট ছোট ছেলেরা বলিত 'নতদানায়' এবং কেহ কেহ বা 'নরদামায়'ও বলিত। যাহাদের নোত্-দে-অনারের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং বাৎসরিক পরীক্ষাতে ফল ভাল হইত, তাহারাই প্রাইজ পাইত। বাৎসরিক পরীক্ষার সময় কেহ পীড়িত হইয়া পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হইলে, সে নোত্-দে-অনার দেখাইয়া উপরের শ্রেণীতে উঠিতে পারিত। এখন এইপ্রকার নোত্-দে-অনার নাই, তাহার পরিবর্ত্তে প্রতি বালকের জন্য একখানি করিয়া ছাপান পুস্তক শিক্ষকের নিকট রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যহ কোন্ বালক কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পাইল, তাহা ঐ পুস্তকে লেখা থাকে। মাসের শেষে ঐ পুস্তকখানিতে শিক্ষক নিজের অভিপ্রায় লিখিয়া ছাত্রের অভিভাবকের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং অভিভাবক তাহা দেখিয়া ছাত্রের পড়াশুনার পরিচয় পান। অভিভাবক দেখিয়া নাম সই করিয়া আবার ছাত্রের দ্বারা শিক্ষকের নিকট পাঠাইয়া দেন। এইপ্রকারে বালকের প্রাত্যহিক পাঠের দোষগুণ লিখিত হইতে থাকে এবং বৎসরের শেষে এই পুস্তক দেখিয়া ছেলেদের পারদর্শিতার বিচার করা হয়। এইপ্রকার লেখাপড়া থাকায় ছেলেরা স্কুলে ফাঁকি দিতে পারে না।

ফরাসী স্কুলের আর একটি সুন্দর নিয়ম এই যে, টিফিনের ছুটি হইলে অথবা অপরাহ্নে স্কুল বন্ধ হইলে বালকগণ দুইজন দুইজন করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে ক্লাস হইতে বাহির হয়। অন্যান্য স্কুলে যেমন দেখিতে পাই, ছুটি হইলেই বালকেরা ভয়ানক গোলমাল করিয়া বেঞ্চ ডিঙাইয়া জান্‌লা লাফাইয়া পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে রাস্তার দিকে ধাবমান হয়, ফরাসী স্কুলে সেরূপ হইত না, এখনও হয় না। ছুটির ঘণ্টা বাজিবামাত্র ছাত্রেরা দণ্ডায়মান হইয়া দুইজন দুইজন করিয়া নীরবে কক্ষ হইতে বাহির হইতে থাকে। প্রথমে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর, তারপর তার উপর এবং সর্ব্বশেষে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ বাহির হয়। স্কুল পার হইয়া পথে গিয়া ছাত্রগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ফরাসী স্কুলের এই প্রথাগুলি সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়।

গড়ের স্কুলে একটি বাংলা বিভাগ ছিল। যদিও তাহা হইতে কখনও কাহাকেও ছাত্রবৃত্তি বা প্রাইমারী পরীক্ষা দিতে দেখি নাই, তথাপি একটি বাংলা বিভাগ ছিল। প্রত্যহ ছুটির পূর্ব্বে প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া ছাত্রেরা বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিত। বালকগণ যখন কোমল কণ্ঠে 'দয়ার সাগর, সর্ব্বগুণাকর, যিনি অখিলের স্বামী' অথবা 'একে একে দিবারাত, করিতেছে গতায়াত, রবি-শশী আলো করে জগতে কেমন হে' বলিয়া সমস্বরে কবিতাপাঠ করিত, তখন সে কবিতাপাঠ বড় মিষ্ট লাগিত। শুনিয়াছি, শিশুগণের এইপ্রকার কবিতা আবৃত্তি করিবার প্রথা হুগলী মডেল স্কুলের কোন একজন শিক্ষক প্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন। 'প্রথমে প্রবর্ত্তিত' অর্থে স্কুলে প্রথমে প্রবর্ত্তিত। নচেৎ

আমাদের দেশীয় পাঠশালে 'বন্দে মাত সুরধ্বনি, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী'[৮৩] আবৃত্তি হইত। কিন্তু স্কুল নামক বিদ্যালয়ে বেঞ্চে বসিয়া ঈশ্বরের মহিমা বিষয়ে কবিতা আবৃত্তির সৃষ্টি প্রথমে হুগলী মডেল স্কুলেই হইয়াছিল। তখন বৰ্দ্ধমান বিভাগে এমন কোনও বিদ্যালয় ছিল না, যেখানে হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রেরা শিক্ষকতা না করিয়াছেন। আমাদের গড়ের স্কুলের পণ্ডিতমহাশয়ও হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন, তাই সেই কবিতা আবৃত্তির প্রথা আমাদের স্কুলেও সংক্রামিত হইয়াছিল। কোন শ্রেণীর বালকেরা অধিক গোলমাল করিলে পণ্ডিতমহাশয় বলিয়া উঠিতেন, 'উত্তিষ্ঠ'। আর অমনি সকলে মুখের অৰ্দ্ধসমাপ্ত কথা অসমাপ্ত রাখিয়া নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিত এবং যতক্ষণ পণ্ডিতমহাশয় না বলিতেন 'উপবিশ', ততক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আমাদের যিনি হেড্‌পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাকে আমরা যমের মত ভয় করিতাম। তাঁহার সময়ে কথা কহা দূরে থাক্, কাশিতে ভয় হইত। আমাদের স্কুলে ছাত্রদের সম্মুখে ডেস্ক অথবা টেবিল ছিল না, ছাত্রেরা সম্মুখের মেঝের উপরেই পুস্তক রাখিত। এই পুস্তকরক্ষাও ঠিক সরলরেখাতে করিতে হইত। যদি রেখা বাঁকিয়া যাইত, তাহা হইলে পণ্ডিতমহাশয় এক-একবার নাম ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন, আর ছাত্রদের এক সের রক্ত শুকাইয়া যাইত। হেড্‌পণ্ডিত মহাশয় একটু অধিক প্যারেড্-প্রিয় ছিলেন। তিনি ক্লাসে প্রবেশ করিয়াই বলিতেন, "পুস্তক লও—সমশির" অর্থাৎ সকলে মস্তক সমান নত করিয়া পুস্তক লও। তার পর যতক্ষণ তিনি না বলিতেন "মস্তক তোল", ততক্ষণ আমরা মাথা নত করিয়া থাকিতাম। এই স্কুলে ছুটির পর সারিবন্দী হইয়া যাওয়া অথবা কোন অপরাধে লেখা-দণ্ড ছিল না। বড় পণ্ডিতমহাশয় বেত্রদণ্ডেই সকল অপরাধের শাস্তিবিধান করিতেন। এই স্কুলে শাস্তির চরম অর্থাৎ capital punishment ছিল 'গাধার টুপি'। গাধার টুপি আবার দুই প্রকারের ছিল—ক্লাসের মধ্যে গাধার টুপি, আর স্কুলের প্রাঙ্গণে গাধার টুপি। স্কুলের মাঝখানে একটা বড় উঠান ছিল। কাহাকেও চরম শাস্তি দিতে হইলে এই উঠানের মাঝখানে একটা টুল রাখিয়া অপরাধীর মস্তকে একটা ত্রিকোণ কাগজের টুপি পরাইয়া দেওয়া হইত। নিৰ্ব্বুদ্ধিতা যদি গাধার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে যাহাদের মাথায় এই টুপি দেওয়া হইত, তাহাদিগকে গাধা বলিতে পারি না। কারণ নির্ব্বোধ ছেলেরা প্রায় কখনও দুষ্ট হয় না। এই গাধার টুপি কখনও নিৰ্ব্বুদ্ধিতার জন্য ব্যবহৃত হইত না। যাহারা অতিরিক্ত বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ দুষ্ট, তাহারাই এই অদ্ভুত শিরস্ত্রাণে সজ্জিত হইত।

গ্রীষ্মাবকাশের একমাস পূৰ্ব্ব হইতে আমাদের মর্ণিং স্কুল হইত। সে এক মহা-আমোদ। আমাদের বাড়ী হইতে গড়ের স্কুল নিতান্ত কাছে ছিল না, প্রায় দেড় মাইল পথ হইবে। প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময় আমাদের স্কুল বসিত, কিন্তু আমরা অতি প্রত্যুষে, বোধহয় সাড়ে তিনটা বা চারিটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতাম। মা পূৰ্ব্বদিন বৈকালে কিছু খাবার আনাইয়া রাখিতেন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া সেই খাবার খাইয়া পথে বাহির হইতাম। তখনও বেশ অন্ধকার থাকিত। মার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদিগকে এই অন্ধকার থাকিতে থাকিতে যাইতে হইত, কারণ

পাড়ার অন্যান্য বয়স্করা আমাদিগকে ডাকিতে থাকিত। এক-একদিন এত প্রাতে যাইতাম যে, যখন স্কুলে উপস্থিত, তখনও ১০/১৫ হাত দূরের লোক চিনিতে পারা যাইত না। স্কুলে একটি অতি প্রাচীন মালী ছিল। সে বেচারা সমস্তরাত্রি মশার অত্যাচারে ছট্‌ফট্ করিয়া ভোরবেলায় একটু চক্ষু বুজিত, সেই সময় স্কুলের পোড়োরা গিয়া চীৎকার-স্বরে তাহার নিদ্রা ভাঙাইয়া দিত। পথে যাইবার সময় যে আমরা খুব ভাল মানুষটির মত যাইতাম না তাহা বলাই বাহুল্য। চৈত্রমাসের প্রায় অর্দ্ধেক আন্দাজ হইলেই আমাদের মর্ণিং স্কুল আরম্ভ হইত। সেই সময় তারকেশ্বর যাত্রী সন্ন্যাসীরা প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া দলবদ্ধ হইয়া তারকেশ্বর যাত্রা করিত। তখন তারকেশ্বরের গাড়ী হয় নাই, সুতরাং যাত্রীরা পদব্রজে যাইত ও মাঝে মাঝে জনশূন্য পথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া 'বলে তারকেশ্বরের শিবো—মহাদেব—জয় বাবা তারকনাথ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিত। আমরাও তাহাদের অনুকরণে 'তারকেশ্বরের শিবো' বলিয়া চীৎকার করিতাম। কখনও বা দলবদ্ধ হইয়া তালে তালে 'ধন্য ধন্য ধন্য আজি দীন-আনন্দকারী' বলিয়া গান করিতে করিতে যাইতাম। আমাদের স্কুলে একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল, তাহার বাৎসরিক অধিবেশনের দিন আচার্য্য মহাশয়ের মুখে ঐ গান শুনিয়া আমরা শিখিয়াছিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা খুব শান্ত-শিষ্ট, প্রথমভাগের 'গোপালের' মত আদর্শ-বালক ছিলাম না। আমরা যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমাদের একজন নূতন শিক্ষক আসিলেন। তিনি জাতিতে কলু। আমাদের দলের একজন ডান্‌পিটে ছেলে একদিন বলিল, "ভাই মর্ণিং স্কুল আস্‌চে, সকালে এসে কলুর মুখ দেখব, তা হবে না। হয় কলুকে তাড়াব, নয় আমি স্কুল ছাড়ব" ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর মর্ণিং স্কুল আরম্ভ হইল। ক্লাসে গিয়া দেখি, আমাদের সেই মাতব্বর বন্ধুটি চক্ষুটি মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিয়াছে! মাষ্টার যাহা প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তর দেয়, কিন্তু মুদ্রিতনেত্রে। শিক্ষক মহাশয় প্রথমদিন কিছু বলিলেন না। ২/৪ দিনের মধ্যে চক্ষু-বোজা-রোগটা সংক্রামক হইয়া পড়িল। মাষ্টারমহাশয় ক্লাসে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই ধৃতরাষ্ট্র হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তিনি তৎক্ষণাৎ কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং অবিলম্বে গিয়া দ্বিতীয় শিক্ষকমহাশয়কে বালকদের এই অদ্ভুত ব্যবহারের কথা বলিয়া দিলেন। আমাদের স্কুলে হেড্‌মাষ্টার সত্ত্বেও second masterই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কারণ তাঁহারই কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়, তিনি বিদ্যালয়ের আরম্ভ হইতে মাষ্টারি করিতেছেন, আর তাঁহার আমলে অনেক হেড্‌মাষ্টারের প্রবেশ ও প্রস্থান হইয়াছে। অধিকন্তু তিনি বড় রাশভারী লোক। এই সকল কারণে তিনি ইংরাজী বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। যাহা হউক আমরা ত চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ "আর করব না sir", "ঘাট হয়েছে sir", "আর না sir" ইত্যাদি সকাতর চীৎকারধ্বনিতে চমকিত হইয়া চক্ষু চাহিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ! স্বয়ং সেকেণ্ড মাষ্টার বেত্রদণ্ডহস্তে ক্লাসে অধিষ্ঠিত হইয়া মুদ্রিতচক্ষু বালকগণের ধ্যানভঙ্গ করিতেছেন। সেকেণ্ড মাষ্টার ক্লাসের এক ধার হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের মস্তকে সজোরে এক

এক ঘা প্রহার করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। আমাদের ধ্যানমগ্ন হওয়াটা যেমন সংক্রামক হইয়াছিল, ধ্যানভঙ্গটাও সেইপ্রকার আকস্মিক হইল। আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ধ্যানভঙ্গ হইলে যোগীরা যে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করেন, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম যে, পুষ্পশরে আহত হইয়া মহাযোগী মহাদেব কেন মদনঠাকুরকে ভস্ম করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে কিন্তু মনে মনে সেকেণ্ড মাষ্টারকে এবং তাঁহার সহিত কলু মাষ্টারকে মদনের দশা পাওয়াইবার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহারা সশরীরে স্বস্ব নির্দ্দিষ্টস্থানে ফিরিয়া যাইলেন। বলা বাহুল্য যে চোরা গাভীর সহিত অনেক কপিলা গাভীও সেকেণ্ড সাহেবের সুমিষ্ট বেত্রদণ্ডের আস্বাদ অনুভব করিয়াছিলেন।

মর্ণিং স্কুলে দশটার সময় ছুটি হইত, আমরা প্রায় এগারটার সময় বাটী পৌঁছিতাম। তাহার পর বোধহয় ৪/৫ মিনিটের মধ্যে বস্ত্রপরিবর্ত্তন, পুস্তকরক্ষা, তৈলম্রক্ষণ ইত্যাদি শেষ করিয়া নিকটস্থ বৃহৎ সরোবরে দলবদ্ধ হইয়া পড়িতাম। সে পতন মৈনাকের সাগরজলে অবগাহনের ন্যায়, তাহার শেষ নাই। কত স্নানার্থী আসিয়া স্নান-আহ্নিক শেষ করিয়া উঠিয়া গেল; কত যুবতী, কত প্রৌঢ়া, কত বৃদ্ধার নিকট হইতে গালি খাইলাম; কেহ বা মার নিকট নালিশ করিবার ভয় পর্য্যন্ত দেখাইতে লাগিল; কিন্তু আমাদের স্নান আর শেষ হয় না। অবশেষে যখন পুষ্করিণীর ঘাটের জল যথেষ্ট কর্দ্দমাক্ত এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও হস্ত-পদ-তল রক্তশূন্য ও কুঞ্চিত হইয়া উঠিত, তখন আমাদের স্নান শেষ হইত। তখন বোধহয় বেলা একটা বাজিত। তার পর আহারান্তেই কি রৌদ্রের ভয়ে স্থির হইয়া গৃহে থাকিতাম? সমস্ত মধ্যাহ্নে বাগানে বাগানে কাঁচা আম পাড়িয়া তাহাই পুদিনা, লঙ্কা ও লবণ সংযোগে অর্দ্ধকুটিত করিয়া চাট্‌নি করিতাম ও কদলীপত্রের দীর্ঘাকৃতি ঠোঙা করিয়া ঠোঙার সরু দিক্‌টা মুখে দিয়া চুষিয়া চুষিয়া সেই চাট্‌নির রস খাইতে থাকিতাম। মর্ণিং স্কুলে ছেলেদের যা কল্যাণ সাধিত হইত, তা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতাম। যদি ইহাতে কাহারও কোন উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে শিক্ষকগণের। কারণ মধ্যাহ্নে চেয়ারে বসিয়া ক্লাসের মাঝে না ঢুলিয়া বেশ সুখে তাঁহারা গৃহে গিয়া নিদ্রা দিতেন।

হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে যখন প্রবিষ্ট হইলাম, তখনও আমরা বালক। হুগলী কলেজে মর্ণিং স্কুল হইত না বটে, কিন্তু আমাদের আবার নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল। আমাদের বাড়ী হইতে হুগলীর কলেজ প্রায় দেড়ক্রোশ পথ। আমরা প্রত্যহ নৌকাযোগে কলেজে যাতায়াত করিতাম। হুগলী কলেজ গঙ্গার উপরেই অবস্থিত, আর আমাদের বাড়ীও গঙ্গার তীর হইতে দশ মিনিটের পথ, সুতরাং জলপথটাই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। কলেজে যাইবার জন্য প্রত্যহ ৫/৬ খানি নৌকা আমাদের চন্দননগর হইতে কলেজে যাইত। কলেজে মোটের উপর বোধহয় ২০/২৫ খানি নৌকা জড় হইত। যাহাদের এইরূপ নৌকায় যাতায়াত, তাহাদের প্রত্যেকের কাছ হইতে কলেজের নৌকার মাঝির মাসিক এক টাকা করিয়া বেতন বরাদ্দ ছিল। আমাদের নৌকা যখন আমাদের ঘাট হইতে ছাড়িত, তখন বেলা ৯টা, ১০টার সময় কলেজ বসিত। এক এক খানি

নৌকায় ১২/১৩ জন ছাত্র থাকিত। প্রতি মাসে এই ১২/১৩ টাকা মাসিক বাঁধা বেতন, তা ছাড়া পূজার সময় সে প্রায় সকল ছাত্রের নিকট হইতে ধুতি-চাদর এবং ছাত্রগণের বিবাহ, উপনয়ন অথবা 'পাস্' হওয়া প্রভৃতি উপলক্ষে নানাপ্রকার বক্‌সিস পাইত। গ্রীষ্মাবকাশ বা পূজার বন্ধে কলেজ বন্ধ হইত, কিন্তু মাঝিদের বেতন বন্ধ হইত না। এই সময় মাঝিরা স্বেচ্ছামত নৌকা ভাড়া দিত। তদ্ভিন্ন প্রাতে মধ্যাহ্নে ও রাত্রে তাহারা গঙ্গায় ইলিশমাছ ধরিত বা ভাড়া পাইলে ভাড়ায় যাইত। মোটের উপর কলেজের নৌকার মাঝিদের অবস্থা মন্দ ছিল না। অনেকেরই মাসে গড়ে ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন হইত। অধিকাংশ নৌকায় একজন করিয়াই মাঝি থাকিত, কেবল দুই-একখানি নৌকাতে একজন সহকারী মাঝি বা দাঁড়ি দেখা যাইত, নতুবা নৌকার বাবুরাই মাঝির সহকারী হইত। কলেজের নৌকায় প্রত্যেক বাবুই এক-একজন পাকা মাঝি। প্রত্যহ প্রাতে এবং অপরাহ্ণে ছাত্রেরা পালা করিয়া হাল না ধরিলে, নৌকা কেবলমাত্র মাঝির সাহায্যে দ্রুতগতিতে যাইতে পারিত না, তাহাতে স্কুলের বেলা হইবার সম্ভাবনা, আর বাড়ী আসিতেও বিলম্ব ঘটিত। সুতরাং ছাত্রদিগকে পালা করিয়া হাল ধরিতেই হইত। ভাদ্রমাসের ভরা-গাঙে রক্তবর্ণ বারিরাশি যখন প্রবলবেগে সগর্জ্জনে সাগরাভিমুখে ছুটিত, তখন আমরা অতি নিশ্চিন্তভাবেই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতাম: জলের গর্জ্জনে, আবর্ত্তের আস্ফালনে, স্রোতের আকর্ষণে ভ্রূক্ষেপও করিতাম না। আমরা প্রায়ই হালের নিকটে বসিয়া বাম হস্তে হাল জড়াইয়া ধরিতাম, আর দক্ষিণ হস্তে ছত্র ধরিয়া সম্মুখে পুস্তক খুলিয়া রাখিয়া পাঠ মুখস্থ করিতাম। নৌকা ঘুরাইবার ফিরাইবার আবশ্যক হইলে বাম হস্তের সাহায্যেই তাহা সমাধা হইত। বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে কলেজ হইতে ফিরিবার সময় প্রায়ই ঝড়বৃষ্টিতে পড়িতাম। অপরাহ্ণে পশ্চিম আকাশে মেঘ দেখিলে আমাদের অভিভাবকগণ চিন্তিত হইতেন, কিন্তু আমরা তাহা গ্রাহ্যও করিতাম না। আমরা যখন কলেজে পড়ি, সেই সময় হুগলীর পুল নির্ম্মিত হইতে থাকে। পুল নির্ম্মাণকালে 'মার্গারেট' নামক একখানি অতি দ্রুতগামী ক্ষুদ্র ষ্টীমার প্রায়ই কলিকাতা হইতে হুগলীতে যাতায়াত করিত। তাহার মস্ত দুইখানা চাকা ছিল, সেইজন্য ষ্টীমারখানি চলিয়া গেলে, ৪/৫টা অতি প্রকাণ্ড ঢেউ সমস্ত গঙ্গার একূল ওকূল আলোড়িত করিয়া দিত। মার্গারেটের ঢেউ লাগিয়া বড় বড় নৌকাগুলিও দুলিয়া উঠিত; কিন্তু আমরা সে ঢেউ দেখিয়া ভয় পাওয়া দূরে থাক, সময় সময় এক আধ-ক্রোশ এই চলন্ত ষ্টীমার ধরিয়াই চলিয়া যাইতাম। কখন কখন তিন-চারিখানা কলেজের নৌকাতে বাচ-খেলা লাগিয়া যাইত। বাচ-খেলাটা প্রায় অপরাহ্ণেই হইত। আমাদের নৌকায় দিনকয়েকের জন্য একজন দাঁড়ি আসিয়াছিল। সে বড় অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। নৌকায় যদি ছাত্রেরা গোলমাল করিত, তাহা হইলে সে বলিত, "বাবুরা গোলমাল কোরো না গো—গোলমাল কল্লে নৈকো-ফৈকো চলে না।" সে নৌকাকে বলিত 'নৈকো'। গোলমাল করিলে অর্থাৎ আরোহীরা সকলে একসঙ্গে উচ্চস্বরে কথা কহিলে 'নৈকো' যে কেন চলিবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কলেজের সম্মুখে গঙ্গার মাঝখানে

একটা খুব বড় রকমের চড়া ছিল। চড়াটা বড় বড় ঘাস, হোগলা, শর, খড়ি এবং অনেকগুলি শিমুলগাছে ভরিয়া গিয়াছিল। চড়ার খানিকটা একজন কৃষক আবাদ করিত। সময়ে সময়ে মধ্যাহ্নে আমরা নৌকা লইয়া এই চড়ায় যাইতাম। আমাদের নৌকায় হুগলী কলেজ ছাড়া অন্যান্য স্কুলেরও দুই-চারিজন ছাত্র ছিল। যদি কোন কারণে আমাদের হাফ্‌স্কুল হইত, তাহা হইলে আমরা অন্যান্য ছাত্রদের জন্য তিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতাম। এই অপেক্ষাটা অনেকসময়ে চড়ার উপরেই কাটিয়া যাইত। মধ্যাহ্নে মাঝিরা প্রায় নৌকায় থাকিত না। কলেজের ঘাটের দক্ষিণের ঘাটে একটা খুব বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ আছে, তাহার তলদেশ সান-বাঁধান। মাঝিরা প্রায় প্রতিদিন এই অশ্বত্থতলে একত্র হইয়া তাস খেলিত, কেহ বা গাত্রমার্জ্জনীর উপাধান করিয়া নিদ্রাদেবীর সেবা করিত। আমরা যখন মধ্যাহ্নে চড়ায় যাইতাম, তখন প্রায়ই মাঝিরা নৌকায় থাকিত না। একদিন আমরা ৪/৫ জনে ছুটিয়া এইপ্রকার চড়ায় গিয়া দেখি যে, একটা শিমুলগাছের তলায় আমাদের তিনজন সহপাঠী বসিয়া 'চড়িভাতি' করিতেছে। তাহাদের নৌকার মাঝি তাহাদের আয়োজন করিয়া দিতেছে। কেরোসিনের ষ্টোভ জ্বালিয়া তাহাতে খিচুড়ি রন্ধন হইয়াছে, আর ইলিশমাছ ভাজা হইতেছে।

কলেজে অধ্যয়নকালে আমাদের জলযোগটা প্রায়ই ছুটির পর নৌকায় বসিয়া হইত। ঐ সময় দুইজন খাদ্যবিক্রেতা মিষ্টান্ন, লুচি, কচুরি ও আলুর দম লইয়া ঘাটে বসিয়া থাকিত। আমরা নৌকায় যাইবার সময় তাহার নিকট হইতে খাবার কিনিয়া লইতাম। কখনও বা স্কুলে যাইবার সময় আমাদের মাঝির নিকট পয়সা দিয়া যাইতাম, সে বাজার হইতে খাবার কিনিয়া আনিয়া রাখিয়া দিত। আমাদের মাঝি দিনকতক খাবারের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। আমরা যে কয়জন নৌকায় জল খাইতাম, মাঝি সেই হিসাবে বাজার হইতে ওজন করিয়া খাবার কিনিয়া আনিত এবং আমাদিগকে খুচরা দরে বিক্রয় করিত। তাহাতে আমাদেরও কোন ক্ষতি হইত না, অথচ মাঝ হইতে মাঝি প্রত্যহ দুই এক আনা পাইয়া যাইত।

আমাদের পাঠ্যাবস্থায় 'বার্ডসাই' ছিল না। চুরুটও যাহা ছিল, তাহা স্কুলের বালকগণের মধ্যে বড় দেখিতে পাইতাম না। এখন দেখিতে পাই, ৬/৭ বৎসরের ছেলেগুলোও বার্ডসাই খায়। তখন যুবকেরাও চুরুট খাইত না, তবে অনেকে হুঁকোতে তামাকু খাইত। আমি যখন সপ্তম কি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি, তখন একজন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রকে চুরুট খাইতে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলাম। তাহার বয়স তখন ১৮/১৯ বৎসর হইবে। ভদ্রলোকের ছেলে এত অল্প বয়সে চুরুট খায়, তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

আমাদের সময়ের আর একটা বিষয়ের অভাব আজকাল বড় অধিক বলিয়া বোধ হয়। আমার মনে হয়, আমাদের সময়ে ছেলেদের মধ্যে গুরুজনকে সম্ভ্রম-সম্মান-প্রদর্শন যেন এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল। আমরা যখন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন প্রথম শ্রেণীর বা কলেজের এফ. এ. ক্লাসের ছাত্রদিগকে অতিশয় ভয় করিতাম। সহপাঠীদের সহিত খুবই বাচালতা চলিত, কিন্তু উপরশ্রেণীর ছাত্র দেখিলে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতাম। আমাদের নৌকায় উপরশ্রেণীর ছাত্রগণকে ঠিক জ্যেষ্ঠভ্রাতার

ন্যায় দেখিতাম। কিন্তু আজকাল দেখিতে পাই, উপরশ্রেণীর ছাত্রগণকে ভয় করা দূরে থাক্, স্কুলের বাহিরে ছাত্রেরা নিজের শিক্ষকগণকেও গ্রাহ্য করে না। এ কথা আমার কল্পিত নহে। প্রায় দুই বৎসর হইল, একদিন হেয়ার স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার নিকট আমরা হুগলী কলেজে পড়িয়াছিলাম। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "বাপু, আজকাল আমি ভারতবর্ষের মধ্যে একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় আমার অধীনে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি হুগলীতে অথবা অন্য কোন পল্লীগ্রামে থাকিলে ভাল হইত। এখানকার ছেলেদের কথা বলিও না; কাহাকেও কিছু বলিতে ভয় করে, পাছে রাস্তায় ছুরি মারে। আমার ছাত্রেরা পথে আমার সম্মুখে বার্ডসাই খায়—লজ্জায় আমি ছাতা আড়াল দিয়া চলিয়া যাই।"

এখন যেমন স্কুল-কলেজের ছেলেদের মধ্যে ফুটবল হইয়াছে, তখন তেম্‌নি জিম্‌ন্যাষ্টিক ছিল। আমাদের এ অঞ্চলে প্রতি পাড়াতেই একটা করিয়া জিম্‌ন্যাষ্টিকের আড্ডা ছিল। একটা হরাইজণ্টাল্ বার, একজোড়া প্যারালাল্ বার ও একটা ট্রেপিজ্ বার তখন সকল পাড়াতেই দেখিতে পাইতাম। এখন সে সকল অদৃশ্য হইয়া তাহার স্থানে ফুটবল দেখা দিয়াছে। এখন কদাচিৎ দুই-একটা স্কুলে জিম্‌ন্যাষ্টিকের সরঞ্জাম দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ, তাহা বলিতে পারি না, তবে হাত-পা-মাথা-ভাঙা উভয়ের মধ্যেই আছে। জিম্‌ন্যাষ্টিকের ছেলে অপেক্ষা ফুটবলওয়ালা ছেলেরা অনেকটা বেশী সাহেবঘেঁষা হইয়া উঠিয়াছে। এখন বঙ্গসন্তানগণ ফুটবলের প্রসাদে সাহেবসুবোকে গুঁতাটা-গাঁতাটা দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

সেকালের পরিচ্ছদ

আমি তখন খুব ছোট, বোধহয় আমার বয়স আট নয় বৎসরের অধিক হইবে না। মনে আছে, আমার মামা বাজার হইতে এক জোড়া লালপাড় ধুতি আনিয়া আমার মায়ের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, কাপড়ের কেমন জমি।" মা কাপড় জোড়াটি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"বেশ জমি ত, যেন রুটির মত। কত দাম?" মামা বলিলেন, "দুই টাকা।" মা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "দু টাকা! এত সস্তা। কোথাকার কাপড়?" মামা বলিলেন, "বিলাতী কাপড়, কলে বোনা হয়।" মা বলিলেন—"বিলাতী? আমি দেশী তাঁতের কাপড় মনে করিয়াছিলাম। ঠিক যেন দেশী কাপড়ের মত পাড় আর জমি করিয়াছে।"

ইহা প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

ষাট বৎসর পূর্ব্বে লোকে সূক্ষ্ম বিলাতী বস্ত্র দেখিয়া বলিত ঠিক যেন দেশী কাপড়। আর এখন আমরা সূক্ষ্ম মিলের বস্ত্র দেখিয়া বলি—ঠিক যেন বিলাতী কাপড়! ষাট বৎসরের মধ্যে ম্যাঞ্চেষ্টারের আর বাঙ্গালা দেশের বস্ত্র সম্বন্ধে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি—বিলাতী বস্ত্রের লাল পাড় ও কালা পাড় এই

দুই বর্ণের পাড় হইত। লাল পাড়টাই লোকে অধিক পছন্দ করিত। কারণ বিলাতী লাল পাড়ের রং বেশ পাকা হইত কিন্তু কালা পাড়ের রং থাকিত না, দুই এক ধোপের পরই কালা রং ফিকে হইয়া যাইত এবং অনেক কালা পাড় পুরাতন কাপড় সাদা ধুতিতে পরিণত হইত। দেশী তাঁতের কাপড়ের কালা পাড়ের রং বেশ পাকা হইত, কিন্তু লাল পাড়ের রং ভাল হইত না, ফিকে হইত।

আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি বিলাতী ধুতির পাড় এক ইঞ্চি অপেক্ষা কিছু কম চওড়া হইত, উহাকে 'ফিতাপাড়' ধুতি বলিত। এখনকার মত 'নরুণপাড়' 'চুলপাড়' ধুতি তখন ছিল না। বিলাতী শাড়ীর পাড় অপেক্ষাকৃত চওড়া অর্থাৎ প্রায় দুই ইঞ্চি চওড়া হইত। বিলাতী ধুতি বা শাড়ীর পাড়ে কোনরূপ নক্সা বা কারুকার্য্য থাকিত না, ঢাকাই এবং শান্তিপুরের কাপড়ের পাড়েই নক্সা হইত, চন্দননগরের কাপড়ের পাড়েও কোনরূপ নক্সা হইত না।

ক্রমে ক্রমে বিলাতী কাপড়ের পাড়ের উন্নতি হইতে লাগিল। কালা পাড়ের রংও বেশ পাকা হইল। তখন হলুদ রঙের, লাল রঙের বা সবুজ রঙের পাড় হইত না, পাড়ের রং হয় লাল, না হয় কালা হইত। কিছুদিন পরে—অর্থাৎ যখন আমাদের বয়স বোধহয় চৌদ্দ পনের বৎসর, সেই সময়ে কলিকাতার গোষ্ঠবিহারী দে নামক একজন বস্ত্র বিক্রেতার নামসংযুক্ত নানা প্রকার বাহারের পাড়যুক্ত বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইল। লোকে সেই কাপড়কে 'গোষ্ঠমার্কা কাপড়' বলিত। গোষ্ঠমার্কা কাপড়ে ফিতা পাড়ের পরিবর্ত্তে কাশী পাড় দেখা দিল এবং গোষ্ঠমার্কা কাপড়েরই প্রথম হলদে পাড় হইল। সেই হলদে রং খুব পাকা ছিল, কাপড় পুরাতন হইয়া ছিঁড়িয়া গেলেও পাড়ের রং মলিন বা ফিকা হইত না। সেই সময় সবুজ পাড় ধুতি ও শাড়ীও বাজারে আসিত, কিন্তু সে রং থাকিত না, সেইজন্য সবুজ বা নীল পাড় কাপড় কেহ একবার কিনিলে আর দ্বিতীয় বার কিনিতে চাহিত না।

সেকালে এই সকল বিলাতী কাপড়ই বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নিত্যব্যবহার্য্য ছিল। ধনবান জমিদারগণ ঢাকাই, শান্তিপুরে বা ফরাসডাঙ্গার ধুতি ও শাড়ী ব্যবহার করিতেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকে সেই সকল কাপড় ব্যবহার করিতে পারিতেন না, তাঁহারা 'পোষাকি কাপড়' হিসাবে দেশী ধুতি ও শাড়ী দুই একখানা ক্রয় করিতেন। বাল্যকালে প্রতি বৎসর পূজার সময় আমাদের একখানি করিয়া দেশী ধুতি হইত। পূজার সময় এবং কোন আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় আমরা সেই সযত্নে রক্ষিত পোষাকি কাপড় পরিয়া যাইতাম। ফরাসডাঙ্গার কালাপাড় ধুতি ও শাড়ী কোরা অবস্থায় নীল বর্ণের থাকে, একবার রজকালয় ঘুরিয়া আসিলে কাপড়ের নীল রং কাটিয়া যাইত। আমরা প্রতি বৎসর পূজার সময় ফরাসডাঙ্গার কোরা কাপড় পাইতাম। আমাদের ধারণা ছিল যে, পূজার সময় কোরা কাপড়ই পরিতে হয়, তাই আমরা পূজার সময় সেই নীল বর্ণের কোরা কাপড় পরিতাম। দেশী তাঁতের কাপড় ধোয়া অপেক্ষা কোরা ক্রয় করাই ভাল, কারণ ধোপারা কোরা দেশী কাপড় কাচিবার সময় যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, তাহাতে

কাপড়ের স্থায়িত্বের হানি হয়। যেখানে ভাল কাপড় জন্মায় সেখানে সেই কাপড় কাচিবার উপযুক্ত রজকও থাকে। ফরাসডাঙ্গার কোরা কাপড় যে সকল রজক কাচিয়া থাকে, তাহারা সাধারণতঃ গৃহস্থের ব্যবহার্য্য মলিন কাপড় কাচে না। তাহারা বস্ত্রবিক্রেতাদের নিকট হইতে কোরা কাপড় লইয়া কাচিয়া থাকে। কোরা কাপড় কাচিয়া তাহারা 'ইস্ত্রি' করিবার পর একটা বড় গুরুভার মুগুর লইয়া সেই কাপড়ের উপর আঘাত করিয়া কাপড়কে একেবারে তক্তার মত করিয়া ফেলে। এই প্রক্রিয়ায় কাপড়গুলি দেখিতে বেশ সুন্দর হয় বটে, কিন্তু শীঘ্রই ছিঁড়িয়া যায়। সেইজন্য দেশী তাঁতের কাপড় কোরা অবস্থায় কিছুদিন রাখিয়া পরে কাচাইয়া লওয়া উচিত। ব্যবহৃত বস্ত্র কোরা হইলেও রজকেরা তাহা নূতন বস্ত্রের মত পিটাইয়া তক্তা করে না, সেইজন্য ঐ বস্ত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আমাদের অভিভাবকগণ এই তথ্য জানিতেন বলিয়াই বোধহয় পূজার সময় কখনও ধোয়া কাপড় কিনিতেন না, কোরা কাপড়ই কিনিতেন এবং পাছে আমরা নীল রঙের কোরা কাপড় পরিতে আপত্তি করি, সেইজন্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে পূজার সময় কোরা কাপড়ই পরিতে হয়।

পূজার কাপড় 'কোঁচাইয়া' পরিতে হয় বলিয়া আমরা সেই নীলরঙের কাপড় কোঁচাইবার জন্য প্রতিবেশীদের দ্বারস্থ হইতাম। আমাদের প্রতিবেশী মাধব ঘোষ এক কালে কোন সৌখীন ধনীর খানসামা ছিল; সে সুন্দররূপে কাপড় কোঁচাইতে পারিত। আমরা কাপড় কোঁচাইবার জন্য তাহারই শরণ লইতাম। আজকাল বালক ও যুবকগণের মধ্যে কাপড় কোঁচাইবার শিল্পও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখনও দুই চারিজন ধনবানকে কোঁচান কাপড় পরিতে দেখা যায়, কিন্তু বোধহয় আর কিছুদিন পরে, কাপড় কোঁচাইয়া পরিবার প্রথা সম্পূর্ণ রূপে লোপ পাইবে; কোঁচান কাপড় কার্ত্তিক এবং গণেশ ঠাকুরেরই একচেটিয়া হইয়া থাকিবে।

আমাদের পূজার কাপড় বা পোষাকি কাপড়ের কথা বলিলাম, এখন জামার কথা বলিব। আজকাল যেমন নানাবর্ণের বিদেশী কাপড়ের জামা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের বাল্যকালে সেরূপ ছিল না। সেকালে ধনবানের পুত্রকন্যারা পূজার সময় সাটিন, মখমল বা গর্ণেটের জামা পরিত, আমরা মধ্যবিত্তশালী গৃহস্থ সন্তানেরা পূজার সময় যাহা হউক একটা নূতন জামা পাইলেই আহ্লাদে আটখানা হইতাম। সাধারণতঃ আমরা পূজার সময় সাদা জমির উপর কালো, লাল বা বেগুনি ছিটের সূতির জামা পাইতাম। সেই জামার কাপড়ের মূল্য প্রতিগজ চারি আনার অধিক হইত না। মোটের উপর, আমরা বাল্যকালে পূজার সময় যে জামা পাইতাম তাহার মূল্য দশ আনা বা বার আনার অধিক নহে। পূজার জুতাও তদ্রূপ, এক টাকার মধ্যেই পূজার জুতা হইত। তখন সাধারণতঃ দুই প্রকার চামড়ার জুতা পাওয়া যাইত, বার্ণিশ ও বুরুষ। কালো রঙের বার্ণিশ জুতাটাই আমাদের অধিক প্রিয় ছিল, কারণ, তাহা বেশ চকচকে। বুরুষ জুতা বড় পছন্দ করিতাম না। জুতাও দুই প্রকার গঠনের ছিল—রবারের সাইড স্প্রিং এবং ফিতা বাঁধা। জুতা-বুরুষের কালি অবশ্য বিলাতী ছিল, ছোট কৌটার দাম দুই পয়সা, বড় কৌটার দাম দুই আনা। সেই কালি তরল নহে, 'কোরা' কালির কৌটাতে

যেরূপ কালি থাকে সেই মোমের মত। যখন আমরা স্কুলে উপর ক্লাসে পড়িতাম তখন জুতার তরল কালি বাজারে বাহির হয়। সম্ভবত তরল কালি তাহার অনেক পূর্ব্বেই কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাতায় আমদানী হইলেও মফঃস্বলে আমদানী তাহার পরেই হইয়া থাকে। আমাদের সময়ে যে দুই প্রকার তরল কালি তাহার নাম—'সাটিন পালিসা' এবং 'নিউবিয়ান ব্ল্যাকিং'। এই শেষোক্ত কালিই আমরা পছন্দ করিতাম কারণ তাহা একবার মাখাইলেই বুরুষ-জুতা বার্ণিশ-জুতার মত চকচকে হইত।

আমরা কৈশোরে বুটজুতাও পায়ে দিয়াছি, কিন্তু অল্প। চটিজুতা এবং নাগরার প্রচলনও বেশ ছিল। এক বৎসর পূজার সময় আমি ঝিনুকের বোতাম বসান বার্নিশ জুতা পাইয়াছিলাম। কালো বার্নিশের উপর চকচকে ঝিনুকের বোতাম দেখিয়া আনন্দবিহ্বল হইয়াছিলাম।

জামার কাপড় যেরূপ এখনকার মত নানাপ্রকার ছিল না, জামার গঠনও সেইরূপ রকমারি ছিল না। সাধারণতঃ কামিজ ও কোটই আমরা পরিতাম। কামিজ নানাপ্রকারের হইত। কামিজ হইলেই তাহার প্লেট ও কফ্ থাকে। কামিজের প্লেট বা বক্ষস্থলে পটি দেওয়া, কুঁচি দেওয়া নানাপ্রকার কারুকার্য থাকিত। কফ্ অর্থাৎ হাতার শেষ অংশে কারুকার্য কিছু থাকিত না, তবে উল্টা কফ্ নামে একপ্রকার কফ্ হইত, সেই কফ্ পশ্চাদ্দিকে উল্টান হইত। আজকাল বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানকে তেমন কামিজ গায়ে দিতে দেখি না, কোটের সঙ্গে কামিজ অনেকেই ব্যবহার করেন; কিন্তু আমরা বাল্যে ও যৌবনে শুধু কামিজই গায়ে দিতাম। সেকালে ইংলিশ কোট অপেক্ষা চায়না কোটের প্রচলনই অধিক ছিল, আমরা বাল্যকালে চায়না কোটই পরিয়াছি। আজকাল আমার মত দুই চারিজন বৃদ্ধ ব্যতীত কাহারও অঙ্গে চায়না কোট দেখিতে পাই না। আমাদের যৌবনকালে পাঞ্জাবী জামার আবির্ভাব হয়। কোট প্রধানতঃ জিন, সাটিন জিন বা কটন ড্রিলের হইত। সাটিন জিনটাই আমরা বেশী পছন্দ করিতাম, কারণ উহা ধবধবে সাদা এবং একটু উজ্জ্বল হইত, জিন বা কটন ড্রিল সেরূপ হইত না। মধ্যে কিছুদিনের জন্য 'পার্শিকোট' বাঙ্গালী যুবকগণের অঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; আজকাল আর কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে 'পার্শিকোট' পরিতে দেখি না। সেই কোট আজানুলম্বিত ছিল। এখনও কলিকাতায় 'পার্শিকোট' দেখিতে পাই, কিন্তু বাঙ্গালীর দেহে নহে, পার্শি, গুজরাটী বা ভাটিয়ারাই ঐরূপ কোট ব্যবহার করেন।

আমাদের বাল্যকালে মোজা বোধহয় কিনিতে পাওয়া যাইত না, অন্ততঃ মফস্বলের কোন দোকানে মোজা বিক্রয় হইতে দেখি নাই। যে বাটীর মহিলারা মোজা বুনিতে জানিতেন, সেই বাটীর পুরুষেরাই মোজা ব্যবহার করিতেন। আমার জননী মোজা বুনিতে পারিতেন, সেইজন্য আমরা শীতকালে মোজা পায়ে দিতাম, কিন্তু আমাদের বাল্যসহচরগণের মধ্যে অনেকেই মোজা পায়ে দিত না, কারণ তাহারা পাইত না।

শীতকালে আমরা শীতনিবারণের জন্য 'দোলাই' গায়ে দিতাম। এই দোলাই

জিনিসটা আজকাল কলিকাতা অঞ্চল হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কি ইতর কি ভদ্র, আজকাল আর কাহাকেও দোলাই গায়ে দিতে দেখি না। দোলাই জিনিসটা কি, একালের অনেকের হয়ত সে ধারণাই নাই। বালাপোশে তুলা না থাকিলে যাহা হয়, তাহাই দোলাই। দুই পর্দ্দা কাপড় চারিদিকে সেলাই করিয়া একত্রবদ্ধ করিলেই দোলাই হয়। বালাপোশের পাড়ের মত দোলাইয়েরও পাড় থাকিত। উহার সদর পিঠ বা বাহিরের পর্দ্দা লাল জমির উপর হলুদ, সবুজ ও নীল বর্ণের বড় বড় কল্কা বা ফুল কাটা, ভিতরের বা নিম্ন পর্দ্দায় কৃষ্ণবর্ণের জমিতে ছোট ছোট সাদা গোলাকার ছাপ থাকিত। এই দোলাই বাল্যকালে আমাদের শীত নিবারণ করিত। দশ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমরা দোলাই গায়ে দিয়া শীত কাটাইয়া 'র‍্যাপারে' প্রমোশন পাইয়াছিলাম। র‍্যাপার বিদেশ হইতে আমদানী পশম, অথবা পাটমিশ্রিত পশমে প্রস্তুত আলোয়ান। বিলাতী কম্বলের মত র‍্যাপারে নানা বর্ণের ডোরা কাটা থাকিত। র‍্যাপারগুলি দেখিতে বড় সুন্দর ছিল, উহাতে পশম থাকিত বলিয়া দোলাই অপেক্ষা উহার শীতনিবারণের ক্ষমতা অধিক ছিল। অল্প মূল্যের র‍্যাপারগুলি জার্ম্মানী হইতে আমদানী হইত। সাধারণতঃ এক একখানা র‍্যাপারের মূল্য চারি পাঁচ টাকা হইত। শীতকালে আমরা গরম কাপড়ের কোট গায়ে দিতাম। সেই সকল কোট সাধারণতঃ বনাত, কাশ্মীয়ার বা সার্জ্জে প্রস্তুত হইত। ঐ সকল গরম কাপড়ের কোটও চায়না কোট ছিল, ইংলিশ কোট নহে। আজকাল যেরূপ মফঃস্বলেও ছোট ছোট ছেলেদিগকে 'অলষ্টার' গায়ে দিতে দেখি, সেকালে সেরূপ দেখিতে পাইতাম না। বলিতে পারি না, সেকালে কলিকাতায় ধনবানের সন্তানগণ অলষ্টার গায়ে দিতেন কিনা, মফস্বলে অলষ্টারের ব্যবহার অজ্ঞাতই ছিল। আমরা চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কতদিন জুতা পায়ে না দিয়াই স্কুলে গিয়াছি। গ্রীষ্মকালে, যখন পথের ইট পাথর অত্যন্ত গরম হইত, তখন নগ্নপদে, পথিপার্শ্বস্থ ঘাসের উপর দিয়া চলিতাম।

সেকালে প্রায় সকল যুবককে এবং অনেক বালককেও চাদর বা উড়ানি ব্যবহার করিতে দেখিতাম। আজকাল চাদরের ব্যবহার নাই, বিশেষতঃ কার্পাস সূত্রের উড়ানি। এখন কার্পাসের উড়ানি উঠিয়া গিয়াছে, রেশমী উড়ানির আবির্ভাব হইয়াছে। এখন অনেক প্রৌঢ় ভদ্রলোকও উড়ানি ব্যবহার করেন না, আমার মত বৃদ্ধেরাই উড়ানির মায়াতে আবদ্ধ আছেন। আমার মনে আছে ১৮৯২ কি ৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সাবিত্রী লাইব্রেরীর এক সভাতে[৮৪] কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথমে রেশমী উড়ানি গায়ে দিতে দেখি।

চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে এদেশে রেশমী উড়ানির প্রচলন ছিল না। গরদের জোড় বা তসরের জোড় অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে, কিন্তু সূতার কাপড় ও গরদ চাদর বা এণ্ডি চাদর একযোগে ব্যবহার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। আমরা বাল্যকালে ও যৌবনে উড়ানি ব্যবহার করিতাম, এমনকি অনেক সময় স্কুলেও উড়ানি লইয়া যাইতাম। মধ্যে দিন কয়েক পাড়ওয়ালা উড়ানির আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই ফ্যাশান বোধ হয় মাদ্রাজ হইতে আসিয়াছিল, কারণ মাদ্রাজী

ভদ্রলোকেরাই পাড়ওয়ালা উড়ানি ব্যবহার করেন। এখন আর সে উড়ানি বাঙ্গালীর বাটীতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমি সেকালের বালক ও যুবকগণের পরিচ্ছদের কথাই বলিলাম, বালিকা ও যুবতীদের বেশভূষা সম্বন্ধে দুই-এক কথা না বলিলে আমার এই প্রবন্ধ অঙ্গহীন হইবে। আমাদের সেকালে বালক ও যুবকগণের পরিচ্ছদ যেরূপ আড়ম্বরহীন সাদাসিদে ছিল, বালিকা ও যুবতীদিগের পরিচ্ছদও কতকটা সেইরূপ আড়ম্বরহীন ছিল। সেকালে মফস্বলে স্ত্রীলোকগণের মধ্যে সেমিজ বা সায়া ব্যবহৃত হইত না। সেমিজ ও সায়ার ব্যবহার বোধহয় চল্লিশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় জামা গায়ে দিতেন, কিন্তু জুতা ব্যবহার স্ত্রীলোকের পক্ষে একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৮৯৭ কি ৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় প্লেগের প্রথম আবির্ভাব হয়,[৮৫] সেই সময় চিকিৎসকগণ নাকি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, যাহারা পাদুকা ব্যবহার করে না, প্রধানতঃ তাহারাই প্লেগে আক্রান্ত হয়; সেইজন্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের, ধনবান অপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিদিগেরই অধিক প্লেগ হয়। চিকিৎসকগণের মতে প্লেগের বীজাণু নাকি মৃত্তিকাতে থাকে, নগ্নপদে গমন করিলে সেই সকল বীজাণুর সংস্পর্শেই প্লেগ হয়। সংবাদপত্রে চিকিৎসকগণের এই অভিমত পাঠ করিয়া আমার পিতা, আমার পত্নী, ভ্রাতৃবধূ এবং জননীর জন্য পাদুকা কিনিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। আমি কলিকাতা হইতে তিন জোড়া কার্পেটের জুতা লইয়া আসিলাম। বাবার আদেশে আমার স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূ সেই জুতা দুই চারি দিনের জন্য পায়ে দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার জননী কিছুতেই জুতা পরিতে সম্মত হইলেন না। আমি যে জুতা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতে চামড়া ছিল না। উহার সাজ কার্পেটের এবং তলা ক্যাম্বিশের, সুতরাং উহা পরিধানের কোনও যুক্তিসংগত আপত্তি ছিল না, কিন্তু মা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন—"প্লেগে মরি সেও ভাল, তাই বলিয়া বুড়া বয়সে জুতা পায়ে দিতে পারিব না।" অথচ আমার মা সেকালে চন্দননগরের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদুষী ও উদারমতাবলম্বিনী বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

বলা বাহুল্য যে সেকালে স্ত্রীলোকদিগের ব্লাউস ছিল না। তাঁহারা যে জামা গায়ে দিতেন, তাহা বডিস ও জ্যাকেট এই দুই প্রকারে বিভক্ত ছিল। বডিস ত আজকাল বড় দেখিতেই পাই না, কোন কোন স্থানে এখনও জ্যাকেট দেখিতে পাই। সেকালে, বৃদ্ধা ত দূরের, প্রৌঢ়ারাও বডিস বা জ্যাকেট পরিধান করিতেন না, বালিকা ও যুবতীরাই জামা ব্যবহার করিতেন, তাহাও পরের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার সময়। আমার মনে হয়, একাল অপেক্ষা সেকালে বাঙ্গালীর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান অধিক ছিল। একথা স্বীকার করি যে, আজকাল রাজনীতিক ক্ষেত্রে বাঙালীর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে, এখন বাঙ্গালী ইংরেজের মুখে দুইটা মিষ্ট কথা শুনিলেই আপ্যায়িত হয় না, শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইলে নীরবে সে লাঞ্ছনা শিরোধার্য্য করে না, কিন্তু আবার অনেক বিষয়ে বাঙ্গালী শ্বেতাঙ্গদের অনুকরণে কৃতকার্য হইলে জীবন সার্থক জ্ঞান করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরিচ্ছদের উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমরা আজকাল যত অধিকসংখ্যক যুবাকে ইউরোপীয় বেশে সজ্জিত দেখিতে পাই, সেকালে সেরূপ দেখিতে পাইতাম না। সেকালে কেবল বিলাতফেরৎ বাঙ্গালীকেই ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখিতাম। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হই। আমরা যখন স্কুলবিভাগে পড়িতাম, তখন কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক অবিনাশ দত্ত মহাশয়কে ইউরোপীয় পরিচ্ছদে কলেজে আসিতে দেখিতাম। অন্য কোন বাঙ্গালী অধ্যাপক ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না। দত্ত সাহেব বিলাতফেরৎ ছিলেন না। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে আচার-ব্যবহারে পুরাদস্তুর সাহেব হইলেও কখনও সাহেব সাজেন নাই। তাঁহার সাহেব না সাজিবার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, তিনি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। অবিনাশ দত্ত গৌরবর্ণ এবং সুপুরুষ ছিলেন; তবে তাঁহার অগ্রজ রমেশচন্দ্র দত্ত সি. এস. আই. মহাশয় বিলাতফেরৎ ছিলেন, হয়ত সেইজন্যই অবিনাশবাবুও ইউরোপীয় পরিচ্ছদে কলেজে যাইতেন। লালবিহারী দে স্বয়ং ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান না করিলেও তাঁহার পুত্রগণ ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করিতেন। তাঁহার পত্নী পারসিক ছিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ পিতার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া মাতার ন্যায় গৌরবর্ণ ছিলেন। লালবিহারী দে-র তৃতীয় পুত্র হর্ম্মসজী দে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, তিনি বাঙ্গালা জানিতেন না, দুই চারিটা বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা কথা বলিতে পারিতেন। অবিনাশ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর মিঃ পি. মুখার্জ্জী হুগলী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। মুখার্জ্জী সাহেব বিলাতফেরৎ ছিলেন, বিলাতী পোষাক পরিতেন, কিন্তু একটা ব্যাপারে তাঁহার বাঙ্গালীত্ব ফুটিয়া উঠিত। তিনি বোধহয় কিছু অধিক পরিমাণে তৈল মাখিতেন, কারণ আমরা দেখিয়াছি যে, যখন তিনি ক্লাসে অনাবৃত মস্তকে আমাদিগকে পড়াইতেন, তখন তাঁহার তৈলাক্ত কেশ চক্ চক্ করিত। আমাদের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন স্বর্গীয় কিশোরীমোহন সেন (কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনের পিতা)। ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন স্বর্গীয় হেমচন্দ্র রায়। ইঁহারা চোগা-চাপকান ব্যবহার করিতেন। আজকাল কলিকাতায় যুবক ডাক্তার, অধ্যাপক এবং হাকিম প্রভৃতির অধিকাংশকেই সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখি। কিছুদিন পূর্ব্বেও কলিকাতায় বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারগণ কি ঘরে, কি বাহিরে, সর্ব্বত্রই সাহেবী পোষাক পরিতেন, কিন্তু আজকাল আর সে প্রথা নাই। হাইকোর্টে বা অন্য কোন আদালতে যাইবার সময় তাঁহারা সাহেবী পরিচ্ছদ পরেন কিন্তু নিজ বাটীতে অথবা সভা-সমিতিতে যাইবার সময় তাঁহারা বাঙ্গালী পরিচ্ছদেই গমন করেন। আমাদের সেকালে মুন্সেফ্, সাবজজ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হাকিমেরা চোগা চাপকান পরিয়াই আদালতে যাইতেন। এখন অনেক সাব-ডেপুটিকেও সাহেবী পোষাকে আদালতে দেখিতে পাই।

গত পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যে দেশের যখন এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখন কেশেরও যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। সেকালে প্রায় সকলেরই

মাথায় কেশ চারিদিকেই সমান থাকিত। যাঁহারা সৌখীন ও বিলাসী ছিলেন, মাথায় সিঁথা কাটিতেন, তাঁহাদের সম্মুখের কেশ পশ্চাদ্দিকের কেশ অপেক্ষা কিছু বড় থাকিত। সেকালে অনেককেই ঘাড় কামাইতে দেখিতাম, ঘাড়ের কাছে—যেখানে কেশের সীমা শেষ হইয়াছে, সেইখানটায় ক্ষৌরকার্য্য করা হইত, তাহার উপরে নহে। আজকাল যেরূপ দুই রগ এবং মাথার পশ্চাৎ ভাগ প্রায় কেশশূন্য করিয়া চুল ছাঁটা হয়, সেকালে সেরূপ ছিল না। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের সকল ফ্যাশানই সমাজের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কেবল দুইটি বিষয় নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আজকাল এই যে বাঙ্গালী ভদ্র যুবকগণের বোধহয় পনের আনা রকমকে রগ ও ঘাড় বাহির করিয়া চুল ছাঁটিতে দেখি, ঐ ফ্যাশান এখনকার ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার মুসলমান কোচম্যান ও বিড়িওয়ালা শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন দেখিতেছি উহা ক্রমশঃ সমাজের উচ্চস্তরেও সসম্মানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিষয় লুঙ্গি পরিধান। লুঙ্গিটা পূর্ব্বে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সমাজেরই একচেটিয়া ছিল। যখন আমরা হুগলী কলেজে পড়িতাম, তখন কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পুত্র আমার সহপাঠী ছিলেন। অনেক সময় আমি আমার মুসলমান বন্ধুদের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের বাটীতে কাহাকেও লুঙ্গি পরিতে দেখি নাই। প্রায় সকলে কাপড় পরিতেন, কেহ কেহ ইজের পরিতেন। হুগলীতে অনেক ভদ্র মুসলমানের বাস আছে, কিন্তু আমার ছাত্রাবস্থায় কোন মুসলমান ভদ্রলোককে পথে লুঙ্গি পরিয়া বেড়াইতে দেখি নাই। লর্ড ডাফরিনের সময় ব্রহ্মদেশ ইংরেজদের অধীন হইলে, ব্রহ্মদেশের যুবরাজ মেইনগুনকে ভারত গভর্ণমেণ্ট বন্দী করিয়া বারাণসীতে আটক রাখেন। তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া প্রায় এক বৎসর বাস করেন। তিনি চন্দননগরে আসিলে, কলিকাতা ও ব্রহ্মদেশ হইতে বহু বার্ম্মিজ চন্দননগরে আসিয়া বাস করেন। সেই সকল বার্ম্মিজকে আমি প্রথমে লুঙ্গি পরিতে দেখি, তাহার পূর্ব্বে কখনও লুঙ্গি দেখি নাই। এখন দেখিতে পাই অনেক বাঙ্গালী হিন্দু সন্তানও লুঙ্গি পরিয়া পথে বাহির হইয়া থাকেন।

সেকালের মহিলাদের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমি অতি সংক্ষেপেই দুই চারি কথা বলিলাম, কারণ, মহিলাদের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পুরুষের লেখা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের লেখাই সমধিক উপযোগী হইবে। স্ত্রীলোকদিগের বেশের কথা বলিতে হইলে ভূষণের কথাও বলা আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদের বেশ ও ভূষা উভয়ের বর্ণনা করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। সেকালের স্ত্রীলোকদিগের সেই অসংখ্য অলঙ্কারের বর্ণনা করা সহজ নহে। মোটের উপর দেখিতেছি যে একালে অলঙ্কারের ফ্যাশান যতই দ্রুত পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, সেকালের ধনবান ভদ্রলোকের বাটীর মহিলারা যত অধিক মূল্যের স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কার ধারণ করিতেন, একালের মহিলারা তাহার শত ভাগের একভাগ ধারণ করেন কিনা সন্দেহ। সেকালে ধনবতীরা সত্য সত্যই 'সোনায় মোড়া' হইয়া কুটুম্বগৃহে গমন করিতেন। মোটা, ভারী, নিরেট গহনাই সেকালের ধনগৌরব

প্রদর্শন করিত। সুতরাং বিশ ভরির চুড়ি, ত্রিশ ভরির হার, পঞ্চাশ ভরির সূর্য্যহার প্রভৃতি অনেক ধনবানের বাটীতেই দেখা যাইত। সেকালে কোন কোন বড় জমিদার-গৃহিণী অম্লান বদনে আড়াই সের তিন সের স্বর্ণালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নিমন্ত্রণরক্ষায় গমন করিতেন, ইহা আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি।

সেকালের ভোজ

প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—আমার বয়স তখন বোধহয় এগার কি বার হইবে—কোন প্রতিবেশীর বিবাহ উপলক্ষে ভাটপাড়ায়, সাধু ভাষায় ভট্টপল্লীতে বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিলাম। চন্দননগর হইতে ভাটপাড়ার দূরত্ব এক ক্রোশের অধিক না হইলেও প্রথমে আমার জননী আমাকে পাঠাইতে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন, কারণ চন্দননগর ও ভাটপাড়ার মধ্যে 'একানদী বিশকোশ' গঙ্গা। মাতার সম্মতি লাভ করিয়া বরযাত্রী হইয়া ভাটপাড়ায় উপস্থিত হইলাম। কন্যাপক্ষের বাটী দেখিয়া মনে হইল তাহারা নিঃস্ব নহেন, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। সন্ধ্যায় গোধূলি-লগ্নে বিবাহ, রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই বিবাহ শেষ হইয়া গেল, বরযাত্রী ব্রাহ্মণদিগকে আহারের জন্য আহ্বান করা হইল। বলিয়া রাখা ভাল যে, সেকালের বিবাহের পূর্ব্বে কি বরপক্ষ, আর কি কন্যাপক্ষ, কোন পক্ষেরই নিমন্ত্রিত লোকদিগের আহারের ব্যবস্থা হইত না। গোধূলি লগ্নে বিবাহ, সুতরাং রাত্রি নয়টা বা সাড়ে নয়টার মধ্যেই আহারাদি শেষ করিয়া বাড়ীতে ফিরিতে পারিব জানিয়াই মা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। নতুবা আমাকে ভাটপাড়ায় যাইতে দিতেন না। ভোজনের আহ্বানে, ভোজনস্থানে গিয়া দেখিলাম, কুশাসনের সম্মুখে কদলীপত্রে চারিখানা করিয়া লুচি এবং পাতের এক পার্শ্বে এক মুষ্টি করিয়া লবণ। আসনে উপবেশন করিয়া দেখিলাম, অন্যান্য বরযাত্রীরা সেই লবণ সহযোগেই লুচি খাইতেছে। আমিও খানিকটা লুচি ছিঁড়িয়া লবণ সংযোগে মুখে দিয়া দেখি সেটা লবণ নহে চিনি। এই লুচি ও চিনি ব্যতীত ভোজনের অন্য অনুষ্ঠানই নাই। সকলেই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই চিনি দিয়া লুচি খাইলেন। অগত্যা আমিও তাহাই উদরস্থ করিয়া আহার শেষ করিলাম।

ভাটপাড়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপ্রধান স্থান, বিশেষতঃ ভাটপাড়ায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের অধিকাংশই গুরুগিরি করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সেইজন্য আহার বিহার সম্বন্ধে তাঁহাদের নিষ্ঠা এত অধিক যে, নিমন্ত্রিত বরযাত্রীদিগের জন্যে লুচি ও চিনি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবস্থা করা তাঁহারা সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই।

এ ত গেল ভাটপাড়ার কথা; অন্য স্থানেও বাল্যকালে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া আহারের যেরূপ ব্যবস্থা দেখিয়াছি তাহা একালের ছেলেরা বোধহয় কল্পনা করিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য যে, কেবল লুচি চিনির ব্যবস্থা ভাটপাড়াতেই দেখিয়াছিলাম, অন্য কোথাও দেখি নাই। অন্যান্য স্থানে লুচির সঙ্গে তরকারি এবং দধি ও সন্দেশ থাকিত। ইহার অধিক আর কিছু থাকিত না। সেকালের লুচির সহিত কুমড়ার

তরকারিই হইত; শীতকালেও কপির তরকারি বড় দেখিতে পাইতাম না। একবার আমাদের অভিভাবক স্থানীয় কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন—"কপিটা ত আমাদের দেশের জিনিস নহে, ওটা সাহেবরা তাহাদের দেশ হইতে আনিয়াছে। ম্লেচ্ছর আনীত বলিয়া উহা দেবতার ভোগে লাগে না। সুতরাং ব্রাহ্মণের পাতেও দেওয়া যায় না।" কথাটা তখন যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু তখন মনে হয় নাই যে, আলুটাও তো সাহেবের আনীত বিদেশী তরকারি, কুমড়ার ব্যঞ্জনে আলু দেবতা ব্রাহ্মণের ভোগে লাগে কিরূপে? ব্যঞ্জনে আলু খাইতে ত দেবতা বা ব্রাহ্মণকে আপত্তি করিতে দেখি নাই। বস্তুতঃ সেকালে গৃহস্থের বাটীতে যেরূপ ভোজনে বিলাসিতা ছিল না, ভোজেও সেইরূপ বিলাসিতা ছিল না—অবশ্য লুচি সম্বন্ধে। ভোজনের প্রধান অঙ্গ অন্ন হইলে ইহার ব্যতিক্রম হইত। আমরা বাল্যকালে যেখানে ভোজে লুচি খাইয়াছি, সেইখানেই লুচির নিত্যসহচর কুমড়ার ব্যঞ্জন, দধি ও সন্দেশ দেখিয়াছি। লুচির সহিত বেগুন ভাজা, শাক ভাজা বা চাটনি হইত না, মাছমাংস ত দূরের কথা। প্রথম যৌবনে একবার কোন বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে হাওড়ায় গিয়াছিলাম। সেখানে প্রথমে দেখিলাম যে লুচির সঙ্গে ছোলার ডাল দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাতে এক অনর্থ ঘটিয়াছিল। একজন বয়স্ক ব্যক্তির পাতে ছোলার ডাল দিবামাত্র তিনি আহার বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিলেন। গৃহস্বামী মহাঅপ্রতিভ হইয়া তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আপনি নবশাখ, আমিও নবশাখ, কিন্তু আপনি আমার স্বজাতি নহেন। আপনার বাটীতে যদি ডাল খাইলাম তবে ভাত খাইতে আপত্তি কি? ডাল ও ভাত কি ভিন্ন?" এই কথা শুনিয়া সেই গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ সেই পাতা সরাইয়া আবার নতুন পাতা করিয়া দিলেন এবং ডাল বাদ দিয়া পরিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকটি বিশেষ সতর্ক বলিয়াই সেই যাত্রা তাহার জাতিরক্ষা হইয়াছিল।

সেকালে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কায়স্থ বা নবশাখগণের বাটীতে ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেন, ভোজনস্থানে গিয়া আসনে উপবেশন করিতেন, পরিবেশকগণের নিকট হইতে বারংবার লুচি ও সন্দেশ চাহিয়া লইতেন কিন্তু ভোজন করিতেন না। ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রের বাটীতে ভোজন রীতিবিরুদ্ধ ছিল, তাই তাঁহারা শূদ্রের বাটীতে বসিয়া ভোজনে আপত্তি করিতেন, কিন্তু শূদ্রের বাটী হইতে লুচি, সন্দেশ স্বগৃহে আনিয়া ভোজন করিতে আপত্তি করিতেন না। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, শূদ্রের দ্বারা নিমন্ত্রিত দূরদেশাগত ব্রাহ্মণগণ, নিমন্ত্রণকারী শূদ্রের বাটীতে ভোজন করিতেন না, নিমন্ত্রণকর্ত্তার প্রতিবেশী কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে বসিয়া নিমন্ত্রণকারী শূদ্রের বাটী হইতে প্রেরিত লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভোজন করিতেন। এইরূপ ব্যবস্থায় অনেক সময় অনেক কৌতুককর ব্যাপারও ঘটিত। আমাদের প্রতিবেশী কোন কায়স্থ ভদ্রলোকের কন্যার বিবাহে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বরযাত্রী কায়স্থের বাটীতে ভোজনে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "আমরা শূদ্রের বাটীতে ভোজন করিব না, যদি কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে ভোজনের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে আমাদের ভোজনে আপত্তি নাই।" এই কথা

শুনিবামাত্র সেই কায়স্থ ভদ্রলোকের জনৈক তিলি প্রতিবেশী বলিলেন, "বেশ কথা, আমার বাটীতে ইহাদিগের ভোজনের ব্যবস্থা করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি সেই কয়জন ব্রাহ্মণকে আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন এবং নিমন্ত্রণকর্ত্তার বাটী হইতে ভোজ্যদ্রব্য আনাইয়া সেই সকল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। এইরূপ ছলনা চাতুরি সেকালে মাঝে মাঝে হইত। শূদ্রের প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্য ভক্ষণে আপত্তি নাই, শূদ্রের বাটীতে বসিয়াই ভোজনে আপত্তি। এরূপ ছলনা দূরদেশে বা ভিন্নগ্রাম হইতে সমাগত ব্রাহ্মণদের অদৃষ্টেই ঘটিত, স্বগ্রামবাসী বা প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণকে এরূপ ছলনা করিতে পারা যাইত না।

সেইকালে ধনশালী ব্যক্তিগণের বাটীতে ভোজে লুচির ব্যবস্থা হইলে ব্যঞ্জন-বাহুল্য হইত না। চন্দননগর গোন্দলপাড়া নিবাসী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন বিশেষ ধনশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকা, জুড়িগাড়ী (তখন মোটর ছিল না), বারমাসে তের পার্ব্বণ, কিছুরই ত্রুটি ছিল না। দুর্গোৎসব এবং পিতামাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার বাটীতে বিরাট ভোজ হইত, কিন্তু তাঁহার বাটীতেও আমরা সেই লুচি, কুমড়ার তরকারি, দধি ও সন্দেশ খাইয়া আসিতাম এবং 'অধিকন্তু' হিসাবে প্রকাণ্ড 'ছাঁদা' বাঁধিয়া আনিতাম। তাহার বাটীতেও আমরা ব্যঞ্জনবাহুল্য বা মিষ্টান্নবাহুল্য দেখি নাই।

সেকালে ভোজের কথা বলিলে ছাঁদা বাঁধার কথা বলিতে হয়। নিমন্ত্রণকর্ত্তা কৃপণস্বভাব কি উদারস্বভাব, তাহা তাঁহার বাড়ীর ছাঁদা দেখিয়াই লোকে অনুমান করিতে পারিত। যতই উদরপূর্ত্তি করিয়া ভোজন করা হউক না কেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ছাঁদা না বাঁধিলে নিমন্ত্রণরক্ষাই মঞ্জুর হইত না। আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে একশত লোককে লুচি খাওয়াইতে হইলে পনের সের হইতে আধমণ ময়দার লুচি ভাজিলেই যথেষ্ট। সাধারণতঃ "বাবু" শ্রেণীর লোকে আধপোয়া ময়দার লুচি খাইতে পারেন কিনা সন্দেহ। সেকালে লোকের ভোজনশক্তি এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। পঁচিশ-ত্রিশখানা লুচি, তদনুরূপ ব্যঞ্জন, এক হাঁড়ি দধি ও পঁচিশ-ত্রিশটা সন্দেশ সেকালে অনেককেই খাইতে দেখিয়াছি। সেজন্য সেকালে নিয়ম ছিল, একশত লোক খাওয়াইতে হইলে একমণ ময়দা, একমণ দধি, একমণ মিষ্টান্ন এবং সেই অনুপাতে ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যত বড় ভোক্তা হউক, একমণ ময়দার লুচি সেকালে একশত সাধারণ লোক খাইতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না। তবে যে একমণ ময়দা ও একমণ মিষ্টান্নের আয়োজন করিতে হইত, তাহার কারণ—ঐ ছাঁদা। আকণ্ঠ ভোজন করিলেও সেকালের নিমন্ত্রিত লোকদিগকে কিছু ছাঁদা হাতে করিয়া বাটীতে লইয়া যাইতেই হইত। আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে শিক্ষিত ভদ্রলোক—অর্থাৎ বাবুমহলে ছাঁদা বাঁধাটা অত্যন্ত ঘৃণার্হ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়, আমাদের সেকালে কিন্তু তা ছিল না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছাঁদা নিমন্ত্রণের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। কেহ ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজনের পর ছাঁদা না লইলে গৃহস্বামী ক্ষুণ্ণ হইতেন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ছাঁদা লইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেন। এই ছাঁদা বাঁধা

সম্বন্ধে আমি প্রাচীনগণের নিকট একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। চন্দননগরের দক্ষিণে তেলিনীপাড়ার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারদিগের খ্যাতি পশ্চিমবঙ্গে অনেকেরই নিকট সুবিজ্ঞাত। স্বর্গীয় রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যূন একশত বৎসর পূর্ব্বে এক জমিদার গোষ্ঠীর অগ্রণী বা কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাটীতে যখন কোন উৎসবাদি উপলক্ষে ভোজের আয়োজন হইত, তখন রামধনবাবু স্বয়ং দেউড়িতে বসিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনা করিতেন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনের পরে যখন জমিদারবাটী হইতে বাহির হইতেন, তখন জমিদারবাবু দেখিতেন যে সকলে ছাঁদা লইয়াছেন কিনা এবং প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, ভোজনে তাঁহাদের পরিতৃপ্তি হইয়াছে কিনা? একবার তিনি এইরূপ একটি ভোজের সময় দেউড়িতে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটি সুবেশ ধনী ভদ্র যুবক ভোজনান্তে রিক্তহস্তে বাহিরে যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রামধনবাবু নিকটে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি আমার বাড়ীতে আসিয়া না খাইয়াই চলিয়া যাইতেছ কেন?"

যুবক সবিনয়ে বলিলেন, "আমি না খাইয়া যাই নাই, বেশ পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়াছি।"

জমিদারবাবু বলিলেন, "খাওয়া হইয়াছে তো ছাঁদা কই? তুমি কি ছাঁদা পাও নাই?"

যুবক বলিলেন, "পেট ভরিয়া খাইয়াছি আবার ছাঁদা কেন?"

জমিদারবাবু বলিলেন, "ও, বুঝিয়াছি তুমি বুঝি কলিকাতায় থাকিয়া ইংরাজী পড়াশুনা কর? তাই ছাঁদা হাতে করিয়া লইয়া যাইতে তোমার লজ্জা হয়, তা বেশ আমি ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি, তোমাকে লজ্জা পাইতে হইবে না।" এই বলিয়া একজন কর্ম্মচারীকে বলিলেন, "এই বাবুটির বাড়ীতে পাঁচজন লোক আছে, একটা হাঁড়িতে করিয়া পাঁচজনের মত ছাঁদা এখানে লইয়া এস।" আদেশমাত্র এক হাঁড়ি লুচি ও সন্দেশ তথায় আনীত হইল। রামধনবাবু নিজের এক পুত্রকে বলিলেন, "ওহে, এই ছাঁদাটা ঐ বাবুর সঙ্গে গিয়ে উঁহার বাড়ীতে দিয়ে এস। উঁহার হাতে করিয়া পথ দিয়া লইয়া যাইতে লজ্জা করে।" জমিদার মহাশয় স্বীয় পুত্রকে ছাঁদা বহন করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন দেখিয়া সেই যুবক অগ্রসর হইয়া স্বয়ং খাবারের হাঁড়ি লইয়া বলিলেন, "আমাকে দিন, আমিই লইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া ছাঁদা লইয়া প্রস্থান করিলেন। যুবক প্রস্থান করিলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "আজকালকার ছেলেরা ইংরাজী শিখিয়া বড়ই স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে। নিজে খাইয়া গেলে কি বাড়ীর লোকের পেট ভরিবে? বাড়ীতে মা আছেন, ছোট বোন ভাই আছে, যাইবার সময় তাহাদের কথাটাও মনে করিতে হয়। বাড়ীর লোককে না খাওয়াইয়া কেবল নিজে খাইয়া কি করিয়া তৃপ্তি হয় কে জানে?"

এই ছাঁদার কথায় বর্ত্তমান কালের একটা ঘটনার কথা মনে পড়িল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একখানা বিলাতী সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, জার্ম্মানীর রাজ্যচ্যুত

সম্রাট যখন জার্ম্মনীর একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন, তখন তিনি কোন ভোজসভাতে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিলে, ভোজনকালে যে মিষ্টান্ন বা ফল ভাল লাগিত তাহার কিয়দংশ রুমালে বাঁধিয়া পকেটে পুরিয়া রাখিতেন। একবার তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সম্রাট বলিয়াছিলেন—"আমার মনে আছে, আমি যখন বালক ছিলাম, তখন আমার পিতা কোন স্থান হইতে আসিয়া যদি পকেট হইতে কিছু খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া আমাদিগকে খাইতে দিতেন, তাহা হইলে আমাদের বড়ই আনন্দ হইত। আমার পিতার নিকট হইতে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য পাইলে আনন্দে নৃত্য করিতাম। বাল্যকালে যে আনন্দ ভোগ করিয়াছিলাম, আমার সন্তানগণকে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিব কেন?" এই ঘটনার পর হইতে জার্ম্মনীতে সম্রাটের অনুকরণে সমাজের উচ্চশ্রেণীর ছাঁদা বাঁধা একটা ফ্যাশান হইয়াছিল।

সেকালে যে ছাঁদা বাঁধা হইত তাহাতে সাধারণতঃ লুচি ও সন্দেশই থাকিত। একটা ছাঁদা অর্থাৎ একজনের ভোজনোপযোগী ছাঁদাতে বারখানা হইতে কুড়িখানা পর্য্যন্ত লুচি ও আটটা হইতে ষোলটা পর্য্যন্ত সন্দেশ থাকিত। সাধারণতঃ ষোলখানা লুচি ও বারটা সন্দেশই থাকিত। নিমন্ত্রণকর্ত্তা ধনবান হইলে কুড়িখানা লুচি ও ষোলটা সন্দেশ এবং দরিদ্র হইলে বারখানা লুচি ও আটটা সন্দেশ প্রত্যেক ছাঁদাতেই দেওয়া হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই ভোজে যাইবার সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ঐ সকল অপোগণ্ড শিশু ও বালক-বালিকা খাইতে যাইত না, ছাঁদা আনিতে যাইত। তাহারা অভিভাবকের নিকট এক-একখানা আসনে বসিয়া থাকিত, তাহাদের সম্মুখস্থ কদলীপত্রে যথানিয়মিত লুচি ও সন্দেশ দেওয়া হইত, কিন্তু সে সকল ভোজ্যদ্রব্য তাহারা স্পর্শ করিত না, তাহাদের অভিভাবক স্বয়ং ভোজন করিতে করিতে আপনার পাত হইতে একখানা লুচি বা একখানা সন্দেশ তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতেন, তাহারা ইহাই খাইত। ভোজন শেষ হইলে বালক বালিকাদের সম্মুখস্থ খাদ্য একখানা গামছায় বা একখানা উড়ানিতে বাঁধা হইত, কখনও বা বালকদের কোঁচায় বা বালিকাদের আঁচলে বাঁধা হইত। অনেকে পানীয় জলের মৃৎপাত্র পূর্ণ করিয়া দধিও লইতেন। অনেককে নিজের পাতে ভুক্তাবিশিষ্ট লুচি সন্দেশও ছাঁদার সঙ্গে বাঁধিয়া লইতে দেখিয়াছি।

কলিকাতায় ও তৎসন্নিহিত স্থানে ভদ্রসমাজ হইতে এই ছাঁদা বাঁধার প্রথাটা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। ঐ প্রথার বিলোপ ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহার আলোচনা পাঠকগণ করিবেন। আমার মনে হয় যে, মূলতঃ দুটি কারণে শহর অঞ্চল হইতে ছাঁদা বাঁধার প্রথা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। প্রথম কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এবং পরিজনবর্গের প্রতি প্রীতির অভাব, দ্বিতীয় কারণ ভোজে বিলাসিতার বাহুল্য। পূর্ব্বে ভোজে যেখানে লোকে লুচি ও সন্দেশ খাইয়া ও খাওয়াইয়া তৃপ্ত হইত, এখন সেখানে পঁচিশ প্রকার মিষ্টান্ন, পঞ্চাশ প্রকার ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে, সুতরাং ভোজের ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সেকালে ধনবান জমিদারগণ ভোজে যেরূপ ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন করিতেন, এখন অতি দরিদ্র ব্যক্তিও সেরূপ আয়োজন করিলে

লজ্জা বোধ করেন। যেখানে নিমন্ত্রণকর্ত্তার অহমিকার ফলে ভোজে জনপ্রতি তিন টাকা, চারি টাকা এমনকি পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয় সেখানে নিমন্ত্রিত লোকদিগের পরিবারবর্গের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা কয়জন ভদ্রলোকের সামর্থ্যে কুলোয়?

সেকালের ভোজে দুই প্রকারের নিমন্ত্রণ হইত, মধ্যাহ্নভোজন ও মধ্যাহ্নজলপান। মধ্যাহ্নভোজন অর্থে অন্নভোজন ও মধ্যাহ্নজলপান অর্থে লুচি ও মিষ্টান্ন ভোজন। ব্রাহ্মণের বাটীতে বিবাহরাত্রির ভোজে এবং শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভোজে অন্নের ব্যবস্থা হইত। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনটা মধ্যাহ্নকালেই হইত, এখনকার মত রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন ভোজন চলিত না। রাত্রিতে খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইত একমাত্র বিবাহে। বিবাহ ব্যতীত অন্য সকল কার্য্যেই মধ্যাহ্নে খাওয়ান হইত। বড় বড় ভোজে যেখানে পাঁচ-সাতশত, এমনকি হাজার লোককে নিমন্ত্রণ করা হইত সেখানেও বেলা তিনটা বা সাড়ে তিনটার মধ্যেই সকলের ভোজনকার্য্য শেষ হইত। বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যেই গৃহস্থকে অতিরিক্ত আলোকের ব্যবস্থা করিতে হইত না। অনাহূত কাঙ্গালীভোজনও অপরাহ্ণেই শেষ হইত। সেকালে স্কুলের ছেলেদের জন্য অপরাহ্ণে এবং আফিসের কর্মচারীদিগের জন্য সন্ধ্যার পর খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইত কিন্তু সেরূপ নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী হইলেও পনের-কুড়ি জনের অধিক হইত না।

সেকালের ভোজে আর একটা প্রথা ছিল পঙ্‌ক্তিভোজন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সকলে সমবেত হইলে সকলকে একসঙ্গে ভোজন করান হইত, ইহারই নাম পঙ্‌ক্তি-ভোজন। সকল বাটীতেই অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান হইত, ব্রাহ্মণদিগের ভোজন শেষ হইলে পরে শূদ্রদিগের ভোজনের ব্যবস্থা হইত, ইহাতে কোন শূদ্র, তা তিনি যত বড় ধনবান ও পদস্থ ব্যক্তিই হউন না কেন কোন আপত্তি করিতেন না। এমনকি অনেক স্থলে যদি ব্রাহ্মণদিগের ভোজন শেষ হইবার পূর্ব্বে শূদ্রদিগের ভোজনের ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে অনেক শূদ্র তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিতেন, "সে কি কথা? আগে দেবতাদিগের সেবা হউক পরে আমরা প্রসাদ পাইব।" এখনকার এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার যুগে অস্পৃশ্যতা বর্জনের আমলে এই ব্যবস্থায় অনেকেই বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই।

আজকাল দেখিতে পাই, ভোজবাটীতে ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে যেমন বিশ-পঁচিশজন লোকের সমাগম হয়, অমনি তাহাদিগকে ভোজন করাইবার জন্যে গৃহান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। যে কক্ষে ভোজন করান হয় সেই কক্ষে বা দালানে হয়ত ষাট-সত্তর জনের জন্য পাতা প্রস্তুত আছে, একদল আসিয়া ভোজনে বসিয়া গেলেন, সেই দলের ভোজন শেষ হইতে না হইতে দ্বিতীয় এক দলের প্রবেশ ও ভোজনে মনোনিবেশ, কিছুক্ষণ পরে হয়ত তৃতীয় এক দলের আগমন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের ভোজন শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রথম দলের ভোজন শেষ ও প্রস্থান। আমরা সেকালে এরূপ ব্যবস্থা (বা সামাজিক হিসেবে অব্যবস্থা) কখনও দেখি নাই। বেলা সাড়ে বারটা বা একটা হইয়াছে, সমস্ত আহার্য্য প্রস্তুত, নিমন্ত্রিত অধিকাংশ লোকই উপস্থিত, কেবল একজন বা দুইজন তখন আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই, সকলেই সেজন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। অনুপস্থিত

ব্যক্তিরা না আসিলে অন্য সকলে আহারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। সকলেই বলাবলি করিতেছেন, "বেলা একটা বাজিয়া গেল, মুখুয্যে মহাশয়ের দেখা নাই কেন?" নিমন্ত্রণকর্ত্তা সেই অনুপস্থিত মুখুয্যে মহাশয়ের বাটীতে (বাটী যদি নিকটে হয়) লোক পাঠাইলেন, তিনি না আসিলে অন্য সকলে বসিতে পারেন না। বেলা প্রায় দুইটার সময় মুখুয্যে মহাশয়ের আবির্ভাব হইল, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "কিহে, তোমার যে আর বার হয় না, আমরা এদিকে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি।" মুখুয্যেমশাই একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "এই দাদা, বাজারে গিয়া একটু দেরি হইয়া গিয়াছে। বাজার থেকে আসিয়া পরে সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া আসিতেছি। বেলা এমন কি বেশী হইয়াছে?"—ইত্যাদি। এরূপ দৃশ্য প্রায় সকল ভোজবাটীতেই দেখা যাইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেকালে ভোজে লুচির ব্যবস্থা হইলে ব্যঞ্জনবাহুল্য বা মিষ্টান্নবাহুল্য হইত না বটে, কিন্তু অন্নভোজনের ব্যবস্থা হইলে ব্যঞ্জনবাহুল্যে কৃপণতা দেখা যাইত না। অন্নের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণবাটীতে হইত, কারণ ব্রাহ্মণবাটীতে সকলেই অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেতর কাহারও বাটীতে কর্ম্মকর্ত্তার স্বজাতীয় লোক ব্যতীত অন্য কেহই অন্ন ভোজন করিতেন না। ব্রাহ্মণের বাটীতে অন্নভোজনের ব্যবস্থা হইলে, নিমন্ত্রণের সময় বলিতে হইত—"অমুকের বাড়ীতে মধ্যাহ্নআহারের নিমন্ত্রণ" আর লুচির ব্যবস্থা হইলে বলিতে হইত—"মধ্যাহ্ন-জলপানের নিমন্ত্রণ" আর শূদ্রকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় বলিতে হইত, "প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ"। শূদ্রের বাটী হইতে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে একজন ব্রাহ্মণের উপর নিমন্ত্রণ করিবার ভার দিতে হইত; শূদ্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলে ব্রাহ্মণের অবমাননা করা হইত। শূদ্রের বাটীতে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় 'ভোজন' 'আহার' 'জলপান' প্রভৃতি উল্লেখ না করিয়া বলিতে হইত,—"অমুকের বাটীতে মধ্যাহ্নকালে পায়ের ধূলি দিবেন।" স্বজাতীয়কে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে 'ভোজন' বা 'আহার' শব্দ ব্যবহার করা হইত।

সেকালে শূদ্র মাত্রেই ব্রাহ্মণের অন্নকে 'প্রসাদ' বলিতেন। একবার একজন ব্রাহ্মণ কোন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য স্বীয় পুত্রকে আদেশ করিলে যুবক পুত্র সেই কায়স্থ ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে বলিল, "বাবা, আপনাকে কাল মধ্যাহ্নে আমাদের বাড়ীতে আহার করিবার কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন।" কায়স্থ ভদ্রলোকটি সেই কথা শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, "বেশ, কিন্তু কি খাওয়াইবে বল দেখি?" যুবক বলিল, "ভাত খাওয়াইব।" সেই কথা শুনিয়া উক্ত ভদ্রলোক বলিলেন "তোমার বাবাকে বলিও, আমি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভাত খাই না।" যুবক শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, তাহা দেখিয়া সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "একথা তুমি বুঝিতে পারিবে না, তোমার বাবাকে বলিলে তিনি বুঝাইয়া দিবেন।" যুবক গিয়া পিতাকে সেই কথা জানাইলে তাহার পিতা বলিলেন, "তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন; ব্রাহ্মণের বাটী হইতে শূদ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে বলিতে হয় প্রসাদ গ্রহণ করিবেন বা প্রসাদ পাইবেন। তুমি আবার গিয়া তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়া এস।" যুবক গিয়া বলিল, "বাবা

বলিয়া দিয়াছেন—কাল আমাদের বাড়ীতে প্রসাদ পাইবেন।" তাহা শুনিয়া কায়স্থ ভদ্রলোক বলিলেন, "এইবার ঠিক হইয়াছে। আমি কায়স্থ, ব্রাহ্মণের বাটীতে আমি প্রসাদ পাইতে পারি, ভাত খাইতে পারি না। ভাত খাইব আমার স্বজাতি কুটুম্বের বাড়ীতে। ব্রাহ্মণের অন্ন শূদ্রের নিকট ভাত নহে—প্রসাদ।"

একালে কলিকাতা অঞ্চলে, কি লুচি আর কি অন্ন, ভোজ মাত্রেই যেমন পেশাদার পাচকব্রাহ্মণের দ্বারা পাক করাইতে হয়, সেকালে তাহা ছিল না। বড় বড় ভোজে লুচি ভাজিবার জন্য অনেক স্থলে পাচকব্রাহ্মণ বা রসুয়ে বামুনঠাকুরকে ডাকা হইত বটে, কিন্তু অন্নভোজে কদাপি বাজারের রসুয়ে বামুনকে ডাকা হইত না। গৃহস্বামীর পরিবারভুক্ত প্রৌঢ়া বা প্রাচীনা মহিলা এবং প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণীগণই পাকের ভার গ্রহণ করিতেন। বাজারে রসুয়ে ব্রাহ্মণের সৃষ্ট অন্ন কোন সামাজিক ভোজে একেবারেই অচল ছিল। সেকালে ব্রাহ্মণের বাটীতে অন্নভোজ প্রায়ই হইত, সেই জন্য বাটীর মহিলারা রন্ধনে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়া উঠিতেন। আমরা বাল্যকাল ও যৌবন দেখিয়াছি, এক এক ব্রাহ্মণবাটীর মহিলারা কোন বিশেষ ব্যঞ্জন রন্ধনে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিতেন। "মুখুয্যেবাড়ীর বড় গিন্নি যেরূপ নিরামিষ রন্ধন করিতে পারেন, সেরূপ আর কোন বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায় না", "চাটুয্যেদের বাসার ঠাকুরাণী যেরূপ সুন্দর পিষ্টক প্রস্তুত করিতে পারেন, সেরূপ আর কেহ পারে না", "বাঁড়ুয্যেদের রামের মা আমিষ রন্ধনে সিদ্ধহস্ত"। এইরূপ কথা সেকালে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যাইত। যাঁহাদের বাটীতে ভোজ অন্ন হইত, তাঁহারা রন্ধননিপুণা ব্রাহ্মণ মহিলাদিগকে অতি শ্রদ্ধা এবং সম্মানসহকারে আপনাদের বাটীতে লইয়া যাইতেন। ভোজনকালে ভোক্তারা কোন রন্ধনের সুখ্যাতি করিলে সেই ব্যঞ্জন রন্ধনকারিনী মহিলার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। ভোক্তারা কোন ব্যঞ্জনের নিন্দা করিলে তাঁহারা উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন এবং ভোক্তা কি বলিতেছেন বারংবার তাহা পরিবেশকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপ গৃহস্থ মহিলাদিগের দ্বারা রন্ধন এখনও মফঃস্বলের কোথাও কোথাও বিদ্যমান আছে, কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে আর নাই বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতা অঞ্চলে বাজারে রসুয়ে ব্রাহ্মণই এখন প্রায় সকল বাটীতেই ভোজে রন্ধনশালার ভার গ্রহণ করিয়াছে। ফলে নগর অঞ্চলে নারীসমাজ হইতে চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা রন্ধন বিলুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে।

একালে দেখিতে পাই, কর্ম্মকর্ত্তা হয়ত কোন ভোজে একশত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, পাছে নিজের খাইতে বিলম্ব হয়, সেইজন্য তিনি তাঁহার গৃহিণী এবং পুত্রকন্যাগণ হয়ত নিমন্ত্রিত লোকজনের আহারের পূর্ব্বেই আপনারা আহার করিয়া কাজ মিটাইয়া রাখিলেন। কেহ হয়ত এরূপ অগ্রে আহার করা অন্যায় মনে করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে একত্র বসিয়াই আহার করিলেন। কিন্তু সেকালে এরূপ ছিল না। নিমন্ত্রিত পুরুষ, নারী এমনকি অনাহূত কাঙ্গালীদিগকে ভোজন না করাইয়া সেকালে কোন গৃহস্বামী এবং তাঁহার পত্নী জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতেন না। আহূত অনাহূত সকলের আহার শেষ হইলে পর গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী আহার করিতেন।

এখনকার ভোজে এরূপ উপবাস করিয়া থাকা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ আজকাল মধ্যাহ্নভোজন প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে, অধিকাংশ ভোজন রাত্রিকালে হয়। সুতরাং প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন এবং রাত্রি এগারটা বারটা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া থাকার প্রয়োজনই হয় না। সেকালে যখন মধ্যাহ্নকালে মধ্যাহ্নভোজন হইত, বাটীর কর্ত্তা ও গৃহিণী অপরাহ্ণ চারিটা পাঁচটা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া থাকিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভোজের জের চলিত না।

ভোজে অন্নের ব্যবস্থা হইলে, আজকাল যেরূপ ব্যঞ্জনের আয়োজন হয় সেইকালে প্রায় সেইরূপই হইত। পাতে অন্ন পরিবেশন করিবার পর প্রথমে সুক্ত, চার প্রকার ভাজা (তন্মধ্যে তিল পিটুলি বেগুন ভাজা বা বেগুনী অপরিহার্য্য) মাছ ভাজা, মোচার ঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, ছেঁচড়া, দুই তিন প্রকার ডালনা, মাছের ঝোল, নিরামিষ অম্বল, মাছের অম্বল, পায়স, দধি এবং মিষ্টান্নই প্রধানতঃ দেওয়া হইত। অন্নের সহিত অনেকে সন্দেশ না করিয়া জিলাপী বোঁদে এবং ছানাবড়া করিতেন। এই সকল মিষ্টান্ন বাটীতেই প্রস্তুত করা হইত। আজকাল অন্নভোজে সাদা ভাতের পরিবর্ত্তে অনেকে পোলাও অথবা 'ঘি-ভাত' করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা বাল্যকালে কোথাও সামাজিক নিমন্ত্রণে পোলাও খাই নাই। ভোজে লুচি হইলে সমস্ত ব্যঞ্জনই নিরামিষ হইত, মাছের নামগন্ধও থাকিত না, অন্নভোজেই মাছ হইত। আজকাল ভোজে মাছ না হইলে সে ভোজই মঞ্জুর হয় না, অধিকাংশ স্থানে মাংসও হয়। কোনো সামাজিক ভোজে এখনও হাঁসের ডিম দেখিতে পাই নাই। তবে আশা আছে, যদি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকি তবে লুচির সহিত হাঁসের ডিম ও কেক বিস্কুট খাইতে পাইব।

আজকাল আর একটা বিষয় দেখিতে পাই—"পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ"। সেকালে দূরস্থিত আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলেই পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিতে হইত। প্রতিবেশী বা স্বগ্রামবাসীকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের প্রথা সেকালে ছিল না। যে সকল সামাজিক উৎসবে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায় করা হইত সেই সকল উৎসবে কেবল অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণকে সংস্কৃত শ্লোকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইত। অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণকে এরূপ পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের প্রথা এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু আজকাল পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের প্রভাব গৃহপার্শ্বস্থিত প্রতিবেশীর বাটীতে পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছে। সেকালে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে গৃহস্বামী স্বয়ং অথবা তাঁহার প্রতিনিধিরূপে, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শূদ্রের বাটীতে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ করিবার একটি আদবকায়দা বা 'এটিকেট' ছিল। নিমন্ত্রণ করিবার সময় করজোড় করিয়া বলিতে হইত, "কার্য্য উপলক্ষে আগামী—আমার বাটীতে মধ্যাহ্নকালে আহার করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন।" নিমন্ত্রণকর্ত্তা শূদ্র হইলে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় বলিতে হইত, "আমার বাটীতে পদধূলিদানে কৃতার্থ করিবেন।" পিতৃশ্রাদ্ধ বা মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে বলিতে হইত, "আমি দায়গ্রস্ত হইয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার বাটীতে শুভাগমনপূর্ব্বক (ব্রাহ্মণপক্ষে 'পদধূলি দানপূর্ব্বক') আমাকে দায়

হইতে উদ্ধার করিবেন।" সেকালে গুরুজনেরা বাটীর বালকদিগকে এইরূপ নিমন্ত্রণ করিবার এটিকেট শিক্ষা দিতেন।

আজকাল বিবাহ, অন্নপ্রাশন এমনকি শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্রে দেখিতে পাই "লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন" অথবা "লৌকিকতার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়" এইরূপ কথা ফুটনোটে লেখা থাকে। আমরা সেকালের বৃদ্ধের দল এইরূপ লেখার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের সমাজে পিতা বা মাতার শ্রাদ্ধ এবং কন্যার বিবাহ 'দায়' নামে পরিচিত। পিতৃদায়, মাতৃদায় বা কন্যাদায় হইতে উদ্ধারলাভের জন্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীর 'দ্বারস্থ' হইবার প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। নিমন্ত্রণ করিবার সময় এই দায়ের উল্লেখ করিয়া দায় হইতে উদ্ধারলাভ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। অথচ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি দায় উদ্ধারের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া অর্থ বা বস্ত্রাদি দ্বারা দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সেই সাহায্য গ্রহণে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। "আমি দায়গ্রস্ত, আমাকে দায় হইতে উদ্ধার কর"—বলিয়া পরে সাহায্য 'গ্রহণে অসমর্থ' বলিলে কথাটা নিতান্ত অসার হয় না কি? পুত্রের বিবাহের পর পাকস্পর্শ উপলক্ষে যদি কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কন্যার মুখদর্শন বা অন্য কিছু বলিয়া কন্যাকে অর্থ অথবা অন্য কোন দ্রব্য উপহার প্রদান করেন, তাহাতে কন্যার শ্বশুর অথবা অপর কাহারো আপত্তি করিবার কোন অধিকার নাই, কারণ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে নবোঢ়া কন্যা যে উপহার প্রাপ্ত হয় সেইটাই তাহার প্রকৃত স্ত্রীধন। এই স্ত্রীধনে স্বামী শ্বশুর এমনকি পুত্রেরও কোন অধিকার থাকে না, একমাত্র কন্যারই তাহাতে সম্পূর্ণ অধিকার। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সেই স্ত্রীধন গ্রহণে কোন পুরুষের আপত্তি করিবার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়নকালে নবোপনীতে ব্রাহ্মণ-কুমারকে "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা করিতে হয়, এবং ঐরূপ ব্রাহ্মণ বালককে ভিক্ষাপ্রদান পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং উপনয়ন উপলক্ষে কেহ যদি ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাতে আপত্তি করিবারও কোন অধিকার নাই। আমার মনে হয়, একমাত্র শিশুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষেই শিশুর অভিভাবক বলিতে পারে "লৌকিকতার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়"। অন্য কোন সামাজিক কার্য্যে এই কথা বলা চলে না।

আমার মনে হয় আমরা যেরূপ আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, জীবনযাপন-প্রণালী, আচার-ব্যবহার সকল বিষয়েই আমাদের বিশিষ্টতা হারাইয়া পাশ্চাত্যভাবে বিলীন হইতেছি, ভোজ ব্যাপারেও সেরূপ ধীরে ধীরে নিজেদের বিশিষ্টতা হারাইয়া পাশ্চাত্য সমাজের অন্ধ অনুকরণে, আমাদের প্রাচীন প্রথা হারাইতে বসিয়াছি। সকল সভ্য সমাজেরই, প্রত্যেক সামাজিক ব্যাপারে এক একটা বিশিষ্টতা থাকে। আমাদের সামাজিক ভোজে যে বিশিষ্টতা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, আজকাল নগরবাসীরা সেই বিশিষ্টতা হারাইতে বসিয়াছেন এবং নগরের অনুকরণে মফঃস্বল হইতেও সেই বিশিষ্টতা লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভোজ ব্যাপারকে আমরা

অকারণে এত ব্যয়বহুল করিয়া তুলিয়াছি যে দরিদ্র ত দূরের কথা মধ্যবিত্তশালী গৃহস্থ ভদ্রলোকেও ইচ্ছা করিলে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে লইয়া উৎসব করিতে পারেন না। যেখানে, পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইত সেইখানে পাঁচশত টাকা ব্যয় করিয়া অহমিকা চরিতার্থ করিতে হয় তাই সহজে আমরা কোন আনন্দ উৎসবে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি না। বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছতার দিনে অকারণ ব্যয়বাহুল্যও যেমন অকর্ত্তব্য, সেইরূপ মধ্যে মধ্যে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সমাগমে ও আদর-আপ্যায়নে ক্ষান্ত থাকিয়া উৎসবের আনন্দভোগে বঞ্চিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না।

সেকালের যাত্রা

বাড়ীর কাছে বারোয়ারীতলায় যাত্রা হইতেছে। গিয়া দেখিলাম ভীষণ ভীড়। আমরা তখন বালক, বয়স তখন ১০/১২ বৎসর। ভীড় ঠেলিয়া কোন রকমে একবারে আসরের নিকট গিয়া বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম—আমাদেরই মত একটি ছেলে রাধিকা সাজিয়াছে, ঘাঘরাপরা, বুকে কাঁচুলি আঁটা, একখানা জরির পাড়ওয়ালা লাল শালুর ওড়না মাথার উপর দিয়া আসিয়া দুইধারে প্রায় পা পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। হাতে অতি মলিন, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ দুই একখানা পিত্তলের গহনা। ছেলেটি বোধহয় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, চোখের কোণ বসিয়া কালি পড়িয়াছে, গাল দুটি ফুলো। ছেলেটি অর্থাৎ শ্রীরাধিকা দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া অতি মিহি সুরে অথচ প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বাঁচে না সখি।" বলিয়া যেন ধুঁকিতে লাগিল। কেহ সাড়া দিল না। প্রায় দুই মিনিট অপেক্ষা করিয়া আবার সেইরূপ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বাঁচে না সখি।" যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্। কোথায় বা সখি, কেই বা সাড়া দেয়! বার বার তিন বার। শ্রীরাধিকা আবার একবার প্রাণপণে চিঁ-চিঁ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বাঁচে না সখি।"

এইবার বোধহয় 'সখি'র দয়া হইল। দেখিলাম যে লম্বাচওড়া একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি, মুখ হইতে তামাকু ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারও পোষাক রাধিকারই মত, ঘাঘরাপরা, শালুর ওড়না, জরির পাড়, তবে প্রভেদ এই যে রাধিকার পোষাক অত্যন্ত মলিন, 'সখি'র পোষাকটা তত মলিন নহে, তাহার গহনাগুলা পিতলের হইলেও এখনও একটু উজ্জ্বল আছে। রাধার কপালে সিঁথি নাই, 'সখি'র কপালে পিত্তলের সিঁথি এবং কানে দুইটা ঝুমকা।

সখি ধীর পদক্ষেপে গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে শ্রীরাধার কাছে গিয়া বজ্রনির্ঘোষে মোটা গলায় বলিল—"এমন প্রেম করেছিলে কেন?" এই বলিয়াই সখী গান ধরিল :

"প্রেম করা কি যারে তারে সাজে,
যারে সাজে, তারে সাজে
অন্যের বুকেতে প্রেম বাজে হে .....।"

গানের সঙ্গে সঙ্গে খোল বাজিতে লাগিল।

সে যাত্রার দলপতি কে তাহার নাম মনে নাই। তবে পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, যিনি 'সখী' সাজিয়াছিলেন—অর্থাৎ বৃন্দা সাজিয়াছিলেন, তিনিই দলপতি বা যাত্রার দলের অধিকারী।

আমার সেই প্রথম যাত্রা দেখা বা শুনা। পিতার সঙ্গে বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, যাত্রা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ হয় নাই।

আমাদের বাল্যাবস্থায় চন্দননগরে অনেকগুলি ভাল ভাল যাত্রার দল ছিল; সে প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। এক সময় চন্দননগর এই যাত্রার জন্য বঙ্গ বিখ্যাত হইয়াছিল। প্রথমে মদন মাষ্টার[৮৬] তাহার পর তাঁহার সাক্‌রেদ মহেশ চক্রবর্ত্তী, রাম বাঁড়ুয্যে, নবীন গুঁই, রামলাল চাটুয্যে প্রভৃতির নামে সেকালের লোকের মুখে লাল পড়িত। কলিকাতা বা মফঃস্বলে যে কোন ধনবানের বাটীতে যদি উল্লিখিত যাত্রাওয়ালাদের কোন একজনের দলের (যাত্রা) না হইত, তাহা হইলে ধনী গৃহস্থ আপনাদের জীবন বিফল বলিয়া (মনে) করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গেও এই সকল দলের প্রতিপত্তি বড় অল্প ছিল না।

পাঁচালীর ন্যায় গোবিন্দ অধিকারীর[৮৭] কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রার পালা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্ব সম্পদ। দাশু রায়ের পাঁচালী পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়াতে এখনও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু গোবিন্দ অধিকারীর রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত না হওয়াতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখন অতি প্রাচীনগণের মুখে—অর্থাৎ আমা অপেক্ষাও বয়োবৃদ্ধগণের মুখে গোবিন্দ অধিকারীর দুই একটা গান শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল বৃদ্ধের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই গোবিন্দ অধিকারীর গানগুলিও বিলুপ্ত হইবে।

গোবিন্দ অধিকারীকে আমরা দেখি নাই, বোধহয় আমার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান ও প্রিয় সাক্‌রেদ ব্রজমোহন দাস অনেক দিন ধরিয়া গোবিন্দ অধিকারীর দল রাখিয়াছিলেন। ব্রজমোহন আমাদের চন্দননগরের অধিবাসী ছিলেন। আমরা তাঁহাকে বাল্যকালে দেখিয়াছি, তাঁহার দুই পুত্র বটুলাল এবং গোষ্ঠবিহারী এখনও জীবিত আছেন। বটুবাবুর বয়স বোধহয় ৭৪/৭৫ বৎসর হইবে। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর লিলুয়া কারখানার একাউণ্টাণ্ট ছিলেন, প্রায় ১৪/১৫ বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি যখন 'হিতবাদী'র সহকারী সম্পাদক ছিলাম, তখন একবার গোবিন্দ অধিকারীর 'পালা'গুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আমি ঐ পালাগুলি বটুবাবুর কাছে থাকিতে পারে, এই আশা করিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, পালাগুলি তাঁহার কাছে নাই। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ঐ যাত্রার দলের এক ব্যক্তি কিছুদিন দল চালাইয়া ছিলেন, এবং সময় সময় তিনি বটুবাবুর জননীকে মাঝে মাঝে কিছু টাকাও দিতেন। বটুবাবুর তখন বোধহয় ছাত্রাবস্থা, তিনি যাত্রার দলের কোন সংবাদ রাখিতেন না। কিছুদিন পরে বটুবাবু সংবাদ পাইলেন যে, যিনি তাঁহার পিতার দল চালাইতে-

ছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গোবিন্দ অধিকারীর লিখিত পালাগুলির আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

গোপাল উড়ের[৮৮] যাত্রা প্রাক্-মদন মাষ্টার যুগের হইলেও এখনও উহা বিদ্যমান আছে। গোপাল উড়ের গান বা টপ্পাও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে,[৮৯] সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গোবিন্দ অধিকারীর সমস্ত পালাই যেরূপ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক, গোপাল উড়ের সমস্ত পালাই সেরূপ মহাকবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক কাব্য অবলম্বনে রচিত। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের পালা আরম্ভের পূর্ব্বে ভিস্তিওয়ালা, মেথর, মেথরাণী প্রভৃতির সং দেওয়া হইত, বোধহয় এখনও হয়। শুনিয়াছি গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায়ও প্রথম ঐরূপ সং দেওয়া হইত। যতক্ষণ সং-এর পালা চলিত ততক্ষণ গোবিন্দ অধিকারী আসরে আসিতেন না, কৃষ্ণ-রাধিকা, গোপবালক ও গোপিকা প্রভৃতি একে একে আসরে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া বসিত। তাহার পর গোবিন্দ অধিকারীর উপবেশনের জন্য বড় মোটা গালিচার আসন, আসরের ঠিক মধ্যভাগে পাতা হইত। তাহার পর অধিকারী মহাশয়ের রূপা-বাঁধান হুঁকা ও হুঁকার বৈঠক আসিত, এইরূপে সমস্ত আয়োজন শেষ হইতে সং-এর পালা শেষ হইত, অধিকারী মহাশয় স্বয়ং বৃন্দাদূতী বেশে আসরে দেখা দিতেন। তিনি আসরে অবতীর্ণ হইলেই যাত্রার পালা আরম্ভ হইত না। অধিকারী মহাশয় প্রায় আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবের আরাধনা ও ধ্যান করিতেন। তাহার পর 'গাওনা' আরম্ভ হইত।

আমি প্রথমে যে কৃষ্ণযাত্রার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা গোবিন্দ অধিকারী বা ব্রজমোহনের যাত্রা নহে। গোবিন্দ অধিকারীর পালার অনুকরণে সেকালে আর পাঁচ সাত জন কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই অভিনীত হইত। আশি টাকাতে ঐ সকল যাত্রার দল পাওয়া যাইত। গোবিন্দ অধিকারী বা গোপাল উড়ের সময়, যাত্রাতে 'প্যালা' বা পুরস্কার দিবার প্রথা ছিল। দর্শকগণ অভিনয় দর্শনে বা গান শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলে টাকাটা, সিকিটা, রুমালে বাঁধিয়া আসরে নিক্ষেপ করিতেন। যাত্রার দলের কোন লোক তাহা খুলিয়া লইয়া শূন্য রুমাল দাতাকে ফিরাইয়া দিত। অনেক সময় যাত্রার দলের একজন লোক একখানা থালা লইয়া দর্শকদের কাছে মধ্যে মধ্যে ঘুরিয়া আসিত। দর্শকগণ সাধ্যানুসারে সেই থালাতে দু আনা, চারি আনা, 'প্যালা' দিতেন। শুনিয়াছি, গোবিন্দ অদিকারী কোন কোন আসরে শতাধিক টাকা 'প্যালা' পাইতেন, ধনবানদের নিকট হইতে সালের জোড়া বখশিস পাইতেন এবং ধনী গৃহিণীদিগের নিকট হইতে অলঙ্কারও পাইতেন। এইরূপ 'প্যালা'র প্রথা এখনও চণ্ডীর গানে, রামায়ণ গানে এবং কথকতাতেও বিদ্যমান আছে।

আদি যুগে এই যাত্রার পূর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন মদন মাষ্টার। মদনবাবু ব্রাহ্মণের সন্তান, সুশিক্ষিত ছিলেন। প্রথমে তিনি কোন স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন বলিয়া তিনি মদন মাষ্টার নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যাত্রাতে কথোপকথন অতিঅল্পই থাকিত, গানই বেশী থাকিত। মদন মাষ্টার গানের অংশ কমাইয়া

কথোপকথনের অংশ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, যাত্রায় দলে 'জুড়ি' ও 'ছোকরার' গান তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার যাত্রাতে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি পুরুষদিগের গান ধ্রুপদ অঙ্গের হইত; সঙ্গীতজ্ঞ 'জুড়িরা' সেই গান করিত। রমণী বা বালক বালিকাদের গান খেয়াল বা টপ্পা অঙ্গের হইত, ছোকরারা সেই গান গাহিত। জুড়িদের পোষাক ছিল সাদা চোগা-চাপকান, প্যাণ্টুলান ও মাথায় জরির টুপি। ছোকরাদের পোষাক—মখমলের বা সার্টিনের জরির কাজ করা বেশ ঝকমকে পোষাক। কথিত আছে একবার এক ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট মফঃস্বল পরিদর্শনকালে একটা গ্রামে গিয়াছিলেন। সেই সময় তথায় বারোয়ারীতলায় যাত্রা হইতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটকে অভ্যর্থনা করিয়া বারোয়ারীতলায় লইয়া যাওয়া হইল এবং বসিবার জন্য একখানা চেয়ার দেওয়া হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট যাত্রা দেখিতেছেন, এমন সময় জুড়িরা উঠিয়া গান আরম্ভ করিল। এক একটা দলে চারিজন করিয়া জুড়ি থাকিত, তাহারা মুখে গান গাহিত এবং হাতে তালি দিয়া তাল দিত। এক একজন জুড়ি এরূপ মুখভঙ্গী সহকারে গান করিত যে, দেখিলে ভয় হইত। ম্যাজিষ্ট্রেট যাত্রা শুনিতেছেন, জুড়িরা পরম উৎসাহে প্রাণপণ চীৎকারে হাততালি দিয়া গান আরম্ভ করিল। জুড়িদের সাদা প্যাণ্টুলান ও চোগা-চোপকান দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে মোক্তার বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পাঁচ সাত মিনিট গান শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট একজনকে ডাকিয়া বলিলেন, "মোক্তার লোককে বৈঠনে বোলো।"

মদন মাষ্টারের যাত্রা পূর্ব্বে যে সকল যাত্রা ছিল, তাহাতে কথোপকথন অপেক্ষা গান অধিক ছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে কথোপকথনে কেমন একটা অস্বাভাবিক টান ও সুর ছিল। দুই চারিটি কথা বলিয়াই অভিনেতা—তা সে নায়কই হউক বা নায়িকাই হউক—বলিত, "তবে প্রকাশ করিয়া বলি শ্রবণ কর।" এই বলিয়াই গান আরম্ভ করিত। অথবা বলিত, "প্রকাশ করে বল শ্রবণ করি"—এই কথা বলিয়াই হয়ত নিজেই সে গান আরম্ভ করিত। এই 'প্রকাশ করিয়া বলা'র প্রথা গোপাল উড়ের যাত্রায় কথায় কথায় ছিল। মালিনীর ফুলের মালা বা ফুল আনিতে বিলম্ব হইয়াছে, বিদ্যা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে, এমন সময় মালিনী ফুল হইয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া বিদ্যা অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল, অনেক গালি দিল। তাহা শুনিয়া মালিনী বিদ্যাকে বলিল, "সে কেমন, প্রকাশ করে বল শ্রবণ করি,"—এই বলিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া নিজেই বিদ্যার গান আরম্ভ করিয়া দিল—

"ওলো কাজ কি লো তোর ফুলে—
মালিনী ও ধনী, দিবি বঁধুর গলে রাখ্‌গে তুলে।"

গানের সঙ্গে সঙ্গে মালিনী নাচও আরম্ভ করিল। মদনবাবু যাত্রার অভিনয়কালে এই 'প্রকাশ করিয়া বলা'র পালা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কি সেকালে আর কি একালে, যাত্রা আরম্ভ হইবার অনতিপূর্ব্বে বাদকগণ স্ব স্ব বাদ্যযন্ত্র, তানপুরা, বেহালা, ডুগী, তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি এবং সুর মিলাইবার জন্য যন্ত্র বাঁধিতে আরম্ভ করিত। এইরূপ আসরে বসিয়া সুর মিলান এখনও হয়। কিন্তু

শুনিয়াছি যে, মদন মাষ্টার তাঁহার দলে এই ব্যবস্থা রহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে নেপথ্যে অর্থাৎ সাজঘরে বাদকগণ বাদ্যযন্ত্র মিলাইয়া আসরে লইয়া যাইত, আসরে বসিয়া যন্ত্রের সুর বাঁধিত না। তাহাতে আর কিছু হউক বা না হউক, সমবেত শ্রোতৃবর্গের বিশেষতঃ বালকগণের, ধৈর্য্যহানি ঘটিবার সুযোগ হইত না।

মদন মাষ্টারের আর একটা সংস্কারের কথাও উল্লেখযোগ্য। যাত্রা আরম্ভ হইলে তিনি একটি পেন্সিল ও কাগজ লইয়া আসরের একপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। যখন কোন অভিনেতা অভিনয় করিত, তখন তিনি সেই অভিনেতার কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শুনিতেন এবং কেহ কোন শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে তাহা লিখিয়া রাখিতেন, পরে সেই অভিনেতাদের ডাকিয়া উচ্চারণ শুদ্ধ করিয়া দিতেন। এরূপ করাতে তাঁহার সময়ে, তাঁহার দলে সকল অভিনেতাই শুদ্ধ উচ্চারণ করিত।

যাত্রার দলের অভিনেতাদের মধ্যে, সেকালে অধিকাংশ হাড়ী, দুলে, বাগদী, ডোম, চাঁড়াল প্রভৃতি নিম্নজাতীয় লোক হইত। দলের অধিকারী স্বয়ং এবং দুই চারিজন অভিনেতা হয়ত ব্রাহ্মণ, বা কায়স্থ বা নবশাখ হইতেন, কিন্তু মোটের উপর উচ্চবর্ণের 'যাত্রাওয়ালা' সেকালে বড় অধিক দেখা যাইত না। তাহার কারণ যাত্রার দলের অভিনেতা অপেক্ষা গায়কের সংখ্যা অধিক হইত। গায়কদের মধ্যে সকলেই যে সুকণ্ঠ হইত তাহা নহে। কাহারও বা সুরবোধ ছিল, কাহারও বা তালবোধ ছিল, কাহারও বা রাগরাগিণী বোধ ছিল এবং কেহ বা সুকণ্ঠ ছিল। এক একটা দলে চারজন বা ছয়জন 'জুড়ি' থাকিত, কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ বা যাটজন পর্যন্ত 'ছোকরা' থাকিত, ইহারা অভিনয় করিত না, কেবল গান গাহিত। ছোকরাদের বয়স ১২/১৪ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭/১৮ বৎসর পর্য্যন্ত হইত। এতে অল্পবয়স্ক 'ছোকরা' ভদ্র শ্রেণী হইতে পাওয়া যাইত না, সেইজন্য ইতরশ্রেণী হইতে ছোকরা এবং সুকণ্ঠ অভিনেতা সংগ্রহ করিতে হইত। কোন যাত্রার দল মফঃস্বলে গাওনা করিতে গিয়া দেখিল, একটি রাখাল বালক মাঠে গরু চরাইতে চরাইতে গলা ছাড়িয়া দিয়া গান গাহিতেছে। তাহার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া দলের অধিকারী তাহাকে দলভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার অভিভাবককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দুই বেলা খোরাকী ও মাসিক পাঁচ টাকা বা সাত টাকা বেতনে অভিভাবককে সম্মত করাইয়া সেই রাখাল বালককে যাত্রা দলের 'ছোকরা' করিয়া লইয়া হইল। রাখাল বালক কৌপীনের পরিবর্ত্তে জরির কাজ করা পায়জামা, কোট টুপি পরিয়া আসর আলো করিয়া দাঁড়াইল। এই প্রমোশন হয়ত তাহার স্বপ্নের অতীত।

এই কারণে যাত্রার দলে, অল্পবয়স্ক অভিনেতাদের মধ্যে সুশ্রী, গৌরবর্ণ, লাবণ্যশালী লোক বড় দেখিতে পাওয়া যাইত না। একটি ছোকরার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট বলিয়া তাহাকে 'সখীর' ভূমিকায় নেওয়া হইল, কারণ সখীকে অনেক গান গাইতে হয়। কিন্তু সখীর চেহারা দেখিয়া দর্শকগণের চক্ষু স্থির। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায়, গালের হাড় বাহির করা সখীকে দেখিলে মনে ঘৃণার উদয় হইত সত্য কিন্তু তাহার নৃত্য ও সঙ্গীত দর্শক ও শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিত। ছোকরাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে

অভিনেতার শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হইত তাহাদের উচ্চারণ যে বিশুদ্ধ হইত না ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পল্লীগ্রামের বর্ণজ্ঞানহীন নীচজাতীয় রাখাল বালককে যদি নায়িকা রাজকুমার বা সখীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হয় তাহা হইলে তাহাকে কেতাদুরস্ত করিবার জন্য যে বিশেষ বেগ পাইতে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। মদন মাষ্টার প্রথমে শিক্ষকতা করিতেন পরে তিনি যাত্রার দল করিলেও শেষে শিক্ষকতার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। ছোকরাদিগকে দুরস্ত করিবার জন্য তাঁহাকে রীতিমত মাষ্টারি করিতে হইত।

তাঁহার এই পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নাই। মদন মাষ্টারের দল বাঙ্গালায় যাত্রাভিনয়ে একটি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তাঁহার প্রভাব সেকালের সকল যাত্রার দলেই পরিদৃষ্ট হইত। কেবল গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা ও গোপাল উড়ের যাত্রা মদন মাষ্টারের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় নাই। ঐ দুই দলে সাবেক চাল অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

মদন মাষ্টারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ অনেক দিন ধরিয়া শ্বশুরের দল চালাইয়া ছিলেন। তিনি ভদ্র কুলবধূ, অন্তঃপুরবাসিনী হইলেও কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে শ্বশুরের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি তিনি অসামান্য বুদ্ধিমতী ছিলেন। মাষ্টারের দলে কালী এবং কৃষ্ণ নামক দুই যমজ ভ্রাতা অভিনয় করিতেন। পরে তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ দলের পরিচালক হইয়াছিলেন। কালী ও কৃষ্ণ উভয়েই স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। সাধারণতঃ তাঁহারা কৈকেয়ী ও কৌশল্যা অথবা কুন্তী ও মাদ্রী সাজিতেন। তাঁহারা যমজ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ছিল, কিন্তু সেজন্য তাঁহারা দুইজনে দুই সপত্নীর ভূমিকা কেন গ্রহণ করিতেন তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। সপত্নীযুগলের মধ্যে যে আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য থাকা আবশ্যক, তাহা মনে হয় না। মদন মাষ্টারের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পুত্রবধূ যাত্রার দল চালাইতেন, তখন লোকে ঐ দলকে 'বেমাষ্টারের দল' বলিত।

মদন মাষ্টারের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নবীনচন্দ্র গুঁই প্রভৃতি কয়েকজন লোক 'মাষ্টারের দল' ছাড়িয়া আপনারা এক একটি পৃথক পৃথক যাত্রার দল করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইজনের দলই সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মহেশ চক্রবর্ত্তী মদন মাষ্টারের দলে ঢোলক বাজাইতেন এবং রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'জুড়ি' সাজিতেন। যখন ইহাদের দলের খ্যাতি পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন কলিকাতায় মতিলাল রায়, লোকনাথ রজক প্রভৃতিও যাত্রাদলের অধিকারী হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শেষে মতিলাল রায়ই শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। মতিলাল রায় সুকবি ও সুলেখক ছিলেন। তিনি স্বরচিত নাটক অভিনয় করিতেন। তাঁহার রচিত—

"মাতঃ শৈলসুতে স্বপত্নী—
শিবে শিব সীমন্তিনী।"

প্রভৃতি গান এখনও বহু কণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। মতিলাল রায়ের দলকে চন্দননগরে

অতি অল্পবারই 'গাওনা' করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কারণ কলকাতা হইতে ঐ দলকে লইয়া যাইতে হইলে অনেক টাকা খরচ হইত। মহেশ চক্রবর্ত্তী বা রাম বাঁড়ুয্যের দল স্থানীয় বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ঐ সকল দল পাওয়া যাইত। আমি মতিলাল রায়ের যাত্রা কখনও দেখি নাই। লোকনাথ রজক বা 'লোকা ধোপা'র দলের অভিনয় একবার দেখিয়াছিলাম। সেকালে নবীন ডাক্তারের দল, সাঁতরার দল, দাশরথী রায়ের দল প্রভৃতি আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট যাত্রার দল ছিল। দাশরথী রায় চন্দননগরের অধিবাসী না হইলেও তাঁহার 'আখড়া' বা কার্য্যালয় চন্দননগরে ছিল।

এই প্রসঙ্গে সেকালের আর একজন যাত্রাওয়ালার নাম না করিলে এই প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে। তাঁহার নাম স্বর্গীয় হরিমোহন রায়। তিনি ভারতবরেণ্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র এবং রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র। গঙ্গার ষ্টীমার লাইন খুলিয়া আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে নিজ বাটীতে বাজার বসাইয়া এবং যাত্রার দল করিয়া তিনি বহু সহস্র টাকা নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি হোর মিলার কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া কলিকাতা হইতে কালনা পর্য্যন্ত ষ্টীমার চালাইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি হোর মিলার কোম্পানী অপেক্ষা ভাড়া কমাইয়া দিলেন, তাহা দেখিয়া হোর মিলার কোম্পানী আরও ভাড়া কমাইয়া দিলেন। হরিমোহন রায় তাহা অপেক্ষাও ভাড়া কমাইলেন, এইরূপে প্রতিযোগিতার অবশেষে বিনা ভাড়ায় স্টীমার যাত্রী বহন করিতে লাগিল। অবশেষ হরিমোহন রায় প্রচার করিলেন, তাঁহার স্টীমারের যাত্রীদের ভাড়া ত দিতেই হইবে না, অধিকন্তু প্রত্যেক যাত্রীকে এক পোয়া করিয়া মিষ্টান্ন জলযোগের জন্য দেওয়া হইবে। এই প্রতিযোগিতায় উভয় পক্ষেরই বিস্তর ক্ষতি হইল। হরিমোহন রায় সেই ক্ষতি সহ্য করিতে পারিলেন না, ষ্টীমার বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বাজারেরও অনুরূপ অবস্থা হইল। সুতরাং তাঁহার যাত্রার দলের পরিণাম যাহা হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেকালে গোবিন্দ অধিকারী ও গোপাল উড়ের দলে প্রথমে মেথর মেথরাণী ভিস্তিওয়ালা প্রভৃতির সং দিয়া পরে যাত্রার পালা আরম্ভ হইত। মদন মাষ্টারের যাত্রাতে বোধহয় ঐরূপ কোন সং দেওয়া হইত না। যাহারা নাটকে কোন ভূমিকা গ্রহণ করিত, তাহাদের মধ্যে বিধূষক প্রভৃতি অভিনয়কালেই হাস্যরসের অবতারণা করিত। পরবর্ত্তীকালে যাত্রার অভিনয়ের শেষে একটি করিয়া 'ফার্স' বা হাস্যরস-প্রধান সং দেওয়া হইত। সেকালের অনেক যাত্রাতেই মাতালের সং দেওয়া হইত। আমাদের প্রতিবেশী স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের বাটীতে একবার হরিমোহন রায়ের যাত্রা হইয়াছিল, সে অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। কিসের পালা হইয়াছিল, মনে নাই। অভিনয়ের শেষে মাতালের সং দেওয়া হইয়াছিল। এক স্থূল কলেবর লোক মাতাল সাজিয়া একহাতে একটি গ্লাস ও বগলে একটা বোতল লইয়া টলিতে টলিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। অন্য একজন লোক সেই মাতালের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। এমন সময় মাতালটা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল—"বাবা বেয়াই, তুই শালা ত আমার পেটের ছেলে, আয় দেখি দুই জনে

খুড়ো-ভগিনীপোতে মিলে একবার মায়ের নাম করি।" এই বলিয়াই টলিতে টলিতে গান ধরিল—

"শ্যামা মা, কে পারে শ্যামাকে চিন্তে
অনায়াসে বামা বেঁধে ফেলে ধামা
কেবল পারে না তবলা ছাইতে।"

মাতালের নৃত্যদর্শনে ও গান শ্রবণে আসরসুদ্ধ লোক হাসিয়া অস্থির হইত। সেকালে আর একটা যাত্রার দলে মাতালের গান ছিল—

"ঘুম ভেঙে বড় মজা হয়েছে
একটা এঁড়ে গরু পিঁজরে ভেঙে
খেজুর গাছে উঠেছে।
মাসীর মার কুটুম এসেছে
ঠিক যে ভাই গেরণ (গ্রহণ) লেগেছে,
আবার গিন্নি গেছে বনভোজনে
হাটে মাথা হারিয়েছে।"

এইরূপ প্রায় সকল যাত্রাতে অভিনয়ান্তে 'বৈষ্ণব বৈষ্ণবী', 'লম্পটের দণ্ড' প্রভৃতি ফার্স দেওয়া হইত। মনে আছে আমাদের পাড়ার বারোয়ারীতে একবার একটা যাত্রার ফার্সে দেখিয়াছিলাম—এক পিতৃহীন বালক তাহার জননীর নিকট পিতার সন্ধান জানিবার জন্য আব্দার করিতেছে। তাহার জননী তাহাকে শান্ত করিতে না পারিয়া গান ধরিল—

"হাবা ছেলে বাবা বলে কাঁদিস নারে আর,
আমি থাকতে ভাবনা কিরে বাপেরই অভাব তোমার।
আমার বিয়ের আগে তুমি, জন্মেছ বাপ যাদুমণি
এমনই সতীলক্ষ্মী আমি, আমার পুণ্যে এ সংসার।"

এই গানের পরই যাত্রা ভাঙিয়া গেল।

সেকালের যাত্রাতে স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিবার জন্য পরচুলা ব্যবহৃত হইত না। যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিত, তাহারা বড় করিয়া চুল রাখিত ও গোঁফ দাড়ি কামাইত। সেজন্য আমরা—অর্থাৎ সেকালের বৃদ্ধেরা একালের কবি প্যাটার্ণের দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশশালী ক্ষৌরিত গুম্ফশ্মশ্রু তরুণের দলকে দেখিয়া সহজেই যাত্রার দলের লোক বলিয়া ভ্রম করিয়া বসি।

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে এদেশে সেমিজ বা সায়ার প্রচলন ছিল না। তখন যে সকল পুরুষ স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিত তাহারা শাড়ী ও কাঁচুলির সাহায্যে স্ত্রীলোক সাজিত। যাত্রার দলকে সর্ব্বদাই নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, আসরে স্নানাহার করিতে হইত, সেজন্য যাত্রার দলের লোকদের অধিকাংশই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শীর্ণকায় ছিল। তাহারা শাড়ী পরিয়া পিত্তলের গহনা দ্বারা সজ্জিত হইয়া যখন রাণী বা দেবীর ভূমিকা গ্রহণ করিত তখন তাহাদিগকে দেখিতে কিরূপ হইত, তাহা পাঠকগণকে কল্পনানেত্রে দর্শন করিতে অনুরোধ করি। সেকালে পাউডার, লিপষ্টিক প্রভৃতি ছিল না।

একালে যেমন যাত্রা বা থিয়েটারে 'ড্রেসার' মুখে ঠোঁটে রং মাখাইয়া এবং সেমিজ সায়া প্রভৃতি পরাইয়া, কৃষ্ণকায় শীর্ণ ব্যক্তিগণকেও একরূপ চলনসই স্ত্রীলোক সাজাইয়া দেয়, সেকালে তাহা ছিল না। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই নায়িকাদিগের বিকট মূর্ত্তি দেখিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যাইত না। মহেশ চক্রবর্তীর দলে মনোমোহন বসু [১৮৩১-১৯১২] প্রণীত 'সতী নাটক'[১০], 'হরিশ্চন্দ্র'[১১] প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হইত। সতী নাটকের অভিনয়ে যে সতী সাজিত তাহারই মাথায় প্রথম পরচুলা দেখি।

মহেশ চক্রবর্তীর দলে বৈষ্ণবচরণ নামক এক ব্যক্তি স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইত। সে জাতিতে বাগদী ছিল, কিন্তু তাহার মত সুকণ্ঠ গায়ক ও সুদক্ষ অভিনেতা অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাহার অভিনয় অত্যন্ত স্বাভাবিক হইত। সে 'সতী নাটকে' সতীর জননী এবং 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে হরিশ্চন্দ্রের মহিষী শৈব্যা সাজিত, তাহার চেহারাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। শিবনিন্দা শ্রবণে মূর্চ্ছিতা সতীকে দেখিয়া প্রসূতি যখন সরোদনে গান ধরিত—

"ধর ধরগো তোমরা ধরে তোল কি হ'ল হায় সতীর কি হ'ল
পতিনিন্দা শুনে বুঝি সতী আমার প্রাণে ম'ল।"

অথবা শৈব্যার ভূমিকায় যখন সে মৃত রোহিতাশ্বকে কোলে করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইয়া গান গাহিত—

"কোথা রাজা হরিশ্চন্দ্র দেখ নয়নে
প্রাণের রোহিত তোমার পড়ে শ্মশানে।"

তখন দর্শক বা শ্রোতাদিগের মধ্যে বোধহয় এমন একজনও লোক থাকিত না যাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইত না।

আমি যাত্রার দলের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই। সুতরাং কোন্ দলের পর কোন্ দলের আবির্ভাব হইয়াছিল, অথবা কোন্ দলে কাহার রচিত গান গাওয়া হইত, যাত্রার পালা কাহার দ্বারা রচিত হইত, সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিব না। আমার বাল্যকালে ও যৌবনে যেরূপ অভিনয় ও সাজসজ্জা যাত্রা দলে দেখিয়াছি, তাঁহারই উল্লেখ করিব। একালের থিয়েটার-বায়োস্কোপ-টকিপ্রিয় তরুণ তরুণীর দল আমার এই বর্ণনা পাঠ করিয়া সেকালের যাত্রা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিবেন, এই আশাতে সেকালের যাত্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা যদি এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া না যাই, তাহা হইলে বোধহয় আর পঁচিশ বৎসর পরে, তরুণ বাঙালী কল্পনা করিতেই পারিবেন না যে তাঁহাদের পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি কিরূপ অভিনয় দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। শুধু আনন্দ লাভ নহে, যাত্রার প্রতি তাহাদের এত আসক্তি ছিল যে, মফঃস্বলে কোথাও যাত্রা হইতেছে শুনিলে লোক মাঠের পর মাঠ ভাঙিয়া যাত্রার স্থলে সমবেত হইতেন।

নবীন গুঁইয়ের দলে প্রধানতঃ রাম বনবাসের পালা হইত। হয়ত অন্য পালাও হইত, কিন্তু আমি অন্য কোন পালা দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না। নবীন গুঁই মদন মাষ্টারের সাক্‌রেদ হইলেও মহেশ চক্রবর্তী বা রাম বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি তাঁহাদের ওস্তাদের

পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে যেরূপ চেষ্টা করিতেন, বোধহয় নবীন গুঁই সেরূপ চেষ্টা করেন নাই। সেইজন্য তাঁহার যাত্রা এক নূতন ধরণের হইয়াছিল। রাম বনবাস অভিনয় হইতেছে, রাম গিয়া কৌশল্যার নিকটে বনগমনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, শুনিয়াই কৌশল্যা উচ্চঃস্বরে গান ধরিলেন—

"ওরে রামশশী, হবি বনবাসী,
কে আমারে ডাকবে মা ব'লে।
ক্ষীর সর ননী ল'য়ে
আমি দিব কার বদনকমলে,
ডাকবে মা ব'লে।"

এ পর্য্যন্ত অভিনয়ে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই, কিন্তু ইহার পরের বিবরণ পাঠ করিলে পাঠকগণ বোধহয় বিশ্বাস করিবেন না যে, সেকালে, অন্ততঃ এককালে এরূপ অভিনয় হইত। কৌশল্যা যখন দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ গান করিতেছিলেন, তখন পুত্রশোকে বিগতপ্রাণ রাজা দশরথ সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বেহালা লইয়া কৌশল্যার গানের সঙ্গে সুর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেকালে অধিকাংশ যাত্রাতে যখন নায়ক বা নায়িকা একাকী গান গাহিত, তখন বেহালাবাদক তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইত। নবীন গুঁইয়ের দলে বেহালাবাদক দশরথ সাজিয়াছিল, সুতরাং তাহার মৃত থাকা চলে না, তাহাকে উঠিয়া বেহালা বাজাইতেই হইল। রাজা বেহালা বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলে সুমিত্রা এবং ঊর্ম্মিলা দুইজনে উঠিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণ তালে তালে মন্দিরা বাজাইতেছেন। এই অবকাশে রাম বসিয়া একটা ছোট হুঁকাতে ধূমপান করিয়া লইলেন, সীতা দেবী রামের হুঁকা হইতে কলিকা তুলিয়া রামের আড়ালে একটু কাত হইয়া (পাছে গুঁই মহাশয় দেখিতে পান) শোঁ শোঁ করিয়া কলিকায় দুই-চারিটা টান দিয়া কলিকাটা অন্য লোকের হাতে দিলেন এবং হাতে তালি দিয়া "বা বেটি বা" বলিয়া বারংবার নৃত্যকারিণী সুমিত্রা ও ঊর্ম্মিলা দেবীকে উৎসাহ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঠক-পাঠিকাগণ হাসিবেন না, এইরূপ অভিনয় আমি অনেকবার দেখিয়াছি।

রাম বনবাসের পালা রামের বনগমনেই শেষ হইত না, রাবণ বধ পর্য্যন্ত লইয়া অবশেষে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে রাম-সীতাকে বসাইয়া তবে পালা শেষ হইত। রামের বনগমনের পর সূর্পনখার নাসা ছেদন। একজন সূর্পনখা সাজিয়া রাম ও লক্ষ্মণের কাছে প্রেম ভিক্ষা করিতে আসিত। তাহাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া আবার যখন আসিত তখন নাসিকাহীন একটি মুখোস পরিয়া অবগুণ্ঠন দিয়া আসিত। তাহাকে দেখিবামাত্র লক্ষ্মণ ধনুকের রজ্জু দ্বারা (কেননা লক্ষ্মণের ধনু ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র থাকিত না) সূর্পনখার নাক কাটিয়া ছাড়িয়া দিত। সূর্পনখা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আনুনাসিক স্বরে একটি গান গাহিয়া আসরে নৃত্য করিত। সে গানটা আমার মনে নাই। তাহার পর রাবণ আসিত, মন্দোদরী আসিত। সূর্পনখাকে দেখিয়া মন্দোদরী গান ধরিত:

"ছি, ছি, ছি, কালামুখী হয়েছি অবাক,
কোন বনেতে গিয়েছিলি কে কেটে নিয়েছে নাক্।"

এই গানের সঙ্গে সঙ্গে মন্দোদরী ও সূর্পনখা উভয়েই নৃত্য করিত। নাচের গানগুলো সাধারণতঃ খেমটা তালে হইত।

তাহার পর মায়ামৃগের পালা। একটি সোনালি পাতে মোড়া পুরু কাগজের হরিণাকৃতি খোলের ভিতর একটি ছেলে ঢুকিয়া নাচিতে নাচিতে আসরে আসিত। সেই হরিণের গলদেশে দুটি ছিদ্র থাকিত, যে হরিণ সাজিত সে সেই গর্ত্তের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইত। হরিণ যখন আসরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিত, তখন গান গাইত :

"ওমা মৃগ তুই কেন এলি বনে,
এই বনে তোর মৃত্যু হবে শ্রীরামের বাণে।"

এইবার হনুমানের পালা। রামযাত্রায় হনুমান না থাকিলে চলিত না। সেকালের হনুমানেরা একালের হনুমানদের মত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লম্বা চওড়া বক্তৃতা করিতে পারিত না। তাহারা আসরে প্রবেশ করিয়াই হনুমানের মত 'হুপ্' 'হুপ্' শব্দ করিয়া লম্ফ প্রদান করিত এবং আসরের মেরাপ বা মঞ্চের উপর উঠিয়া হনুমানের মত দোল খাইত, নানা প্রকার কসরৎ দেখাইত। যদি কোন দর্শক হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া সুপক্ক কদলী নিক্ষেপ করিত, তাহা হইলে হনুমান সেটা লুফিয়া লইয়া খোলাশুদ্ধই কামড়াইয়া খাইয়া ফেলিত এবং মধ্যে মধ্যে দন্ত বিকাশ করিত। হনুমানের সজ্জা ছিল একটা ধূসর বর্ণের আপাদমস্তক ঢাকা পোষাক, একটা সুদীর্ঘ লাঙ্গুল। মুখে ও হাতে কালি মাখা। শুনিয়াছি যে, একবার একজন সাহেব যাত্রায় হনুমান দেখিয়া এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই হনুমানকে দশ টাকা বকশিস দিয়াছিলেন। সেই সাহেবকে কোথাও যাত্রা শুনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলে তিনি অগ্রে সংবাদ লইতেন যে, হনুমান আসিবে কি না। তিনি নাকি একবার যাত্রাতে শুম্ভ-নিশুম্ভ পালা দেখিতে গিয়া জেদ ধরিয়াছিলেন—'মাংকি বোলাও'। সাহেবের আগ্রহে একজন লোক হনুমান সাজিতে বাধ্য হইয়াছিল।

নবীন গুঁইয়ের এই রাম বনবাসের পালায় দেখিয়াছি, মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী ক্রোধাগারে গিয়া দ্বার বন্ধপূর্ব্বক ধরাসনে উপবিষ্ট। রাজা দশরথ ঐ সংবাদ শ্রবণে অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক মহিষীর অনেক সাধনা করিলেন, অনেক মিনতি করিলেন, কিন্তু রাণী কিছুতেই দ্বার খুলিলেন না। তখন রাজা নিরুপায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"ওহে নগরবাসিগণ"—

যেন অযোধ্যা নগরের সমস্ত অধিবাসী রাজার অন্তঃপুরে ক্রোধাগারের নিকট উপস্থিত। রাজার আহ্বান শ্রবণমাত্র জুড়ি, ছোকরা, বাদকের দল অভিনেতা প্রভৃতি 'নগরবাসিগণ' একবাক্যে বলিয়া উঠিল—'হাঁ হাঁ'। রাজ-আহ্বানের যোগ্য সসম্মান উত্তর!

রাজা বলিলেন—"বড় রাণী যে ক্রোধালয়ে দ্বার বন্ধ করে বসে আছেন, কিছুতেই দ্বার খোলেন না, কি করি?"

নগরবাসীগণ পরামর্শ দিল—"মহারাজ পদাঘাতে দ্বার ভঙ্গ করুন।"

রাজা বলিলেন—"তবে পদাঘাতেই দ্বার ভঙ্গ করি, কি বল?"

নগরবাসীগণ বলিল—"হাঁ মহারাজ, তাই করুন, পদাঘাতেই দ্বার ভঙ্গ করুন।"

রাজা তখন ভূমিতে এক পদাঘাত করিলেন। সেই মুহূর্তে ঢোলক, ডুগী, তবলা, মন্দিরা প্রভৃতিতে একবার আঘাত করিয়া দ্বার ভাঙ্গার শব্দ করা হইল।

মহেশ চক্রবর্ত্তী বা রাম বাঁড়ুয্যের দলে এরূপ অস্বাভাবিক অভিনয় বা গান প্রভৃতি কখনও শুনি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহেশ চক্রবর্ত্তীর দলে 'সতী নাটক' ও 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' সাধারণতঃ অভিনীত হইত। রাম বাঁড়ুয্যের দলে 'বিরাট পর্ব্ব', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনয় হইত। সেই পালাতে রামলাল চট্টোপাধ্যায় অর্জ্জুন বা বৃহন্নলা সাজিতেন। রাম বাঁড়ুয্যের দলে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি অভিনেতাদের চেহারা একেবারে রাজার মত না হউক ভদ্রলোকের মত ছিল; সুতরাং তাহারা রাজার পোষাক পরিলে মানাইত মন্দ নয়। একটু গোলমাল বাঁধিত রামলাল বাঁড়ুয্যের গোঁফ লইয়া। অর্জ্জুনবেশে কোনরূপ গোলযোগ হইত না, কিন্তু নপুংসক বৃহন্নলার নারীবেশে সগুম্ফ আসরে উপস্থিতিটা বড়ই অশোভন হইত। বৃহন্নলা সেইজন্য একখানা রুমাল দিয়া গোঁফ ও মুখ চাপা দিয়া থাকিতেন, পরে অর্জ্জুনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া মুখ হইতে রুমাল নামাইতেন।

এই রামলাল চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন রাম বাঁড়ুয্যের দলে থাকিয়া পরে পৃথক দল করিয়াছিলেন। তাঁহার নূতন দলেও 'বিরাট পর্ব্ব' পালা হইত, কিন্তু তিনি তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। রামলাল চাটুয্যেই বোধহয় প্রথম যাত্রাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বক্তৃতার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে যাত্রাতে আর কাহাকেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে বক্তৃতা করিতে শুনি নাই। তাঁহার বিরাট পর্ব্বে, গোধন উদ্ধারকালে অর্জ্জুনের সহিত দুর্যোধনের যুদ্ধে অসিভঙ্গ হইলে দুর্যোধন বলিলেন—

"নিরস্ত্র হয়েছি এবে পেয়েছ সময়
বধ মোরে ধনঞ্জয়—"

উত্তরে ধনঞ্জয় বলিলেন—

"ধনঞ্জয় তোর মত কাপুরুষ নয়,
ধর অস্ত্র, যোঝ পুনঃ মর কিম্বা মার—" প্রভৃতি

অথবা 'অভিমন্যু বধ' পালাতে, অভিমন্যুর মৃত্যু-সংবাদে অর্জ্জুনের বিলাপোক্তি—

"কি করে শুনিনু অদ্য ভীষণ বচন,
বামন হইয়া চন্দ্র করেতে স্পর্শিল
ডুবিল সামান্য ঘাতে দীর্ঘ জলযান—" প্রভৃতি

আমরা বাল্যকালে রামলাল চাটুয্যের স্বরচিত বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু পরে দেখিলাম যে কবিবর স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে ঐ সকল কথা অবিকল আছে। যাহা হউক সেকালের অভিনেতাদের মধ্যে রামলাল চাটুয্যেই এণ্ট্রান্স পাস করিয়া এল-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, অন্য কাহারও বিদ্যা অতদূর অগ্রসর হয় নাই, এইরূপ একটি জনরব শুনিয়াছিলাম। মদন মাষ্টার বা নবীন ডাক্তারের বিদ্যা কতদূর ছিল তাহা শুনি নাই। সেকালে যাত্রা কিরূপে স্টেজবিহীন থিয়েটারে ক্রমে ক্রমে পরিণত হইয়াছিল,

তাহা আমরা দেখিয়াছি। আজকাল যে সকল যাত্রা শুনি, তাহা আসরে নামিলেই যাত্রা, স্টেজে উঠিলেই থিয়েটার।

আমার প্রবন্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সেকালের যাত্রা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। আজকাল যেরূপ কলকাতার থিয়েটারের অনুকরণে প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই এক একটা থিয়েটার পার্টি গজাইয়া উঠিয়াছে, সেকালে মফঃস্বলের অনেক গ্রামেই সেরূপ সখের যাত্রার দল ছিল। সেই সকল যাত্রার গাওনা সন্নিহিত দুই চারিটি গ্রাম ব্যতীত দূরবর্ত্তী কোন স্থানে বা কোন শহরে হইত না। শহরে যাত্রার প্রয়োজন হইলে হয় কলিকাতা হইতে মতি রায়, নবীন ডাক্তার প্রভৃতির অথবা চন্দননগর হইতে মাষ্টারদের, মহেশ চক্রবর্তীর বা রাম বাঁড়ুয্যে প্রভৃতির 'বায়না' হইত। পল্লীগ্রামের সখের দলগুলি সর্ব্বাংশেই স্থানীয় ছিল। ভিন্ন গ্রামের লোক সেই যাত্রায় যোগদান করিত না।

বড় বড় গ্রামে দুই তিনটা যাত্রার দল থাকিত, হয়ত এখনও আছে। উত্তরপাড়ার দল, দক্ষিণ পাড়ার দল, এমন কি দুলে পাড়ার দলের কথাও শুনিয়াছি। অনেক গ্রামে দুলে, বাগদী, ডোম, চাঁড়াল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগেরও সখের যাত্রার দল ছিল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর যাত্রাতে কিরূপ অভিনয় হইত তাহার একটু নমুনা দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বর্দ্ধমান জেলার কোন সুদূর পল্লীগ্রামের দুলে পাড়ার যাত্রাতে 'বেহুলা' পালা গাওনা হইতেছিল। মনসা, বেহুলা, লখীন্দর, চাঁদ সওদাগর,—প্রভৃতি সকলেই ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, ম্যালেরিয়া নিবন্ধন শীর্ণকায়। সকলেই দরিদ্র বলিয়া পরিচ্ছদের কোন পরিপাট্য নাই। অভিনেতারা সাধুভাষায় কথোপকথন করিবার চেষ্টা বা ইচ্ছা করে, কিন্তু ভাষাজ্ঞান কাহারও নাই। মনসা দেবী চাঁদ সওদাগরের নিকট মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, লখীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটাইবেন, কিন্তু বেহুলা সতী জাগ্রত থাকিলে লখীন্দরের মৃত্যু হইবে না, তাই বেহুলাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য নিদ্রাকে আহ্বান করিলেন—"কোথায় হে নিদ্দে (নিদ্রে) কোথায়?" নিদ্রা বলিল—"এজ্ঞে আইচি" (আজ্ঞে আসিয়াছি)। মনসা বলিলেন—"বেভলার কন্ধে ভর করগা গেয়ে।" নিদ্রা করজোড়ে বলিল—"এজ্ঞে চন্নাম" (আজ্ঞে চলিলাম)। বেহুলার স্কন্ধে নিদ্রা ভর করিল, বেহুলা ঘুমাইয়া পড়িল। তখন মনসা দেবী স্বীয় অনুচর কালীয় নাগকে স্মরণ করিলেন—"কোথায় হে কালীয় লাগ?" কালীয় নাগ করজোড়ে বলিল, "এজ্ঞে আইচি।" "নখীন্দরকে ডংশাও (দংশন কর) গেয়ে।" কালীয় নাগও "এজ্ঞে চন্নাম" বলিয়া বিদায় লইল।

এই শ্রেণীর যাত্রা পল্লীগ্রামের সকল স্থানে না হউক, অনেক স্থানেই এখনও আছে।

যানবাহন

আমার জননীর মুখে গল্প শুনিয়াছি যে, তাঁহার বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমাদের চন্দননগরে প্রথম ঘোড়ার গাড়ী হয়। সে আজ বিরাশী বৎসর পূর্ব্বে,

ধনবান এবং ভদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মহিলারা বাটী হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে পাল্কীতে যাতায়াত করিতেন, সাধারণ গৃহস্থ মহিলারা গরুর গাড়ী ব্যবহার করিতেন। সুতরাং গরুর গাড়ীই ছিল সেকালে স্ত্রীলোকদিগের প্রধান যান। পাল্কীর ভাড়া ছিল অধিক, গরুর গাড়ী অনেক অল্প ভাড়ায় পাওয়া যাইত, সেইজন্য দরিদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষে পাল্কী ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য ছিল।

সেকালে শহরে আর কি মফঃস্বলে, সকল ধনবান ব্যক্তিই বাটীতে পাল্কী রাখিতেন। অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরও পাল্কী ছিল। সেকালে পাল্কীর প্রচলন ছিল বলিয়া সকল স্থানেই বাহকের ব্যবস্থা ছিল। পারিশ্রমিক দিলেই বাহক পাওয়া যাইত। যে সকল ধনবানের সর্ব্বদাই পাল্কী আবশ্যক হইত, তাঁহাদের বেতনভোগী বাহক থাকিত। পাল্কী বহিবার জন্য চারিজন বাহক আবশ্যক। চারিজন লোককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া রাখা ধনবান ব্যতীত অন্যের পক্ষে সুসাধ্য ছিল না। সেকালের দুলেরাই প্রধানতঃ পাল্কী বহন করিত। যাহারা পাল্কী বহিত তাহাদিগকে লোকে 'কাহার' বা 'বেয়ারা' বলিত; সেইজন্য প্রায় সর্ব্বদাই দুলে ও বেয়ারা একই শব্দরূপে ব্যবহৃত হইত। দুলে জাতি হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য ছিল। সেইজন্য নিষ্ঠবান ব্রাহ্মণগণ ও উচ্চবর্ণের নিষ্ঠাবতী মহিলারা যে বস্ত্রে পাল্কীতে আরোহণ করিতেন, সেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া পূজা, আহ্নিক বা আহার করিতেন না। অন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগরে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্থানীয় ব্রাহ্মণ সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে নিষ্ঠাবান হিন্দুর পালনীয় সকল আচারই পালন করিতে হইত। তিনি প্রত্যহ পাল্কীতে করিয়া বাটী হইতে তাঁহার কর্ম্মস্থল "দে অঁল্যা" নামক দুর্গে গমন করিতেন। অস্পৃশ্য দুলের দ্বারা বাহিত পাল্কীতে বসিয়া তাম্বূল-চর্ব্বণ ব্রাহ্মণের পক্ষে অনুচিত বলিয়া তিনি উড়িষ্যা হইতে একদল গোপজাতীয় বাহককে আনাইয়া চন্দননগরে স্বীয় বাটীর কাছে বাস করাইয়াছিলেন। গোয়ালারা অস্পৃশ্য নহে, উৎকলীয় গোয়ালাদিগের দ্বারা বাহিত পাল্কীতে আরোহণ করিয়া চৌধুরী মহাশয় তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রত্যহ কর্মস্থলে গমন করিতেন। সেই সকল উড়িয়া বেহারা যে পল্লীতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, উত্তরকালে সেই পল্লীই চন্দননগরের মধ্যে ভাড়াটিয়া পাল্কীর প্রধান কেন্দ্র বা আড্ডা হইয়াছিল। চৌধুরী বংশের অবনতির পর ঐ সকল উড়িয়া বেহারার বংশধরগণ পাল্কী বহন করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিত। তাহারা যে পল্লীতে বাস করিত তাহা এখনও 'উড়িয়া পাড়া' বা 'বেহারা পাড়া' নামে অভিহিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেই পল্লীতে উড়িয়া ভাষাভাষী একজন লোকও নাই। সেই সকল উড়িয়ার বংশধরদিগের মধ্যে দুই-একজন এখনও তথায় বাস করে বটে, কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ বাঙালী হইয়া গিয়াছে। এখন চন্দননগরে একখানিও পাল্কী নাই।

সেকালে যে সকল ধনবান গঙ্গার ধারে বাস করিতেন, তাহারা জলপথে ভ্রমণের জন্য বজরা রাখিতেন। পাল্কী রাখা অপেক্ষা বজরা রাখা অধিক ব্যয়সাধ্য ছিল, কারণ প্রথমতঃ একখানি পাল্কী অপেক্ষা একখানি বজরার মূল্য অনেক অধিক ছিল; দ্বিতীয়তঃ

বজরার মাঝি ও দাঁড়ী বেতন দিয়া রাখিতে হইত। পারিশ্রমিক দিলে পাল্কীর বেহারা পাওয়া যাইত। কিন্তু ঠিক দাঁড়ী-মাঝি পাওয়া যাইত না। সেইজন্য বিশিষ্ট ধনবান ব্যতীত আর কেহই বজরা রাখিতেন না, বা রাখিতে পারিতেন না। ধনবানদিগের বজরা কিরূপ ছিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দেবী চৌধুরাণী'[৯২] নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সেকালে জলপথে দ্রুত গমনের জন্যে 'ছিপ' নামক একপ্রকার নৌকার প্রচলন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'তে সেই ছিপের বর্ণনাও করিয়াছেন।

এখনও মফঃস্বলে অনেক স্থানে 'ডুলি' নামক একপ্রকার যান দেখিতে পাওয়া যায়। পাল্কীর মত ডুলিও বাহকের দ্বারা বাহিত হয়। পাল্কী বহনের জন্য চারিজন বাহক আবশ্যক, ডুলি দুইজন লোকেই বহন করে। ডুলি পাল্কীরই সাধারণ সংস্করণ। কলিকাতাতে এখন ডুলির অস্তিত্ব না থাকিলে, পল্লীগ্রাম হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার জননীর মুখে শুনিয়াছি যে চন্দননগরের প্রথম ঘোড়ার গাড়ী যখন আমদানী হয় তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর। বাঙালী ভদ্রমহিলার ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ সেকালের লোকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠেই বুঝিতে পারা যাইবে। চন্দননগরে ঘোড়ার গাড়ী আমদানী হইলে, আমার মাতামহী আমার জননীকে সঙ্গে লইয়া কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দুই-চারদিন তাঁহাদিগকে নানা প্রকার বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কোন বর্ষীয়সী মুখরা প্রতিবেশিনী আমার মাতামহীকে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "কি বুকের পাটা তোমার বৌমা! গেরস্তের বৌ হয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়তে তোমার ভয় হল না?" আমার মাতামহী হাসিয়া বলিলেন, "ভয় হবে কেন? সে ত ঠিক পাল্কীর মত। পাল্কী মানুষে কাঁধে ক'রে নিয়ে যায় আর গাড়ী ঘোড়াতে টেনে নিয়ে যায়,—তাতে ভয়ের কি আছে?" উত্তরে সে প্রাচীনা গৃহিণী বলিয়াছিলেন, "তা হোক্ মা। যে মেয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়তে পারে, সে ঘোড়াতেও চড়তে পারে। বাঙালীর ঘরের বৌমানুষ ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে, বাপের বয়সে এমন কথা শুনি নি—" ইত্যাদি। এইরূপ সমালোচনা আমার মাতামহীকে উপর্য্যুপরি তিন-চারি দিন একাধিক গৃহিণীর নিকট শুনিতে হইয়াছিল।

চন্দননগরে ঘোড়ার গাড়ী আসিবার বৎসর দুই পরে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম রেলপথ খোলা হয়।[৯৩] প্রথমে হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত এবং কিছুদিন পরে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যাত্রী-গাড়ী যাতায়াত করে। প্রথমে যে সকল গাড়ীতে যাত্রী লওয়া হইত, সেই সকল গাড়ীর ছাদ ছিল না, বসিবার জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না। এখন যেরূপ গাড়ীতে কয়লা, পাথর বা মাটি বোঝাই করা হয়, সেইরূপ অনাচ্ছাদিত মালগাড়ী বা open truck যাত্রী বহনের জন্য দেওয়া হইত। অবশ্য তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের জন্য open truck দেওয়া হইত, অন্য শ্রেণীর গাড়ী কিরূপ ছিল তাহা শুনি নাই। সেই খোলা এবং বেঞ্চবিহীন গাড়ীতে যাত্রীদিগকে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ছাতা মাথায় দিয়া বসিতে হইত। এরূপ ব্যবস্থা অধিক দিন ছিল

না, বোধহয় এক বৎসরের মধ্যেই ছাদ ও বেঞ্চওয়ালা গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছিল।

আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি যে, প্রথম যখন কলের গাড়ী চলিতে আরম্ভ হয়, তখন রেলপথ হইতে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও শত শত লোক, কেবল কলের গাড়ী দেখিবার জন্য, রেলপথের নিকটে আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিত। গরু নাই, মহিষ নাই, ঘোড়া নাই, কেবল আগুনের জোরে গাড়ী চলে, এই অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিবার জন্য যে রেলপথের উভয় পার্শ্বে বিপুল জনসমাগম হইত, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। যে সকল মোহজাল বিস্তার করিয়া ইংরেজ এ দেশের লোককে, বিশেষতঃ অজ্ঞ জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কলের গাড়ীই বোধহয় তাহার মধ্যে প্রধান। কেবল আগুন ও জলের সাহায্যে যাহারা গাড়ী চালাইতে পারে তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। নিশ্চয়ই তাহারা দেবতার অংশ, এই ধারণা সেকালের বোধহয় শতকরা নব্বই জনের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেকালের বাঙালী তাই কলের গাড়ীকে "পুষ্পক রথ" বলিতে ইতঃস্তত করে নাই। সেকালের অজ্ঞ প্রাচীন-প্রাচীনারা কলের গাড়ীকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত প্রথম কলের গাড়ী চলিবার কয়েকদিন পরে আমাদের কোন প্রাচীনা প্রতিবেশিনী আমার পিতাকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহাকে কলের গাড়ী দেখাইয়া আনিতে হইবে, সেই বৃদ্ধা আমার পিতার 'ঠানদিদি' বা পিতামহী পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। আমাদের বাটী হইতে ষ্টেশন এক মাইলের মধ্যে। বৃদ্ধার অনুরোধে আমার পিতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া একদিন ষ্টেশনে গিয়া প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন একখানা আপ ট্রেন আসিবার সময়। রেলকর্ম্মচারীরা যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিলেও আপ এবং ডাউন প্ল্যাটফর্মেই শত শত দর্শকের জনতা হইয়াছিল। যথাসময়ে গাড়ী আসিবার সঙ্কেতসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইল, সমবেত জনতা উদ্‌গ্রীব হইয়া সুদূর দক্ষিণ রেলপথের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে দণ্ডায়মান রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, এঞ্জিন দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। ভীষণ গর্জ্জন সহকারে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে গাড়ী প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিবামাত্র জনতার শত শত ব্যক্তি করজোড়ে গাড়ীকে নমস্কার করিল, সেই বৃদ্ধা এবং আরও অনেকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

যখন হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইল, তখন বর্দ্ধমান জেলার লোকেও ঐরূপ আগ্রহ সহকারে কলের গাড়ী দেখিবার জন্য রেলপথের উভয় পার্শ্বে সমবেত হইত। সেকালে, যাহারা কলের গাড়ী দেখে নাই, তাহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করিত না যে কলের গাড়ী এক ঘণ্টায় এক দিনের পথ যাইতে পারে। পল্লীগ্রামের যে সকল ভাগ্যবান গাড়ী চড়িবার সুযোগ পাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বগ্রামে ফিরিয়া গিয়া কলের গাড়ী সম্বন্ধে কত অদ্ভুত এবং অতিরঞ্জিত গল্পই করিত। কলের গাড়ীতে ভ্রমণকালে কানে তুলা দিয়া বক্ষে দৃঢ় করিয়া একখানা কাপড় বাঁধিয়া বসিতে হয়, নতুবা গাড়ীর শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায় এবং বাতাসের ধাক্কা

লাগিয়া বুক ফাটিয়া যায়, এইরূপ কত কথাই সেকালের অজ্ঞ পল্লীগ্রামবাসীদিগকে শুনিতে হইত।

'হিতবাদী'র ভূতপূর্ব্ব প্রুফ-রীডার এবং সুবিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত ধীরানন্দ কাব্যনিধি মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যে সময় গ্রামে কলের গাড়ী হয়, সেই সময় বর্দ্ধমান জেলায় তাঁহাদের গ্রাম হাটগোবিন্দপুরে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি দৃষ্টিশক্তি এবং চলচ্ছক্তিহীন হইয়াছিলেন, বর্দ্ধমান কালনা রোডের উপরেই তাঁহার বাটী ছিল। তিনি প্রত্যহ সকালে এবং বৈকাল হইতে রাত্রি আটটা-নয়টা পর্য্যন্ত পথের ধারে তাঁহার বাটীর দাওয়াতে বসিয়া থাকিতেন। গ্রামস্থ সকলেই সেই অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। কেহ গ্রামান্তরে কোন কার্য্য উপলক্ষে গমনকালে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইত আবার গ্রামান্তর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিত। একদিন তিনি প্রাতঃকালে দাওয়াতে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন গ্রামবাসী তাঁহার পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিলে তিনি তাঁহার নাম এবং সে কোথায় যাইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি বলিল, "আমি কলিকাতায় যাইতেছি।" সন্ধ্যার পর সে কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে ব্রাহ্মণ তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি নাম বলিলে বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি যে সকালে বলিলে কলিকাতায় যাইতেছ, কলিকাতায় কি যাও নাই?" সে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ কলিকাতাতে সকালে গিয়াছিলাম, এখন কলিকাতা হইতে আসিতেছি।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কলিকাতা এখান থেকে তিন দিনের পথ, সকালে কলিকাতায় গিয়া সন্ধ্যার সময় কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে, ব্যাপার কি?" তখন সেই লোকটি যথাসাধ্য কলের গাড়ীর বর্ণনা করিয়া বলিল, বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত লোহার পাটি পাতা আছে, তাহার উপর দিয়া গাড়ী যায়। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি গ্রাম সম্পর্কে ঠাকুরদাদা বলিয়া কি আমার সঙ্গে তামাশা করিতেছ? আমরা ঘরে মশারি খাটাইবার জন্য একটি লোহার পেরেক খুঁজিয়া পাই না, আর গাড়ী চালাইবার জন্য বর্দ্ধমান থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত লোহার পাটি পাতা হইয়াছে। এত লোহা পাবে কোথায়?"

সেকালের রেলগাড়ীর সহিত একালের রেলগাড়ীর আকৃতি, বর্ণ ও গঠনগত অনেক প্রভেদ হইয়াছে। অবশ্য আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের গাড়ীর কথা বলিতেছি। এখনকার বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি প্রথমে আমার জ্ঞানে রেলগাড়ীতে আরোহণ করি। আমার পিতা কটক হইতে বীরভূম সিউড়ীতে বদলী হইলে আমরা চন্দননগর হইতে রেলপথে সাঁইতে ষ্টেশনে গিয়া তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া সিউড়ী যাই। তখন অণ্ডাল-সাঁইতে রেলপথ কাহারও কল্পনাতেও উদিত হয় নাই। সেখানে সেই রেলগাড়ীর প্রত্যেক 'ক্যারেজে' ছয়টি করিয়া কক্ষ থাকিত। স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক কক্ষের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোন গাড়ীতেই পায়খানা ছিল না; লোহার গরাদের দ্বারা একটি কক্ষ অন্য কক্ষ হইতে পৃথক করা ছিল। কোন

ভদ্রলোক যদি সপরিবারে ট্রেনে কোথাও যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একটি কক্ষ 'রিজার্ভ' করিতে হইত, নতুবা অন্য পুরুষযাত্রীর সহিত একসঙ্গে অন্তঃপুর-চারিণীদিগকে ভ্রমণ করিতে হইত। রিজার্ভ-করা কক্ষের আব্রু রক্ষার জন্য একখানা বিছানার চাদর বা মোটা কাপড় পর্দ্দা করিয়া গরাদেতে টাঙাইয়া দেওয়া হইত।

সেকালে রেলগাড়ীর প্রত্যেক কক্ষে (তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীতে) দুই খানা করিয়া বেঞ্চ থাকিত। প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচজন করিয়া যাত্রী বসিবার নিয়ম ছিল। সেই জন্য প্রত্যেক কক্ষের ভিতরে, দ্বারের উপরে, একখানা লম্বা কাগজে বড় বড় অক্ষরে বাঙলায় লেখা থাকিত "প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচজন বসিবে"। এখন সেরূপ দশ জন আরোহী বসিবার কক্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর কোন গাড়ীতে নাই এবং "প্রত্যেক বেঞ্চে দশ জন বসিবে" লেখা কাগজও নাই। এখন গাড়ী বড় হইয়াছে, কক্ষগুলি বড় হইয়াছে, এবং কোন কক্ষে কতজন আরোহী বসিবে তাহা প্রত্যেক কক্ষের ভিতরে দেওয়ালে তেলের রঙে লেখা থাকে।

পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে সকল ট্রেনেই শ্রেণী অনুসারে গাড়ী রং করা হইত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী সাদা, মধ্য শ্রেণী লাল ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী সবুজ রঙের হইত। তখন মধ্য শ্রেণীর গাড়ীতে গদি ছিল না, গাড়ীর রং দেখিয়া মধ্য শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর পার্থক্য বুঝিতে হইত। সেকালে লোকে জানিত, লাল গাড়ীর দেড়া মাশুল। এখনকার তৃতীয় শ্রেণীর অজ্ঞ আরোহীরা মধ্য শ্রেণীর গাড়ীতে গদি দেখিয়া বুঝিতে পারে, গদিওয়ালা গাড়ী তাহাদের নহে।

আমাদের বাল্যকালে ষ্টেশনের সংখ্যা এত অধিক ছিল না। আমার পিতা সিউড়ী হইতে বর্দ্ধমানে আসিলে আমরা বহুবার চন্দননগর হইতে বর্দ্ধমানে যাতায়াত করিয়াছি। সেকালে হাওড়ার পর বালী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর (ভদ্রেশ্বরও অপেক্ষাকৃত আধুনিক), চন্দননগর, হুগলী, মগরা, খন্ন্যেন, পাণ্ডুয়া, বৈঁচী, মেমারী, শক্তিগড় ও বর্দ্ধমান এই কয়টি ষ্টেশন ছিল। এখন হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত প্রতি দুটি ষ্টেশনের মধ্যে একটি, অনেক স্থলে দুইটি ষ্টেশন হইয়াছে। সেকালে ট্রেনের সংখ্যাও অধিক ছিল না। এখন পকেট টাইম-টেবল্ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হইয়া এক পয়সা মূল্যে বিক্রীত হয়, সেকালে পকেট টাইম টেবল্ ছিল একখানি পোষ্টকার্ডের মত, উহার এক পৃষ্ঠায় আপ্ এবং অন্য পৃষ্ঠায় ডাউন ট্রেনের সময় লিখিত হইত। তখন নিউ কর্ড, তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ, নৈহাটী ব্রাঞ্চ বা ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লাইন ছিল না বলিয়া একখানি ক্ষুদ্রায়তন কাগজের উভয় পৃষ্ঠাতেই হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সকল ষ্টেশনের নাম ও সকল ট্রেনের সময় লিখিত হইত। এই পকেট টাইম টেবল্ বিনামূল্যে ডেলি প্যাসেঞ্জারদিগকে দেওয়া হইত। পরবর্ত্তীকালে উহা ছোট পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হইবার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে এদেশে সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাব হয়। সেই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের কলিকাতার সন্নিহিত কোন কোন স্থানে গতিশীল

ট্রেনের উপর লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইত। রেল কর্তৃপক্ষ অনুমান করিলেন যে, শ্বেতাঙ্গ আরোহীরা প্রধানতঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেইজন্য বিপ্লববাদীরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী লক্ষ্য করিয়াই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে, যদি সকল গাড়ীর বর্ণ একরূপ হয়, তাহা হইলে বিপ্লববাদীদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। এইরূপ অনুমান করিয়াই গাড়ীর বর্ণবৈষম্য রহিত করা হইল।

সেকালে এক্সপ্রেস ট্রেন ছিল না। লোকাল ট্রেন, থ্রু ট্রেন এবং মেল ট্রেন এই তিন প্রকার গাড়ী ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে হুগলী, পাণ্ডুয়া এবং বর্দ্ধমান হইতে ডাউন লোকাল ট্রেন ছাড়িত এবং আপ লোকাল ঐ তিনটি ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইত। লোকাল ট্রেনগুলিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক আরোহী হইত বালী ষ্টেশনে। তখন এক বালী ষ্টেশনে ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, বালী, বেলুড় এবং গঙ্গার পরপারে দক্ষিণেশ্বর, এঁড়েদহ প্রভৃতি স্থানের যাত্রীরা ওঠানামা করিত। ইহার পর ষ্টীমার সার্ভিস হওয়াতে এবং উত্তরপাড়া, বেলুড় ও লিলুয়াতে নূতন ষ্টেশন হওয়াতে বালীর যাত্রীসংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। তদুপরি এখন বাস যাতায়াত করাতে বালীর যাত্রী আরও কমিয়া গিয়াছে। এখন যেরূপ সকল ষ্টেশনেই মান্থলী টিকিট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। একমাত্র হাওড়া ষ্টেশনেই মান্থলী টিকিট বিক্রয় হইত। সেকালের হাওড়ার পুরাতন ষ্টেশনে মান্থলী টিকিট বিক্রয় করিবার জন্য অনেকগুলি উইণ্ডো বা জানালা ছিল। উহার মধ্যে পাঁচ-ছয়টিতে বালীর মান্থলী টিকিট বিক্রয় হইত, অন্য উইণ্ডোগুলোর প্রত্যেকটিতে চারি-পাঁচটা ষ্টেশনের টিকিট পাওয়া যাইত। হাওড়ার পুরাতন ষ্টেশনে প্রথমে মাত্র দুটি প্ল্যাটফর্ম ছিল, পরে আর একটি প্ল্যাটফর্ম নির্মিত হয়। এই তিনটি প্ল্যাটফর্মই হাওড়া ষ্টেশনে তখন যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার পর বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ হাওড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে হাওড়ায় নূতন ষ্টেশন নির্ম্মিত হয়। এই নূতন ষ্টেশনে এখন এগারটি প্ল্যাটফর্ম আছে, কিন্তু তাহাতেও সকল গাড়ীর স্থান হয় না বলিয়া কোন কোন প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে, অগ্রপশ্চাৎ করিয়া দুইখানি করিয়া ট্রেন রাখিতে হয়।

আজকাল হাওড়া ষ্টেশনে মোটর গাড়ী, বাস, ঘোড়ার গাড়ী এবং রিক্‌শ যাত্রী লইবার জন্য উপস্থিত থাকে, সেকালে সেইরূপ ঘোড়ার গাড়ী ও পাল্কী থাকিত। মোটর গাড়ী তখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, রিকশ্‌র নামগন্ধও ছিল না। কলিকাতার ভিতরে, সর্ব্বত্রই পাল্কী আড্ডা ছিল। কলিকাতার বড় বড় রাজপথে ট্রাম চলিত, তাহাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। সে ট্রামগাড়ী ঘোড়ায় টানিত। প্রায় এক মাইল অন্তর ঘোড়া বদল করিবার আড্ডা ছিল। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে দারুণ গ্রীষ্মের সময় প্রায় প্রত্যহই ট্রামের দুই একটা ঘোড়া সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মারা যাইত। সেকালে কলিকাতায় মাল বহনের জন্য মহিষের গাড়ী অপেক্ষা গরুর গাড়ীর সংখ্যা অধিক ছিল।

এখনকার পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে বাইসিক্‌ল প্রায় দেখা যাইত না। এখন সেরূপ বাইসিক্‌লের দুইখানি চাকাই সমান, সেকালে প্রথম যে সকল বাইসিক্‌লের

আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা অন্যরূপ ছিল। তাহার একখানি চাকা বড়—তিন হাত বা সাড়ে তিনহাত ব্যাসের, আর একখানি অতি ক্ষুদ্র নয় ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি ব্যাসের। বড় চাকার উপর আরোহী উপবেশন করিত, ছোট চাকাখানা বড় চাকার পশ্চাতে থাকিত। এই ছোট চাকার সাহায্যে বাইসিক্‌লকে মোড় ফিরাইতে পারা যাইত। এই বাইসিক্‌লের নাম ছিল "হাই হুইল বাইসিক্‌ল" বা উচ্চ-চাকাযুক্ত বাইসিক্‌ল। এই বাইসিক্‌লে আরোহণ করা বড়ই কঠিন ছিল। আরোহণ অভ্যাস করিবার সময় আরোহীকে যে কতবার আছাড় খাইতে হইত তাহার সংখ্যা নাই। সেইজন্য হাই হুইল বাইসিক্‌লের প্রচলন অতি অল্পই ছিল। সেকালে বয়স্ক ব্যক্তিদের আরোহণের জন্য 'ট্রাইসিক্‌ল' ছিল। একালে শিশু ও অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য যেরূপ ট্রাইসিক্‌ল দেখিতে পাওয়া যায়, সেকালে ঐরূপ বড় ট্রাইসিক্‌লে বয়স্ক ব্যক্তিরা আরোহণ করিতেন। এখনকার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখন পার্ক ষ্ট্রীটে থাকিতেন, তখন তিনি প্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে ট্রাইসিক্‌লে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেন দেখিয়াছি।

সেকালে আপিস অঞ্চলে প্রত্যেক বড় বড় আপিসের সম্মুখে শত শত ঘোড়ার গাড়ী দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন মোটর গাড়ী সেই সকল গাড়ীর স্থান অধিকার করিয়াছে। সকল আপিসেরই মোটা বেতনের শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় কর্ম্মচারীরা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আপিসে যাইতেন। আপিসের বাঙালী 'বড় বাবুদের' অনেকেই পাল্কী করিয়া আপিসে যাইতেন। শ্বেতাঙ্গগণের মধ্যে অনেকেরই ঘোড়া ছিল, তাঁহারা অশ্বারোহণে আপিসে যাতায়াত করিতেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একজন শ্বেতাঙ্গ একদিন অশ্বারোহণে আপিসে আসিয়া অশ্ব হইতে নামিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে জিন্‌টা একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তিনি সহিসকে জিন্‌টা দেখাইয়া বলিলেন, 'অমুক সাহেব কোম্পানীর দোকান হইতে জিন্‌টা মেরামত করিয়া আনিও।' সহিস ভাবিল সাহেব কোম্পানী হয়ত মেরামত করিতে দুই টাকা চাহিয়া বসিবে অথচ লালবাজারে যে কোন মুচি চারি আনায় মেরামত করিয়া দিবে। এই ভাবিয়া সে লালবাজারে দেশী মুচির দ্বারাই জিন্‌টি মেরামত করাইয়া আনিল। বৈকালে আপিস বন্ধ হইলে সাহেব ঘোড়ায় চড়িবার জিন্ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "কত খরচ হইল?" সহিস উত্তর দিল "বার আনা"। সাহেব কোম্পানী বার আনা মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া জিন্ মেরামত করিয়াছে শুনিয়া সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করিলে সহিস বলিল যে, সাহেব-কোম্পানী দুই টাকা মজুরী চাহিয়াছিল, লালবাজারে দেশী মুচি বার আনায় মেরামত করিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র সাহেব ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া হস্তস্থিত চাবুক দ্বারা সহিসকে প্রহার করিতে করিতে বলিলেন, "শূয়ার, তুই আমার বার আনা বরবাদ করিয়াছিস; সাহেব-কোম্পানী দুই টাকা সে লইলে আমার দেশে যাইত। এই বার আমার সমস্তটাই এদেশে থাকিয়া যাইবে।" এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ইংরেজের স্বাদেশিকতা ও আমাদের স্বাদেশিকতার মধ্যে কিরূপ প্রভেদ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার পিতা কটক হইতে সিউড়ীতে বদলী হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৮ বা ৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কটকে গিয়াছিলেন, তখন আমার

বয়স এক বৎসর মাত্র, সুতরাং সে কথা আমার মনে নাই। কটকে প্রায় পাঁচ বৎসর অবস্থান করিবার পর তিনি একবার শীতকালে কয়েকমাসের ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। ছুটির শেষে তিনি যখন দ্বিতীয়বার কটকে যান, তখন কলিকাতা হইতে উড়িষ্যার চাঁদবালী পর্য্যন্ত জলপথে ষ্টীমারে গিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম আমরা 'মেরী গ্রাণ্ট' নামক একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমারে বঙ্গোপসাগর দিয়া ধামরা নদীর মোহনা পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম এবং তথা হইতে নৌকা ও শকট-যোগে, বোধহয় তিন-চারি দিনে কটকে গিয়াছিলাম। সেই ষ্টীমার যাত্রার কথা আমার এখন এই বৃদ্ধবয়সে বিস্মৃত প্রায় স্বপ্নের মত অল্প অল্প মনে পড়ে। আমার পিতা প্রথমে যখন কটকে যান তখন ষ্টীমারে করিয়া উড়িষ্যায় যাইবার ব্যবস্থা ছিল না। স্থলপথে মেদিনীপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া পদব্রজে বা গোশকটে করিয়া যাইতে হইত। ছুটির শেষে কটকে গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আমার পিতাকে সেখানে অধিকদিন থাকিতে হয় নাই, বোধহয় এক বৎসরের মধ্যেই তিনি সিউড়ীতে বদলী হইয়া চিরকালের জন্য উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এক বৎসরের মধ্যে দুইবার স্থলপথে উড়িষ্যা হইতে বাংলায় আসাতে এই আগমনের কথা আমার কিছু কিছু মনে আছে। অধিকন্তু দেশে আসিবার পর আমার পিতা এবং জননী আত্মীয় বন্ধুদের নিকটে উড়িষ্যার পথের দুর্গমতার কথা সুবিধা-অসুবিধার কথা বর্ণনা করাতে আমার মনেও সেই পথের স্মৃতি এখন পর্য্যন্ত অনেকটা জাগরুক আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের পুরী এক্সপ্রেসে পুরীতে গিয়াছিলাম, তখন মহানদীর পুল পার হইয়া শেষ রাত্রিতে ট্রেন কটক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে আমার মনে হইল—এই সেই কটক, যেখানে আমার পিতা বাষট্টি তেষট্টি বৎসর পূর্ব্বে দুইটি শিশুপুত্র, পত্নী, একজন বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী এবং বালকভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া চন্দননগর হইতে বাইশ দিনে কটকে আসিয়াছিলেন, আজ আমি সেই কটকে, হাওড়া হইতে সাত-আট ঘণ্টায় গাড়ীতে ঘুমাইতে ঘুমাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেকালে দূরদেশে গমন যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য এবং কষ্টসাধ্য ছিল, তাহা এখনকার যুবক ও প্রৌঢ় লোকেরা বোধহয় ধারণা করিতেও অসমর্থ। আমার অনেক সময় মনে হয়, আরও পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পরে যখন বিমান বা না-আবিষ্কৃত অন্য কোন যানের সাহায্যে লোকে ঘণ্টায় একশত দেড়শত মাইল বা তাহারও অধিক গমন করিবে, তখন তাহারা বিস্মিত হইয়া ভাবিবে, দিল্লী, এলাহাবাদ, কাশী, পুরী যাইতে হইলে সেকালের লোকে কি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ীতে বসিয়া থাকিত? না জানি তাহাদের কত কষ্টই হইত।

আমার পিতা কটক হইতে বদলী হইয়া বাংলায় আসিবার সময় কিরূপে সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি আমার মনে জাগরূক আছে। তিনখানি গরুর গাড়ী দৈনিক পারিশ্রমিক হিসাবে ভাড়া করা হইয়াছিল। সে পারিশ্রমিক কত তাহা আমি জানি না। প্রাতঃকালে আহারাদির পর আমরা অর্থাৎ আমার জননী, আমার তিন সহোদর এবং একটি ভগিনী এই পাঁচ জনে আমরা একটি গাড়ীতে আরোহণ

করিলাম। আমার মাতুল অন্য একখানি গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার গাড়ীতে কয়েকটি বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি ছিল। তৃতীয় গাড়ীতে কেবল মালপত্র বোঝাই করা হইল। পূর্ব্বদিন কটকপ্রবাসী বাঙ্গালী বাবুরা বাবাকে বিদায় দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের যাত্রার সময় আমাদের বাসাতে আসিয়াছিলেন। আমার পিতার ছাত্রগণ আমাদের বাসাতে আসিয়া একটি উড়িয়া কবিতায় বিদায়-অভিনন্দন সুর করিয়া পাঠ করিলেন এবং সেই অভিনন্দন পত্রখানি বাবার হাতে দিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বাবাও প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন করিলে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইল। ছাত্রগণ বলিলেন যে, তাঁহারা আমাদের সঙ্গে মহানদীর তীর পর্য্যন্ত যাইবেন। সেইজন্য বাবা গাড়ীতে না উঠিয়া পদব্রজে ছাত্রদের সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। আমাদের বাসা হইতে মহানদীর দূরত্ব প্রায় এক ক্রোশ।

মহানদীতে জোড়া নৌকায় খেয়া পার হইত। দুইখানি অতি বৃহৎ নৌকা পাশাপাশি বাঁধা থাকিত। সেই নৌকাতে একসঙ্গে পাঁচ-সাতখানা গরুর গাড়ী, পাঁচ-সাত জোড়া বলদ, বিশ-পঁচিশ জন আরোহী এবং মালপত্র বোঝাই করিতে পারা যাইত। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, সেই নৌকা কত বড় ছিল। আমরা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নৌকা আমাদের জন্য ঘাটে অপেক্ষা করিতেছে, তিন চারিখানা গরুর গাড়ী, গরু এবং বহুযাত্রী তখন নৌকায় উঠিয়াছে। নৌকায় প্ল্যাটফর্ম বা চাতাল হইতে ডাঙা পর্য্যন্ত খুব লম্বা চওড়া এবং পুরু তক্তা পাতা ছিল, তাহার উপর দিয়া মালপত্রসহ গাড়ীগুলি নৌকার উপর উঠানো হইল। নৌকার উপর গাড়ী উঠিবার সময় নৌকার দাঁড়ী-মাঝিরাও প্রাণপণ শক্তিতে গাড়ীগুলিকে ঠেলিয়া গরুগুলিকে সাহায্য করিল। তাহার পর আমরা নৌকার উপর উঠিলাম, বাবা তখনও নদীর তীরে তাঁহার ছাত্রদিগের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অবশেষে, আর একবার প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গনের পর বাবা অশ্রুসিক্তনয়নে চিরকালের জন্য ধীরে ধীরে ছাত্রগণের নিকট বিদায় লইয়া নৌকাতে উঠিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

উড়িষ্যাতে নদী পার হইবার জন্য যে সকল খেয়া নৌকা ছিল, তাহার প্ল্যাটফর্মের চতুর্দ্দিকই বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত। গরু, গাড়ী ও যাত্রীদের উঠা নামার জন্য দুই পার্শ্বের খানিকটা অংশ খোলা থাকিত। নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে সেই স্থানটাও বেড়া দেওয়া হইত। উড়িষ্যার অধিকাংশ নদীতেই ভয়ানক কুম্ভীরের উপদ্রব ছিল। অনেক সময় তাহারা নাকি নৌকার উপর হইতে মানুষ টানিয়া লইয়া যাইত। সেই কুম্ভীরের আক্রমণ হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় সকল নৌকাতেই ঐরূপ বেড়া দেওয়া হইত। আমি পূর্ব্বে নৌকার দাঁড়ী-মাঝির উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু দাঁড়ী শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক হয় নাই। কারণ সে নৌকায় দাঁড় ছিল না। দুইজন মাঝি দুইখানা নৌকার হাল ধরিয়াছিল, আর অন্য নাবিকেরা 'লগি' বা সুদীর্ঘ বাঁশের সাহায্যে নৌকাকে ঠেলিতে ঠেলিতে এক পাড় হইতে অন্য পাড়ে লইয়া যাইত। নৌকার উপরে কোনরূপ আচ্ছাদন ছিল না, আরোহীরা রৌদ্র, বৃষ্টি মাথায় করিয়া বসিয়া থাকিত। আমরা গাড়ীর ভিতরে গিয়া আশ্রয় লইলাম, আমার পিতা ছাতা মাথায় দিয়া

নৌকার উপরে দাঁড়াইয়া তাঁহার ছাত্রগণকে দেখিতে লাগিলেন।

বোধহয় তিন ঘণ্টা পর, নদীর পরপারে নৌকা উপস্থিত হইলে, বেড়া খুলিয়া তক্তা পাতা হইল, একে একে গরু, গাড়ী, আরোহী সকলে তীরে অবতরণ করিল। আমরা ডাঙায় উঠিয়া দেখিলাম, অনেক যাত্রী ও কয়েকখানা গাড়ী, দুইখানা পাল্কী নদী পার হইবার জন্য তীরে অপেক্ষা করিতেছে। আমরা নৌকা ত্যাগ করিলে আবার তাহাদিগকে নৌকায় উঠাইবার পালা আরম্ভ হইল। মহানদীর উত্তর তীরে আসিয়া আমার পিতা একখানি গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। আমাদের আবার যাত্রা আরম্ভ হইল। যে রাজপথ দিয়া গাড়ী চলিতেছিল, তাহা পুরী রোড নামে প্রসিদ্ধ। ঐ রাজপথ নাকি বর্দ্ধমান হইতে পুরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক প্রভৃতি নগরের ভিতর দিয়া ঐ পথ পুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেকালে যখন ষ্টীমার বা রেলপথ ছিল না, তখন প্রত্যহ শত শত লোক ঐ পথ দিয়াই উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের মধ্যে যাতায়াত করিত। এখন বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ হওয়াতে ঐ পথ একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে; স্থানীয় অধিবাসী ব্যতীত আর কেহ ঐ পথে যাতায়াত করে না। সেইপথ ধরিয়া আমাদের গাড়ী সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটা 'চটী'তে উপস্থিত হইল। এই চটী সেকালে যাত্রীদিগকে দিগন্তবিস্তৃত পথে আশ্রয় দিত। চটীগুলি একখানা বা দুইখানা দোকান এবং কতকগুলি তৃণাচ্ছাদিত কুটীর ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাজপথের এক পার্শ্বে বা উভয় পার্শ্বে কতকগুলি চালাঘর, তাহার মধ্যে একখানা বা দুইখানা দোকান। সেই দোকানে চাল, ডাল, তরিতরকারী, হাঁড়ি, কাঠ, ঘুঁটে, তেল, নুন প্রভৃতি বিক্রয় হইত। দোকানদারই চটীর মালিক, সেই যাত্রীদিগকে ঘরভাড়া দিত এবং তাহাদের আহার্য্য সরবরাহ করিত। পুরী রোডের উপর তিন-চারি, কোথাও বা পাঁচ-ছয় ক্রোশ অন্তর এক-একটা চটী ছিল।

আমরা কটক হইতে যাত্রা করিবার সময় চাল, ডাল, ঘি, নুন প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম; তরিতরকারীও কয়েকদিনের মত ছিল। আমাদের গাড়ী চটীতে উপস্থিত হইলে বাবা দুইখানি ঘর দেখিয়া লইলেন এবং চটীওয়ালা বা দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে চটীতে রাত্রি যাপন করে কিনা। যাঁহারা সেকালে উড়িষ্যার পথে দুই চারিবার যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রশ্নের সার্থকতা বুঝিতেন, চটীওয়ালা চটীতে রাত্রিযাপন করিবে শুনিলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন। যে চটীতে চটীওয়ালা রাত্রিযাপন করিত না, সেই চটীতে রাত্রিকালে প্রায়ই চুরি, ডাকাতি হইত। অনেক সময় চটীওয়ালারাই চোর ও ডাকাতদিগকে সংবাদ দিত। চটীওয়ালা যদি সন্দেহ করিত যে যাত্রীদের নিকট টাকাকড়ি এবং অলংকারাদি আছে, তাহা হইলে সেই চটীওয়ালাই ডাকাতের দলে সংবাদ দিত। যে সকল চটী গ্রামের নিকটে ছিল, সেই সকল চটীতে প্রায়ই ডাকাতি হইত না, কারণ সেই চটীতে ডাকাতি হইলে পুলিশ আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে পীড়ন করিত, কিন্তু সকল চটী গ্রামের নিকট ছিল না, অনেক চটী গ্রাম হইতে তিন-চারি ক্রোশ দূরেও থাকিত।

উড়িষ্যার ডাকাতেরা কেবল যাত্রীদিগের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইত না,

তাহারা যাত্রীদিগকে টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া রাখিয়া যাইত, শিশু, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক সকলকেই হত্যা করিত। এই ভীষণ প্রকৃতির ডাকাতগণ উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী, অসভ্য অনার্য্য। তাহারা যেরূপ নিষ্ঠুর, তেমনই নির্ভীক। ডাকাত পড়িলে কোন কোন যাত্রী পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে, তাহারও উপায় ছিল না। কারণ ত্রিশ-চল্লিশ জন দস্যু গভীর রাত্রিতে চতুর্দ্দিক হইতে চটী বেষ্টন করিয়া যাত্রীদিগকে আক্রমণ করিত। তাহাদের এক হাতে প্রজ্বলিত মশাল ও অন্য হাতে উন্মুক্ত তরবারি থাকিত। লুণ্ঠনের পর তাহারা চটীর সন্নিহিত বন, জঙ্গল, জলাশয়, ধান্যক্ষেত্র প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া দেখিত যে কেহ লুকাইয়া আছে কিনা। চটীওয়ালারা অনেক সময় যাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিত যে তাহারা কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথায় যাইবে। ঐরূপ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাত্রীরা যদি কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আগমন এবং দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতেছে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট পাথেয় হিসেবেও অধিক টাকা থাকিবার সম্ভাবনা, চটীওয়ালারা এইরূপ অনুমান করিত।

আমরা প্রথম চটীতে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন খুব ভোরে, এমনকি অন্ধকার থাকিতে থাকিতে, যাত্রা আরম্ভ করিয়া বেলা সাড়ে নয়টা-দশটার সময় আর এক চটীতে উপস্থিত হইলাম। এই চটীতে হাঁড়ি ও কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আর রন্ধন হয় নাই। মা কটক হইতে খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। সকল চটীতেই দুধ এবং অনেক চটীতে মাছ কিনিতে পাওয়া যাইত। চটীওয়ালারা দুধ ও মাছ রাখিত না, গ্রামান্তর হইতে স্ত্রীলোকেরা মাছ ও দুধ চটীতে বিক্রয় করতে আসিত। তাহারা জানিত যে বেলা দশটা-এগারটায় এবং সন্ধ্যার সময় চটীতে যাত্রীরা আসিয়া থাকে, সেইজন্য তাহারা ঐ সময় নিজ নিজ পণ্য লইয়া চটীতে উপস্থিত হইত। যে দুগ্ধ বিক্রয় হইত তা কাঁচা দুগ্ধ নহে, জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ। অনেক সময় পথিমধ্যেও অনেক জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ কিনিতে পাওয়া যাইত। যে সকল গরুর গাড়ী উড়িষ্যা হইতে মেদিনীপুর যাতায়াত করিত, সেই সকল গাড়ীর গাড়োয়ানেরা জানিত যে কোন্ চটীতে রাত্রিযাপন নিরাপদ, কোন্ চটীতে ভাল তরিতরকারী পাওয়া যায়। সেইজন্য অনেক সময় তাহাদের প্রস্তাব অনুসারে চটীতে রাত্রিযাপন বা পরবর্ত্তী চটীর জন্য তরিতরকারী সংগ্রহ করা হইত। প্রাতে আহারাদির পর মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম এবং বেলা তিনটা-সাড়ে তিনটার সময় আবার যাত্রা আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার সময় আর এক চটীতে আশ্রয় গ্রহণ, এইরূপে আঠার-উনিশ দিন অতিবাহনের পর মেদিনীপুর হইতে কটক বা কটক হইতে মেদিনীপুরে যাতায়াত হইত।

শেষবারে কটক হইতে আসিবার সময় আমরা একবার ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের অপার করুণায় আমরা রক্ষা পাইয়াছিলাম। সেই কাহিনী বিবৃত করিয়া আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দাঁতন নামে একটি স্থান আছে। আমরা সন্ধ্যার পর সেই দাঁতনের চটীতে উপস্থিত হইলাম। আমার পিতার প্রশ্নের উত্তরে চটীওয়ালা বলিল যে, সে চটীতেই রাত্রিযাপন

করে। তাহার কথা শুনিয়া পিতা নিশ্চিন্ত হইলেন, মা রন্ধনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার মাতুল লক্ষ্য করিলেন একজনের পর একজন ভীষণাকৃতি লোক সেই চটীওয়ালার সহিত অস্ফুট স্বরে বাক্যালাপ করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার মনে সন্দেহ হইল যে লক্ষণ শুভ নহে। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় চটীওয়ালা আসিয়া বলিল, তাহার বাড়ী হইতে লোক ডাকিতে আসিয়াছে, তাহাকে বাড়ীতে যাইতে হইবে। মামা তাহাতে আপত্তি করিলেন, বাবা পুলিশের ভয় দেখাইলেন, সে কিন্তু কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেল। আমাদের চটীতে উপস্থিত হইবার কিছু পরে মেদিনীপুরের দিক হইতে তিনখানা গাড়ী আসিয়া চটীর উত্তর দিকে আশ্রয় লইয়াছিল। আমরা চটীর দক্ষিণ প্রান্তে ছিলাম। সেই গাড়ীর আরোহীদের সহিত কথাবার্ত্তার অবসর হয় নাই, সকলেই নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আমাদের একজন গাড়োয়ান আসিয়া সংবাদ দিল যে ডাকাত আসিতেছে! সেই কথা শুনিয়া বাবা ও মামা পথে বাহির হইয়া দেখিলেন, চটী হইতে অনেক দূরে, পথের উত্তর ও দক্ষিণে দুই সারি আলোক জ্বলিতেছে। সেই আলোকমালা ধীরে ধীরে চটীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহা দেখিয়া বাবা চটীর উত্তর দিকের যাত্রীদিগকে সংবাদ দিতে গেলেন।

বাবা গিয়া দেখিলেন, একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এবং তাঁহার ছয়জন দ্বারবান তথায় রহিয়াছেন। বাবা সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে ডাকাতদলের আগমন সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, "আপনাদের কোন ভয় নাই। আমি রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করি, সর্ব্বদা পাঁচ-সাত হাজার টাকা মূল্যের কাপড় লইয়া আমাকে এই পথে যাতায়াত করিতে হয় বলিয়া ছয়জন দ্বারবান সঙ্গে রাখি। উহাদের প্রত্যেকের এবং আমার সঙ্গে দুই-নলা বন্দুক আছে। ডাকাতদিগকে এই চটীতে পঁহুছিতে হইবে না। এই বলিয়া তিনি দ্বারবানদিগকে বন্দুক লইয়া প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন এবং আমার জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাবার সঙ্গে আমাদের বাসার কাছে আসিলেন। ডাকাতেরা তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। তিনি আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দ্বারবানদিগকে বন্দুকের মুখ আকাশের দিকে করিয়া আওয়াজ করিতে বলিলেন বন্দুকের শব্দ শুনিবামাত্র ডাকাতেরা স্থির হইয়া দাঁড়াইল, পাঁচ-ছয় মিনিট পরে আবার বন্দুকের শব্দ হইলে দস্যুদল মশাল নিবাইয়া অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গেল। পাছে তাহারা অন্ধকারে আসিয়া আক্রমণ করে সেইজন্য প্রভুর আদেশে দ্বারবানেরা সমস্ত রাত্রি পথে টহল দিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বন্দুকের শব্দ করিতে লাগল। আমার মনে পড়ে, প্রথম বার বন্দুকের শব্দ হওয়াতে আমি ও দাদা ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলাম।

পরদিন ভোরবেলা আমাদের প্রাণরক্ষাকারী সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বাবা বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনিও পথে আর কোথাও ডাকাতের ভয় নাই বলিয়া জননীকে আশ্বস্ত করিয়া দক্ষিণ মুখে সদলে প্রস্থান করিলেন, আমরাও নির্ব্বিঘ্নে বাংলায় প্রবেশ করিলাম।

সেকালের ছাত্রসমাজ

সেকালের ছাত্রসমাজের সহিত একালের ছাত্রসমাজের যে কত প্রভেদ, তাহা আমার মত বৃদ্ধেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই প্রভেদ বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায় ছাত্রদের বেশভূষায় এবং আচার-ব্যবহারে।

আমরা যখন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে পড়িতাম তখন বাইসিক্‌ল ছিল না। সকল ছাত্রই পদব্রজে স্কুলে যাতায়াত করিত, দুই-চারি জন ধনবানের সন্তান ঘরের গাড়ীতে যাতায়াত করিত। আমাদের বাটী হইতে হুগলী কলেজ প্রায় তিন মাইল। কিন্তু আমাদিগকে প্রত্যহ দুই বেলা এই তিন মাইল তিন মাইল ছয় মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইত না। আমাদের সময়ে কলেজে ও স্কুলে ছাত্র লইয়া যাইবার জন্য অনেকগুলি নৌকা ছিল। প্রত্যেক নৌকায় বার-চৌদ্দ জন করিয়া ছাত্র যাইত। হুগলী কলেজ গঙ্গার উপরেই অবস্থিত, গঙ্গার পশ্চিমকূলে, উত্তরে বাঁশবেড়ে হইতে দক্ষিণে ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া এবং গঙ্গার পূর্ব্বতীরে উত্তরে কাঁচড়াপাড়া হইতে দক্ষিণে শ্যামনগর মূলাযোড় পর্য্যন্ত সকল জনপদ হইতেই শত শত ছাত্র নৌকাযোগে যাতায়াত করিত। এইরূপ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশখানা নৌকা ছিল। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক নৌকাতেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র থাকিত। আমাদের নৌকাতে, আমাদের উপরি শ্রেণীস্থ এবং কলেজেরও কয়েক জন ছাত্র যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদের সম্মুখে আমরা কখনও চপলতা বা বাচালতা করিতে সাহস করিতাম না, করিলেও তাঁহারা কখনও তাহা উপেক্ষা করিতেন না, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে চপলতা করিতে দেখিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেরূপ শাসন করেন, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ আমাদের সময়ে সেইরূপ নিম্নশ্রেণীস্থ ছাত্রগণের অশিষ্ট ব্যবহার দেখিলে শাসন করিতেন, এমনকি কর্ণমর্দ্দন পর্য্যন্ত করিতেন। আমরা আমাদের এক ক্লাস বা দুই ক্লাস উপরের ছাত্রদিগকেও অগ্রজের মতই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতাম। আমাদের কোন ত্রুটি দেখিয়া তাঁহারা শাসন করিলে আমরা বিনা প্রতিবাদে তাঁহাদের শাসন মানিয়া লইতাম।

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন কলিকাতার ছাত্রসমাজ কিরূপ ছিল জানি না, কারণ সে সময় আমি কদাচিৎ কলিকাতায় আসিতাম, কলিকাতায় ছাত্রসমাজের সহিত আমার কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু সেকালের চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী প্রভৃতি স্থানের ছাত্রসমাজের সহিত, একালের স্থানীয় ছাত্রসমাজের তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পঞ্চাশ-ষাট বৎসরে, ছাত্রসমাজে শিষ্টাচার সম্বন্ধে কি ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন দেখিতে পাই যে, নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের অধিকাংশই তিন-চারি ক্লাস উপরের ছাত্রগণের সহিত সমকক্ষভাবে 'ইয়ার্কি' দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না, কিন্তু আমাদের সময়ে আমরা এক ক্লাস উপরের ছাত্রদিগের সহিত সমান ভাবে মিশিতে কুণ্ঠাবোধ করিতাম। খেলার সময় উচ্চতর বা নিম্নতর ক্লাসের ছাত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া খেলা করিতাম বটে, কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রেও দুই-এক বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ বা দুই-এক ক্লাস উপরের ছাত্রদিগকে যথোচিত সম্মান করিতাম। যাহারা সেরূপ সম্মান করিত না, তাহাদিগকে আমরা অভদ্র মনে করিতাম।

আমরা যখন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন আমাদের ক্লাসের যে-সকল ছাত্র বোর্ডিঙে থাকিত, তাহারা মধ্যে মধ্যে চন্দননগরে বেড়াইতে আসিত। সে-সময় চন্দননগরের মসিয়ে কুর্জ্জন নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক নিজের বাড়ীতে একটা ছোটখাট পশুশালা করিয়াছিলেন। তাহাতে সিংহ, বাঘ, হায়না, গণ্ডার, জিরাফ, বনমানুষ এবং নানা জাতীয় পশু এবং কয়েক প্রকার বানর ছিল। ঐ সাহেব নিজের নবনির্ম্মিত অট্টালিকাও নানাপ্রকার বহুমূল্য সাজসজ্জায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুসজ্জিত আবাস ও পশুশালা দেখিবার জন্য প্রত্যহ বহু লোকের সমাগম হইত। আমাদের সতীর্থদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই উহা দেখিবার জন্য অবকাশ পাইলেই চন্দননগরে আসিত এবং আমাদের বাটী কুর্জ্জন সাহেবের বাটীর অদূরে ছিল বলিয়া প্রায়ই আমাদের বাটীতে আসিত। উহারা আমাদের বাটীতে আসিলে আমার জননী তাহাদিগকে জলযোগ না করাইয়া ছাড়িতেন না। দূরবর্ত্তী স্থানের যে-সকল ছাত্র বোর্ডিঙে থাকিত, তাহাদের পক্ষে প্রতি শনিবারে বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'মুখ বদলাইবার জন্য' মাঝে মাঝে আমাদের বাটীতে আহার করিত। তাহারা শনিবারে স্কুলের ছুটির পর আমাদের সঙ্গে নৌকা করিয়া চন্দননগরে আসিত এবং সোমবার প্রাতে আহারাদি করিয়া আমাদের সঙ্গেই আবার স্কুলে যাইত। আমার যে-সকল সতীর্থ আমাদের বাড়ীতে আসিত, তাহারা সকলেই আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিত, মাও তাহাদিগকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমার ছোট ভাই ও ভগিনীরা তাহাদিগকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরের রবিবারে আমার মা তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন।

সেকালে ছাত্রসমাজে ধূমপান ছিল না বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। আমার বয়স যখন চৌদ্দ কি পনের বৎসর, সেই সময় আমার কোন সহপাঠীর অগ্রজকে আমি চুরুট খাইতে দেখিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি, তখন বোধহয় কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেন। তাহার পূর্ব্বে আমি কোন ছাত্রকে ধূমপান করিতে দেখি নাই। আমাদের ধারণা ছিল যে বয়োবৃদ্ধ লোকেই ধূমপান করে, ছাত্রজীবনে উহা অস্পৃশ্য। আমাদের ছাত্রাবস্থায় সিগারেটের প্রচলন ছিল না। যাহারা ধূমপান করিত, তাহারা হুঁকা কলিকার সাহায্যে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবেই ধূমপান করিত; বাঙালীদের মধ্যে কদাচিৎ চুরুট ব্যবহৃত হইত, আমরা জানিতাম চুরুটটা সাহেবদিগেরই ব্যবহার্য্য। আজকাল দেখিতে পাই সিগারেট ও বিড়ি ছাত্রসমাজে পান ও চায়ের মত বহুল প্রচলিত হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি সেকালে স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে তাম্বূলের ব্যবহারও খুব অল্পই ছিল। পান খাইলে জিব মোটা হয়, ইংরেজী শব্দের ঠিক উচ্চারণ হয় না, বোধহয় এই ধারণা সেকালে ছাত্রসমাজে বদ্ধমূল থাকাতেই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে তাম্বূলচর্ব্বণের প্রথা খুব অল্প ছিল।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় মফঃস্বলের কোথাও ফুটবল খেলা ছিল না। কলিকাতাতেও তখন বোধহয় অতি অল্প লোকেই ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেকালে জিমন্যাষ্টিকেরই প্রচলন ছিল। প্রায় প্রত্যেক বড় বড় স্কুলে ছাত্রদের শরীরচর্চ্চার জন্য

প্যারালাল বার, হোরাইজন্টাল বার এবং ট্রাপিজ বার ছিল। স্কুলের বাহিরে প্রায় প্রতি পাড়াতেই একটা জিমন্যাষ্টিক গ্রাউণ্ড বা আখড়া ছিল, সেখানেই দশ-পনের জন বালক ও যুবক মিলিত হইয়া জিমন্যাষ্টিক করিত। জিমন্যাষ্টিক ব্যতীত কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতির আখড়াও ছিল। ভেলদিগ্‌দিগ্ বা কপাটীখেলা বাঙালী বালক ও যুবকগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ক্রীড়া ছিল। কিন্তু সেকালে আমাদের এই জাতীয় ক্রীড়াতে প্রতিযোগিতা ছিল না। স্থানীয় বালক ও যুবকগণ আপনাদের মধ্যেই এই খেলা করিত, অন্য স্থানের ছেলেদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইত না। পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি '*দৈনিক হিতবাদী*'তে বাংলার জাতীয় ক্রীড়া সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে, কি সভ্য কি অসভ্য সকল সমাজেই কোন-না-কোন প্রকার জাতীয় ক্রীড়া আছে। এই কপাটীখেলা বাংলার জাতীয় ক্রীড়া; অতি প্রাচীন কাল হইতে বাংলার বালক এবং যুবকসমাজে কপাটী খেলার প্রচলন আছে। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের কিছুদিন পরে, চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের[১৪] প্রতিষ্ঠাতা এবং 'প্রবর্ত্তক'[১৫] নামক মাসিক কাগজের সম্পাদক, আমার স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়[১৬] তাঁহার সঙ্ঘস্থিত বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের মধ্যে কপাটী খেলা উন্নত প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত করেন এবং ঐ খেলার কতকগুলি নিয়মকানুন প্রণয়ন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন ও সেই পুস্তিকার মুখবন্ধস্বরূপ, 'হিতবাদী'তে প্রকাশিত আমার সেই প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেন। মতিবাবুই প্রথমে ভেলদিগ্‌দিগ্ খেলার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে একটি 'শীল্ড' বা ঢাল প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার জন্য চন্দননগরের পালপাড়া, গোন্দলপাড়া প্রভৃতি পল্লীর ছাত্রগণের দ্বারা কয়েকটি ভেলদিগ্‌দিগ্ সমিতি গঠিত হয়। আজকাল কলিকাতা, বালী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, হাওড়া, হুগলী, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে বহু কপাটী বা ভেলদিগ্‌দিগ্ সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং বেশ সমারোহের সহিত ঐ খেলার প্রতিযোগিতা হয়। মতিবাবু আমাদের এই জাতীয় ক্রীড়াকে 'ফুটবল' 'ক্রিকেট' 'টেনিস' প্রভৃতি বৈদেশিক ক্রীড়ার সমান মর্য্যাদা প্রদান করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। জাতীয় খেলাধূলার প্রতি অনুরাগ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানেরই পরিচায়ক।

আমার মনে হয় যে, সেকাল অপেক্ষা একালের ছাত্রসমাজে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান প্রবল হইয়াছে। সেকালে ছাত্রসমাজে দেশাত্মবোধ ছিল না বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সমসাময়িক ছাত্রসমাজে স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশানুরাগের সূত্রপাত হইয়াছিল কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৮৩৮-১০৯৩] 'ভারতসঙ্গীত'[১৭] হইতে। তাঁহার সেই—

বাজরে বীণা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

আবৃত্তি করিতে করিতে সেকালের যুবকদের হৃদয় উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিত। কিন্তু সেই উৎসাহ ঐ কবিতার আবৃত্তিতেই শেষ হইত। সেকালে কোন বাঙালী শ্বেতাঙ্গের সহিত যে মারামারি করিতে পারে, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারিতাম না। কোন শ্বেতাঙ্গ কোন অন্যায় কার্য্য বা অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিকার আমরা অসম্ভব বলিয়াই মনে করিতাম। সেকালের বাঙালীর এই ভীরুতা দর্শনে স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ রায় লিখিয়াছেন—

একটা সাহেব যদি রেগে ওঠে
শতটা বাঙালী প্রাণভয়ে ছোটে
'দে রে জল' বলি ভূমিতলে লোটে
ঘুষির প্রহারে কাতর হয়।

সত্যই এখনকার পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীর ভীরুতা ও কাপুরুষতা এইরূপই ছিল। সেইজন্য আমরা বাল্যকালে যখন গল্প শুনিতাম যে, স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ একাকী চার-পাঁচটা গোরাকে মল্লযুদ্ধে হঠাইয়া দিয়াছেন, বিলাতে গিয়া সেখানে সাহেবের সঙ্গে মারামারি করিয়া নাম কিনিয়াছেন, তখন আমরা জিতেন্দ্রনাথকে অতিমানব বলিয়া মনে করিতাম। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, একজন ফিরিঙ্গী, কি একটা কাবুলী রেলের গাড়ীর একটা কক্ষ একাকী অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, অন্যান্য কক্ষে যাত্রীর খুব ভীড় হইয়াছে অথচ কোন যাত্রী সাহস করিয়া সেই ফিরিঙ্গী বা কাবুলীর অধিকৃত কক্ষে প্রবেশ করিতেছে না, কি জানি পাছে সে অপমান করে। এই অপমানের ভয়ে ন্যায্য অধিকার পরিত্যাগ যে কত বড় অপমান, সেকালের অতি অল্প বাঙালী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। একালের ছাত্রসমাজের তুলনায় যে সেকালের ছাত্রসমাজ অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ ছিল তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই।

মনে পড়ে ১৮৮৭ বা '৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফরাসী ভারতে conscription বা বাধ্যতামূলক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে চন্দননগরে জনসাধারণের মধ্যে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। কন্‌স্ক্রিপ্‌শন আইন অনুসারে যাহারা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে, তাহাদিগকে বিদেশে গিয়া যুদ্ধ করিতে হয় না, যদি কখনও শত্রুপক্ষ তাহাদের দেশ আক্রমণ করে, তবেই তাহাদিগকে দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হয়। ফরাসী ভারতে ঐ আইন প্রবর্ত্তিত হইলে কোন ভারতীয় ফরাসী প্রজাকে ভারতের বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিতে হইত না, যদি কোন শত্রুপক্ষ ভারতে ফরাসী অধিকার আক্রমণ করিত তাহা হইলেই সেই শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। ফরাসী ভারতে সেরূপ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না, সুতরাং চন্দননগরের কোন যুবক কন্‌স্ক্রিপ্‌শন তালিকাভুক্ত হইলেও তাহাকে কখনই কোন রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে হইবে না, ইহা জানিয়াও লোকে ভয়ে অস্থির হইয়াছিল এবং যাহাতে ফরাসী ভারতে বাধ্যতামূলক সমরশিক্ষা প্রবর্ত্তিত না হয়, সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। ঐ

আবেদনের ফলেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষ ফরাসী ভারতে কন্‌স্ক্রিপ্‌শনের আইন প্রবর্ত্তিত করেন নাই। যে চন্দননগর সেকালে কন্‌স্ক্রিপ্‌শনের ভয়ে অস্থির হইয়াছিল, সেই চন্দননগরই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, ইউরোপীয় মহাসমরে সর্ব্বাগ্রে স্বেচ্ছায় বাঙালী যুবকদলকে সৈনিকরূপে প্রেরণ করিয়াছিল। চন্দননগরের যুবকগণকে স্বেচ্ছায় সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখিয়া পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে প্রভৃতি ফরাসী উপনিবেশের যুবকগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল। ভার্দ্দুনের রণক্ষেত্রে বাঙালী গোলন্দাজ সেনার সাহস ও রণকৌশল দর্শন করিয়া একজন প্রবীণ ফরাসী সেনাপতি তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভার্দ্দুনের রণক্ষেত্রে যদি এক রেজিমেণ্ট বাঙ্গালী সেনা থাকিত তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই জর্ম্মন সেনাকে ভার্দ্দুন পরিত্যাগ করিতে হইত। এখন যদি ফরাসী গবর্ণমেণ্ট থাকায় ফরাসী ভারতে বাধ্যতামূলক সমরশিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে চন্দননগের শত শত বাঙালী যুবা স্বেচ্ছায় সমর-বিদ্যা শিক্ষায় অগ্রসর হইবে, তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে চন্দননগরের যুবকসমাজের মনোভাবের এই পরিবর্তন বিস্ময়কর নহে কি?

আজকাল আমরা দেখিতে পাই, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব রোষে বিপন্ন জনগণকে রক্ষা ও সাহায্য করিবার জন্য ছাত্রসমাজই অগ্রণী হয়। দেশহিতকর কার্য্যে অর্থের প্রয়োজন হইলে, ছাত্রগণই সর্ব্বাগ্রে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ কার্য্য সেকালের ছাত্রসমাজে অজ্ঞাত, এমনকি ধারণারও অতীত ছিল। আমাদের বয়স যখন আট বৎসর কি নয় বৎসর, সেই সময়ে মাদ্রাজে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সে-যুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'সুলভ সমাচার'[৭৮] ছাত্রসমাজের বিশেষ প্রিয় ছিল। সেই 'সুলভ সমাচারে' মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সকলকে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। বোধহয় সেই চিত্র ও আবেদন পাঠ করিয়া আমাদের স্কুলের শিক্ষকদিগের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল, তাই তাঁহারা একদিন প্রত্যেক ক্লাসের ছাত্রদিগকে দুই আনা বা এক আনা করিয়া চাঁদা দিতে বলিয়াছিলেন। আমরাও চাঁদা দিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদিগকে সাহায্য করিবার জন্য স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীর বা কলেজের ছাত্রদিগকে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পৃথক্ ভিক্ষা করিতে দেখি নাই। এই সকল ব্যাপারে যে সেকালের ছাত্রসমাজ অপেক্ষা একালের ছাত্রসমাজেক কর্ত্তব্যজ্ঞান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেকালের ছাত্রদের তুলনায় একালের ছাত্রগণ অত্যধিক বিলাসী হইয়াছে। একালের ছাত্রগণ ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়ার জন্য যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে পারে বটে, কিন্তু সাংসারিক কার্য্যে তাহারা অত্যন্ত বাবু হইয়া পড়িয়াছে। এখনও পল্লীগ্রামে অনেক স্কুলের ছাত্রসমাজে শহরের ছাত্রদের মত বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই সত্য, কিন্তু বালক ও যুবকগণ যেরূপ অনুকরণপ্রবণ, তাহাতে আর কিছু দিন পরে পল্লীগ্রামের ছাত্রসমাজেও বিলাসিতা প্রবেশ করিবে সন্দেহ নাই। সকল দেশেই

রাজধানীই বিলাসিতার কেন্দ্রস্থল। রাজধানীর ফ্যাশানই বন্যার জলের মত ধীরে ধীরে দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতার ছাত্রসমাজের অনুকরণ করে পল্লীগ্রাম অঞ্চলের ছাত্রগণ। সুতরাং কলিকাতার ছাত্রসমাজের সকল বিষয়েই সাবধান হওয়া উচিত।

আমরা বাল্যকালে, চন্দননগর গড়ের স্কুলে পড়িতাম। গড়বাটী নামক পল্লীতে ঐ স্কুলটি অবস্থিত বলিয়া লোকে সংক্ষেপতঃ উহাকে গড়ের স্কুল বলিত। ঐ স্কুল আমাদের বাটী হইতে অন্যূন দেড় মাইল বা তিন পোয়া দূরে। আমার বয়স যখন সাত বৎসর কি আট বৎসর তখন আমি ঐ স্কুলে প্রবেশ করি। আমাদের বাটীর নিকটে, ফরাসী মিশনারীদের 'সেণ্ট মেরিজ ইনষ্টিটিউশন' নামে আর একটি স্কুল ছিল কিন্তু তাহাতে ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না, ফরাসী শিক্ষার প্রতি মিশনারীদের ঝোঁক ছিল বলিয়া তথায় ফরাসী শিক্ষাটাই ভালরূপ হইত। ঐ স্কুলে ফরাসী-বিভাগে ছাত্রদের বেতন ছিল না, সেজন্য ঐ স্কুলে ফরাসী-বিভাগে দরিদ্র ছাত্রগণই অধ্যয়ন করিত। যাঁহারা বাংলা এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা পুত্রদিগকে গড়ের স্কুলেই ভর্ত্তি করিয়া দিতেন। সেইজন্য আমরা বাটীর কাছে 'সেণ্ট মেরিজ ইনষ্টিটিউশন' থাকিতেও দেড় মাইল দূরবর্ত্তী গড়ের স্কুলেই ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, ফরাসী গবর্ণমেন্ট মিশনারীদিগের হাত হইতে লোকশিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করাতে 'সেণ্ট মেরিজ ইনষ্টিটিউশনের' মিশনারী শিক্ষকগণ চন্দননগর হইতে প্রস্থান করেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ স্কুলের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে 'ডুপ্লে কলেজ'এ নামে অভিহিত করিলেন, কিন্তু তখন উহাতে কলেজ বিভাগ ছিল না, এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত ছিল। কয়েক বৎসর পরে উহাতে কলেজ ক্লাস খোলা হয়। গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিবার পর হইতেই 'ডুপ্লে কলেজে' ইংরাজী শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়।

সেকালের ছাত্রসমাজের প্রসঙ্গে 'ডুপ্লে কলেজ'এর ইতিহাস অবান্তর হইলেও, বাটীর কাছে স্কুল থাকিতেও কেন আমরা গড়ের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম, পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। চন্দননগরের পশ্চিমে, বেজড়া, নবগ্রাম, আলতাড়া প্রভৃতি গ্রামের বহু ছাত্রও গড়ের স্কুলে পড়িত। গড়ের স্কুল হইতে ঐ সকল গ্রামের দূরত্ব দুই ক্রোশ, আড়াই ক্রোশ হইবে। সুতরাং ঐ সকল গ্রামের ছাত্রগণকে গড়ের স্কুলে পড়িবার জন্যে প্রত্যহ চার-পাঁচ ক্রোশ পদব্রজে যাতায়াত করিতে হইত। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার বৃষ্টিধারা মাথায় করিয়া দশ-বার বৎসর বয়স্ক বালকগণ দুই ক্রোশ আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্কুলে পড়িতে যাইত, ইহা একালের কলিকাতা বা মফঃস্বলের শহরবাসী ছাত্রগণ বোধ হয় ধারণাই করিতে পারে না। তাহারা ফুটবল গ্রাউণ্ডে খেলার সময় বোধ হয় সাত-আট মাইল দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে, কিন্তু এক মাইল দূরবর্ত্তী স্কুল বা কলেজে যাইতে হইলে ট্রাম কিংবা বাস্ না হইলে যাইতে পারে না। একদিন একজন ভদ্রলোক দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন, "আজকালকার ছেলেরা ফুটবল খেলিবার সময় একঘণ্টা ধরিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে কষ্টবোধ করে না, কিন্তু বাজারে

বা দোকানে যাইতে বলিলেই তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। সেদিন আমার ছেলেকে বাজারে যাইতে বলাতে সে উত্তর করিল সাইকেলে লিক্ হয়েছে, কি ক'রে যাব?" বলা বাহুল্য যে একালের অধিকাংশ ছেলেরই সাংসারিক কার্য্যে কোথাও যাইতে হইলেই বাইসিক্লে লিক্ হয়।

আমরা বাল্যকালে বোধ হয় মাসের মধ্যে পনের কি কুড়ি দিন জুতা না পরিয়াই স্কুলে যাইতাম। আমাদের যে জুতা ছিল না তাহা নহে, 'দেড় মাইল পথ যাইব, নাইবা জুতা পায়ে দিলাম' এই কথাটাই মনে হইত। আমাদের সময়ে স্কুলের বোধ হয় অর্দ্ধেক ছাত্র নগ্নপদেই স্কুলে যাইত আর আজকাল সেই গড়ের স্কুলে শতকরা পাঁচ জন ছেলে নগ্নপদে যায় কিনা সন্দেহ। সেকালের ছাত্রসমাজে বেশভূষার পরিপাট্য ছিল না বলিলেই হয়। একখানা পরিধেয় কাপড় এবং গায়ে একটা জামা—তা সেই জামায় বোতাম থাকুক আর নাই থাকুক, ইহাই ছিল সাধারণ ছাত্রের বেশ। শীতকালে সেই জামার উপর একখানা মোটা চাদর অথবা দোলাই। যাহারা একটু সাজসজ্জা করিয়া যাইত তাহাদিগকে সকলে বাবু বলিয়া লজ্জা দিত। স্কুলে কোন ছাত্রের মাথায় 'সিঁতা' বা 'টেরি' ছিল না। আমরা যখন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতাম, তখন শিবচন্দ্র সোম মহাশয় হেডমাষ্টার ছিলেন। কোন ছাত্র সিঁতা কাটিয়া স্কুলে গেলে তিনি সেই ছাত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চুল এলোমেলো করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, cultivate the inner part of your head, not the outer part. একালের ছাত্রদের বেশভূষার পরিপাট্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, সকলেই তাহা দেখিতে পাইতেছেন। একদিন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ট্রামে কয়েকজন স্কুলগামী ছাত্রকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এখনকার ছেলেরা সেজেগুজে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে কি স্কুলে যাইতেছে তাহা বলা কঠিন।" কথাটা মিথ্যা নহে।

পুত্রকন্যাদের স্কুলের বেশভূষা জোগান একালের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের পক্ষে একটা দায় হইয়াছে। এই দায় আরও বাড়াইয়াছে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী। সেকালে একখানা কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী, পদ্যপাঠ প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ,[৯৯] লোহারামের ব্যাকরণ,[১০০] শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূগোলসূত্র,[১০১] প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর পাটীগণিত[১০২] বহু বৎসর ধরিয়া স্কুলে চলিত। গৃহস্থ একবার কয়েকখানা পুস্তক কিনিয়া কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতেন, সেই পুস্তক তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, মধ্যম পুত্র, তৃতীয় পুত্র প্রভৃতি পরে পরে অধ্যয়ন করিত। ইংরাজী স্কুলেও ঐরূপ ছিল, বার্ণার্ড স্মিথের বা পি. ঘোষের এলজেব্রা, এরিথ্মেটিক, ইউক্লিডের জিয়মেট্রি, লেনিজ গ্রামার, লেথ্ব্রিজের সিলেকশন্স্ প্রভৃতি পুস্তক বহু বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ে পঠিত হইত। দরিদ্র ছাত্রেরা উপর ক্লাসের ছাত্রদের নিকট হইতে পুরাতন পুস্তক চাহিয়া লইয়া পড়িত। ছাত্রগণ প্রথমে স্লেটে অঙ্ক কষিয়া পরে সেই অঙ্ক খাতাতে তুলিত। গড়ের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ পর্য্যন্ত স্কুলে স্লেট লইয়া যাইত। আজকাল প্রতি বৎসর নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা হওয়াতে দরিদ্র ছাত্রদের অভিভাবকবর্গ অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। কেবল পাঠ্যপুস্তকে নিস্তার নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থ-

পুস্তকও চাই। আমাদের সময়ে এত অর্থ-পুস্তকের ছড়াছড়ি ছিল না। আমরা দুর্ব্বোধ্য শব্দের অর্থ ডিক্‌শনারি বা অভিধান দেখিয়া বাহির করিতাম ও খাতাতে লিখিয়া লইতাম। আমরা এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিয়া প্রথমে ইংরাজী সাহিত্যের অর্থ-পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলাম। সংস্কৃতের অর্থ-পুস্তক দ্বিতীয় শ্রেণীতে কিনিয়াছিলাম। আজকাল নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের হাতে বড়-একটা স্লেট দেখিতে পাই না; অঙ্ক, শ্রুতিলিখন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই কাগজে কলমে করিতে হয়। আমরা যখন নিম্নশ্রেণীতে পড়িতাম 'এক্সারসাইজ বুক' নামক খাতা কিনিতে পাওয়া যাইত না, অন্ততঃ মফঃস্বলে ছিল না, কলিকাতায় ছিল কি না বলিতে পারি না। আমরা ডিক্‌শনারি বা অভিধান দেখিয়া যে-খাতায় শব্দের অর্থ লিখিতাম, সে-খাতা আমরা নিজেরাই তৈয়ারী করিতাম। সুতরাং সকল ছাত্রের খাতা ঠিক একই আকারের হইত না।

আমাদের সময়ে ষ্টীল পেনের প্রচলন খুব অল্প ছিল। বাংলা হস্তাক্ষরের জন্য কঞ্চি, শর, খাগড়া বা পাহাড়ে কলমীলতার কলম ব্যবহার করিতাম, ইংরাজী হস্তাক্ষরের জন্য কুইল পেন বা হংসপুচ্ছ লেখনী ব্যবহার করিতাম। বালক-বালিকারা প্রথমেই ষ্টীল পেনে লিখিতে আরম্ভ করিলে হাতের লেখা পাকিতে বিলম্ব হয় এবং নিবের খোঁচাতে অনেক সময় কাগজ ছিঁড়িয়া যায়। আমরা বোধ হয় স্কুলে তিন-চারি বৎসর পরে ষ্টীল পেনে হাত দিয়াছিলাম। কুইল পেনের ব্যবহার আজকাল নাই বলিলেই হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর আমি কলিকাতায় কোন সওদাগরী আপিসে কর্ম্ম করিয়াছিলাম। সেই আপিসের বড়সাহেব কখনও ষ্টীল পেন ব্যবহার করিতেন না, তিনি সর্ব্বদাই কুইল পেন ব্যবহার করিতেন, অনেক সময় খাগড়ার কলমেও লিখিতেন। তিনি অবসর লইয়া স্বদেশে যাইবার সময় আফিসের বড়বাবুকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার জন্য যেন মধ্যে মধ্যে কিছু খাগড়ার কলম কাটিয়া তাঁহার কাছে পাঠান হয়। বড়সাহেব যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন বড়বাবু প্রতি বৎসর বড়দিনের উপহারস্বরূপ পাঁচ-ছয় ডজন খাগড়ার কলম কাটিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতেন।

আমরা যে-বৎসর হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, সেই বৎসর স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৪৮-১৯২৫] মহাশয়ের বিরুদ্ধে আদালত-অবমাননার অভিযোগ ও বিচারে তাঁহার কারাদণ্ড[১০৩] হয়। এই ঘটনাই বোধ হয় বাঙালী ছাত্রজীবনে রাজনীতিক আলোচনার সূত্রপাত করে। সুরেন্দ্রবাবুর কারাদণ্ড হইবার পর, কলিকাতার অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা কয়েক দিনের জন্য পাদুকা ত্যাগ করিয়া শুধুপায়ে বিদ্যালয়ে গিয়াছিল। হুগলী কলেজেও কলিকাতার সেই তরঙ্গ লাগিয়াছিল; কলেজ ক্লাসের অনেক ছাত্র পাদুকা ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু আমাদের হেডমাষ্টার মহাশয় স্কুল-বিভাগের ছাত্রদিগকে পাদুকা ত্যাগ করিতে নিষেধ করাতে আমরা পাদুকা ত্যাগ করি নাই। বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষেই আমাদের দেশের ছাত্রগণের মধ্যে রাজনীতিক আন্দোলন প্রকট হইয়াছিল। বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রবাবু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দেশে দেশে বক্তৃতা করিয়া ছাত্রসমাজে দেশাত্মবোধের

সঞ্চার করিয়াছিলেন, ছাত্রগণ পিকেটিং প্রভৃতি দ্বারা সেই দেশাত্মবোধ কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে ছাত্রসমাজকে দলবদ্ধভাবে অনুরূপ কোন কার্য্য করিতে বড় দেখা যাইত না। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ করিয়া বাঙালীর তথা বাংলার ছাত্রসমাজে, জাগরণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একালের ছাত্রসমাজে যেমন অনেক গুণ আছে, সেইরূপ অনেক দোষও প্রবেশ করিয়াছে। সেকালের ছাত্রসমাজও দোষেগুণে মিশ্রিত ছিল। যাঁহারা সেকালের ছাত্রসমাজ দেখিয়াছেন, এবং একালেও ছাত্রসমাজ দেখিতেছেন, তাঁহারা সহজেই উভয় কালের ছাত্রসমাজের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। সেকালের ছাত্রমাজের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আকর্ষণ এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান কম ছিল, একালের ছাত্রসমাজে অবিনয়, অশিষ্টতা, বিলাসিতা এবং সাংসারিক ব্যাপারে ঔদাস্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা আমরা অর্থাৎ বৃদ্ধের দল বেশ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

সেকালের বিবাহ

আমার প্রবন্ধের নাম শুনিয়াই হয়ত অনেকে বলিবেন—"বিবাহে আবার সেকাল-একাল কি? সেই বৈদিক মন্ত্র, সেই স্ত্রী-আচার, সেই বাসর, সেই কুশণ্ডিকা, সেই ফুলশয্যা—সেকালে যাহা ছিল, একালেও তাহাই আছে, তবে সেকালের বিবাহ নাম দিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন কি?"

প্রয়োজন আছে। কারণ, আমরা সেকালে, অর্থাৎ আমাদের বাল্যকালে বা যৌবনে, বিবাহের ক্রিয়াকর্ম্ম যেরূপ দেখিয়াছি, একালে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার মনে হয় যে, আর পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পরে ভাবী তরুণ-তরুণীরা কল্পনাও করিতে পারিবেন না যে, তাঁহাদেরই পিতামহ প্রপিতামহের বিবাহ কিরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, আমি যাহাকে 'সেকালের বিবাহ' বলিতেছি, তাহা কলিকাতা অঞ্চলে ও মফঃস্বলের অনেক শহরে সেকালের তালিকা-ভুক্ত হইলেও এখনও পল্লীগ্রামের বহু স্থানে 'একাল' হইয়াই আছে, অর্থাৎ আমরা পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বা শহর অঞ্চলে বিবাহের যে-সকল আচার-অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি দেখিয়াছি, মফঃস্বলের বহু স্থানে তাহা এখনও বিদ্যমান আছে, সুতরাং সেই সকল গ্রামের অধিবাসীরা আমার এই প্রবন্ধে নূতন কিছু দেখিতে পাইবেন না; বরং তাঁহাদের জন্য 'একালের বিবাহ' নাম দিয়া প্রবন্ধ লিখিলে হয়ত সেই প্রবন্ধে তাঁহারা অনেকে নূতন বিষয় দেখিতে পাইবেন।

বিবাহে এমন অনেক আচার-অনুষ্ঠান আছে, যাহা সকল জেলায় সমান নহে। জেলাভেদে অনুষ্ঠানের পার্থক্য ত আছেই, অনেক আচার ও অনুষ্ঠান গ্রামভেদে, এমন কি পরিবারভেদে পৃথকরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমি যখন 'কাব্যনিধি'তে কার্য্য করিতাম, সেই সময় আমার কোন পুত্রের বিবাহের পূর্ব্বে 'কাব্যনিধি'র ভূতপূর্ব্ব প্রুফ-রীডার, বিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত ধীরানন্দ কাব্যনিধি মহাশয়কে গাত্রহরিদ্রার জন্য

একটা শুভদিন দেখিতে অনুরোধ করিলে 'কাব্যনিধি'র তদানীন্তন সম্পাদক পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন, "বিবাহের পূর্ব্বে পৃথক একটা দিনে গাত্রহরিদ্রা আমাদের দেশে নাই, ওটা পশ্চিমবঙ্গেই প্রচলিত দেখিতে পাই।" আমি বলিলাম—"কিন্তু পঞ্জিকাতে ত গাত্রহরিদ্রার দিন শুভকর্ম্মের তালিকায় লেখা থাকে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "অধিকাংশ পঞ্জিকাই পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়, সেই জন্যই পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত গাত্রহরিদ্রার দিনও পঞ্জিকাতে লিখিতে হয়। আমাদের ত্রিপুরায়, বিবাহের পূর্ব্বে একদিন 'অভিষেক' হয়, আপনাদের দেশে অভিষেক বলিয়া কিছু হয় না।" এইরূপ অনেক ব্যাপার, অনেক ক্ষেত্রে একই স্থানে এক পরিবারে অনুষ্ঠিত হয়, অন্য পরিবারে অনুষ্ঠিত হয় না। আমি পশ্চিমবঙ্গ (হুগলী জেলা) নিবাসী নিকষ কুলীনসন্তান, সুতরাং আমার এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের কথাই অধিক থাকিবে।

সেকালে আমাদের ব্রাহ্মণসমাজে, ঘটকের সাহায্য ব্যতীত কোন বিবাহই হইত না। অমৃতলাল বসুর [১৮৩৯-১৯১৩] 'বিবাহবিভ্রাট'[১০৪] প্রহসনে ঘটক বলিতেছেন, "আমি ঘটক, প্রজাপতির পাখ্না" অর্থাৎ পক্ষ না থাকিলে কোন পতঙ্গ যেরূপ অচল হইয়া থাকে, ঘটক না থাকিলে সেইরূপ বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজাপতিও অচল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। সেকালে দেশবিখ্যাত বড় বড় ঘটক ছিলেন, তাঁহাদের চতুষ্পাঠী থাকিত, সেই চতুষ্পাঠীতে ঘটকালি শিক্ষার্থী ছাত্র থাকিত। ঘটকেরা ব্রাহ্মণদিগের কুলের সংবাদ রাখিতেন বলিয়া, জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা যেরূপ গ্রহাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, ঘটকেরা সেইরূপ কুলাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। সেকালে অধিকাংশ ঘটকেরই 'চূড়ামণি' উপাধি ছিল।

পাত্র বা পাত্রীর পিতা অথবা অভিভাবকেরা ঘটকের নিকট গিয়া সংবাদ লইতেন যে, তাঁহাদের সমকক্ষ কৌলীন্যমর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন। যিনি সংবাদ লইতে যাইতেন, অগ্রে তিনি নিজের বংশ-পরিচয় ঘটকের নিকটে বর্ণনা করিতেন। সেই বর্ণনা শুনিয়া তবে ঘটক-মহাশয় তাঁহাকে বলিতেন যে, কোন্ গ্রামে তাঁহার সমকক্ষ ব্রাহ্মণ আছেন। একালে যাঁহারা ঘটকালি করেন, তাঁহারা পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান বলিয় দেন, সেকালের ঘটকেরা পাত্র-পাত্রীর সংবাদ বড় রাখিতেন না, তাঁহাবা বলিয়া দিতেন—"অমুক স্থানে আপনার সমকক্ষ তিন-চারি ঘর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের কাহারও বিবাহযোগ্য পুত্রকন্যা আছে কি না, গিয়া সংবাদ লইতে পারেন।" ঘটকেরা এই সকল সংবাদ বিনা পারিশ্রমিকে সরবরাহ করিতেন না, কিঞ্চিৎ দর্শনী লইতেন। তাঁহারা পাথেয় এবং পারিশ্রমিক পাইলে স্বয়ং গিয়া পাত্র-পাত্রীর সংবাদ লইয়া আসিতেন।

সেকালে কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন ব্রাহ্মণেরা পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, স্বভাব, চরিত্র বা বয়স ও বিষয়সম্পত্তি অপেক্ষা কৌলীন্যমর্য্যাদাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিত, কৌলীন্যমর্য্যাদার প্রতি। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, চরিত্রে বা বিষয়সম্পত্তিতে হাজার উৎকৃষ্ট হইলেও যদি পাত্রের কৌলীন্যমর্য্যাদায় বিন্দু

মাত্র কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে সে পাত্র কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীনের নিকট অচল। তিনি যদি কোন সূত্রে জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার মনোনীত পাত্রের পিতার, পিতামহর বা প্রপিতামহের ভগিনীর যে পরিবারে বিবাহ হইয়াছিল, সেই পরিবারের 'কেশরকুনি' বা 'বীরভদ্রী' অথবা ঐরূপ কিছু একটা দোষ আছে, তাহা হইলে আর সেই পাত্রের সহিত বিবাহ হইত না। কারণ, রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কন্যা-গত-কুল; অর্থাৎ কন্যার যদি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই কন্যার পিতা এবং তাঁহার অধস্তন সন্তানসন্ততি সকলেই সেই নিম্নস্তরের দোষপ্রাপ্ত হন। সুতরাং পাত্রের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কাহারও কন্যা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে বিবাহিত হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার জন্যই ঘটকের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য ছিল। সেকালে কৌলীন্যমর্য্যাদা থাকিলে অপর সমস্ত দোষ উপেক্ষিত হইত, তাহা স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র [১৮৩০-১৮৭৩] মহাশয় 'লীলাবতী'[১০৫] নাটকে নদেরচাঁদের বিবাহ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। নদেরচাঁদ মূর্খ, অসভ্য, অশিক্ষিত, সকল প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত, হীনচরিত্র এবং অতি কদাকার, তথাপি একজন ধনবান জমিদার তাঁহার একমাত্র কন্যা রূপে গুণে অতুলনীয়া লীলাবতীকে সেই নদেরচাঁদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত, কারণ নদেরচাঁদ তাঁহার অপেক্ষা কুলে শ্রেষ্ঠ। আমরা শুনিয়াছি আমাদের একজন নিকষ কুলীন প্রতিবেশীর বাঁয়া-তবলা বাজাইবার খুব সখ ছিল, কিন্তু সে গণ্ডমূর্খ এবং মধ্যে মধ্যে চুরি করিয়া লাঞ্ছিতও হইয়াছিল। একবার সে কোন বিবাহে বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিল; সেখানে—কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে, এক জোড়া খুব সুন্দর বাঁয়া-তবলা দেখিয়া সে লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, চুরি করিল, কিন্তু শেষে ধরা পড়িয়াছিল। কন্যাপক্ষের লোক যখন তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবার পরামর্শ করিতেছিল, তখন কন্যাকর্ত্তা কোন সূত্রে জানিতে পারিলেন যে, সেই চোর নিকষ কুলীন, তখন তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, চোর যদি তাঁহার অন্য এক কন্যাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তিনি আর পুলিস ডাকিয়া কোন গোলমাল করিতে দিবেন না। চোর জেলে যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া কন্যাকর্ত্তার প্রস্তাবে সম্মত হইলে কন্যাকর্ত্তা সেই রাত্রেই তাঁহার প্রথমা কন্যাকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পাত্রে এবং দ্বিতীয় কন্যাকে সে চোরের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বীয় বংশমর্য্যাদা উজ্জ্বল করিলেন। এইরূপ জানিয়া শুনিয়া, হীনচরিত্র, মূর্খ, মদ্যপ কুলীনসন্তানকে জামাতাপদে বরণ সেকালে বিরল ছিল না।

আমাদের পরিচিত একজন কুলীন ব্রাহ্মণের দুই কন্যা ছিল, পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার কিছু জমি ছিল এবং সাত-আট হাজার টাকা নগদ ছিল। তিনি তাঁহার প্রথমা কন্যার সমান ঘরে অর্থাৎ কুলীনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, দ্বিতীয় কন্যা অবিবাহিতা ছিল, তাহার জন্য তিনি পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহার নগদ টাকা তিনি কোথায় লুকাইয়া রাখিতেন, তাহা তাঁহার পত্নী ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কোনরূপে পিতার গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া তাহা নিজ স্বামীকে বলিলে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া সেই টাকা অপহরণ করিল।

কয়েক দিন পরে সেই ব্রাহ্মণ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সমস্ত নগদ টাকা তাঁহারই কন্যা ও জামাতার দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। তখন তিনি জামাতার বাড়ীতে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, সেই জন্য তাঁহার টাকার কিয়দংশ জামাতার নিকট দাবি করিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার জামাতা বলিল, "আপনার অবৰ্ত্তমানে আপনার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আপনার এই দুইটি কন্যাই পাইবে, তা আপনি যদি এক কাজ করেন, তাহা হইলে সকল গোলমাল মিটিয়া যায়। আপনার দ্বিতীয়া কন্যাকে আমার হস্তেই সম্প্রদান করুন; আমি যদি আপনার দুইটি কন্যাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে আপনার সম্পত্তি লইয়া কাহারও সহিত ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতে হইবে না, আপনিও কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবেন।" শ্বশুরমহাশয় দেখিলেন, এই প্রস্তাব অতি সমীচীন; তিনি জামাতার প্রস্তাবে আনন্দ সহকারে সম্মত হইয়া তাহারই সহিত দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। সেই শ্বশুরমহাশয় অনেক দিন হইল লোকান্তরে—সম্ভবতঃ কৌলীন্যলোকে—গমন করিয়াছেন, আর তাঁহার জামাতা শ্বশুরের টাকা চুরি করিয়া এখন গ্রামের মধ্যে একজন গণ্যমান্য মাতব্বর হইয়াছে।

এস্থলে একটা বিষয়ের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেকেরই ধারণা আছে যে, সেকালের নিকষ কুলীনেরা বহু বিবাহ করিতেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। বহু বিবাহকারীরা সকলে পত্নীকে ও তাঁহাদের গর্ভজাত পুত্রকন্যাদিগের ভরণপোষণ করিতেন না, সাধারণতঃ তাঁহারা একটি বা দুটি পত্নীকে লইয়াই 'ঘর' করিতেন; অনেকে কলহ বিবাদ ও পারিবারিক অশান্তির ভয়ে একাধিক পত্নীকে বাড়ীতে রাখিতেন না, কেহবা পৰ্য্যায়ক্রমে দুইটি বা তিনটি স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিতেন, অবশিষ্ট সকল পত্নীই চিরকাল পিতা বা ভ্রাতার সংসারে বিনা বেতনে পাচিকা ও দাসীরূপে কালযাপন করিতেন। বৎসরের মধ্যে এক দিন বা দুই দিন যদি তাঁহারা পতিসেবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের গর্ভে যে-সকল পুত্রকন্যা জন্মিত, তাহারা চিরকাল মাতুলালয়ে বাস করিত, মাতুলেরাই তাহাদের ভরণপোষণ, শিক্ষা এবং বিবাহের ভার লইতেন, ভাগিনেয়ীর বিবাহ মাতুলেরাই দিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যাগত কুল অর্থাৎ কন্যা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কুলে বা 'দোষ'-গ্রস্ত কুলে বিবাহিতা হইলে কন্যার পিতার এবং তাঁহার অধস্তন বংশাবলীর কুল চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হইয়া যায়। সেই কারণে কুলীন ব্রাহ্মণেরা কন্যার বিবাহের সময়, যাহাতে নিজের কুলমৰ্য্যাদায় কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ না করে, সেজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। কোন কুলীন ব্রাহ্মণ যদি তাঁহার ভাগিনেয় বা দৌহিত্রীকে নিকৃষ্ট-বংশীয় পাত্রের হস্তে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের কুলের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু কন্যার পিতার কুল নষ্ট হয়। ভাগিনেয়ী বা দৌহিত্রীর বিবাহকালে কন্যার মাতুল বা মাতামহ পাত্রের কুলশীলের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন না, যাহাকে হউক পাত্রীকে সম্প্রদান করিয়া দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতেন। নিকষ কুলীনের সন্তান বহুবিবাহ করিলে পাছে তাঁহার

কোন কন্যা নিকৃষ্ট ঘরে বিবাহিতা হইয়া তাঁহার কুল নষ্ট করে, সেই ভয়েই তাঁহারা বহুবিবাহ করিতে পারিতেন না। বহুবিবাহ করিতেন ভঙ্গকুলীনেরা। তাঁহারা একবার অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ঘরে বিবাহ করাতে তাঁহাদের কুল ভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের আর কুল ভাঙ্গিবার ভয় ছিল না, তাঁহারা যেখানে ইচ্ছা ও যত ইচ্ছা বিবাহ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ'[১০৬] নামক পুস্তকে সেকালের বহুবিবাহকারীদের নামের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে। ঘটকমহাশয়দের মতে, সেই তালিকায় দুই-এক জন ব্যতীত কোন নিকষ কুলীনের নাম নাই। যে দুই-এক জনের নাম আছে, তাঁহারাও তিনটি বা চারিটির অধিক বিবাহ করেন নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যাঁহাদের কুল ভাঙ্গিয়াছে অর্থাৎ ভঙ্গ-কুলীনগণের মধ্যে সেকালে অবাধে বিবাহ হইত; কিন্তু তাহা নহে। যিনি নিম্নস্তরে বিবাহ করিয়া কুল ভঙ্গ করিতেন, লোকে তাঁহাকে বলিত 'স্বকৃত ভঙ্গ'। তাঁহার পুত্র 'দুই পুরুষে', পৌত্র 'তিন পুরুষে', প্রপৌত্র 'চার পুরুষে' নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপে সাত পুরুষ হইয়া গেলে 'বংশজ' অভিধানে অভিহিত করা হইত। যিনি 'তিন পুরুষে' তিনি নিজ কন্যার বিবাহের জন্য 'দুই পুরুষে' পাত্রের সন্ধান করিতেন, সহজে 'চার পুরুষে' বা 'পাঁচ পুরুষে' পাত্রে কন্যাদান করিতে সম্মত হইতেন না। সুতরাং কুল ভাঙ্গিলেই যে কৌলীন্যের জঞ্জাল মিটিয়া যাইত, তাহা নহে। তাহার উপর কুলীন ব্রাহ্মণগণ 'ফুলিয়া' 'খড়দহ' 'বল্লভী' 'সর্ব্বানন্দী' প্রভৃতি নানা 'মেলে'[১০৭] বিভক্ত, তন্মধ্যে ঘটকদিগের মতে উল্লেখিত চারিটি মেলই শ্রেষ্ঠ। এক মেলের ব্রাহ্মণ অন্য মেলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সম্মত হইতেন না; ভঙ্গকুলীনেরাও কিছুতেই 'মেলান্তর' হইতে সম্মত হইতেন না। ঘটকদিগের মতে—"ফুলিয়া খড়দহ নাস্তি বিশেষ" অর্থাৎ ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না-থাকাতে পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানে ঐ দুই মেলের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শুনিয়াছি পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও কেহ মেলান্তর স্বীকার করেন না।

ব্রাহ্মণের বিবাহে, সেকালে ঠিকুজি কোষ্ঠীর কথা প্রায় উঠিত না, কারণ এই কুলশীলের হাঙ্গামার পর যদি বা একটি পাত্রী বা পাত্র পাওয়া যাইত, তাহাদের কোষ্ঠী বিচার করিতে গেলে আর বিবাহ দেওয়া চলিত না। অনেক সময় বিবাহের 'শুভদিন' পর্য্যন্ত দেখা হইত না, পাত্র মনোনীত হইলে কন্যার পিতা অনেক সময় যে-কোন দিনে কন্যার বিবাহ দিতেন। আমরা বাল্যকালে আমাদের পাড়ায় এক বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা দেখিয়াছি। শুনিয়াছি, তাঁহাদের বিবাহ নাকি ভাদ্র মাসের অমাবস্যাতে হইয়াছিল, অথচ ভাদ্র মাসে বিবাহ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ। সেকালের অনেক ব্রাহ্মণই এইরূপ "মাকড় মারলে ধোকড় হয়" নীতি অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

একটা বিষয়ে সেকালের বিবাহ একালে আদর্শস্থানীয় হইতে পারে। সেকালে কোন কন্যার পিতাকেই অর্থাভাবের জন্য 'কন্যাদায়গ্রস্ত' হইতে হইত না। কোন পাত্রের পিতাই পুত্রের বিবাহকালে কন্যার পিতার গলায় ছুরি দিতেন না। সেকালের ধনশালী ব্রাহ্মণেরা কন্যার বিবাহে যে যৌতুক ও বরাভরণ দিতেন, একালে সেরূপ ব্যবস্থা

হইলে অতি দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিও বাঁচিয়া যান। কুলীনের সন্তান, বিবাহকালে কন্যার পিতার নিকটে কৌলীন্যমর্য্যাদাস্বরূপ মাত্র ষোল টাকা দাবি করিতে পারিতেন, ইহার অধিক দাবি তিনি করিতে পারিতেন না। এই কৌলীন্যমর্য্যাদার ষোল টাকা এখন ষোল শতে পরিণত হইয়াছে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, মধ্যবিত্তশালী ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহে, বরাভরণ অলঙ্কার, দানসামগ্রী প্রভৃতিতে মোট দেড় শত বা দুই শত টাকা ব্যয় হইত। এখন সেইরূপ মধ্যবিত্ত কোন ব্রাহ্মণ যদি দুই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করেন। গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বরের মূল্য যেরূপ দ্রুত চড়িয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বরের এই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভোজ উপলক্ষে অর্থব্যয় বিস্ময়কর রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। সেকালের যে সময় আমাদের বিবাহ হইয়াছিল, সে সময় 'পাকা দেখা' বলিয়া কিছু ছিল না। বিবাহের পূর্ব্বে একদিন কন্যার পিতা বরকে এবং অন্য একদিন বরের পিতা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতেন। প্রথমে ধান, দূর্ব্বা ও চন্দন দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়া পরে রৌপ্যমুদ্রা বা ধনবান হইলে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া আশীর্ব্বাদ করা হইত। আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য কন্যাকর্ত্তা বা বরকর্ত্তা একাকী না গিয়া দুই-চারিজন আত্মীয়বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, যাঁহাদের বাড়ীতে আশীর্ব্বাদ হইত তাঁহারও দুই-চারিজন আত্মীয় বা প্রতিবেশী তথায় উপস্থিত থাকিতেন, আশীর্ব্বাদের সকলকেই একটু 'মিষ্টিমুখ' করান হইত। সেই মিষ্টিমুখের জন্য বাজার হইতে তিন-চারি প্রকার মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনা হইত। এই আশীর্ব্বাদ আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে 'পাকা-দেখা' রূপে পরিণত হইয়া, অপব্যয় যে কত রূপে হইতে পারে, তাহারই উদাহরণস্বরূপ হইয়াছে। গত বৎসর কলিকাতায় আমার কোন বন্ধুর পুত্রের বিবাহে পাকা-দেখাতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া লুচি ও পোলাও ছাড়া মাছ, মাংস, আমিষ, নিরামিষ তরকারি এবং চাটনি, মিষ্টান্ন, দধি, রাবড়ী প্রভৃতিতে চল্লিশ প্রকার ভোজ্যের আয়োজন দেখিয়া আসিয়াছি। পরে শুনিলাম যে, কন্যাকর্ত্তাও হারিবার পাত্র নহেন, তিনি কন্যার পাকা-দেখার দিন পাত্রের পিতা এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে, শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া অর্থাৎ বাহান্ন প্রকার ভোজ্যের আস্বাদ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এই পাত্রপক্ষ বা পাত্রীপক্ষ বিশেষ ধনশালী নহেন, মধ্যবিত্তশালী গৃহস্থ। আমরা সেকালের বৃদ্ধগণ যখন আজকালকার পাকা-দেখা উপলক্ষে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার অর্থের অপব্যবহার দেখি, তখন মনে হয় যে, পাত্রের পিতা ও কন্যার পিতা উভয়ের মধ্যে যে কত অধিক নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে পারেন, তাহা লইয়া যেন ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আজকাল পাকা-দেখা অথবা অনুরূপ কোন কার্য্য উপলক্ষে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পাত্রে যে-সকল ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হয়, কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি তাহার চতুর্থাংশও ভোজন করেন না বা ভোজন করিতে পারেন না। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের বার আনা নষ্ট হয়। অনেকে বলিতে পারেন যে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পাত্রে যে-সকল

ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য পড়িয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা নষ্ট হয় না, পরে সেই সকল খাদ্য দরিদ্র কাঙালীদিগের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাহারা ঐ সকল দেবদুর্লভ খাদ্য কিনিয়া খাইতে পারে না, গৃহস্থের বাড়ীতে ভোজ উপলক্ষে সেই সকল খাদ্য তাহারা ভোজন করিতে পায়। কিন্তু এই যুক্তি নিতান্ত অসার। যে-ভোজে চারিশত টাকা ব্যয় হয়, তাহার চতুর্থাংশ মাত্র নিমন্ত্রিতগণ ভোজন করিলে প্রায় তিন শত টাকার আহার্য্য কাঙালীরা খায় সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন উপকার হয় কি? সেই তিন শত টাকায় অন্যরূপে কোন উপকার করিতে পারা যায় না কি? এক দিন তাহারা আধখানা চপ, একখানা পেস্তার বরফী বা একখানা শোণপাঁপড়ি খাইয়া চতুর্ভুজ হয় না। যাক, এ অর্থনীতির আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আজকাল বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রীর সংখ্যা সেকাল অপেক্ষা অনেক অধিক হয়। সেকালে যেরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্রের বিবাহে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন বরযাত্রী হইত আজকাল সেইরূপ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ পুত্রের বিবাহে এক শত বা দেড় শত বরযাত্রী হয়। সেকালের লোকে বোধ হয় এইরূপ মনে করিতেন যে, আমার পুত্রের বিবাহে, যাহারা আমার আত্মীয়বন্ধু, আমার পুত্রের বন্ধুবান্ধব বা আমার প্রতিবেশী, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইলে আমার বাড়ীতে খাওয়াইব, কন্যাদায়গ্রস্ত অপর একজন ভদ্রলোকের স্কন্ধে তাঁহাদের ভার চাপাইব কোন্ অধিকারে? সেইজন্য যাঁহারা পুত্রের বিবাহে, গাত্রহরিদ্রা বা পাকস্পর্শ উপলক্ষে তিন-চারি শত লোককে নিমন্ত্রিত করিতেন, তাঁহারাও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের অধিক বরযাত্রী লইয়া যাইতেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, আমার সুপরিচিত কোন যুবকের বিবাহে, বরযাত্রীর সংখ্যা এক শতের কিছু অধিক হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় আশি জন বরের সতীর্থ ও বন্ধু। সেই বিবাহে পাত্রীর পিতাকে সামান্য অসুবিধায় পড়িতে হয়। পাত্রীর পিতা কলিকাতাবাসী, কলিকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীর ন্যায় তাঁহার বাড়ীতে একান্ত স্থানাভাব, বোধ হয় কুড়ি জন লোককে বসাইয়া খাওয়াইবার স্থান তাঁহার বাটীতে নাই। ইহা জানিয়াও পাত্রপক্ষ এক শতের অধিক বরযাত্রী আনিয়াছিলেন।

সেকালে বরযাত্রীর দলে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সংখ্যা অধিক থাকিত, যুবক ও বালকের সংখ্যা খুব অল্প হইত। একালে ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াছে। সেকালে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের মধ্যে যেন একটা বিরোধ ভাব দেখা যাইত। উভয় পক্ষ পরস্পরকে ঠকাইবার বা জব্দ করিবার জন্য যেন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিত। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বচসা হইতে অবশেষে মারামারি পর্য্যন্ত হইত এবং সেটা অধিক সময়ে বালক ও যুবকগণের মধ্যেই হইত। তবে অনেক ক্ষেত্রে, সেই বিবাদে প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত জড়াইয়া পড়িতেন। সেই কলহবিবাদের ফলে অনেক বিবাহ পর্য্যন্ত হইত না, বরের অভিভাবক বিবাহের পূর্ব্বেই বরকে লইয়া প্রস্থান করিতেন। সেইরূপ ঘটনায় কন্যার পিতা, সেই রাত্রেই প্রতিবেশী বা গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে এক জন পাত্রের সন্ধান করিয়া তাহারই সহিত কন্যার বিবাহ দিতেন। কারণ, সেই রাত্রেই কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে কন্যার পিতাকে সমাজচ্যুত হইতে হইত; পরে সেই

কন্যার বিবাহ বড়ই কঠিন হইত। এই কারণে অনেক সময় অযোগ্য পরিণয় হইত। হয়ত কন্যার সমবয়স্ক অথবা তাহা অপেক্ষা দুই-তিন বৎসরের বড় পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইত, অথবা বিগতযৌবন, কৃতদার কোন ব্যক্তিকে অনুরোধ, উপরোধ, অনুনয়-বিনয় করিয়া বা অর্থের লোভ দেখাইয়া তাহারই হস্তে কন্যা সম্প্রদান করা হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেকালের পাত্রের বিদ্যা-বুদ্ধি বা স্বভাব-চরিত্র অপেক্ষা তাহার কৌলীন্যমর্য্যাদার প্রতিই সমধিক দৃষ্টি রাখা হইত। সুতরাং কোন বিবাহ-বিভ্রাট উপস্থিত হইলে, পাত্রীর পিতা স্ব-ঘরের অর্থাৎ নিজের মত কৌলীন্যমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরই অনুসন্ধান করিতেন, তা সে পাত্র বিবাহিত কি অবিবাহিত, বৃদ্ধ কি প্রৌঢ়, তাহা দেখিবার প্রয়োজন হইত না। আমরা বাল্যকালে আমাদের প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াছি, তাঁহার বিবাহ নাকি ঐরূপ অকস্মাৎ হইয়াছিল। তিনি গল্প করিতেন—"রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শুইয়া আছি, রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আমার পিতার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল; ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—ওঠ, শীঘ্র কাপড় বদলাইয়া আমার সঙ্গে চল, তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে;—মুখুজ্যের কন্যার বিবাহ-সভা হইতে বর উঠিয়া গিয়াছে, তুমি সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে, নচেৎ সে ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট হয়।" কোথায় বা আশীর্ব্বাদ আর কোথায় বা গাত্রহরিদ্রা! আমি বাবার সঙ্গে প্রায় আধ ক্রোশ পথ চলিয়া গিয়া কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সেই রাত্রেই আমার বিবাহ হইয়া গেল। এরূপ বিবাহ সেকালে বিরল ছিল না।

সেকালে যে-সকল যুবক ও বালক বরযাত্রী হইয়া যাইত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কন্যাপক্ষের অনিষ্ট করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্প যেন করিয়া যাইত। অনেকে ছুরি বা কাঁচি পকেটে করিয়া লইয়া যাইত, বরযাত্রী কন্যাযাত্রীদিগের উপবেশনের জন্য যে-সকল আসন পাতা হইত, অনেকে সেই আসন, জাজিম বা চাদর কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিত। কেহ বা ভোজনকালে পাত হইতে লুচি ও মিষ্টান্ন লইয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিত। এই সকল অন্যায় কার্য্য করা অনেকে বিশেষ বাহাদুরি বলিয়া মনে করিত এবং বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বন্ধু-বান্ধবের নিকট গর্ব্বভরে গল্প করিত। প্রধানতঃ ঐ সকল কার্য্য করিবার সময় কেহ ধরা পড়িলেই কলহবিবাদ ও মারামারি হইত। সুখের বিষয়, ঐরূপ অশিষ্টতা ও অন্যায় একালে বড় দেখা যায় না।

সেকালে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীরা পরস্পরকে কথায় ঠকাইবার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিত না। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প আমরা বাল্যকালে শুনিতাম। দুই-একটা গল্পের উদাহরণ বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেকালে হুগলী জেলায় গঙ্গার তীরে অবস্থিত গুপ্তিপাড়া এবং গঙ্গার অপর পারে নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগর গ্রামের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। গুপ্তিপাড়া অঞ্চলে হনুমানের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। ঐ অঞ্চলে যত অধিকসংখ্যক হনুমান ছিল এবং এখনও আছে হুগলী জেলার অন্য কোন স্থানে সেরূপ নাই। সেইজন্য উলা বা শান্তিপুরের লোক রহস্য করিয়া গুপ্তিপাড়ার অধিবাসীদিগকে পাকেপ্রকারে হনুমান

বলিয়া আমোদ উপভোগ করিত। একবার গুপ্তিপাড়ার একটি পাত্রের সহিত উলার একটি কন্যার বিবাহ হয়। সেই বিবাহে কন্যাপক্ষ বরযাত্রীদিগকে আহ্বান করিবার জন্য একটা হনুমান ধরিয়া কন্যার বাড়ীর দ্বারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, গুপ্তিপাড়া হইতে একদল হনুমান বরযাত্রী হইয়া আসিতেছে, সুতরাং একটা হনুমানই কন্যাপক্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ তাহাদের অর্ভ্যর্থনা করুক। বরযাত্রীরা বর লইয়া কন্যার বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সেই হনুমানটাকে দেখিতে পাইল এবং কন্যাপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। তখন বরযাত্রীদের মধ্যে একজন প্রৌঢ় অগ্রসর হইয়া হনুমানের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং হনুমানের গালে একটা চড় বসাইয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া কন্যাপক্ষের এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া হনুমানকে চড় মারিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই প্রৌঢ় বরযাত্রী তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া হনুমানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বেহায়া, দেশে থাকিয়া কি খাইতে পাইতিস না, তাই এই শ্বশুরবাড়ীতে ঘরজামাই হইয়া দ্বারবানগিরি করতেছিস?"

আর একবার গুপ্তিপাড়ায় একদল বরযাত্রী শান্তিপুরে বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন। কন্যাকর্ত্তার বাড়ীর দ্বারদেশে কন্যাকর্ত্তার ভাগিনেয় বরযাত্রীদিগের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিল। সেই যুবক প্রত্যেক বরযাত্রীকে "আসুন, আসুন, আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—"মহাশয়, লঙ্কার সংবাদ কি?" রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রামচন্দ্র সীতার সংবাদ জানিবার জন্য হনুমানকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়া আগ্রহ সহকারে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাই ঐ যুবক প্রত্যেক বরযাত্রীকে লঙ্কার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে হনুমান বলিতেছিল। বালক ও যুবক বরযাত্রীরা তাহার কথার কোন উত্তর দিল না। অবশেষে বরের পিতৃস্থানীয় এক বৃদ্ধকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "তুমিই? তা বেশ হইয়াছে, আমাকে আর অধিক অনুসন্ধান করিতে হইল না; আমার সঙ্গে এসো, আমি একটু বিশ্রাম করিয়া ধূমপানের পর সব কথা বলিতেছি।" এই বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে সভামধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন। যাহারা ঐ প্রশ্ন এবং বৃদ্ধের কথা শুনিয়াছিল, তাহারা, বৃদ্ধ কি উত্তর দেন শুনিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া সভায় গিয়া উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধের ধূমপান শেষ হইলে সেই যুবা আবার তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, লঙ্কার সংবাদ কি বলুন।" তখন বৃদ্ধ বলিলেন, "লঙ্কার সংবাদ জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইবারই কথা। আমিও এইমাত্র লঙ্কা হইতেই আসিতেছি। লঙ্কার সংবাদ বড় ভাল নহে। লঙ্কাতে গিয়া দেখিলাম, তথায় অনেক গৃহ দগ্ধ ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমি রাবণ রাজার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, সাগরপার হইতে একটা হনুমান আসিয়া তাঁহার সুবর্ণপুরী লঙ্কার এই দশা করিয়াছে, তিনি প্রতিশোধ লইবার জন্য হনুমানটাকে ধরিয়া তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং অনুচরদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, হনুমানটাকে যেন জীবিত অবস্থায় দগ্ধ করা হয়। রাজার মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমি তখনই সমুদ্রতীরে গিয়া দেখিলাম, একটা বীর হনুমান রজ্জুবদ্ধ অবস্থায়

সমুদ্রতীরে পড়িয়া আছে, রাজার অনুচরেরা দূরে চিতাসজ্জা করিতেছে। আমি হনুমানের কাছে যাইবা মাত্র সে আমাকে দেখিয়া কাতর স্বরে বলিল, 'আপনাকে দেখিয়া বাঙ্গালী বলিয়া মনে হইতেছে। যদি আমার এই আসন্ন মৃত্যুকালে একটি উপকার করেন, তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব।' আমি তাহার উপকারে সম্মত হইলে সে বলিল, 'আমার পুত্রকে আমার এই বিপদের কথা জানাইয়া তাহাকে অবিলম্বে এখানে আসিতে বলিবেন।' আমি বলিলাম—'আমি ত তোমার পুত্রকে চিনি না, কোথায় তাহার সাক্ষাৎ পাইব?' তাহাতে সে বলিল, 'আমার পুত্র শান্তিপুরে আছে। আমি লঙ্কায় আসিয়াছি সে জানে। অনেক দিন আমার সংবাদ না পাইয়া সে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। সে যাহাকে দেখিতেছে, তাহাকেই লঙ্কার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে।' যাহা হউক, সহজেই তোমার সহিত দেখা হইল, আমাকে অধিক অনুসন্ধান করিতে হইল না। এখন ত লঙ্কার সকল সংবাদ শুনিলে, যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।" এইরূপ বাকযুদ্ধ সেকালে বিবাহসভায় বরযাত্রীদের মধ্যে সর্ব্বদাই হইত।

সেকালে, বিবাহরাত্রিতে, বিবাহকার্য্য শেষ না হইলে বরযাত্রী বা কন্যাযাত্রী কাহাকেও খাওয়ান হইত না বোধ হয় কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ পণ্ড হইত বলিয়াই ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। তবে যদি অধিক রাত্রিতে বা শেষরাত্রিতে বিবাহের লগ্ন থাকিত, তাহা হইলে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইত, বিবাহের পূর্ব্বেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে খাওয়ান হইত। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বরযাত্রীদিগকে অগ্রে খাওয়াইয়া তাহার পর কন্যাযাত্রীদিগকে খাওয়ান হইত, ইহাতে কন্যাযাত্রীরা কোন আপত্তি করিতেন না। বোধ হয়, বরযাত্রীরা অভ্যাগত, সেই জন্য কন্যাযাত্রীরা তাঁহাদিগকে অতিথি মনে করিয়াই অগ্রে তাঁহাদিগের ভোজনে কোন আপত্তি করিতেন না। বরযাত্রীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রে ভোজনস্থানে লইয়া গিয়া বসান হইত, তাঁহারা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে তবে শূদ্র বরযাত্রীদিগকে ভোজনস্থানে লইয়া যাওয়া হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় উভয় পক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে একসঙ্গেই ভোজন করান হইত, কারণ তাহা না করিলে শূদ্র বরযাত্রীরা বলিতেন, "যে-বাড়ীতে কোন ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাকেন, সে বাড়ীতে আমরা অগ্রে কিরূপে ভোজন করিব?" সেইজন্য উভয় পক্ষের ব্রাহ্মণগণকে একযোগেই খাওয়ান হইত। তবে কন্যাযাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে ট্রেন ধরিবার জন্য ষ্টেশনে যাইতে হইত তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলের অগ্রে খাওয়ান হইত। তখন আর সামাজিক বিধিনিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইত না। সেকালের ভোজে আমিষের কোন সংস্রব থাকিত না, সমস্ত ব্যঞ্জনই নিরামিষ হইত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির বাড়ীতে ভোজে ব্যঞ্জনে লবণ দেওয়া হইত না, কারণ, ব্যঞ্জনে লবণ দিলেই তাহা 'শক্‌ড়ি' হয়। স্বজাতীয় ভিন্ন অন্য কোন জাতি সেরূপ শক্‌ড়ি ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন না। আমি যৌবনকালে কোন বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী হইয়া হাওড়াতে গিয়াছিলাম। আমার বন্ধুটি শূদ্র। সেই বিবাহ-বাটীতে প্রথম দেখিলাম যে, লুচির সঙ্গে ছোলার ডাল দেওয়া হইল, তাহার পূর্ব্বে কোন শূদ্রের বাড়ীর ভোজে ছোলার ডাল দেখি নাই। বলা বাহুল্য যে, সেই ডাল ও অন্যান্য ব্যঞ্জনে

লবণ ছিল না। আমরা তখন 'ছেলে ছোকরা', সুতরাং আমরা বিনা আপত্তিতে সেই ডাল ভোজন করিলাম। কিন্তু গোল বাধাইলেন একজন বৃদ্ধ তিলি। তাঁহার পাতে ডাল দিবা মাত্র তিনি ভোজনে বিরত হইয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ এবং আমার স্বজাতি ছাড়া অন্য শূদ্রের বাড়ীতে ডাল খাইব কিরূপে? যদি ডাল খাইলাম, তাহা হইলে ভাত খাইতে আপত্তি কি? ডাল ভাত একই কথা।" তখন তাঁহার সেই ডালস্পৃষ্ট ভোজনপাত্র সরাইয়া আবার নূতন করিয়া পাতা দেওয়া হইলে তিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেকালে বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান স্ত্রী-আচারের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বর বেচারাকে নানারূপ শারীরিক নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। শ্যালিকা, শ্যালকজায়া বা 'ঠানদি' প্রভৃতি মহিলাদিগের সুকোমল করস্পর্শে বরের কর্ণ অনেক সময় রক্তাক্ত হইত, বর প্রতিবাদ করিলেই সে বদরাগী বলিয়া গণ্য করা হইত। 'ছাদনাতলা'য় যখন বরবধূকে বরণ করা হইত, তখন অনেক সময় বরের পৃষ্ঠদেশ আগেকালকার পুলিসের মৃদু যষ্টি চালনার ন্যায় কোমল মুষ্ট্যাঘাতে জর্জ্জর হইত। ছাদনাতলায় বরকে যে পীঠপিঁড়ার উপর দাঁড়াইতে হয়, অনেক সময় কোন কোন সুরসিকা সেই পিঁড়ার তলায় পাঁচ-সাতটা সুপারি দিয়া রাখিতেন, উদ্দেশ্য যে বর পিঁড়ার উপর দাঁড়াইবা মাত্র পিঁড়া সরিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বরও পড়িয়া যাইবে। এই অদ্ভুত রসিকতার জন্য কোন কোন বরকে গুরুতর আহত হইয়া শয্যাগত হইতে হইত। সেইজন্য, বিবাহ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বরের বাড়ীর গৃহিণীরা বরকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিতেন, 'ছাঁদনাতলায় পিঁড়ায় দাঁড়াইবার পূর্ব্বে পায়ে ক'রে পিঁড়াটা ঠেলিয়া দেখিও তাহার তলায় সুপারি আছে কি না।" এই ছাঁদনাতলাতেই বরকনের 'শুভদৃষ্টি' হয়, অর্থাৎ বর বধূকে এবং বধূ বরকে উভয়ে দর্শন করে। শুভদৃষ্টির পূর্ব্বে বরবধূর পরস্পরকে দেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। বরের অভিভাবকগণ কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিতেন, কন্যার অভিভাবক বরকে দেখিয়া আসিতেন। শুনিয়াছি, সেকালে (অর্থাৎ আমার পিতৃ-পিতামহর আমলে) নিকষ কুলীনের বিবাহে অনেক ক্ষেত্রে, বিবাহের পূর্ব্বে বর বা কন্যাকে দেখিবারও প্রয়োজন হইত না, ঘটকের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সমাধা হইত, বিবাহের দিন স্থির হইলে বর বিবাহ করিতে যাইত, তখন সকলে, বরকে প্রথম দেখিত। বিবাহের পর কন্যা শ্বশুরালয়ে গেলে, লোকে কন্যা দেখিত এবং তাহার রূপের সমালোচনা হইত।

ছাঁদনাতলায় অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বর বেচারা নিষ্কৃতি পাইত না, তাহার কঠোরতর অগ্নিপরীক্ষা হইত বাসরঘরে। বর বাসরঘরে গিয়া উপবেশন করিলে প্রথমেই সমাগত স্ত্রীলোকগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কন্যা পছন্দ হইয়াছে কি?" যেন পছন্দ না হইলে তাঁহারা কোন প্রতিকার করিতে পারেন। তাহার পর বরকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ। বর যতক্ষণ গান না করিত, ততক্ষণ তাহার উপর জুলুম চলিত। বাসরঘরেও বরের কর্ণমর্দ্দন প্রভৃতি শারীরিক দণ্ডের অভাব হইত না। বাসরঘরে সমবেত মহিলারা অনেক সময় বরের সহিত এরূপ প্রাকটিক্যাল জোক

করিতেন যে, বরের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইত। তাম্বূলের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে চুন বা লঙ্কাবীজ দিয়া বরকে খাইতে দেওয়া হইত। আমরা বাল্যকালে গল্প শুনিয়াছি যে, এক বর সুদূর পল্লীগ্রামে বিবাহ করিতে গিয়াছিল, বাসরে তাহার গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে সে একখানা পাখা চাহিয়াছিল। তাহা শুনিয়া বাসরে সমাগত স্ত্রীলোকেরা বলে, "আমাদের দেশে গরম বোধ হ'লে লেপ গায়ে দিতে হয়।" এই বলিয়া একখানা লেপ বরের উপর চাপা দিয়া তাহাকে এমন চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া বরের মৃত্যু হয়। এই গল্প অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু সেকালে পল্লীগ্রামে অশিক্ষিতা রমণী-সমাজে রসিকতাজ্ঞান কিরূপ ছিল, তাহা এই গল্প হইতে অনুমান করা যাইতে পারে।

আমাদের সময়ে বিবাহের বয়স, পাত্রপক্ষে পনের-ষোল হইতে কুড়ি-একুশ এবং পাত্রীপক্ষে নয় হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমার এবং আমার সতীর্থগণের মধ্যে অনেকেরই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার দুই-এক বৎসর পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল। সেকালে এগার-বার বৎসর বয়সে বালিকাদের বিবাহ না হইলে তাহার অভিভাবকবর্গের আর দুশ্চিন্তায় রাত্রিতে নিদ্রা হইত না। কুমারী কন্যার বয়স বার উত্তীর্ণ হইলে তাহার জনক-জননীর, বিশেষতঃ জননীর পাড়ায় মুখ দেখান ভার হইত। ইহার ব্যতিক্রম হইত কুলীন কুমারীর বেলা। স্বঘরে পাত্র অন্বেষণ করিতে করিতে অনেক সময় কুলীন কুমারীর বয়স সতের, আঠার এমনকি কুড়ি বৎসরও পার হইয়া যাইত, অনেকের একেবারেই বিবাহ হইত না। আমি ঐরূপ দুইটি কুমারীকে দেখিয়াছি। আমার কোন বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে, হালিশহরে বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের সাক্ষাৎ লাভ করি। তাঁহারা দুইটি সহোদরা, উভয়েরই মাথার চুল পাকিয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে। তাঁহারা সধবার মত শাড়ী ও অলঙ্কার পরিয়াছিলেন, কিন্তু মাথায় সিন্দুর ছিল না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমার বন্ধুকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "উঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভগিনী। উঁহারা বড় কুলীন, উঁহাদের সমান ঘর এ অঞ্চলে না-থাকাতে উঁহাদের বিবাহ হয় নাই।" সেই কুমারীদ্বয়ার বয়স তখন বোধ হয় ষাট হইতে সত্তর হইবে। সেকালে বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ হইত বলিয়া বালিকারা অল্প বয়সেই সন্তানের জননী হইত। অনেকে বার-তের বৎসর বয়সেই মাতৃত্ব লাভ করিত।

সেকালের

আমাদের বাল্যকালে, অর্থাৎ এখনকার ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে, বাংলায় নারীসমাজে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না বলিলেই হয়। কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের অনেক শহরে তখন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সকল বিদ্যালয়ে প্রকৃত লেখাপড়া কিছুই হইত না। বালিকাদের অক্ষর-পরিচয় হইত, কোন কোন বালিকা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক কষিতে পারিত, কোনরূপে আঁকাবাঁকা অক্ষরে

চিঠি-পত্রও লিখিতে পারিত, ইহার অধিক আর কোন বালিকাকে অগ্রসর হইতে বড় দেখা যাইত না। সেই সকল বালিকার নিরক্ষরতা দূর হইত মাত্র, শিক্ষা কিছুই হইত না। যে-সকল স্ত্রীলোক বাল্যকালে ঐরূপ নাম মাত্র শিক্ষা লাভ করিতেন, তাঁহারাই সেকালের নারীসমাজে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতেন। এইরূপ 'শিক্ষিত' স্ত্রীলোকও সেকালে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। অনেকেই বাল্যকালে অধীত বিদ্যা বিবাহের পর বিস্মৃত হইত, মাত্র বর্ণপরিচয়টাই থাকিয়া যাইত। ইহার কারণ, অনেক বাটীতেই স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শেখা একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। যে-সকল বালিকা লেখাপড়া শিখিত, তাহারা বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া শাশুড়ী-ননদের নিকটে লেখাপড়া শেখার কথাটা গোপন রাখিতেই চেষ্টা করিত। স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়, এই ধারণা সেকালের বর্ষীয়সীদিগের মনে একরূপ বদ্ধমূল ছিল। যদি শাশুড়ী-ননদ জানিতে পারিতেন যে, নববধূ লিখিতে পড়িতে জানে, তাহা হইলে কথায় কথায় তাঁহারা বালিকার বিদ্যাবত্তার উল্লেখ করিয়া তাহার জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিতেন। লজ্জাবনতা, দীর্ঘ-অবগুণ্ঠনবতী, নবম বা দশম বর্ষীয়া বালিকা বধূর পদস্পর্শে হয়তো একটা ঘটি বা গেলাস পড়িয়া গেল, তাহা দেখিবামাত্র শাশুড়ী সগর্জ্জনে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বাপ-মা মেয়েকে নেকাপড়া শিখিয়ে মেম করেছে, সংসারের কাজকর্ম্ম কিছুই শেখায় নি?" এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যাইত না, সেকালে বোধ হয় এরূপ ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী অতি অল্পই ছিল।

সেকালে অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইজন্য স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া শেখাটা অনাবশ্যক বিলাসিতা বলিয়া গণ্য ছিল। আবার অনেক বাটীতে পুরুষদিগের মন এত সঙ্কীর্ণ ও নীচ ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলেই পরপুরুষকে প্রেমপত্র লিখিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এখনকার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও আমারই সমবয়সী, কোন আত্মীয়কে বাহাদুরি করিয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের অন্তঃপুরে কালি-কলম কাগজ-পেন্সিল রাখিবার হুকুম নাই, কারণ, তাঁহাদের বাটীর দুই-একটি বধূ পিত্রালয়ে কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, পাছে বধূরা পরপুরুষকে পত্র লেখেন সেইজন্যই বাটীর কর্ত্তা ঐরূপ হুকুম জারি করিয়াছিলেন, অথচ তিনি নিজে অশিক্ষিত ছিলেন না। যে-যুগে শিক্ষিত পুরুষগণই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ নীচ ও নিন্দনীয় ধারণার বশবর্ত্তী ছিলেন, সে-যুগে অশিক্ষিতা গৃহিণীরা যে লেখাপড়া-জানা মেয়েকে পুত্রবধূরূপে পাইলে আপনাদিগকে দুর্ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অথচ সেকালে যে-স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিতেন, অনেক সময় তাঁহার সমাদরও হইত। সমাদরটা বেশী হইত লিখন-পঠনে অনভিজ্ঞা সমবয়সী তরুণীদিগের মধ্যে। নববিবাহিতা তরুণীরা স্বামীকে পত্র লিখিবার জন্য বা স্বামীর লিখিত পত্র পড়াইয়া শুনিবার জন্য লেখাপড়া-জানা মেয়েদের শরণাপন্ন হইত, অনেক সময় প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা গৃহিণীরাও আত্মীয়-আত্মীয়াকে পত্র লেখাইবার জন্য লেখাপড়া-জানা যুবতীর সাহায্য লইতেন, আবার তাঁহারাই প্রতিবেশিনীদিগের নিকটে ঐরূপ বিদুষী যুবতীর নিন্দা

করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শিক্ষিতা মেয়েদের আর এক বিষয়েও সমাদর ছিল। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, কোন কোন বাড়ীতে মধ্যাহ্নে মহিলা-মজলিস বসিত, সাধারণতঃ সেই মজলিসে পরচর্চ্চা ও পরনিন্দাই বেশীর ভাগ হইত, কোন কোন মজলিসে পুস্তক-পাঠও হইত। সাধারণতঃ কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত বা দাশুরায়ের পাঁচালী পড়া হইত। একটি স্ত্রীলোক পুস্তক পাঠ করিতেন, অন্য সকলে অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। যাঁহারা পুস্তক-পাঠ শুনিতেন, তাঁহারা সকল সময় নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেন না, কেহ পুস্তক শুনিতে শুনিতে সুপারি কাটিতেন, কেহবা সলিতা পাকাইতেন, কেহ বা ঐরূপ কোন গৃহস্থালীর কাজ করিতেন। অনেকে এরূপ একটা শিল্প-কাজ করিতেন, যে-শিল্প আজকাল মফঃস্বল হইতে এবং বহুকাল হইল শহর-অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই শিল্প চুলের দড়ি বিনান। স্ত্রীলোকেরা একালে কবরী-বন্ধনের সময় 'কার' এবং ফিতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেকালে একালের মত এক পয়সায় আট হাত কার বা চারি হাত ফিতা কিনিতে পাওয়া যাইত না, কারের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকেরা চুলের দড়ি ব্যবহার করিতেন। সেই চুলের দড়ি কিনিতে পাওয়া যাইত না, বাড়ীতে বিনাইয়া লইতে হইত।

মধ্যাহ্নের মহিলা-মজলিসটা আরম্ভ হইত বেলা দুইটা কি আড়াইটার সময়, আর চারিটার পর, আমরা স্কুল হইতে বাড়িতে আসিলে সে-মজলিস ভঙ্গ হইত। আমার মা বই পড়িয়া শুনাইতেন বলিয়া আমাদের বাড়ীতে মধ্যাহ্নকালে দশ-বারটি প্রতিবেশিনীর সমাগম হইত। প্রতিবেশিনীদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাতে প্রথম সম্ভাষণ হইত "আজ কি রান্না হ'ল" বলিয়া। ইহা প্রাত্যহিক সম্ভাষণ, কোন দিন ইহার অন্যথা হইতে দেখি নাই। সেকালে প্রায় সকল স্ত্রীলোকই অশিক্ষিতা ছিলেন বলিয়া মহিলা-মজলিস মাত্রেই পুস্তক-পাঠ হইত না। মহিলা-মজলিসে আমাদের বাড়ীতে, পুস্তক-পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল আমার পিতার চেষ্টায়। তিনি জানিতেন যে, সাধারণতঃ মহিলা-মজলিসে প্রতিবেশীদিগের নিন্দা, আত্মীয়-পরিজনের নিন্দা, পরচর্চ্চা ও কুৎসা প্রভৃতিই হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত নারীসমাজে আর কোন আলোচ্য বিষয় থাকিত না। তাই তিনি আমার জননীকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "পাড়ার পাঁচজন মেয়ে আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলে তাহাদিগের নিকটে রামায়ণ, মহাভারত, বা অন্য কোন বই পড়িও, যেন আমাদের বাড়ীতে পরচর্চ্চা বা পরকুৎসা না হয়।" তদবধি এই পুস্তক-পাঠের ব্যবস্থাই প্রচলিত হয়।

সেকালে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সাধারণের উপযোগী স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক খুব অল্পই ছিল। আমরা বাল্যকালে সংবাদপত্র দেখিয়াছি,—'সুলভ সমাচার', 'এডুকেশন গেজেট',[১০৮] 'সাধারণী'[১০৯]। ইহা ব্যতীত আরও হয়তো সংবাদপত্র ছিল, কিন্তু আমাদের সহিত অন্য কোন কাগজের সম্পর্ক ছিল না।

বাল্যকালে আমরা স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী উপদেশপূর্ণ একখানি মাত্র উপন্যাসের কথা জানিতাম, সেই পুস্তকের নাম 'সুশীলার উপাখ্যান',[১১০] গ্রন্থকারের নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। ঐ পুস্তকের প্রথম ভাগ অবিবাহিতা বালিকাদের জন্য,

দ্বিতীয় ভাগ বিবাহিতা তরুণী ও যুবতীদের জন্য এবং তৃতীয় ভাগ প্রৌঢ়া গৃহিণীদের জন্য লিখিত হইয়াছিল। সেই পুস্তক আমাদের বাড়ীতে ছিল, আমাদের স্কুলপাঠ্য না হইলেও আমরা সেই পুস্তক বাল্যকালে পাঠ করিয়াছি। তাহার অনেক পরে ঐ ধরণের একখানি পুস্তক স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন তাহার নাম 'মেজো বৌ'[১১১]। এই পুস্তক বোধ হয় এখনও পাওয়া যায়। 'সুশীলার উপাখ্যান' এখন আর পাওয়া যায় না। এখনকার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, আমি যখন 'হিতবাদী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতাম, সেই সময় আমাদের গ্রাহকদিগকে উপহার দিবার জন্য 'সুশীলার উপাখ্যান' সংগ্রহের জন্য একবার বিশেষ চেষ্টা করা হয়, কিন্তু আমাদের সে-চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

আমার পিতা সেকালের লোক হইলেও অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী, এমনকি এখনকার ভাষায় যাহাকে 'প্রগতিশীল' বলা হয়, তাহাই ছিলেন। তিনি আমার জননীকে লেখাপড়া শিখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা গল্প শুনিয়াছি যে, তিনি যখন আমার মাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন, তখন আমাদের বাটীর গৃহিণীরা তাহাতে প্রবল অন্তরায় হইয়াছিলেন। কিন্তু বাবা তাঁহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আমার মাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বাবার কাছে মা যে কেবল বাংলা পুস্তক পাঠ করিতেই শিখিয়াছিলেন তাহা নহে, মা ইতিহাস, বিজ্ঞান, বাংলা ব্যাকরণ, ভূগোল এবং খগোল সম্বন্ধেও আমার পিতার নিকট হইতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

লেখাপড়ার চর্চ্চা না থাকাতে সেকালের মহিলাসমাজ যে কিরূপ অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত ছিল, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। স্বদেশ, বিদেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণাই ছিল না। বাসস্থান হইতে দুই-তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান তাঁহাদের পক্ষে বিদেশ ছিল। যাঁহারা দেশের অর্থাৎ নিজের পল্লীর বাহিরের কোন সংবাদ রাখা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা যে বিদেশের কোন সংবাদ রাখিতেন না, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। দৈনিক সংসারযাত্রানির্ব্বাহ-সংক্রান্ত ব্যাপার ব্যতীত স্ত্রীলোকের আলোচ্য অন্য কোন ব্যাপার থাকিতে পারে, ইহা সেকালের নারীরা ধারণা করিতেই পারিতেন না। দেশের বা সমাজের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সভা-সমিতিতে যোগদান করা যে স্ত্রীলোকেরও উচিত, এরূপ কথা কেহ বলিলে লোকে তাহাকে পাগল বলিত।

সেকালের বঙ্গমহিলাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না বলিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, তাঁহাদের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা ছিল না। সেকালের মহিলাদের মধ্যে অনেকে সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন, কিন্তু সেই সকল গায়িকার কণ্ঠস্বর সাধারণতঃ কোন পুরুষের কর্ণগোচর হইত না। আমরা বাল্যকালে, অনেক মহিলা-মজলিসে, কোন কোন মহিলাকেও গান করিতে শুনিয়াছি। তাঁহারা এরূপ মৃদুস্বরে গান করিতেন যে, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর কখনও অন্তঃপুরের সীমা অতিক্রম করিত না। সেই সকল গানের অধিকাংশই যাত্রা বা পাঁচালীর গান ছিল। রামপ্রসাদের গান, স্বর্গীয় গোবিন্দ অধিকারীর রচিত কৃষ্ণ-যাত্রার গান, দাশুরায়ের পাঁচালী, মদন মাষ্টারের

যাত্রার গান এবং নিধুবাবুর বা গোপাল উড়ের টপ্পা সেকালে অনেক ভদ্রমহিলার জানা ছিল। সেই সকল সঙ্গীতের যথোচিত সদ্ব্যবহার হইত বিবাহবাসরে। যে-সকল প্রৌঢ়া গৃহিণী যুবতী বধূর উচ্চকণ্ঠ ভীষণ দোষাবহ বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাও বিবাহরাত্রিতে বাসরঘরে, সদ্যবিবাহিত বরের সম্মুখে তাঁহাদের যুবতী বধূর গানকে অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন না। সেকালে হার্ম্মোনিয়মের এরূপ প্রচলন ছিল না; মফঃস্বলে .কালেভদ্রে কখনও হার্ম্মোনিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইত, সুতরাং বাসরেই হউক বা মহিলা-মজলিসেই হউক, মহিলারা যে গান করিতেন, তাহা বিনা বাদ্যযন্ত্রে। যে-যুগে স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া জানা একটা দোষ বলিয়া গণ্য হইত, সেই যুগে স্ত্রীলোকের সঙ্গীতচর্চ্চা যে পুরুষসমাজে অতিবড় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে সঙ্গীত-শ্রবণ-স্পৃহা ছিল না তাহা নহে। যে যুবতীর কণ্ঠস্বর মধুর হইত, তাহার গান শুনিবার জন্য বর্ষীয়সী মহিলারা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সেইরূপ কোন সুকণ্ঠী গায়িকা কোন মহিলা-মজলিসে উপস্থিত হইলে প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা তাহাকে "একটা গান গা না মা, তোর গলাটি বেশ মিষ্টি" এইরূপ বলিয়া গান শুনিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতেন। গান শুনিবার আগ্রহ সকলেরই ছিল, কিন্তু সঙ্গীতের রীতিমত চর্চ্চা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত।

এক বিষয়ে সেকালের মহিলারা একালের মহিলাদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন। রন্ধনবিদ্যায় এবং শারীরিক পরিশ্রমে সেকালের স্ত্রীলোকদের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। সাংসারিক নিত্য রন্ধন তো স্ত্রীলোকদের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। বড় বড় ভোজেও রন্ধনের ভার তাঁহারাই গ্রহণ করিতেন এবং অম্লানবদনে সেই ভারবহন করিতেন। রন্ধনকুশলতার জন্য বহু ব্রাহ্মণ-মহিলার খ্যাতি ছিল। সেকালে অনেক স্ত্রীলোকই সূক্ষ্ম কারুকার্য্যেও বেশ দক্ষতা প্রকাশ করিতেন। বিবাহ প্রভৃতি শুভকার্য্যে তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা স্বস্তিক বা 'শ্রী' নির্ম্মাণ, পিঁড়ার উপর আলিপনা, পঞ্চগুঁড়ির আসন নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে অনেকে এমন সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিতেন যে, তাহা দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিত। অনেকে চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, ছোলার ডালের বরফী, মুগের নাড়ু, সুজির নাড়ু ইত্যাদি নানাবিধ সুন্দর সুন্দর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারিতেন, সেই সকল মিষ্টান্ন প্রধানতঃ ফুলশয্যার তত্ত্ব বা অন্য কোন তত্ত্বর সহিত কুটুম্ববাড়ীতে প্রেরিত হইত। আমার কোন নিকট-আত্মীয়া অর্দ্ধপক পেঁপে কাটিয়া এমন সুন্দর কৃত্রিম চাঁপা ফুল প্রস্তুত করিতে পারিতেন যে, পাঁচ-সাতটা চাঁপা ফুলের সহিত সেই কৃত্রিম ফুলটা রাখিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারা যাইত না যে উহাদের মধ্যে কোন্‌টা কৃত্রিম। অতি সূক্ষ্মভাবে সুপারি কাটাও সেকালে একটা কারুশিল্প ছিল। এক এক জনের কর্ত্তিত সুপারি ঠিক সূতার মত সূক্ষ্ম হইত। খয়ের ভিজাইয়া কোমল করিয়া তাহা দ্বারাও অনেকে নানা প্রকার ফলমূল, পশুপক্ষী প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

একালের ভদ্রমহিলারা বালকদিগের জন্য যেরূপ হাফপ্যাণ্ট, ফ্রক ইত্যাদি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সেকালে কেহই সেরূপ করিতে পারিতেন না। তাহার

প্রধান কারণ, সেকালে অলঙ্কারবাহুল্য থাকিলেও পরিচ্ছদবাহুল্য একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। ভদ্র পরিবারের বালিকারা ছয়-সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ীতে প্রায়ই নগ্ন থাকিত; বাটীর বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে বালক-বালিকারা কাপড় পরিত, বালকেরা জামা ও জুতা পরিত, বালিকারা জামা বা জুতা ব্যবহার করিত না। অনেক বালিকার অঙ্গে প্রথম জামা উঠিত, নববধূরূপে বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাটী যাইবার সময়। সেকালের ভদ্রমহিলারা যে এখনকার মহিলাদের মত বাটীতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে পারিতেন না, তাহার অন্য কারণ, সেকালে সেলাইয়ের কল ছিল না, সকল প্রকার সেলাই-কাজই হাতে করিতে হইত। সেকালে কোন ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক শেমিজ বা সায়া ব্যবহার করিতেন না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, আমার স্ত্রী শেমিজের উপর শাড়ী পরিয়া কোন আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহাকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। প্রৌঢ়া গৃহিণীরা তাঁহাকে শেমিজ পরিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "যোগিনকে দিয়ে এইবার কলকাতা থেকে জুতা ও কোট আনিয়ে পরিও। মেমেদের মত ঘাগরা পরেছ, জুতো পায়ে না দিলে মানাবে কেন?" শুনিয়াছি কেবল একজন প্রৌঢ়া মহিলা শেমিজ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এ পোষাক তো বেশ, পাতলা কাপড় পড়লেও বে-আব্রু হ'তে হয় না। আমিও বৌমাদের জন্য এইরকম জামা কলকাতা থেকে আনতে বলব।" তিনি কলিকাতা হইতে শেমিজ আনাইয়া পুত্রবধূদিগকে পরাইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই। বলা বাহুল্য যে, আমার স্ত্রীর জন্য শেমিজ আমি কলিকাতা হইতে লইয়া গিয়াছিলাম। এখন এক এক সময় ভাবি যে, সেকালে ঐ সকল রক্ষণশীলা প্রৌঢ়া গৃহিণীদের মধ্যে যদি কেহ রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কল-এর মত সুদীর্ঘ চল্লিশ কি পঞ্চাশ বৎসর গাঢ় নিদ্রার পর এখন নিদ্রাভঙ্গে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান ভদ্রমহিলাদিগের বেশভূষা, আচার-ব্যবহার দেখিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না যে, তিনি বঙ্গদেশেই আছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে সকল ভদ্রমহিলাকে দেখিতেছেন, তাঁহারা তাঁহারই পৌত্রী, প্রপৌত্রী, বাঙালী মহিলা।

বাস্তবিক, গত পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে নারীসমাজে যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পুরুষসমাজে তাহার তুলনায় অতি সামান্যই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন কলিকাতাতেও মহিলাসমাজে কঠোর অবরোধ-প্রথা ছিল। কোন ভদ্রমহিলাকে যদি নিজের বাটী হইতে বাহির হইয়া পথ দিয়া দুই-তিনখানা বাটীর পরবর্ত্তী বাটীতে যাইতে হইত, তাহা হইলে পাল্কী ডাকিতে হইত। তখন কলিকাতায় রিক্‌শ ছিল না, কলিকাতার সকল পল্লীতেই বহুসংখ্যক পাল্কী ছিল। সেকালে সেই সকল পাল্কীর ছাদের উপর মোটা কাপড়ে প্রস্তুত আট-দশ হাত দীর্ঘ এবং চার হাত প্রস্থ দুইখানা করিয়া পর্দ্দা থাকিত। পাল্কীর বেহারারা সেই দুইখানা পর্দ্দা, ফুটপাথের উপর গৃহস্থের বাটীর দ্বার হইতে পাল্কীর দ্বার পর্য্যন্ত দুই ধারে আড়াল করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত; ভদ্রমহিলারা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সেই পর্দ্দার অন্তরাল

দিয়া পাল্কীতে আরোহণ করিতেন। তাঁহারা আরোহণ করিবার পর, বেহারারা পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া তবে পাল্কী কাঁধে করিত। অনেক পাল্কীতে 'ঘেরাটোপ' থাকিত; 'ঘেরাটোপ' অর্থে স্থূল বস্ত্রে নির্ম্মিত একটা বড় মশারী। পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া বেহারারা ঐ ঘেরাটোপ দিয়া পাল্কী ঘিরিয়া দিত; তাহাতে পাল্কীর মধ্যে অবরুদ্ধ মহিলারা যে পাল্কীর দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তাহারও উপায় থাকিত না। কলিকাতায় কলুটোলা প্রভৃতি মুসলমানপল্লীতে এখনও ঐরূপ কঠোর অবরোধ-প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্য দুই-চারিখানা পাল্কীও আছে; ভদ্র হিন্দুপল্লীতে পাল্কী আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় 'রাজা' 'মহারাজা' উপাধিধারী কোন কোন বনিয়াদী বংশে এখনও ঐরূপ কঠোর অবরোধ-প্রথা আছে। এখনকার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সাধারণ হিন্দু ভদ্রগৃহস্থের বাটীতেও অবরোধ সম্বন্ধে এইরূপ কঠোরতা ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গঙ্গাস্নানের সময় গঙ্গার ঘাটে, বা কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থে আবরোধ-প্রথার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। গঙ্গার ঘাটে শত শত পুরুষের দৃষ্টির মধ্যে অবগাহন এবং অতিসূক্ষ্ম সিক্তবস্ত্রসহ জল হইতে উঠিয়া ঘাটের উপর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে কোন মহিলা কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ঘোড়ার গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া যে-সকল ভদ্রমহিলা কালীঘাটে দেবীদর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরের সঙ্কীর্ণ পথে, পুরুষের ভীড়ের মধ্য দিয়া গমন করিতে এবং বাজারে দোকানদারগণের সহিত দরদস্তুর করিয়া খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। অবরোধ সম্বন্ধে যুগপৎ ঐরূপ রক্ষণশীল ও ঔদারনীতিক ব্যবস্থা দেখিয়া কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালীর মেয়ে'[১১২] নামক ব্যঙ্গ কবিতায় লিখিয়াছিলেন,

"কুটুম বাড়ী যেতে হলেই গাড়ী মুদে যাওয়া
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গার ঘাটে নাওয়া।"

সেকালে বাঙালী ভদ্রগৃহস্থের অন্তঃপুর-মধ্যে অবগুণ্ঠনের যেরূপ বাহুল্য ছিল, তাহা দেখিলে একালে কলিকাতা-অঞ্চলে কিশোরী ও যুবতী বধূদের পক্ষে বোধ হয় হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইবে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, অন্তঃপুর-মধ্যেও বধূদিগকে প্রায় সর্ব্বক্ষণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতে হইত। পরিবারভুক্ত বয়োবৃদ্ধ স্ত্রীলোক ব্যতীত বাহিরের যে-কোন প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাকে দেখিলে যুবতী ও বালিকা বধূদিগকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে হইত। পরিবারভুক্ত বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়গণের সহিত কথা কহা তো দূরের কথা, তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেই বধূদিগকে ঘোমটা দিতে হইত। দিবাভাগে স্বামীর সহিত কথা কহা অত্যন্ত নির্লজ্জতা বলিয়া বিবেচিত হইত। আমরা যখন হুগলী কলেজে পড়ি তখন হালিশহরে আমার এক সতীর্থ বন্ধুর বাটীতে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে গিয়া দুই-চারি দিন কাটাইয়া আসিতাম। আমার বন্ধুর বাটীতে তাঁহার তিন-চারিটি ছোট ভ্রাতা ভগিনী, জনক, জননী ও পিতামহী ছিলেন। আমার বয়স তখন কুড়ি কি একুশ বৎসর হইবে। আমার বন্ধুর জননীর বয়স তখন বোধ হয়

পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইবে, অর্থাৎ তিনি আমার জননীরই সমবয়স্কা ছিলেন। আমি তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও আমাকে ঠিক পুত্রের মতই আদরযত্ন করিতেন। সেই প্রৌঢ়া মহিলা তখনও তাঁহার বৃদ্ধা শ্বশ্রূর সম্মুখে স্বামীকে দেখিলে একগলা ঘোমটা দিতেন, এমনকি, আমার সাক্ষাতেও তিনি স্বামীকে দেখিলে অবগুণ্ঠনবতী হইতেন। তাঁহার এইরূপ অত্যধিক লজ্জাশীলতা দেখিয়া আমি প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম, কারণ আমাদের বাড়ীতে অবগুণ্ঠনবাহুল্য একেবারেই ছিল না। বোধ হয় চন্দননগরে আমার পিতাই সর্ব্বপ্রথম অবরোধ-প্রথা ও অবগুণ্ঠন-প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেইজন্য আমার পিতার বহু বন্ধু আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীরা তাঁহাকে 'বেম্ম', 'খ্রীষ্টান' প্রভৃতি বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, আমি এক দিন অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে বাটীতে ফিরিবার সময় বালীতে আমার এক আত্মীয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম। আমি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে গৃহস্বামী পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া আসিলেন। সেই অবেলায় তাঁহাকে স্নানের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আর বল কেন? বউমার (ভ্রাতৃবধূর) আঁচলটা আমার গায়ে ঠেকে গিয়েছিল, তাই এই অবেলায় ডুব দিয়ে এলাম।" কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ এবং ভাগিনেয়-বধূকে স্পর্শ করিলে, এমনকি অসাবধানতাবশতঃ তাঁহাদের বস্ত্র স্পর্শ করিলেও এমন উৎকট পাপ হইত যে, তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত! যাঁহারা বলেন যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ দারুণ ঘৃণাবশতঃ নীচ শূদ্রকে স্পর্শ করেন না বা স্পর্শ করিলে স্নান অথবা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, ভ্রাতৃবধূ অথবা ভাগিনেয়-বধূকে অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃই সেকালে লোকে স্পর্শ করিতেন না? হিন্দুসমাজে এই যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার বদ্ধমূল হইয়া আছে, ঘৃণাই যে ইহার প্রধান বা একমাত্র কারণ, তাহা নহে; বহুকাল প্রচলিত দেশাচার ও সংস্কারই ইহার প্রধান কারণ। অবশ্য মেথর, ডোম, মুদ্দফরাস প্রভৃতির প্রতি যে উচ্চবর্ণের হিন্দুর আদৌ ঘৃণা নাই, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

সেকালে বাংলার ভদ্র নারীসমাজে পরিচ্ছদবাহুল্য না থাকিলেও যে অলঙ্কার-বাহুল্য ছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেকালে ভদ্রমহিলাদের এক শাড়ী ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পরিচ্ছদ ছিল না; ধনবতী মহিলারা নিজ বাটীতে বিশেষ কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে বা কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় বেনারসী শাড়ী পরিধান করিতেন। সেই সকল শাড়ীর মূল্য পঞ্চাশ-ষাট টাকা হইতে পাঁচ-সাত শত টাকা পর্য্যন্ত ছিল। সাধারণ গৃহস্থ-মহিলারা ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর বা ঢাকাই শাড়ী 'তোলা পোষাক' রূপে ব্যবহার করিতেন। কার্পাস বস্ত্র যত সূক্ষ্ম হইত ততই তাহা মূল্যবান হইত। সুতরাং যে-যুগে সেমিজ বা সায়ার প্রচলন ছিল না, সেই যুগে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র পরিধান করিয়া ভদ্রমহিলারা যে কিরূপে লজ্জা নিবারণ করিতেন, তাহা বর্ত্তমান যুগে অনুমান করাও কঠিন। বোধ হয় সেইজন্যই সেকালে অবরোধ-প্রথা এবং পরপুরুষের সম্মুখে বাহির হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কঠোরতা ছিল।

তাহার পর সেকালের অলঙ্কারের কথা। মহিলাসমাজের কথা বলিবার সময় অলঙ্কারের উল্লেখ না করিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেকালে ধনবানদিগের পুত্রবধূ, কন্যা বা গৃহিণীরা যখন সকল প্রকার অলঙ্কার পরিধান করিতেন, তখন অনেক সময় তাঁহাদিগকে অলঙ্কারের ভারে বিব্রত হইতে হইত। তাঁহাদের আড়ষ্ট ভাব দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইত যে, তাঁহারা অলঙ্কারের জন্য দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। আজকাল দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী প্রভৃতির প্রতিমাকে যেরূপ আপাদ-মস্তক বহু অলঙ্কারে ভূষিত করা হয়, সেকালে লক্ষ্মীর বরকন্যারা ঠিক সেইরূপ ভূষণে ভূষিত হইতেন।

আমার মনে হয়, সেকালে ভদ্র গৃহস্থ মহিলাদের মধ্যে আত্মমর্য্যাদাবোধ এক বিষয়ে এখনকার অপেক্ষা অল্প ছিল। সেকালে অনেক স্ত্রীলোকই কুটুমবাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যাইবার সময়, প্রতিবেশিনীদিগের নিকট হইতে অলঙ্কার চাহিয়া লইয়া পরিধান করিয়া যাইতেন। একালে বোধ হয় সামান্য আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন স্ত্রীলোকও সেকালের মত পরের গহনা পরিয়া কুটুম্ববাড়ীতে 'বড়মানুষী' দেখাইতে ঘৃণা বোধ করেন। সেকালে মহিলাসমাজে আর একটা প্রথা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইত, একালে তাহা বড় দেখিতে পাই না। আমরা বাল্যকালেও দেখিয়াছি, ধনবতী মহিলারা আপাদমস্তক অলঙ্কার ও বহুমূল্য বেনারসী শাড়ী পরিয়া আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া আসিবার সময় খাবারের একটা 'ছাঁদা' বাঁধিয়া আনিতেন। আজকাল কোন ভদ্রমহিলা এইরূপ ছাঁদা বাঁধিতে ঘৃণা করেন; বোধ হয় তাঁহারা কল্পনা করিতেও পারেন না যে তাঁহাদের পিতামহী-মাতামহীরা কুটুম্ববাড়ী হইতে বড় বড় খাবারের পুঁটুলি হাতে লইয়া গাড়ী-পাল্কীতে আরোহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

আর একটা বিষয়ে মহিলাসমাজে প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেকালে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যত অধিকসংখ্যক শুচিবায়ুগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যাইত একালে সেরূপ দেখা যায় না। এক এক জন স্ত্রীলোকের শুচিবায়ুর কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হইত। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের এক প্রতিবেশিনীর এইরূপ উৎকট শুচিবায়ু ছিল। তিনি রন্ধনশালাতে রন্ধনের জন্য যে জল ব্যবহার করিতেন, সেই জলে প্রত্যহ একটুকরা ঘুঁটে ফেলিয়া রাখিতেন, কারণ পুষ্করিণী হইতে জল আনিবার সময় যদি তাঁহার পদতলে কোন অশুদ্ধ দ্রব্য ঠেকিয়া থাকে, তাহা হইলে যে তাঁহার কক্ষস্থিত ঘড়ার জলটাও অপবিত্র হইত, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাঁধিবার জলের সেই অপবিত্রতা দূর করিবার জন্যই তিনি সেই জলকে গোময় দ্বারা পবিত্র করিয়া লইতেন। আমরা বাল্যকালে একজন বিধবা ব্রাহ্মণীকে দেখিয়াছি, তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় কক্ষস্থিত ঘড়ার গঙ্গাজল পথে ছড়া দিতে দিতে আসিতেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "পথে কত নোংরা জিনিষ থাকে, কত হাড়ী-মেথর পথ মাড়িয়ে চলে, গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ হয়ে সে-পথে চলি কেমন ক'রে? তাই গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে পথটাকে শুদ্ধ ক'রে নিই।" শুচিবায়ুগ্রস্ত অনেক স্ত্রীলোক সর্ব্বদা জল ঘাঁটার জন্য বার মাসই হাতে পায়ে

'হাজা' ক্ষতে কষ্ট পাইতেন। কোন কোন স্ত্রীলোক সমস্ত দিন সিক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন, সিক্ত বস্ত্রটা নাকি অশুচিতা-নিবারক। এই শুচিবায়ুরোগ কেবল যে প্রাচীনা ও বিধবাদেরই ছিল তাহা নহে, অনেক সধবা যুবতীও উৎকট শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন।

সেকালের মহিলাসমাজে আর একটা প্রথা ছিল সম্বন্ধ পাতানো। 'সই' (সখি), 'মিত্তিন' (মিত্রাণী), 'মকর', 'গঙ্গাজল', 'মহাপ্রসাদ', 'সাগর', 'গোলাপজল', 'গোলাপ', 'বেয়ান', 'মনের কথা' প্রভৃতি যাহা হউক একটা সম্পর্ক পাতাইয়া সেকালের মহিলারা পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতেন। এই সকল পাতানো সম্বন্ধের মধ্যে কোন কোনটির প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মভাবের উপর ছিল। পুরীতে জগন্নাথ-দর্শনে গিয়া মহিলারা পরস্পরের মুখে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ দিয়া 'মহাপ্রসাদ' সম্বন্ধ পাতাইয়া আসিতেন। অনেক সময় কোন মহিলা পুরী হইতে মহাপ্রসাদ আনিয়া নিজ পল্লীবাসিনীর মুখে সে মহাপ্রসাদ দিয়া 'মহাপ্রসাদ' সম্বন্ধ পাতাইতেন। উত্তরায়ণে গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে গিয়া পরস্পরের মধ্যে 'সাগর' পাতাইয়া আসিতেন। মকর-সংক্রান্তির দিন, গঙ্গাস্নান করিয়া পরস্পরের মধ্যে 'মকর' পাতানো হইত। 'বেয়ান' সম্বন্ধটা সাধারণতঃ বাল্যকালে পুতুল খেলার সময় পাতানো হইত। একটি বালিকার পুতুল-ছেলের সহিত অন্য বালিকার পুতুল-মেয়ের বিবাহ দিয়া বালিকারা পরস্পরের 'বেয়ান' হইত। সংসারক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকৃত বেয়ানদের মধ্যে, দেনা-পাওনা বা পারিবারিক কোন ব্যাপার লইয়া মনোমালিন্য ঘটিতে দেখা যায়, কিন্তু পাতানো 'বেয়ান' অথবা অন্য কোন পাতানো সম্পর্কে সম্পৃক্তা মহিলাদের মধ্যে কখনও মনোমালিন্য ঘটিতে দেখা যাইত না, কারণ উহা নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি এবং ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হইত। এই সকল প্রীতির সম্বন্ধ অনেক সময় দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিত। পুত্রকন্যারা মাতার 'সই' বা 'বেয়ান'কে 'সই-মা' বা 'বেয়ান-মা' বলিয়া সম্বোধন করিত। 'সই-মার' মত সেকালে 'সই-ঠাকুরমা' 'সই-দিদিমা' 'মকর-ঠাকুরমা' পর্য্যন্ত সম্বোধন আমরা শুনিয়াছি। অনেক সময় রঙ্গপ্রিয়া রসিকরা পরস্পরের মধ্যে এমন অদ্ভুত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন যে, তাহা শুনিলে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইত। আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি আমার জননীর সমবয়স্কা দুইজন মহিলা পরস্পরের মধ্যে 'মুখে আগুন' সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন এবং সর্ব্বজনসমক্ষে পরস্পরকে 'মুখে আগুন' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। আমাদের বয়স যখন চৌদ্দ কি পনের বৎসর অর্থাৎ এখনকার পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্ব্বে, একটা জনরব প্রচারিত হইল যে, কোনও গ্রামের গ্রাম্য দেবতা নাকি স্বপ্নযোগে কোন মহিলাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, পুত্রকন্যার কল্যাণকামনায় প্রত্যেক স্ত্রীলোককে অন্য একজন স্ত্রীলোকের সহিত 'সই' পাতাইতে হইবে, না পাতাইলে ভীষণ অমঙ্গল হইবে। আর যায় কোথা? একে দেবতার প্রত্যাদেশ, তাহার উপর পুত্রকন্যার শুভাশুভ লইয়া কথা। কোন্ গ্রামে, কোন্ দেবতা, কাহাকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রয়োজন হইল না, ইতর-ভদ্র প্রায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই 'সই'

পাতাইবার ধুম পড়িয়া গেল। দেবতার নাকি আদেশ ছিল যে, দধি ও চিপিটকে ফলার মাখিয়া পরস্পরের মুখে দিয়া "মুখে দিলাম চিঁড়ে-দই, তুমি আমার জন্মের সই", এই মন্ত্র তিন বার বলিতে হইবে। সেই হুজুগে কয়েকদিন ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে চিঁড়া-মুড়কি বিক্রয় হইয়াছিল। এই হুজুগের পূর্ব্বে, যাঁহারা 'সই' পাতাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সইয়ের বাড়ীতে দধি, চিঁড়া, মুড়কি, কদলী এবং মিষ্টান্ন পাঠাইয়া সেই অজ্ঞাত গ্রামের অপরিচিত গ্রাম্য দেবতার কোপ-শান্তি করিয়াছিলেন। সেকালের মহিলাসমাজে এই কৃত্রিম সম্বন্ধ পাতাইবার ইচ্ছা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা অশিক্ষিতা ও কুসংস্কারমণ্ডিতা হইলেও পরকে আপন করিতে, নিঃসংপৃক্ত পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

বিশ্বভারতীর অঙ্কুর

কিঞ্চিৎ কম চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। একদিন আপিস হইতে বাড়ীতে আসিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর লিখিত একখানি পত্র পাইলাম। পত্রে তিনি অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছেন, "শান্তিনিকেতনে আমি ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া একটি স্কুল করিয়াছি। তোমার বড় ছেলেটির বয়স কত হইল? যদি আট-দশ বৎসরের হইয়া থাকে, তবে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়ো।"

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রকুমারের বয়স তখন আট কি নয় বৎসর হইবে। কবিবরের পত্র পাঠ করিয়া আমি আমার পিতাকে সেই পত্র পাঠ করিতে দিলাম। তিনি পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, "রবীন্দ্রবাবু ধীরেনকে বোলপুর পাঠাইতে বলিয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা। কিন্তু আমরা দরিদ্র গৃহস্থ, তিনি রাজাবিশেষ লোক। তাঁহার স্কুলে ধীরেনকে রাখিতে যে ব্যয় হইবে, তাহা তাঁহার পক্ষে নগণ্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে হয়ত সে ব্যয়ভার বহন করা কষ্টকর বা অসাধ্য হইবে। স্কুলের বেতন কত, সেকালে মাসিক কিরূপ ব্যয় হইবে, রবীন্দ্রবাবু তাহা কিছুই লেখেন নাই। আমার মতে তুমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া অগ্রে মাসিক ব্যয়ের খবরটা জানিয়া লও, যদি আমাদের সাধ্যে কুলায় তাহা হইলে পাঠাইতে আপত্তি নাই। তবে ধীরেনকে পাঠাইবার পূর্ব্বে তুমি একবার নিজে গিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আসিলে ভাল হয়।"

আমি সেই দিনই কবিবরের পত্রের উত্তর দিলাম, সেই পত্রে আমার পিতার অভিমতও তাঁহাকে জানাইলাম। তিন দিন পরে রবীন্দ্রবাবুর পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি তোমার ছেলেকে পাঠাইতে বলিয়াছি, তুমি খরচের কথা লিখিয়াছ কেন? আমি তোমার সাংসারিক অবস্থার কথা জানি। তোমার ছেলের জন্য এক পয়সাও তোমাকে দিতে হইবে না। তুমি আসিবে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আসিবার পূর্ব্বে আমাকে সংবাদ দিলে ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইয়া দিব।"

আমি তখন কলিকাতায় একটা সওদাগরী আপিসে কার্য্য করিতাম, ছুটি না পাইলে বোলপুর যাইতে পারি না, তাই ছুটির জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

সেই সময় চন্দননগরের সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়* আমাদের বাড়ীতে একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি শীঘ্রই এক দিন বোলপুরে যাইব শুনিয়া রাজারামবাবু বলিলেন, "দ্বিজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় আছে, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে জানা-শুনা নাই। তোমার সঙ্গে গিয়া রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিলে হয়।" আমি কবিবরকে সেই কথা লিখিলে তিনি উত্তরে লিখিলেন, "তোমার সঙ্গে রাজারামবাবু আসিলে গুডফ্রাইডে উপলক্ষে ছুটি পাইয়া রাজারামবাবুকে লইয়া বিশেষ আনন্দিত হইব।" ইহার কয়েক দিন পরই আমি রবীন্দ্রবাবুর আমন্ত্রণে বোলপুর যাত্রা করিলাম।

আমরা প্রাতঃকালে স্নান আহার করিয়া ট্রেনে উঠিয়া বেলা প্রায় তিনটার সময় বোলপুর ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাদের দুইজনের সঙ্গে দুইটা ব্যাগ ছিল, তাহাতে বস্ত্র ও গামোছা প্রভৃতি লইয়াছিলাম। ষ্টেশনের গেটে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিয়া শান্তিনিকেতন হইতে কোন গাড়ী আসিয়াছে কিনা অনুসন্ধান করিতেছিলাম, এমন সময় একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথায় যাইবেন?" আমরা শান্তিনিকেতন যাইব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমিও শান্তিনিকেতনেই যাইব, আমার সঙ্গে আসুন, ঐ যে শান্তিনিকেতনের গাড়ী।" এই বলিয়া আমাদিগকে লইয়া একখানা বুলক্ ট্রেনের নিকট গমন করিলেন। বুলক্ ট্রেন গো-বাহিত শকট তবে তাহা দরমা-আচ্ছাদিত নহে, ঘোড়ার গাড়ীর মত অথবা শিবিকার মত তক্তাদ্বারা নির্ম্মিত, ভিতরে চার-পাঁচ জন আরোহী অনায়াসে বসিতে পারে। গাড়ীর তলায় ঘোড়ার গাড়ীর মত স্প্রিং থাকাতে অসমতল পথে আরোহীকে ধাক্কা খাইতে হয় না।

আমরা তিনজনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমাদের সহযাত্রী সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন যে, তিনি কলিকাতা হইতে আমাদের সহিত একই ট্রেনে আসিয়াছেন, তিনি রবীন্দ্রবাবুর জমিদারীর এক জন কর্ম্মচারী; রবীন্দ্রবাবু শান্তিনিকেতনে থাকিলে তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসিতে হয়। তিনি ষ্টেশন হইতে পদব্রজেই শান্তিনিকেতনে যাইতেন, আমাদের সহিত দেখা হওয়াতে তাঁহাকে আর চলিতে হইল না, আমাদের জন্য প্রেরিত গাড়ীতেই তিনি আমাদের সঙ্গে একত্রে গমন করিলেন। ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতন বোধ হয় এক ক্রোশ হইবে। আমাদের সহযাত্রী সেই ভদ্রলোক বলিলেন যে, শান্তিনিকেতন যে গ্রামের নিকট অবস্থিত, সেই গ্রামের নাম ভুবনডাঙা। প্রায় আধ ঘণ্টার পর আমরা ভুবনডাঙা অতিক্রম করিয়া গ্রামের উত্তর দিকে মাঠে উপস্থিত হইলে, সেই ভদ্রলোক সম্মুখে অদূরে একটি দ্বিতল সুন্দর অট্টালিকা দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ শান্তিনিকেতন।"

---

* স্বর্গীয় রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আদি বাস হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরে। তিনি কৃষ্ণনগর হইতে চন্দননগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় কলিকাতায় প্রথমে যে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, রাজারামবাবু তাহাতে অন্যতম অধ্যাপকরূপে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিতেন। স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ও রাজারামবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রাজারামবাবু ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি প্রভৃতি কণ্ঠসঙ্গীত ও পাখোয়াজ, ডুগি-তবলা, বীণা, সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি যন্ত্র-সঙ্গীত, উভয় প্রকার সঙ্গীতই শিক্ষা দিতেন। চন্দননগরের বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়ক বসন্তলাল মিত্র, ভদ্রকালীর সুবিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা ও গায়ক রামচন্দ্র দত্ত রাজারামবাবুর ছাত্র ছিলেন।

একটা বড় জলাশয়ের পূর্ব্ব ও উত্তর পার্শ্ব দিয়া আমাদের গাড়ী শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকের ফটকে উপস্থিত হইল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র এক জন দ্বারবান গাড়ীর ভিতর হইতে আমাদের ব্যাগ দুইটি লইয়া আমাদিগকে সেই অট্টালিকাতে লইয়া গেল। ষ্টেশন হইতে যে ভদ্রলোকটি আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনি আমাদের সঙ্গে না গিয়া অন্য পথে অট্টালিকার পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন।

শান্তিনিকেতন একটি প্রকাণ্ড সুন্দর বাগান, বাগানে নানাবিধ ফলকর বৃক্ষ ও ফুলের গাছ, বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে অট্টালিকা—অট্টালিকা হইতে দক্ষিণ দিকের ফটক পর্য্যন্ত একটি সুন্দর, সরল, বিস্তৃত পথ। পরে দেখিয়াছিলাম যে, বাগানের উত্তর দিকেও ঐরূপ একটি ফটক ও ফটক পর্য্যন্ত পথ আছে। উত্তর দিকের ঐ পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ আমলকী গাছ। বাগানের পশ্চিম ও উত্তর দিকে বিস্তৃত মাঠ, নিকটে গ্রাম নাই। পূর্ব্ব দিকে কিছু দূরে রেলওয়ে লাইন, কিন্তু শান্তিনিকেতন হইতে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ শান্তিনিকেতন উচ্চভূমিতে অবস্থিত, রেলপথ সেই উচ্চভূমি খনন করিয়া প্রায় ২০ হাত নীচে দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলের ভূমি নিম্নবঙ্গের ভূমির মত সমতল নহে, উঁচু নীচু ঢেউ-খেলান। শান্তিনিকেতনের অগ্নিকোণে, যে জলাশয়ের ধার দিয়া আমাদের গাড়ী আসিয়াছিল, সেই জলাশয়ের দক্ষিণে ভুবনডাঙা নামক গ্রাম। এই জলাশয়টিকে বাঁধ বলে। ক্রমনিম্ন ভূমির নিম্ন দিকে বাঁধ বাঁধিয়া জলাশয় করা হইয়াছে। এইরূপ জলাশয়কেই বীরভূম জেলাতে বাঁধ বলে।

আমরা দ্বারবানের সঙ্গে অট্টালিকার নিম্নতলস্থ হলঘরে প্রবেশ করিলে দ্বারবান একটা টেবিলের উপর ব্যাগ দুইটি রাখিয়া চলিয়া যাইবামাত্র অন্য দ্বার দিয়া একজন বাঙালী ভৃত্য হলঘরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল যে আমরা তামাক খাই কি না। রাজারামবাবু তামাক খাইতেন, তিনি ধূমপানের ইচ্ছা জানাইলে ভৃত্য বলিল—ব্রাহ্মণের হুঁকা? রাজারামবাবু সম্মতি প্রকাশ করিলে ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে তামাক সাজিয়া আনিয়া রাজারামবাবুর হাতে হুঁকা দিয়া বলিল, "আপনারা কুয়ার জলে স্নান করিবেন, না বাঁধে স্নান করিবেন?" আমরা স্নান করিয়া আসিয়াছি শুনিয়া সে বলিল, "তবে আপনাদের আহারের স্থান করিতে বলি?"

রাজারামবাবু বলিলেন, "আমরা বাড়ী হইতে স্নানাহার সারিয়া আসিয়াছি, সেজন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রবীন্দ্রবাবু কোথায়?"

ভৃত্য বলিল, "তিনি উপরে আছেন, চারিটার পরই নীচে আসিবেন", এই বলিয়া চলিয়া গেল এবং প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দুইখানা রেকাবিতে কিছু মিষ্টান্ন ও ফলমূল আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "আপনারা মুখে হাতে জল দিয়া একটু জলযোগ করুন।"

রাজারামবাবু বলিলেন, "এখন আবার জলখাবার আনিলে কেন?"

ভৃত্য বলিল, "সেই কোন্ সকালে কলিকাতা হইতে আহার করিয়া আসিয়াছেন, আবার রাত্রে নয়টার সময় খাওয়া হইবে, একটু জলযোগ না করিলে কষ্ট হইবে।" এই

বলিয়া সে আমাদিগকে মুখ-হাত ধুইবার স্থান দেখাইয়া দিলে আমরা মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া জলযোগে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের জলখাওয়া শেষ হইলে রাজারামবাবু পুনরায় ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন, ভৃত্য রেকাবি দুইখানি লইয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, "বাবু এখনই আসিবেন, তাঁর নামিবার সময় হইয়াছে।"

পাঁচ-ছয় মিনিট পরে পার্শ্বস্থ কক্ষে পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, রবীন্দ্রবাবু সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছেন। আমি সেই কক্ষের দ্বারের নিকট অগ্রসর হইলে রবীন্দ্রবাবু আমাকে দেখিতে পাইয়া হাসিমুখে বলিলেন, "যোগিন এসেছ? রাজারামবাবু এসেছেন?"

আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকটে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি লইয়া বলিলাম, "হাঁ, তিনি এসেছেন।"

রবীন্দ্রবাবু হলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজারামবাবুকে দেখিবামাত্র হাসিমুখে নমস্কার করিলে রাজারামবাবুও দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিনমস্কার করিলেন।

আমরা তিনজনে উপবেশন করিলে রাজারামবাবু বলিলেন, "বোধ হয় পঁচিশ বৎসরের পর আমি আপনাকে দেখিলাম। আমি আপনার বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকটে যখন আপনাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাইতাম, তখন আপনার বয়স বোধ হয় পনের-ষোল বৎসর হইবে।"

রাজারামবাবু রবীন্দ্রবাবু অপেক্ষা কুড়ি-বাইশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা দুইজনে সেই সেকালের অর্থাৎ রবীন্দ্রবাবুর পনের-ষোল বৎসর বয়সের ও তাহারও পূর্ব্বেকার ঘটনার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আমি নীরব শ্রোতা হইয়া তাঁহাদের আলোচনা শুনিতে লাগিলাম। সেই সেকালে, আদি ব্রাহ্মসমাজে কে সঙ্গীত করিতেন, কে পাখোয়াজ বাজাইতেন, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর [১৮৪০-১৯১৪] মহাশয়ের বাড়ীতে সেকালের কোন্ কোন্ সুবিখ্যাত গায়ক আসিতেন, রাজারামবাবু কোথায় কোন্ কোন্ ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। আমি লক্ষ্য করিলাম, অন্য সময় আমি রবীন্দ্রবাবুর কাছে গেলে তিনি আমার সঙ্গে যেরূপ বিবিধ বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিতেন, সেদিন সেরূপ করিলেন না, আমি যেন তাঁহাদের আলাপ-পরিচয়ের বাহিরে পড়িয়া রহিলাম। আমি বুঝিলাম যে, রাজারামবাবুর সহিত সেদিন তাঁহার প্রথম পরিচয় বলিয়া তিনি শিষ্টাচারবশতঃ রাজারামবাবুর সঙ্গেই আগ্রহ সহকারে কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইলেন। বিশেষতঃ সেদিন রাজারামবাবুর সঙ্গে যে সকল ব্যক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল, আমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার কৈশোরের যৌবনের বিস্মৃতপ্রায় কোন কোন ঘটনার কথা রাজারামবাবুর মুখে শুনিয়া যে আনন্দলাভ করিতেছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম।

বেলা পাঁচটার সময় রবীন্দ্রবাবু গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "এস যোগিন, তোমাকে আমার ইস্কুল দেখাই গে।" এই বলিয়া রাজারামবাবুকে বলিলেন, "আমি এখানে একটা পাঠশালা খুলেছি, সেই কথা যোগিনকে লিখে ওকে এখানে আসতে বলেছিলেম।"

এই বলিয়া তিনি রাজারামবাবুকে লইয়া অগ্রসর হইলেন, আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম।

বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত একতলা ঘরে আমরা উপস্থিত হইলাম। ঘরটি খুব বড়ও নহে ছোটও নহে, বোধ হয় পনের-ষোল হাত দীর্ঘ ও আট-নয় হাত প্রস্থ হইবে। ঘরের মেঝেতে ঢালা বিছানা পাতা, আট-নয়টি বালক সেই বিছানার উপর দুই-তিন দলে বিভক্ত হইয়া বসিয়া ছিল। রবীন্দ্রবাবু সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া রাজারামবাবুকে বলিলেন, "এই আমার পাঠশালা।" দেখিলাম, তিন-চারিজন ভদ্রলোক ছেলেদের পড়াইতেছেন। শিক্ষকগণের মধ্যে আমার পূর্ব্বপরিচিত দুইজন লোককে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। একজন স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, আর একজন স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় [১৮৬৯-১৯৩৩]। দেখিলাম, একজন পশ্চিম-ভারতীয় ভদ্রলোক কয়েকটি ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার হিন্দুস্থানী বলিয়া মনে হইল, পরে শুনিলাম তিনি সিন্ধুদেশবাসী খ্রীষ্টান, তাঁহার নাম মিঃ রেবাচাঁদ। এই তিনজন ব্যতীত আর এক জন বাঙালী ভদ্রলোককে সেখানে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়াতে জানিলাম, তিনি আমাদের চন্দননগরের ডাক্তার হরলাল দত্ত মহাশয়ের জামাতা, নাম বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র নান। কার্ত্তিকবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষক নহেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, সেইজন্য কার্ত্তিকবাবু মাঝে মাঝে আসিয়া দশ-পনের দিন শান্তিনিকেতনে থাকেন, সেই সময় তিনি ছাত্রগণকে রবীন্দ্রবাবুর নির্দ্দেশ-ক্রমে পড়াইয়া থাকেন।

পাছে ছাত্রদের পড়াশুনায় ব্যাঘাত হয়, তাই আমরা কক্ষের এক পার্শ্বে নীরেব বসিয়া রহিলাম। রবীন্দ্রবাবু তিন-চারিটি বালককে ইংরাজী পড়াইতে লাগিলেন। এই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় একটি নূতন ব্যবস্থা দেখিলাম, প্রায় সকল বিষয়ই মুখে মুখে শিখান হইতেছিল, অন্যান্য স্কুলের মত পুস্তকের সহিত ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিলাম না। রবীন্দ্রবাবু এক-একটি বাংলা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ বলিয়া দিয়া সেই শব্দ ক্রিয়ার সহিত কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, কয়েকটি বালককে লইয়া শিখাইতে লাগিলেন। দেখিলাম, দশ-বার মিনিটের মধ্যেই ছাত্রেরা "আমার বই টেবিলের উপরে আছে", "তোমার হাত বাক্সের মধ্যে ছিল" প্রভৃতি ছোট ছোট বাক্য ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বালকদিগের খেলিবার ছুটি হইল। অন্যান্য স্কুলে খেলিবার ছুটি হইলে ছাত্রেরা যেরূপ ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি করে, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম না, পার্থক্য এই দেখিলাম যে, রবীন্দ্রবাবু ও শিক্ষকগণও ছাত্রদের খেলার সাথী হইলেন; তাঁহারা দৌড়াদৌড়ি না করিয়া এক স্থানে বসিয়া বালকগণের ক্রীড়া পরিচালনা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন যে, আমার বড় ছেলের বয়স যদি আট-দশ বৎসর হইয়া থাকে, তবে তাহাকে তাঁহার স্কুলে পাঠাইয়া দিলে তিনি আনন্দিত হইবেন। দেখিলাম, ছাত্রদের বয়স আট-দশ বৎসরই হইবে। দুইটি ছাত্রের

বয়স বোধ হয় এগার বৎসর হইবে, যেটির বয়স সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, তাহার বয়স বোধ হয় ছয় বৎসর হইবে, শুনিলাম সেটি রবীন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ।

সন্ধ্যার পর বালকগণ স্কুলের বারান্দায় সমবেত হইল। শুনিলাম, সন্ধ্যার পর রবীন্দ্রবাবু বালকগণকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেদিন রাজারামবাবু ছিলেন বলিয়া বোধ হয় বালকগণের সঙ্গীত শিক্ষা বন্ধ রাখিয়া কবিবর রাজারামবাবুর সহিত সঙ্গীত আলোচনা করিতে লাগিলেন। স্কুলে একটি বক্স হার্ম্মোনিয়ম ছিল, রবীন্দ্রবাবু তাহা লইয়া একটি গান করিলেন। গানটি কবির স্বরচিত। তাহার পর তিনি রাজারামবাবুকে একটি গান করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে গানে অভ্যস্ত নই। যে যন্ত্রে সুর বাঁধা থাকে, চাবি টিপিলেই একটা সুর বাহির হয়, সেরূপ যন্ত্র আমি ব্যবহার করি না। আমার মনে হয়, হার্ম্মোনিয়মটা যেন ছেলেদের ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের ছাপান মানের বই, ডিক্‌সনারি খুলিতে হয় না, বানান দেখিতে হয় না, পাতা উল্টাইলেই উদ্দিষ্ট শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। তানপুরা, সেতার, বীণা, এস্রাজ, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রে সুর বাঁধিয়া লইতে হয়, তাহাতে শিক্ষার্থীদের অতি শীঘ্র সুরবোধ জন্মে, আমার কোন ছাত্রকে আমি হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে গলা সাধিতে বা গান গাহিতে দিই না।"

রাজারামবাবুর কথা শুনিয়া কবিবর একজনকে তানপুরা আনিতে বলিলে আট-দশ মিনিট পরে একটা তানপুরা আনীত হইল, তখন রাজারামবাবু একটি স্বরচিত বাংলা গান করিলেন। তাহার পর প্রায় রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বাংলা ও হিন্দী কয়েকটি গান ও রাগরাগিণী সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলিল।

রাত্রি নয়টার সময় রবীন্দ্রবাবু আমাদের সকলকে লইয়া শান্তিনিকেতনে সেই অট্টালিকায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম যে, যে হলঘরে আমরা বসিয়াছিলাম, তাহার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় আমাদের ভোজনের স্থান হইয়াছে। আসন ও থালা, বাটি, গ্লাস প্রভৃতি তৈজসপত্র সব এক রকমের। রবীন্দ্রনাথ একটা আসনে উপবেশন করিলে ছাত্রগণ তাঁহার দক্ষিণ দিকে এবং আমরা তাঁহার বাম দিকে উপবেশন করিলাম। রবীন্দ্রবাবু আসনে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে উপাসনা করিলেন। আহারের শেষেও সেইরূপ উপাসনা করিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলে আমরাও আসন ত্যাগ করিলাম। ছাত্রগণ হাত-মুখ ধুইয়া স্কুলে চলিয়া গেল, রবীন্দ্রবাবু আমাদিগকে লইয়া সেই হলঘরে গিয়া উপবেশন করিলেন, একজন ভৃত্য রাজারামবাবুকে তামাক দিয়া গেল।

রাত্রি দশটার সময় আমার নিদ্রাবোধ হইলে রবীন্দ্রবাবু বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "যোগিন, তোমার ঘুম পাচ্ছে। সমস্ত দিন গাড়ীতে এসেছ, শরীর অবসন্ন হয়েছে, তুমি যাও শোও গে।" অনন্তর রাজারামবাবুকে বলিলেন, "আপনারও গাড়ীতে এসে কষ্ট হয়েছে, আপনিও বিশ্রাম করুন, আমরাও একটু পরেই উঠব।" কবিবরের অনুমতি পাইয়া আমরা দণ্ডায়মান হইলে একজন ভৃত্য হলের পশ্চিম দিকে একটা কক্ষে আমাদিগকে লইয়া গেল। আমরা দেখিলাম সেই কক্ষে দুইটি পৃথক্ শয্যা রচিত

হইয়াছে। ভৃত্য দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে রাজারামবাবু আমাকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "যোগিন, একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছ? আমাদের সঙ্গে আজ রবীন্দ্রবাবুর সাক্ষাতের পর তিনি একবারও আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, আমাদের আহারাদি হইয়াছে কি না, কেন বল দেখি?" আমি এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, "টাকা থাকিলেই লোক বড়লোক হয় না, বড়লোক প্রমাণ হয় ব্যবহারে। তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগকে এমন শিখাইয়া দিয়াছেন যে তাহারাই অতিথি-সৎকার নিখুঁত ভাবে করিতে পারে। রবীন্দ্রবাবু জানেন যে, তিনি না থাকিলেও অতিথি অভ্যাগতদিগের ত্রুটি হইবে না।"

পরদিন ভোরবেলা ঢং-ঢং করিয়া ঘণ্টার শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমরা হলঘরে আসিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বদিনের সেই বাঙালী ভৃত্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রবাবু উঠিয়াছেন কি না তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "বাবু অনেকক্ষণ উঠেছেন, তিনি স্নান করছেন।" কখন তিনি নীচে আসিবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিল যে, রবীন্দ্রবাবু স্নান করিয়া প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হয়েন, ভ্রমণের পর তিনি মন্দিরে উপাসনা করিতে যান, উপাসনার পর স্কুলে যাইবেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা এখন স্নান করিব কি পরে স্নান করিব। রাজারামবাবু বলিলেন, "এত সকালে স্নান করা আমাদের অভ্যাস নাই, আমরা একটু বেড়াইয়া আসিয়া স্নান করিব।"

আমাদের মুখ-হাত ধোওয়া শেষ হইলে রাজারামবাবু বলিলেন, "চল যোগিন, আমরা একটু চারিদিকে ঘুরিয়া আসি।" আমরা স্কুলের কাছে আসিয়া দেখিলাম, বালকগণ ল্যাঙ্গট পরিয়া ধূলিধূসরিত হইয়া দ্বারবানের সঙ্গে কুস্তি করিতেছে। নয়-দশ বৎসর বয়স্ক বাঙালী বালকগণের একজন প্রাপ্তবয়স্ক বলবান পশ্চিমা পালোয়ানের সহিত কুস্তি দেখিয়া আমরা বিশেষ আমোদ বোধ করিলাম। পাঁচ-সাত মিনিট কুস্তি দেখিয়া আমরা দক্ষিণ দিকের ফটক—অর্থাৎ পূর্ব্বদিন যে ফটকে আমরা গাড়ী হইতে নামিয়াছিলাম—সেই ফটক হইতে বাহির হইয়া ভুবনডাঙা গ্রামের দিকে যাইতে লাগিলাম। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। দেখিলাম আমাদের বামদিকে, বাগানের সীমানার বাহিরে অসংখ্য ছোট ছোট ঝোপ রহিয়াছে এবং সেই ঝোপের মধ্যে দুইখানি তৃণাচ্ছাদিত কুটীর রহিয়াছে। একটা কুটীরের দাওয়াতে উপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া আমরা সেই দিকে অগ্রসর হইলে তিনি হাসিমুখে আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, তাই লোকালয়ে বাস না করিয়া এই শালবনে কুটীরে একাকী বাস করি, আর ঐ কুটীরে শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ তাঁহার ভাইকে লইয়া থাকেন।" শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদের ছোট ভাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র, বয়স দশ-এগার বৎসর হইবে।

আমরা যে ছোট ছোট ঝোপ দেখিয়াছিলাম, সেগুলি শালগাছের চারা, অধিকাংশ গাছই কোমর-সমান উচ্চ, দুই-চারিটা তিন হাত সাড়ে তিন হাত উচ্চ হইয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, রবীন্দ্রবাবু এইখানে একটা শালবন তৈয়ারী করিতেছেন। ঐ সকল শালের চারা দূর হইতে আনাইয়া রোপণ করা হইয়াছে। সে শালবন এখনও আছে কি না জানি না; যদি থাকে, তবে এতদিনে গাছগুলি নিশ্চয়ই খুব বড় হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আমরা ভুবনডাঙা গ্রামটি প্রদক্ষিণ করিয়া আবার যখন বাঁধের নিকটে আসিলাম তখন ছাত্রেরা বাঁধে স্নান করিতেছিল, ছোট ছোট ছেলেদের জলাশয়ে স্নান করিবার সময় একজন শিক্ষক তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন, সেদিন জগদানন্দবাবুকে ছাত্রদের সহিত স্নান করিতে দেখিলাম। উপাধ্যায় মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে বেড়াইতেছিলেন, বেড়াইবার সময় তাঁহার নিকট হইতে শান্তিনিকেতন ও বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইলাম। তিনি বলিলেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নির্জ্জনে ঈশ্বর-চিন্তায় কালযাপনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে কলিকাতা হইতে বহুদূরে নির্জন স্থানে এই শান্তিনিকেতন স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে যে-কোন ভদ্রলোক আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন। শান্তিনিকেতনের সীমার মধ্যে মাদক দ্রব্য সেবন এবং মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য সপ্তাহে দুই-তিন দিন মাংস খাইতে দেওয়া হয়, সেই জন্য রবীন্দ্রবাবু স্কুলগৃহের অব্যবহিত পশ্চিমে শান্তিনিকেতনের সীমার বাহিরে ছাত্রদের জন্য রন্ধনাগার ও ভোজনাগার নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ছাত্রেরা সেইখানেই ভোজন করে, তবে মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনে তাহাদের গুরুদেবের সঙ্গেও আহার করে। ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রমের ছাত্রগণ রবীন্দ্রবাবুকে গুরুদেব বলে। উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, স্নানের পর ছাত্রগণ মন্দিরে গিয়া রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে উপাসনা করে, তাহার পর স্কুলে আঁসিয়া জলযোগের পর পড়াশুনা করে।

বেলা সাতটার সময় ছাত্রেরা শিক্ষকগণের সহিত শ্রেণীবদ্ধভাবে উপাসনা-মন্দিরে গমন করিল। আমরা অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে আট-দশ জন ভদ্রলোক যেখানে উপস্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন রাজারামবাবুকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে রাজারামবাবু বলিলেন, "আমি আপনাকে ঠিক চিনিতে পারিতেছি না।" সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "কলিকাতার সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। আপনি আমাকে বিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু আমি আমার ওস্তাদজীকে কি ভুলিতে পারি?" সেই ভদ্রলোকের বয়স তখন বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসর হইবে। তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা কলিকাতা হইতে রাত্রির ট্রেনে যাত্রা করিয়া ভোরবেলা বোলপুরে ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে আসিয়াছেন। তাঁহারা কয় জন আসিবেন এবং কোন্ ট্রেনে আসিবেন তাহার স্থিরতা ছিল না বলিয়া পূর্ব্বে করিবরকে সংবাদ দিতে পারেন নাই।

মন্দিরে শঙ্খধ্বনি (আমার ঠিক মনে নাই শঙ্খধ্বনি কি ঘণ্টাধ্বনি, তবে শঙ্খধ্বনি বলিয়াই মনে হইতেছে) শ্রবণ করিয়া আমরা সকলে মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড হল, উহার প্রাচীর ইষ্টকের পরিবর্ত্তে শার্শীর মত কাচে নির্ম্মিত। হলের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে সারি সারি কুশাসন পাতা, বোধ হয় চল্লিশ কি পঞ্চাশখানা আসন ছিল। মন্দিরের ছাদের উপর এক পার্শ্বে রথের চূড়ার মত একটি অতি উচ্চ লৌহনির্ম্মিত চূড়া আছে। রেলের গাড়ী ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক গভীর খাদের মধ্য দিয়া গিয়াছে বলিয়া ট্রেনের যাত্রীরা গাড়ী হইতে শান্তিনিকেতনের অট্টালিকা দেখিতে পায়

না, কিন্তু এই চূড়ার উপরিভাগ বোলপুর স্টেশন হইতে দেড় মাইল বা দুই মাইল উত্তরে গাড়ী আসিলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্দিরের বাহিরে পাদুকা উন্মোচনপূর্ব্বক আমরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রবীন্দ্রবাবু পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, মন্দিরের পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাস্য হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে গায়ক ও বাদকগণ এবং বাম পার্শ্বে ছাত্রগণকে লইয়া শিক্ষকগণ স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। আমরাও নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করিলে পাখোয়াজ ও তানপুরা সহযোগে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইল। মন্দিরস্থ সকলের গাম্ভীর্য্যে ধূপ-ধুনার সৌরভে মন্দিরটি যেন শান্তি ও পবিত্রতার আকর বলিয়া মনে হইতেছিল, ব্রহ্মসঙ্গীতটি যেন সেই শান্তি ও পবিত্রতা বহুগুণে বৰ্দ্ধিত করিল। সঙ্গীতের পর কবিবর প্রায় দশ-বার মিনিট প্রার্থনা করিলেন। কবিবর মধুর কণ্ঠে গম্ভীর অথচ সুললিত ভাষায় যখন প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন আমার মনে হইল যে, তাঁহার মুখে উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দ যেন আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করিতে লাগিল। উপাসনার পর আর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইলে উপাসনাকার্য্য শেষ হইল। উহার পূর্ব্বে ও পরে চন্দননগরে এবং কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মসঙ্গীত, উপাসনা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি, এমনকি মাঘোৎসবের সময় মহর্ষির জোড়াসাঁকোর ভবনেও স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা এবং রবীন্দ্রবাবুর মুখে ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সেদিন শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনাতে যোগ দিয়া হৃদয়ে ও মনে যে শান্তি ও পবিত্রতার ভাব জাগরূক হইয়াছিল, মনে হইল যে তাহা অতুলনীয়।

বালকেরা শিক্ষকদের সহিত স্কুলে চলিয়া গেল, রবীন্দ্রবাবু তাঁহার নবাগত অতিথিদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে হলঘরে গমন করিলেন, রাজারামবাবু কার্ত্তিকবাবু ও আমরা তিনজনে কথা কহিতে অট্টালিকার দিকে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে আমি কার্ত্তিকবাবুকে বলিলাম যে, আজ মন্দিরে আমি যে অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি পাইয়াছি, পূর্ব্বে সেরূপ কখনও পাই নাই। রাজারামবাবু বলিলেন, "সেটা মহর্ষির সাধনার প্রভাব! এই শান্তিনিকেতন মহর্ষির সাধনার পীঠস্থান। তিনি এই স্থানে যে অপার্থিব শান্তি ও পবিত্রতার বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফল কখনও ব্যর্থ হইবে না। ইহা একটি মহাতীর্থ।"

আমরা হলের দ্বারে উপস্থিত হইলে ভৃত্য বলিল, "আপনারা বাঁধে স্নান করিবেন, না কুয়াতলায় স্নান করিবেন?" রাজারামবাবু বলিলেন যে বহুদিন হইতে তোলা জলে স্নান করিতেছেন, জলে অবগাহন করিয়া স্নান করেন না। রাজারামবাবু বাঁধে যাইবেন না শুনিয়া আমিও আর বাঁধে গেলাম না, দুইজনেই কুয়াতলায় গিয়া স্নান করিলাম। কুয়াতলায় আর একজন ভৃত্য উপস্থিত ছিল, সেই জল তুলিয়া দিল। স্নানান্তে আমরা সেইখানেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম। আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব দিনের সেই ভৃত্য আমাদের জন্য দুইটা রেকাবিতে মোহনভোগ ও দুই গ্লাস জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমরা জলযোগ করিয়া ইস্কুলে গেলাম। সকালে

আটটা হইতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইত। সকালে দেখিলাম, ছাত্রেরা পুস্তক লইয়া পড়িতেছে। কোন শিক্ষক অঙ্ক শিখাইতেছেন, কেহ বা ম্যাপ দেখাইয়া ভূগোল পড়াইতেছেন, কেহ বা সাহিত্য পড়াইতেছেন। সেদিন সকালে রবীন্দ্রবাবুকে স্কুলে দেখিলাম না, বোধ হয় তিনি কলিকাতা হইতে সমাগত ভদ্রলোকদিগের নিকটে ছিলেন।

বেলা এগারটার সময় শিক্ষকগণের সহিত আমরা আহার করিতে গেলাম, সেদিন ছাত্রগণ আর আমাদের সঙ্গে গেল না, তাহারা ছাত্রাবাসের পাকশালাতে ভোজন করিতে গেল। আমরা পূর্ব্বরাত্রিতে যেখানে আহার করিয়াছিলাম, কবিবর তাঁহার নূতন অতিথিদিগকে লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, প্রত্যেকের অন্ন শ্বেতপ্রস্তরের থালাতে সজ্জিত রহিয়াছে, ব্যঞ্জনের বাটি ও গ্লাসগুলিও শ্বেতপাথরের। পূর্ব্বরাত্রির মত কবিবর ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে কিয়ৎক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে নীরবে মনে মনে উপাসনা করিলেন।

বেলা বারটার সময় রবীন্দ্রবাবু উপরে চলিয়া গেলেন, আমরা হলঘরে বসিয়া নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। আমরা সেইদিন রাত্রির ট্রেনে চন্দননগরে ফিরিব, একথা রবীন্দ্রবাবুকে বলিলাম।

সেদিন বৈকালে ছাত্রদের কোন ক্লাস হইল না, সন্ধ্যা হইতে সঙ্গীতচর্চ্চা আরম্ভ হইল। কবিবর ও রাজারামবাবু উভয়েই গান করিলেন। আমার মনে হইতেছে, রাজারামবাবুর সেই কলিকাতাবাসী সাকরেদটিও গান করিয়াছিলেন। কবিবর এক বার রাজারামবাবুকে বলিলেন, "আপনি এখানে থাকিয়া স্কুলে সঙ্গীত শিক্ষার ভার লইতে পারেন না কি?" উত্তরে রাজারামবাবু বলিলেন, "আমার সংসারে আমি একমাত্র পুরুষ, সেইজন্য আমাকে বাড়িতে থাকিতে হয়। এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাঁহাতে এখানে থাকিতে পারিলে ত ধন্য হই, কিন্তু থাকিবার উপায় নাই।"

কিয়ৎক্ষণ পরে রবীন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন, "যোগিন, যদি আজই ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আটটার সময় আহারাদি করিয়া লইও, আমাদের সঙ্গে রাত্রি নয়টায় খাইলে আজ আর যাওয়া হইবে না।" তিনি পূর্ব্বেই তাঁহার পাচককে বোধ হয় বলিয়া রাখিয়াছিলেন, কেননা রাত্রি আটটার সময় সেই ভৃত্য আসিয়া আমাকে বলিল, "আপনাদের খাবার দেওয়া হইয়াছে।" আমরা আহার করিয়া রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় লইবার জন্য আবার স্কুলে গেলাম, ভৃত্য আমাদের ব্যাগ দুইটা লইয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। আমি গিয়া কবিবরকে প্রণাম করিলাম এবং উপাধ্যায় মহাশয়, জগদানন্দবাবু, কার্ত্তিকবাবু প্রভৃতির নিকট বিদায় লইলাম। রাজারামবাবুও সকলের সহিত নমস্কার বিনিময় করিলে, রবীন্দ্রবাবু তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে ফটক পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। দেখিলাম, পূর্ব্বদিনের সেই গাড়ী উপস্থিত রহিয়াছে। গাড়ীর মধ্যে আমাদের ব্যাগ রহিয়াছে। আর এক বার প্রণাম ও নমস্কারের পর আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রের বয়স তখন নয় বৎসর। আমার মুখে

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা শুনিয়া আমার পিতা ধীরেনকে শান্তিনিকেতনে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। রাজারামবাবুও ধীরেনকে বোলপুরে পাঠাইবার জন্য আমার পিতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দিন-পনের পরে আমি আপিস হইতে এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বোলপুরে ধীরেনকে লইয়া গেলাম। যাইবার পূর্ব্বে কবিবরকে পত্র দিয়াছিলাম। বোলপুরে ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলাম যে, আমাদের জন্য শান্তিনিকেতনের গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। সেই দিনই ধীরেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইল।

ধীরেনকে রাখিতে গিয়া আমি পাঁচ দিন সেখানে ছিলাম। সেই পাঁচ দিনে স্কুলের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলাম। সাধারণ স্কুলে যেরূপ শ্রেণী-বিভাগ থাকে, ঐ স্কুলে সেরূপ শ্রেণী-বিভাগ ছিল না, সকল ছাত্রই সকল শ্রেণীর ছাত্র। যে-ছাত্র যে-বিষয়ে যত দূর জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তাহাকে তদনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইত। ধীরেন ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ পর্য্যন্ত গণিত শিখিয়াছিল, বাংলা যে-কোন পুস্তক পড়িতে ও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত কিন্তু ইংরাজীর অক্ষরপরিচয় পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে সে কোন স্কুলে পড়ে নাই, বাড়ীতে আমার পিতার কাছে পড়াশুনা করিত। আমার পিতা সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য করিয়া সে সময় পেন্সন লইয়া বাড়িতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিমত ছিল যে, দশ-বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেরা যদি মাতৃভাষায় শিক্ষা পায়, তাহা হইলে পরে যে-কোন বিদেশীর ভাষা তাহারা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে। সেইজন্য তিনি আমাদিগকে দশ-এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাংলা স্কুলে পড়াইয়া পরে ইংরাজী স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন। ধীরেনকে কোন বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া স্বয়ং তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধীরেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গিয়া ইংরাজী আরম্ভ করিয়াছিল, সেইজন্য সাত-আট বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের সহিত তাহাকে ইংরাজী পড়িতে হইত। কিন্তু বাংলা, গণিত ও ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের ছাত্রদের সহিত একত্র পড়িত। সকল ছাত্রের পক্ষেই এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। স্কুলে বার্ষিক, ষাণ্মাসিক পরীক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রগণের শিক্ষা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা শিক্ষকগণই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানেন। তাঁহারা যে-ছাত্রকে যে-পুস্তক পড়িবার অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন তাহাকে সেই পুস্তক পড়াইতেন। শিক্ষাবিষয়ে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অনেকটা সেকালের চতুষ্পাঠীর শিক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হইত। তবে চতুষ্পাঠীর শিক্ষার সহিত আশ্রমের শিক্ষায় এই প্রভেদ ছিল যে-চতুষ্পাঠীতে প্রত্যেক ছাত্র ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, কাব্য, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি যে, কোন বিষয়ের একটি মাত্র অধ্যয়ন করে এবং সেই বিষয়ের পাঠ শেষ হইলে অন্য বিষয়ের পাঠ আরম্ভ করে; স্মৃতির ছাত্র অলঙ্কার পড়ে না, কাব্যের ছাত্র দর্শন পড়ে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সকল ছাত্রকেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। বাংলা, ইংরাজী, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, সঙ্গীত, শিল্পকার্য্য—সকল বিষয়েই প্রত্যেক ছাত্রকেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। কবিবর স্বয়ং ছাত্রদিগকে ইংরাজী, বাংলা ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, জগদানন্দবাবু বিজ্ঞান পড়াইতেন, কার্ত্তিকবাবু ভূগোল পড়াইতেন।

চার-পাঁচ দিন সেখানে থাকিয়া আমি ছাত্রদের দৈনিক কার্য্যক্রম যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা এই : অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের পর ছাত্রগণকে কুস্তি ও ব্যায়াম করিতে হইত, তাহার পর সূর্য্যোদয়ের সময় স্নান; স্নানের সময় সন্তরণ-শিক্ষা। স্নানান্তে মন্দিরে গিয়া উপাসনা। উপাসনার পর জলযোগ—মোহনভোগ ও দুগ্ধ। তাহার পর বেলা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত পড়াশুনা, এগারটার সময় ভোজন। ভোজনের পর বিশ্রাম, বিশ্রাম অর্থে দিবানিদ্রা বা শয়ন নহে—স্কুলঘরের মধ্যে বসিয়া ক্রীড়া (indoor games), গল্প প্রভৃতি। কয়েক মাস পরে একবার গিয়া দেখিয়াছিলাম যে, একজন মৃৎশিল্পীকে মধ্যাহ্নকালে ছাত্রগণকে মাটির ফল ফুল পাতা ও পুতুল প্রভৃতির নির্ম্মাণ শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে কাঠের কাজ ও বয়নশিল্প শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ধীরেন স্বহস্তে একখানি গামোছা বয়ন করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। বেলা চারিটার পর পুনরায় জলযোগ, কোন দিন লুচি, কোন দিন চিঁড়ার ফলার বা মুড়ি এবং ঋতু-অনুযায়ী ফলমূল। এই জলযোগের পরে আবার কিয়ৎক্ষণ অধ্যয়ন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাত্রগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিত। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত, আবৃত্তি, গল্প প্রভৃতি। ছাত্রগণকে অনুমানে পারদর্শী করিবার জন্য কবিবর অতি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদিন দেখিলাম, ছোট বড় ভাঙা ইট আনাইয়া এক স্থানে রাখা হইয়াছে। ইটগুলি কি হইবে জিজ্ঞাসা করাতে কবিবর বলিলেন, "এখনই দেখিতে পাইবে।" সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাত্রদের খেলিবার ছুটি হইলে কবিবর ছাত্রদের লইয়া এক স্থানে উপবেশন করিলেন এবং এক জনের পর একজন ছাত্রকে ডাকিয়া, এক-একখানা ইটের ওজন কত হইবে, ছাত্রদিগকে আন্দাজ করিতে বলিলেন। ছাত্রগণ যাহা বলিল, তিনি তাহা একজন শিক্ষককে লিখিতে বলিলেন। তার পর একখানির পর একখানি ইট তৌলদাঁড়িতে ওজন করিয়া ছাত্রগণকে দেখাইয়া দিলেন যে, তাহারা যে ওজন অনুমান করিয়াছিল তাহা প্রকৃত ওজন হইতে কত তফাৎ। অন্য এক দিন দেখিলাম, তিনি একটা বল দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সেটা কত গজ দূরে পড়িল, তাহা ছাত্রগণকে অনুমান করিতে বলিলেন এবং পরে গজের দ্বারা মাপিয়া দেখাইলেন যে, প্রকৃত দূরত্ব হইতে তাহাদের কথিত আনুমানিক দূরত্বের পার্থক্য কিরূপ। এইরূপ ভারের অনুমান, দূরত্বের অনুমান, সময়ের অনুমান সম্বন্ধে ছাত্রগণের একটা ধারণা হইত।

শিক্ষকগণ যে সকল সময় স্কুলগৃহের মধ্যে বসিয়াই অধ্যাপনা করিতেন, তাহা নহে; এক জন শিক্ষক হয়ত তিনটি ছাত্রকে লইয়া একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়াইতে লাগিলেন, অন্য এক জন শিক্ষক অপর তিন-চারিটি ছাত্রকে লইয়া বাগানের আর এক দিকে অন্য একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়াইতে লাগিলেন। একবার দেখিয়াছিলাম, জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় একটা গাছতলায় বসিয়া ছাত্রগণের সহিত বিজ্ঞান সম্বন্ধে গল্প করিতেছেন। উদ্ভিদের গাত্রে আঘাত করিলে যে তাহারাও বেদনা বোধ করে, তাহা আমরা কিরূপে জানিতে পারি, সেই সম্বন্ধে তিনি গল্প করিতেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন ইংরাজী সাহিত্যের

অধ্যাপক বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কেও একবার কবিবরের 'পাঠশালায়' গুরুমহাশয়গিরি করিতে দেখিয়াছিলাম।

ধীরেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বোধ হয় দুই বৎসরের কিছু অধিক কাল ছিল। সেই সময়ের মধ্যে আমি পাঁচ-ছয় বার বোলপুরে গিয়াছিলাম। চন্দননগর হইতে ধীরেনই প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গমন করে। তাহার পর আমার মুখে আশ্রমের সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া হুগলীর ভূতপূর্ব্ব উকীল-সরকার স্বর্গীয় শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এক দিন আমার সঙ্গে বোলপুর গমন করেন ও রবীন্দ্রবাবুর সহিত পরিচিত হন। ইহার কয়েক দিন পরেই ললিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবনীমোহন এবং এক সহোদরকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার অল্পদিন পরে আমার অন্যতম বন্ধু এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের খুল্লতাত-পুত্র প্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অরুণপ্রকাশকেও আশ্রমে পাঠাইয়া ছিলেন। অরুণপ্রকাশ এখন লক্ষ্ণৌয়ে একটা কলেজের অধ্যাপক। বঙ্কিম-যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক 'নবজীবন'[১১৩] সম্পাদক স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অচ্যুতচন্দ্রকে এবং চন্দননগরের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক আমাদের প্রতিবেশী স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গৌরচন্দ্রকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। গৌরচন্দ্র সেখানে শিক্ষা শেষ করিয়া বিশ্বভারতীর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। গৌরচন্দ্র কবিবরের সঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া এখন শ্রীনিকেতনে আছেন। অচ্যুতচন্দ্র বর্ত্তমানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ধীরেনের সতীর্থগণের মধ্যে শ্রীমান্ প্রেমানন্দ সিংহ এখন হাইকোর্টের উকীল ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র অরুণচন্দ্র সেনও ধীরেনের সতীর্থ ছিলেন। ইনি এখন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক। সে সময় আরও যে কয়জন বালক ছিল তাহাদের সকলের নাম মনে নাই এবং কে কোথায় আছে জানি না। কবিবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ এবং কবিবরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র সন্তোষচন্দ্রকে লইয়াই বোধ হয় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একরূপ সূত্রপাত। রবীন্দ্রবাবু ইঁহাদের দুইজনকে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে কবিবর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, বর্ত্তমান শ্রীনিকেতন তাহার ফল। এখনকার প্রায় কুড়ি কি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন 'হিতবাদী'তে কার্য্য করিতাম, সে সময় এক দিন সন্তোষচন্দ্র আমার আপিসে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহার পর একদিন সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাঠ করিলাম। ধীরেনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিত্যাগের পর সন্তোষচন্দ্র, অচ্যুতচন্দ্র, প্রেমানন্দ এবং আমাদের প্রতিবেশী গৌরচন্দ্র ব্যতীত ধীরেনের সতীর্থগণের মধ্যে কাহারও সহিত আমার আর দেখা হয় নাই। প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে ধীরেনের মৃত্যু হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ছাত্রবৃদ্ধির সহিত শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একদিন

কবিবর আমাকে বলিলেন, "যোগিন, তোমার জানা এমন কোন লোক আছেন, যিনি যৎসামান্য বৃত্তির পরিবর্ত্তে আমার আশ্রমে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন? যদি থাকেন আমাকে পত্র দিও।" সেই সময় চন্দননগরের সুকবি শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ. পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। আমি কবিবরের প্রস্তাবের কথা তাঁহাকে বলাতে তিনি আনন্দসহকারে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, আমিও রবীন্দ্রবাবুকে পত্রদ্বারা জানাইলাম যে, নরেন্দ্রনাথ বোলপুরে যাইতে সম্মত। আশ্রম প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ একদিন কবিবরকে দর্শন করিবার জন্য আমার সঙ্গে জোড়াসাঁকোতে গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি রবীন্দ্রবাবুর নিকটে অপরিচিত ছিলেন না। কবিবরের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবোধচন্দ্র মজুমদার এবং উপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্রমে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মনোরঞ্জনবাবু এখন সম্বলপুরে ওকালতি করেন।

ছাত্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছাত্রাবাসের প্রয়োজন হয়। আমি শেষ বার যখন বোলপুরে যাই তখন দেখি যে, স্কুলগৃহের পূর্ব্বদিকে একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সুদীর্ঘ ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইতেছে। তখন প্রাচীর, টালির ছাদ এবং কক্ষতল সম্পূর্ণ হইয়াছিল, জানালায় ও দ্বারে তখনও কবাট লাগান হয় নাই। ছাত্রাবাসটি নির্ম্মিত হইবার পর ছাত্রগণ সেই গৃহে এবং শিক্ষকগণ স্কুলগৃহে থাকিতেন।

এখন, আমার এই তিয়াত্তর বৎসর বয়সে, দুর্ব্বল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং আমার এই রচনার মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ ও ক্রটিবিচ্যুতি না থাকাই আশ্চর্য্য। আবার লিখিবার সময় এমন অনেক বিষয় মনে পড়িয়া যায়, যাহা লিখিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে। তবে একটা বিষয়ের উল্লেখ না করিলে আশ্রমের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ধীরেনের মুখে শুনিয়াছিলাম, আশ্রমে একবার তাহার জ্বর হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর পত্নী সেই সংবাদ শুনিয়া ধীরেনকে ছাত্রাবাস হইতে নিজের কাছে লইয়া যাইবার জন্য একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দেন। জ্বরটা তিন-চারি দিন ছিল, সেসময় তাহাকে দুধ ও জলসাগু খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। দশ বৎসরের বালক জলসাগু খাইতে আপত্তি করিলে রবীন্দ্রবাবুর পত্নী তাহাকে কাছে বসাইয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে "লক্ষ্মী আমার, যাদু আমার, এইটুকু খেয়ে ফেল, তাহলে তোমার জ্বর ভাল হয়ে যাবে" প্রভৃতি বলিয়া সাগু খাওয়াইতেন। আশ্রমে কোন বালকের পীড়া হইলে তিনি রোগীকে উপরে আপনার কাছে আনাইয়া স্বয়ং তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। পরবর্ত্তী কালে দেখিয়াছি, ধীরেন যখনই কবি-পত্নীর কথা বলিত, তখনই তাহার নয়নযুগল সজল হইয়া উঠিত।

ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, শান্তিনিকেতনের নৈর্ঋত কোণে. একটি অনতিবৃহৎ কক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামে যে অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল, এখন তাহার 'বিশ্বভারতী' রূপ বিশাল বনস্পতিতে পরিণত হইয়া সমগ্র সভ্য জগতের বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতেছে। একদিন পাঁচ-ছয়টি অল্পবয়স্ক বালককে লইয়া মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ

যে প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, এখন তাহা শত শত ছাত্রছাত্রী-পরিবেষ্টিত অধ্যাপকমণ্ডলীর সমবায়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। একজন লোকের যত্ন, আগ্রহ, একাগ্রতা, স্বার্থত্যাগ এবং সর্ব্বোপরি অতুলনীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে যে কত বড় মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, বিশ্বভারতী তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। যদি রবীন্দ্রবাবু কবি, সাহিত্যিক বা সঙ্গীত-রচয়িতা নাও হইতেন তাহা হইলেও তাঁহাকে এই বিশ্বভারতীই জগদ্বিখ্যাত এবং অমরত্ব প্রদান করিত।

সেকালের লোকশিক্ষা

ভারতবর্ষে, জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল, সেই সকল ব্যবস্থা কাল সহকারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা শাস্ত্রানুশীলন করিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতেন। কিন্তু কোন সমাজেই শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক থাকে না, অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক থাকে। এদেশেও শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক ছিল না, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক ছিল। অথচ ঐ সকল অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোক সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত বা পৌরাণিক জ্ঞানবর্জ্জিত ছিল না। শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিত লোকের মনে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগরূক রাখিবার জন্য এমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, সেই ব্যবস্থার ফলে, একই সময়ে শত সহস্র ব্যক্তি আনন্দের সহিত ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিত। সেকালের ধর্ম্মপ্রচার একালের ধর্ম্মপ্রচারের ন্যায় নীরস, শুষ্ক উপদেশ মাত্র ছিল না।

চৈতন্যমঙ্গল, চণ্ডীর গান, রামায়ণ গান, কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, এমনকি কবির গান, তরজা ও প্রাথমিক যুগের থিয়েটারে নাটকাভিনয়ও জনসাধারণের মনে ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তারের প্রধান সহায় ছিল। যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনেই রচিত ও গীত হইত। কথকদিগের সমস্ত পালাই, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং দেবীপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ হইতে রচিত হইত। পূর্ব্বে এদেশে যাত্রার প্রচলন ছিল না, দেড়শত বা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে যাত্রা ছিল না, কবিগান, তরজা, কথকতা প্রভৃতি যাত্রার অপেক্ষা বহু প্রাচীন। পুরাণ-পাঠ তদপেক্ষাও প্রাচীনতর।

পুরাণপাঠকেরা শত সহস্র শ্রোতার মধ্যে বসিয়া রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন, পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় শ্রোতৃবর্গ অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিত। ধনবান্ ব্যক্তিরা পুরাণ পাঠের ব্যয়ভার আনন্দচিত্তে বহন করিতেন, অনেক সময় দুই আনা, চারি আনা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াও পুরাণ পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। এই পুরাণ পাঠের ব্যয় বহন করা লোকে পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিত।

এইরূপ পুরাণ-পাঠ শ্রবণে জনসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটিত বটে, কিন্তু ঐ ব্যবস্থা বোধ হয় অশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণে বিশেষ সফল হইত না। যাহাতে জনসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান লাভের সহিত আনন্দ লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন কথক মহাশয়েরা। তাঁহারাও পৌরাণিক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়াই

কথকতা করিতেন, উপরন্তু মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত এবং শান্ত, করুণ, বীর, বীভৎস, হাস্য প্রভৃতি রসের সহযোগে তাঁহাদের বক্ষ্যমান বিষয়কে একান্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিলেন। পুরাণপাঠকেরা কেবল পুরাণের শ্লোক পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিতেন, কথকেরা পুরাণের শ্লোক অল্পই আবৃত্তি করিতেন, কিন্তু সেই সকল শ্লোকের সমর্থক গান, গল্প, উদাহরণ প্রভৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃসুলভ অঙ্গভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন ও সময়োপযোগী বর্ণনা দ্বারা বিষয়টি এতই হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম করিতেন যে, কি শিক্ষিত আর কি অশিক্ষিত, সকল শ্রোতাই আত্মবিস্মৃত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত কথকের বাক্য শ্রবণ করিত। এক কথায়, পুরাণপাঠকগণের অপেক্ষা কথকগণ শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় অধিকারে সমধিক সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সকল কঠিন বিষয়, পুরাণপাঠকগণের মুখে শ্রবণ করিয়া অশিক্ষিত লোকে সহজে বুঝিতে পারিত না, কথক মহাশয়েরা গান, গল্প, উদাহরণ প্রভৃতি দ্বারা তাহা জলের মত সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহারা ঐ সকল কঠিন বিষয় যে কেবল বুঝাইয়া দিতেন তাহা নহে এরূপ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, শ্রোতার হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা বদ্ধমূল হইয়া থাকিত।

কথকেরা ব্যাসাসনে অর্থাৎ বেদীতে বসিয়া যে সকল গান করিতেন, তাহা বাদ্যযন্ত্র নিরপেক্ষ। সেই সকল গানের সহিত কোনরূপ বাদ্যধ্বনি করা হইত না, অথচ শ্রোতাদের মধ্যে সকলেই যে সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিত তাহাও নহে। সঙ্গীতজ্ঞ শ্রোতাদের জন্য কথকদিগকে রাগরাগিণী এবং তাল, সম, লয় প্রভৃতিও শিক্ষা করিতে হইত। কথকেরা, বেদীতে বসিয়া যে সময়ের বর্ণনা করিতেন, তাহা সেই সময়ে গেয় রাগিণীতে গান করিতেন। অপরাহ্নের বর্ণনা পূরবী বা মুলতানে, সন্ধ্যা বর্ণনা ইমনে, নিশীথ বর্ণনা বেহাগ, শঙ্করা বা খাম্বাজে, প্রভাত বর্ণনা ললিত, ভৈরোঁ প্রভৃতি প্রভাতী রাগরাগিণীতে গান করাতে সেই সময়ের বর্ণনাটা শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে সত্য সত্যই সেই সময়ের চিত্র অঙ্কিত করিত। আমার মনে আছে, আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন আমাদের বাটীতে একজন কথক কথকতা করিতেন। অহল্যা-উদ্ধার পালাতে তিনি এমন সুন্দর প্রভাতী রাগিণীতে প্রভাত বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, শ্রবণকালে আমাদের ধারণা হইয়াছিল যে, বুঝি সত্য সত্যই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। এইরূপে শ্রোতাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া কথকেরা সরল ভাষায় অতি দুরূহ দার্শনিক-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেও, শ্রোতাদের তাহা হৃদয়ঙ্গম হইত। এইরূপ ধর্ম্মের দার্শনিক ব্যাখ্যাও নিরক্ষর অশিক্ষিত ব্যক্তির চিত্তে প্রস্তরে খোদিত চিত্রের মত স্থায়ী হইত এবং তাহা সমাজের নিম্নতম স্তরে পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিত। রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের আখ্যান ভাগ জানিত না, এরূপ লোক হিন্দুসমাজে অশিক্ষিত জনগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। যে সকল পাশ্চাত্য মনীষী দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিয়া এদেশের সকল স্তরের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় হিন্দুদিগকেই দার্শনিক জাতি— nation of philosophers বলিয়া উল্লেখ করেন। বাস্তবিক, অনেক সময় এ দেশের অশিক্ষিত লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায় যাহা অন্য দেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণের মুখেই

শোভা পায়। 'হিতবাদী'র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক, সুকবি স্বর্গীয় মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, তিনি কালীঘাটে, শ্মশানের অতি দূরে অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে আসিয়া মুনীন্দ্রবাবুর নিকটে উপবেশন করিল এবং তাঁহাকে কোন আত্মীয় বিয়োগ-শোক-কাতর মনে করিয়া সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে জীবনের নশ্বরতা ও ভগবানের সকল কার্য্যই যে মঙ্গলকর তাহার উল্লেখ করিয়া মুনীন্দ্রবাবুকে শোকে তাপে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিল। মুনীন্দ্রবাবু তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেই লোক চব্বিশ পরগণার কোন পল্লীগ্রামের নিরক্ষর ঘরামি, কলিকাতায় কালীদর্শন করিতে আসিয়াছে। সেই নিরক্ষর শ্রমিকের মুখে উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা শুনিয়া মুনীন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এই যে সমাজের নিম্নতম স্তরে পর্য্যন্ত, ঈশ্বরকে মঙ্গলময় জানিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ, এ শিক্ষার শিক্ষক কে? পুরাণপাঠক ও কথকেরাই কি জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষার বিস্তার করেন নাই?

সে কালের যাত্রাও এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারে কম সাহায্য করে নাই। যাত্রাতে অভিনীত পালাগুলিও প্রধানতঃ পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনেই রচিত হইত। কথকেরা একাই সকল ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, পুরুষ বা বীরের ভূমিকায় পুরুষকণ্ঠে উচ্চস্বরে কথা কহিতেন আবার পরমুহূর্ত্তে নারীর ভূমিকা গ্রহণপূর্ব্বক রমণীসুলভ মৃদু ও কোমল কণ্ঠে কহিতেন, করুণ রসের অবতারণা করিয়া শ্রোতাদিগের হৃদয় বিগলিত করিতেন, তাহাদের নয়নে অশ্রু বহাইতেন, আবার তখনই বিদূষকের অভিনয়ে শ্রোতৃবর্গকে হাসাইয়া অস্থির করিয়া তুলিতেন। যাত্রাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিত, যে যখন যে ভূমিকা গ্রহণ করিত, তখন সে সেই ভূমিকার উপযোগী পরিচ্ছদে ভূষিত হইত, গানের সময়ে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত, দর্শক ও শ্রোতাদিগের দৃষ্টির অন্তরালে অভিনেতারা সাজসজ্জা করিত। এই সকল ব্যাপারের জন্য কথকতা অপেক্ষা যাত্রা অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। তবে, কথকতা শ্রবণকে জনসাধারণ যেরূপ পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিত, যাত্রা অভিনয়কে সেভাবে গ্রহণ না করিয়া আমোদপ্রমোদ রূপেই গ্রহণ করিত। সেইজন্য কথকতা অপেক্ষা যাত্রা শুনিবার জন্য অধিক লোকের সমাগম হইত, দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও শত শত ব্যক্তি যাত্রাস্থলে সমবেত হইত। শ্রোতারা যাত্রা শ্রবণকে পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে না করিলেও, যে উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্ম হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য—অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার বিস্তার ব্যর্থ হয় নাই। পুরাণপাঠক বা কথকেরা যেরূপ জনসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক জ্ঞান বিস্তার করিতেন যাত্রার দলের অধিকারীরা তাহার অন্যথা করেন নাই। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্রের বনগমন, পতিনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ, অধার্ম্মিক রাবণ ও দুর্য্যোধনের সবংশে বিনাশ, প্রহ্লাদের ভক্তি, ধ্রুবের কঠোর সাধনা, কর্ণের দানশীলতা প্রভৃতি সেকালে কোন লোকেরই অজ্ঞাত ছিল না।

আমরা দেখিতে পাই যে, সেকালের যাত্রার মধ্যে একমাত্র বিদ্যাসুন্দরের পালাই অপৌরাণিক ছিল, এই একটি মাত্র পালা ব্যতীত যাত্রার কোন পালাই ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশশূন্য ছিল না। অবশ্য প্রহসন হিসাবে, মূল পালার অভিনয়ের পর কোন কোন যাত্রাতে হাস্যরসাত্মক একাঙ্ক নাটিকা অভিনীত হইত। সেই সকল নাটিকাও প্রধানতঃ সামাজিক বা পারিবারিক কলঙ্ক উপলক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইত, তাহাতেও যে সকল কদাচার সমাজদেহে পীড়ারূপে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার অপকারিতা প্রদর্শন করা হইত। বহুবিবাহ, বৃদ্ধের বালিকা বিবাহ, কৌলীন্য রক্ষার জন্য অযোগ্য পাত্র বা পাত্রীর পরিণয় এবং তারকেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব মোহান্ত মাধবগিরির লাম্পট্যের[১১৪] পরিণাম প্রভৃতি সমাজদেহের দুষ্টব্রণই লোকসমাজে উদঘাটিত করিয়া দেখান হইত। মাটের উপর কি পৌরাণিক আর কি সামাজিক, সকল অভিনয়েই পরিণামে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় দেখান হইত।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতায় যখন প্রথম জনসাধারণের জন্য রঙ্গালয়[১১৫] স্থাপিত হয়, তখন তাহাতে প্রধানতঃ পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত নাটকেরই অভিনয় হইত। সে কালের থিয়েটার, 'নলদময়ন্তী'[১১৬] 'শ্রীবৎস-চিন্তা'[১১৭] প্রভাসমিলন'[১১৮] 'নন্দবিদায়'[১১৯] 'প্রহ্লাদ চরিত্র' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক এবং মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'[১২০] নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া সহস্র নরনারীর হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। তদানীন্তন 'বেঙ্গল থিয়েটারে' 'প্রহ্লাদ চরিত্র' এবং 'ষ্টার থিয়েটারে'[১২১] 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দর্শনে, ভক্তিঅশ্রুতে কপোল প্লাবিত হইত না, এরূপ দর্শক বোধ হয় একজনও থাকিত না।

সেকালের পাঁচালীও জনসাধারণের মনে ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করিতে অল্প সাহায্য করে নাই। পাঁচালীওয়ালাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় মহাকবি দাশরথী রায়ই ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠ। তাঁহার রচিত পৌরাণিক পালাগুলিতে সকল রসেরই সমাবেশ থাকাতে শ্রোতারা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঁচালী শ্রবণ করিত। কথকতার মত পাঁচালীও একজনের দ্বারা পঠিত এবং যাত্রার মত একাধিক বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে, একাধিক গায়কের দ্বারা গীত হইত। সেকালের, সুদুর মফঃস্বলে, বোধ হয় এরূপ কোন গ্রাম ছিল না, যে গ্রামে, অশিক্ষিত নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিকদিগের মুখেও যাত্রা বা পাঁচালীর গান শুনিতে পাওয়া যাইত না। মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর যাত্রার 'সতীনাটক' পালার—

"ধর গো তোমরা ধরে তোল, কি হ'ল হায় সতীর কি হল,
পতি নিন্দা শুনে বুঝি সতী আমার প্রাণে মো'ল।"

অথবা দাশরথী রায়ের রচিত 'শ্রীরামচন্দ্রের দেশে আগমন' পালার—

"চল সবে ভার লয়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে
বিনা সে ভূভারহারী রাম বিনা ভার আর কে ল'বে;
দিয়ে ভার ল'লে শরণ বল্‌ব তাঁর ধরে চরণ
এবার ভার বইলাম যেমন, (আর) এমন ভার দিয়ো না ভবে।"

প্রভৃতি গান সেকালে ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পুরুষ-স্ত্রী নির্ব্বিশেষে অনেকেরই জানা ছিল। এই শ্রেণীর গানের মধ্য দিয়া স্ত্রীলোকের পতিভক্তি বা ভগবানে আত্ম-সমর্পণের যে ভাব প্রকটিত হইত, তাহা লোকশিক্ষার পক্ষে কি অতুলনীয় নহে?

একালে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, যাহারা এতদিন অশিক্ষিত নিরক্ষর পল্লীবাসী-দিগের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া, কৃপণের মত আপনাদের অর্জ্জিত বিদ্যা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারে বিরত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কৃষক ও শ্রমিকদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য, অবসর মত পল্লীগ্রাম অঞ্চলে গিয়া সফর করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু, তাহাতে মতদ্বৈত নাই। কিন্তু বর্ণপরিচয় বা নাম স্বাক্ষর করিতে পারাই কি মনুষ্যত্ব? যে ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষকে প্রকৃত মানুষ পদবাচ্য করে, সেই ধর্ম্মবুদ্ধি উন্মেষের কোন চেষ্টা হইতেছে কি? পূর্ব্বে, পুরাণ-পাঠ, কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণ যে শিক্ষা লাভ করিত, যে সদুপদেশ প্রাপ্ত হইত, বর্ত্তমান কালের কোন ব্যবস্থায় তাহা হয় কি? আমার মনে আছে, সাতষট্টি বৎসর পূর্ব্বে, আমার পিতা যখন বীরভূম জেলার সদর সিউড়ীতে শিক্ষকতা করিতেন, তখন স্থানীয় একজন বৃদ্ধ উগ্রক্ষত্রিয় আমাদের বাসাতে ভৃত্যের কার্য্য করিত যে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল। আমাদের বয়স তখন ছয় সাত বৎসর মাত্র। সেই বৃদ্ধ প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পর আমাদিগকে ঘুম পাড়াইবার জন্য রামায়ণ বা মহাভারতের গল্প বলিত। একদিন আমার জননী তাহাকে মহাভারতের একটা আখ্যান বলিতে শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি ত লেখাপড়া শিখ নাই এ সব গল্প কোথায় শুনিলে?" সে বলিল, "কথকঠাকুরের মুখে শুনেছি আর কোথায় শুনব মা?" চন্দননগরে আমাদের বাটীর পার্শ্বেই উদয় মিস্ত্রী নামক আমাদের একজন প্রজা ছিল। সে লেখাপড়া জানিত না, জাতিতে বাগদী, রাজমিস্ত্রির কার্য্য করিত। তাহার মত ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও নির্ম্মল চরিত্র লোক কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ধূমপান ব্যতীত অন্য কোনরূপ মাদকদ্রব্য সেবন করিত না, মাংস খাইত না, প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে কোন প্রতিবেশীকে দিয়া নিজের কুটীরের দাওয়াতে সন্ধ্যার পর কৃত্তিবাসী রামায়ণ অথবা কাশীদাসী মহাভারত নিয়মিত-ভাবে পাঠ করাইত। তাহার অধীনে যে সকল শ্রমিক রাজ অথবা মজুরের কার্য্য করিত, তাহাদের মধ্যে আট-দশজন প্রত্যহ সেই 'পাঠ' শুনিবার জন্য অঙ্গনে সমবেত হইত। এই স্থলে একটা কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি চন্দননগর, চুচুঁড়া ও হুগলী প্রভৃতি আমাদের এ অঞ্চলে বাঙ্গালী ব্যতীত কোন অ-বাঙ্গালী রাজমজুর ছিল না; দুলে, বাগদী, চাঁড়াল, ডোম, হাড়ী প্রভৃতি রাজমজুরের কার্য্য করিত। এই কার্য্যে বাঙ্গালী মুসলমানও ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। আজকাল আমাদের ও-অঞ্চলে মুসলমানগণই গৃহ নির্ম্মাণকার্য্যে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশী উদয় মিস্ত্রির কাছে একজন প্রৌঢ় মুসলমান রাজের কাজ করিত। সেই মুসলমান রাজও মধ্যে মধ্যে মিস্ত্রির বাটীতে 'পাঠ' শুনিতে আসিত। দুই চারিদিন অনুপস্থিতির পর, একদিন আসিয়া সে মিস্ত্রিকে বা অপর কোন রাজকে জিজ্ঞাসা করিত—"রাবণ এসে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেল, সেদিন এই পর্য্যন্ত শুনেছিনু,

তারপর কি হ'ল?" তখন মিস্ত্রি বা অন্য কেহ তাহার কাছে বালীবধ, সাগরবন্ধন ও লঙ্কাদহনের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিত— "আজ রাম-রাবণে যুদ্ধ আরম্ভ হবে।"

আমি আমার দেখা এই একটি উদাহরণ দিলাম, এইরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত পাঠ প্রায় প্রতি পল্লীতেই হইত। সূত্রধরের কারখানা, তাঁতীর তাঁতশালা, স্বর্ণকারের ও মুদীর দোকানে এইরূপ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ হইত, পঞ্চান্ন বা ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমরা ইহা দেখিয়াছি। সেকালে বাঙ্গালীর চরিত্রগঠনে এই দুইখানি বাঙ্গালা মহাকাব্য যে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়াছে, পৃথিবীর কোন দেশে, কোন সমাজে কোন পুস্তক সেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছে কি না সন্দেহ। সেকালে এরূপ কোন ভদ্র গৃহস্থের বাটী ছিল না, যেখানে, বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মহাভারত দেখিতে পাওয়া যাইত না। আজকাল স্কুল কলেজের ছাত্রেরা রবীন্দ্রনাথের বা শরৎ চাটুয্যের নবপ্রকাশিত পুস্তক যেরূপ আগ্রহ সহকারে পাঠ করে, আমরা সেইরূপ আগ্রহ সহকারে ছাত্রাবস্থায়, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিতাম। এগার বৎসর বয়সে, ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি রামায়ণ শেষ করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য বা নীতি-উপদেশ গ্রহণের জন্য আমরা রামায়ণ মহাভারত পড়ি নাই, পড়িয়াছিলাম সরল গল্প পাঠের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য। শর্করামণ্ডিত ঔষধের ন্যায়, অবাস্তব এবং অদ্ভুত কাহিনী সমন্বিত রামায়ণ বা মহাভারত আমাদের চরিত্রগঠনে কি কিছুমাত্র সাহায্য করে নাই? ঐ দুইখানি মহাকাব্য হইতে আমরা যাহা পাইয়াছিলাম, তাহা কি কেবলই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ?

আমার মনে হয়, এখন যে সকল সভা-সমিতি বা প্রতিষ্ঠান হইতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য মফঃস্বলে শিক্ষিত যুবকদিগকে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকল সমিতি বা প্রতিষ্ঠান যদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে কথকতা এবং রামায়ণ-মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। প্রতিষ্ঠান হইতে প্রেরিত স্বেচ্ছা-শিক্ষকগণই একাধারে শিক্ষক-কথক বা শিক্ষক-পাঠক হইবেন। যাঁহাদের সঙ্গীতে সাধারণ জ্ঞান এবং বক্তৃতাশক্তি আছে, তাঁহারা শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে কথকতাও করিবেন; আর যাঁহাদের সে শক্তি নাই, তাঁহারা শিক্ষকতা ও রামায়ণ-মহাভারতের অংশবিশেষ পাঠ করিবেন। অংশবিশেষ বলিলাম, কারণ সমগ্র রামায়ণ বা সমগ্র মহাভারত পাঠ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, তত সময় ব্যয় করা হয়ত তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

এই ব্যবস্থায় অনেকে হয়ত এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন যে, মফঃস্বলে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক সেখানে কথকতা ও রামায়ণ-মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা কি করিয়া হইবে? উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, আমি হিন্দু সমাজের লোকশিক্ষার কথা বলিতেছি, মুসলমানসমাজের কথা বলিতেছি না। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে বাঙ্গালা পুরাণ রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় বাঙ্গালী মুসলমান-

সমাজের উপযোগী কোন পুস্তক আছে কি না তাহা আমি জানি না। মুসলমানসমাজের চরিত্রগঠন ও লোকশিক্ষার বিষয় শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ বিবেচনা করিবেন। পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করিয়াও যে ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করা যায়, তাহা সেকালের পুরাণপাঠক ও কথকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং এখন মফঃস্বলে কথকতা বা রামায়ণ-মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা হইলে, অ-হিন্দুদিগের তাহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন হয়, তখন মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, ব্যারিস্টার মিঃ রসুল, মুন্সি দেদার বক্স, মৌলবী আবুল কাসেম, মৌলানা আক্রাম খাঁ, ডাক্তার গফুর, মৌলবী আবুল হোসেন প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবর্গ সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়া মফঃস্বলে গ্রাম হইতে গ্রামাঞ্চলে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। সেই সময়ের বহু সভাতে, বক্তা হিসাবে বা শ্রোতা হিসাবে যোগদানের সুযোগ এই প্রবন্ধ লেখকের হইয়াছিল। মৌলবী আবুল হোসেনসাহেব বক্তৃতাকালে কথায় কথায় বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত হইতে অজস্র কবিতা এবং দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি একবার চন্দননগরে একটা সভাতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহই তাঁহাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পাঠে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বলিতেন, "যদি মানুষ হইতে চাও ত রামায়ণ-মহাভারত পড়।" অথচ সেই বৃদ্ধ মুসলমান ইসলাম ধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনি পৌত্রকে 'মানুষ' করিবার জন্যই রামায়ণ-মহাভারত পড়াইয়াছিলেন, পৌত্রের পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য নহে।

সেকালে লোকশিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। কবির লড়াই ও তরজা আর নাই, পাঁচালীর কথাও আর বড় শুনিতে পাই না। যাত্রাদলের সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে যে, খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়; কথকের সংখ্যাও বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে, যে কয়জন কথক আছেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা মহিলাগণের ধর্ম্মবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়; কথকের সংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, আর পঁচিশ বা পঞ্চাশ বৎসর পরে লোকশিক্ষার এই অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠানও বিলুপ্ত হইবে। পুরাণ-পাঠ কথকতা অপেক্ষাও শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। থিয়েটারে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হইলে টিকিট-বিক্রয় হয় না। এখন দেশী ও বিলাতী সিনেমা, লোকশিক্ষার নহে, লোকের চিত্তরঞ্জনের ভার গ্রহণ করিয়াছে। যে সিনেমাতে ষোড়শী সুন্দরী ও সুকণ্ঠী গায়িকার সংখ্যাই অধিক এবং নৃত্যগীতে অঙ্গ-সঞ্চালন ও কটাক্ষের ছড়াছড়ি, যে সিনেমাতে পিতাপুত্র বা ভ্রাতাভগিনী একত্র বসিয়া দেখিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, সেই সিনেমা হইতে দর্শকদিগকে স্থানের অভাবে ফিরিয়া যাইতে হয়। ইহা হইতেই বর্ত্তমান সমাজের রুচি ও শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।

সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণসমাজ

(রাজা রামমোহন রায়ের পর এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলের পূর্ব্বে একটি প্রকৃত ঘটনা আমি গল্পচ্ছলে বর্ণনা করিব। গল্পটি আমি শুনিয়াছিলাম একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে। তিনি আমার পিতার দূরসম্পর্কীয় মাতুল প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়। হুগলী জেলার জনাই গ্রামে তাঁহার বাস। জনাই গ্রামটি ব্রাহ্মণপ্রধান। শত শত কুলীন ও অকুলীন ব্রাহ্মণ এই গ্রামের অধিবাসী। আমি যে ঘটনার কথা লিখিতেছি তাহা আমার ঐ দাদামহাশয় নিজে দেখিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার বয়স একশত তিরিশ বৎসরেরও অধিক হইত। এই প্রাণবল্লভবাবু হাওড়া আদালতে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন।)

দাদামহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, জনাই গ্রামে রাধাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বলা বাহুল্য, এই গল্পে আমি যে সকল নাম ব্যবহার করিব তাহা সমস্তই কাল্পনিক। এই মুখুয্যে মহাশয়ের দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। পুত্র দুইটি বড়। ষোল-সতের বয়সের পূর্ব্বেই ছেলে দুইটির বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু মুশকিল হইল কন্যাদের বিবাহ লইয়া। বল্লালসেনের ব্যবস্থা মত কুলীনদিগের কন্যাগত কুল। অর্থাৎ কোন কুলীনের পুত্র যদি একটু নীচু ঘরে বিবাহ করে তাহা হইলে সেই পুত্রেরই কুলে দোষ হয়। তাহার পিতা বা সহোদরদের কুলে কোন দোষ হয় না। তাহাদের কুল ঠিক বজায় থাকে। কিন্তু কোন কুলীনের কন্যার যদি একটু নীচু ঘরে বিবাহ হয় তাহা হইলে সেই কন্যার পিতা এবং তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সেই ন ঘরের দোষযুক্ত হইয়া থাকে নীচু। এমনকি সেই কন্যার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারাও সেই দোষে দোষী বলিয়া গণ্য হন।

রাধাচরণ মুখুয্যে মহাশয় পুত্রদিগের বিবাহে কুল রক্ষার জন্য এতটা কড়াকড়ি করেন নাই। কিন্তু কন্যার বিবাহের সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কন্যাদিগকে কিছুতেই 'নীচু ঘরে' অর্থাৎ দোষযুক্ত ঘরে বিবাহ দিবেন না। যেমন করিয়াই হউক পৈত্রিক কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতেই হইবে। সমান ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে মেয়েদের বয়স বাড়িতে লাগিল। বড়মেয়ে গৌরীর বয়স হইল ২১ বৎসর, মধ্যম দুর্গার বয়স হইল ১৭ বৎসর এবং ছোট মেয়ে উমা ১৫ বৎসরে পদার্পণ করিল। কিন্তু তাহাদের কপালে বর আর জুটিল না। মুখুয্যে মহাশয়ের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। এক শত বিঘার উপর নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল। অনেক ধনবান শিষ্যও ছিল। সেকালে কুলীন সন্তানগণ কৌলীন্যমর্য্যাদাস্বরূপ 'গণ-পণ' হিসাবে মাত্র সতের টাকা পাইবার অধিকারী ছিলেন, ইহার অধিক নগদ টাকা তাঁহারা দাবি করিতে পারিতেন না। তবে কন্যার পিতা নিজের ইচ্ছানুসারে বরাভরণ, কন্যার অলঙ্কার ও ভূমি যৌতুক দিতেন। সুতরাং সেকালে, এখনকার মত, টাকার জন্য কন্যাদায় বলিয়া কিছু ছিল। মুখুয্যেমশায় কন্যাদের জন্য স্বঘরে পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘটক প্রেরিত হইল। কিন্তু কোন পাত্রের কুলশীল তাঁহার পছন্দ হইল না। একজন ঘটক একটি পাত্রের সন্ধান আনিলেন। পাত্রটি সকল রকমেই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মুখুয্যেমশায় গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, কন্যার প্রপিতামহের এক বৈমাত্রেয় ভগিনীর যে বংশে বিবাহ হইয়াছে সে বংশে নাকি 'কেশর কুনী' দোষ আছে। সুতরাং সেখানে

তিনি কন্যা দিতে রাজী হইলেন না। আর একটি পাত্রেরও খবর পাইলেন। সেটিও সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাহারা নাকি 'বীরভদ্রি', অর্থাৎ নিত্যানন্দ বংশের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে। সুতরাং 'বীরভদ্রিতে' কন্যা দেওয়া চলে না।

অবশেষে মুখুয্যেমশায় একদিন খবর পাইলেন যে জনাইয়ের নিকটবর্ত্তী বক্‌সা গ্রামে বৃদ্ধ হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়কে তীরস্থ করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্রপৌত্রেরা বৃদ্ধকে লইয়া উত্তরপাড়ার গঙ্গাতীরে মুমূর্ষু-নিকেতনে আজ দুই দিন হইল গিয়া বাস করিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র মুখুয্যেমশায়ের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যেন একখানি যবনিকা অপসৃত হইল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কেবল "পাত্রের অনুসন্ধানে যাইতেছি" বাটীতে এই সংবাদ দিয়া তিনি গ্রাম ত্যাগ করিলেন। যথাসময়ে তিনি উত্তরপাড়ায় গঙ্গাযাত্রী নিবাসে উপস্থিত হইলেন এবং মৃত্যুপথযাত্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে বলিলেন, "আপনার পীড়ার কথা আমি কিছুই জানিতাম না। আজ খবর পাইবামাত্র আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি।" বৃদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায় নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ মুখুয্যের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "রাধাচরণ এসেছ। আমি ত যাচ্ছি। ছেলেপিলেরা রইল। তুমি মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিও।"

বলা বাহুল্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয় অপেক্ষা গাঙ্গুলী মহাশয় পঁচিশ বৎসরের বড়।

রাধাচরণ বলিলেন, "খোঁজখবর নেব বলেই ত আমি এখানে ছুটে এসেছি। আপনি ত চললেন। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে আমার একটা উপকার করে যান। আমার কুল রক্ষার ব্যবস্থা করে গেলে আপনার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে।"

গাঙ্গুলী মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমি তোমার কুল রক্ষা করব কেমন করে? আজকালকার ছেলেরা কি বাপ-মাকে মানে—না তাদের কথা রাখে? তারা যে এখন সব সাহেব হতে আরম্ভ করেছে। আমার ত দুটি ছেলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে জান। তারা কি আর আমার কথা শুনে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হবে?"

রাধাচরণ বলিলেন, "আমি আপনার ছেলেদের কথা বলি নি। আমি আপনার কথাই বলছি। আপনি দয়া করে আমার গৌরীকে আপনার পায়ে স্থান দিন। তার আইবুড়ো নাম ঘুচিয়ে দিন। এই আমার ভিক্ষে। এতে আপনি আর অমত করবেন না।"

বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিষ্প্রভ চোখের কোণে একটু হাস্যের আমেজ টানিয়া বলিলেন, "আমি? আমি আর কতক্ষণ আছি? মা গঙ্গার কোলে এসে ত দু'রাত্তির কাটিয়ে দিলাম। বড় জোর আর একটা কি দুটো রাত্তির।"

রাধাচরণ বলিলেন, "তা হোক গৌরীর আইবুড়ো নাম ত ঘুচবে। তার পর যা থাকে তার কপালে। সেজন্য আপনাকেও ভাবতে হবে না, আমাকেও ভাবতে হবে না। আপনি বিজ্ঞ লোক, সবই ত জানেন। ব্রহ্মার সৃষ্টি এই কুলীনের কৌলীন্যমর্য্যাদা। যে কুলাঙ্গার এ মর্য্যাদা রক্ষা না করে তাকে যে অনন্ত কাল নরক ভোগ করতে হয়। আমাকে সেই নরক থেকে আপনি রক্ষা করুন। আপনি বেগের গাঙ্গুলী। আমি ফুলের মুখুটি। আমরা পরস্পর সমান। আপনি দয়া করে রাজী হন। আমি আমার মেয়েকে এইখানে এনে আপনার হাতে সমর্পণ করব। আপনি আপনার ছেলেদের ডেকে তাদের

একটু বুঝিয়ে বলুন, "কুলীনের কুল রক্ষা করা কাশীতে শিব স্থাপনা করার চেয়েও বড় কাজ। টাকা থাকলে সকলেই কাশীতে গিয়ে শিব স্থাপনা করতে পারে। কিন্তু কুলীনের কুল রক্ষা করা কি যার তার কাজ? আপনি আপনার ছেলেদের বুঝিয়ে বলুন। আমিও তাদের বুঝিয়ে বলব। আপনি বলুন আমি তাদের এইখানে ডেকে আনি।" এই কথা বলিয়া মুখুয্যে মহাশয় বৃদ্ধ গাঙ্গুলীমশায়ের দুইটা হাত চাপিয়া ধরিলেন। বৃদ্ধ তখন অতিকষ্টে বলিলেন, "ভাল, তাই হোক। আমি যাবার সময় কুলীনের ছেলের মনে আর কষ্ট দিয়ে যাব না। আমি তোমার মেয়েকে পত্নীরূপে গ্রহণ করব। তুমি আমার ছেলেদের আর নাতিদের এইখানে ডেকে আন।"

এই কথা শুনিয়া প্রৌঢ় মুখুয্যেমশায় আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া গাঙ্গুলীর পুত্রগণকে ও আত্মীয়গণকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহারা রোগীর শয্যার নিকট উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ গাঙ্গুলী পুত্রদিগকে বলিলেন, "আমি রাধাচরণের কাছে একটা বিষয় বাগ্‌দত্ত হয়েছি। আমি মা-গঙ্গার কূলে এসে তাকে কথা দিয়েছি যে আমি তার বড় মেয়ে গৌরীকে বিবাহ করব। তোমরা তাতে কোন আপত্তি করো না। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে সিংহাসন ছেড়ে বনবাসী হয়েছিলেন, একথা আমাদের শাস্ত্রে আছে। তোমরা যদি এতে বাধা দাও তবে আমাকে সত্যভঙ্গের জন্য অনন্ত নরকে বাস করতে হবে। তোমাদের কিছুই করতে হবে না। যা কিছু করবার রাধাচরণই সব করবে।"

পিতার কথা শুনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভু ভাবিল পিতা বুঝি প্রলাপ বকিতেছেন। সে মধ্যম সহোদরকে বলিল, "হরিশ, বাবা প্রলাপ বকছেন। আর বিলম্ব করো না, চল ধরাধরি করে এই বেলা অন্তর্জলির ব্যবস্থা করা যাক্।"

সেই কথা শুনিয়া রাধাচরণ বলিলেন, "শম্ভু, না প্রলাপ নয়। উনি সজ্ঞানেই আছেন এবং সজ্ঞানেই কথা বলছেন। তোমরা সৎ পুত্র, বাপকে তাঁর সত্যপালনে আপত্তি করো না। আমি এখনই বাড়ীতে গিয়ে আমার মেয়ে গৌরীকে আর আমাদের পুরুতমশাইকে নিয়ে শিগ্‌গীর ফিরে আসছি। বিবাহের যা কিছু প্রয়োজন এই উত্তরপাড়ার বাজারেই সব কিন্‌তে পাওয়া যাবে। আমি তোমাদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে যাই, তোমরা সব কেনা-কাটা করে রাখ। আমি গৌরীকে আর পুরুতমশাইকে নিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ এইখানে ফিরে আসব। তোমাদের কিচ্ছু ভাবতে হবে না। গাঙ্গুলী মহাশয় পুণ্যাত্মা, ঋষিতুল্য লোক। তাঁর সৎকার্য্যের ফলে তোমাদের গাঙ্গুলী-বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে।" এই বলিয়া শম্ভুর হাতে দশটা টাকা দিয়া দ্রুতপদে মুখুয্যেমশায় স্বগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাধাচরণ প্রস্থান করিলে গাঙ্গুলী মহাশয় পুত্রদিগকে বলিলেন, "দেখ বাবা, কুলীনের কুল রক্ষা করা কুলীনেরই কাজ। কুলিমজুরের কাজ নয়। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমি তার কথায় রাজী হয়েছি। তারপর তার মেয়ের কপালে বিধাতা যা লিখেছেন তাই হবে। তোমার আমার সাধ্য নেই যে সে লেখা খণ্ডন করি।"

সেকালে লোকের পক্ষে দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে তিন-চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম

করা অতি সহজসাধ্য ছিল। তিনি বেলা দুইটা-আড়াইটার মধ্যে নিজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া উল্লাসভরে পত্নীকে বলিলেন, "ওগো, গৌরীর বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা করে এলাম। গৌরীকে নিয়ে এখনই উত্তরপাড়ায় যেতে হবে। আজ রাত্রেই বিবাহ। বর এখানে আসতে পারবে না। আমার অনেক সাধ্য-সাধনার পর বললে, "তবে আপনি আজকেই আপনার মেয়েকে এইখানে আনুন। আমার এখন যাবার সময় নেই। আমাকে আবার দুই-এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে যেতে হবে।" তুমি তিন মেয়েকে নিয়ে কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে থাক। আমি গোবরা দুলেকে বলিগে, সে তার গাড়ী নিয়ে এখনই আসবে। তার গাড়ী এলেই তোমরা চার জনেই দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়বে। আমি আমাদের পুরুত বিষ্টুঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আসি।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগো আজকেই বিয়ে? এতদিন পরে কি তবে গৌরীর বিয়ের ফুল ফুটল? তারা আমাদের স্বঘর ত? তাদের কুলে ত কোন দোষ নেই?"

রাধাচরণ বলিলেন, "তুমি পাগল হয়েছ? সে আমার খুব জানা ঘর। রাধু মুখুয্যে কুল রাখতে না পারলে মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলবে, তবু কুলে কালি দেবে না।" এই বলিয়াই তিনি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান এবং বিষ্টুঠাকুরের উদ্দেশ্যে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে উত্তরপাড়ায় শম্ভু, হরিশ প্রভৃতি সমস্ত কেনা-কাটা শেষ করিয়া রাধাচরণের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাধাচরণ ও বিষ্টুঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিলেন যে মেয়েরা গাড়ীতে আসছে। দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছবে। বিষ্টুঠাকুর পথিমধ্যে রাধাচরণের মুখে পাত্রের সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "এ বেশ হয়েছে! বুড়ো যে এত সহজে রাজী হবে তা আমি ভাবতে পারি নি। আজকে পাঁজীতে বিয়ের লগ্ন না থাকলেও যে কোন দিন গোধূলি লগ্নে বিবাহ হতে পারে এ ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে।" গাঙ্গুলীমশায়ের মধ্যম পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা ত বসতে পারবেন না। তিনি কি বিছানায় শুয়েই কনের পাণি গ্রহণ করবেন?" বিষ্টুঠাকুর বলিলেন, "টোপর মাথায় দিয়ে বসা, ছাদনাতলায় বরকে নিয়ে গিয়ে বরণ করা ওসব মেয়েলি শাস্ত্র। ওসব এক এক দেশে এক এক রকম প্রথা। ওসব দেশাচার পালন না করলেও বিবাহের কোন ত্রুটি হয় না। কনের বাপ বলবেন, এসা সালঙ্কারা সর্বস্ত্রা কন্যাং অহং সম্প্রদদে। আর বর বলবেন, ওঁ স্বস্তি, অহং গৃহ্ণামি। বাস বিয়ে হয়ে গেল। তারপর বাকি হইল আভ্যুদয়িক। সেটা বিবাহের রাত্রেও হতে পারে, কিংবা বিয়ের পর যে কোন দিন হতে পারে। বিয়ের রাত্রিতে হলে বেশী সময় লাগে না। আমি সংক্ষেপে সেরে নেব! আপনারা তার জন্য চিন্তা করবেন না।"

রাধাচরণ মুখুয্যে কন্যা সম্প্রদানের সময় একটা অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বড় মেয়ে গৌরীর কাপড়ের সঙ্গে সকলের অলক্ষ্যে, একটা সরু সুতা বাঁধিয়া সেই সুতার অপর প্রান্ত মধ্যমা কন্যা দুর্গার এবং কনিষ্ঠা কন্যা উমার বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের সময় গৌরীর মধ্যমা এবং কনিষ্ঠ ভগিনীরাও

বিবাহ-কক্ষের এক পার্শ্বে বসিয়াছিল। রাধাচরণের উদ্দেশ্য ছিল বৃদ্ধ গাঙ্গুলীর হস্তে একযোগে তিনটি কন্যাকেই সম্প্রদান করিবেন। তাই তিনি একগাছা সুতার দ্বারা কন্যাদের অঞ্চলগুলি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

আভ্যুদায়িকের সময় গাঙ্গুলী মহাশয় যখন গৌরীর সিঁথিতে সিন্দুর পরাইয়া দেন সেই সময় রাধাচরণের গৃহিণী দুর্গাকে ও উমাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া তাহাদের সীমন্ত সিন্দুর-শোভিত করিয়া দিলেন। রাধাচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সৎপাত্রে ও স্বঘরে একযোগে তিনটি কন্যা সম্প্রদান করা হইল।

তাহার পর? আরও কিছু শুনিতে চাহেন? দুই দিন পরে বৃদ্ধ গাঙ্গুলীর গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলে রাধাচরণ তিনটি কন্যার কপালে সিন্দুর মুছিয়া সাদা থান ধুতি পরাইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বিজয়গৌরবে ঘোষণা করিলেন যে তিনি ফাঁকি দিয়া এক ঢিলে তিন পাখী মারিয়াছেন। তাঁহার ঢিলের আঘাতে পাখী তিনটি মরিল, কি বিধবা হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় রহিল সে আলোচনার আর প্রয়োজন নাই।

আমাদের ভাষা (১)

আমরা বাঙালী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু আমাদের ভাষার নাম পূর্ব্বে বাংলা ভাষা ছিল না। আমি বাল্যকালে প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি তাঁহারা যে পুস্তক পাঠ করিয়া স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণাদি শিখিয়াছিলেন সে পুস্তকের নাম ছিল 'গৌড়ীয় ভাষার বর্ণমালা'[১২২]। সেকালে 'ক্ষ' ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ অক্ষররূপে ব্যবহৃত হইত। উহা যুক্তাক্ষর হইলেও অযুক্তাক্ষর-সমাজে কি করিয়া স্থান পাইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বর্ণপরিচয় রচনা করেন তখন এই 'ক্ষ' অক্ষরটা বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে যুক্তাক্ষরের সমাজে নিজের আসন প্রাপ্ত হয়।

এইবার আমাদের ভাষার কথা বলি। বাংলাদেশে ইংরেজের প্রভাব লুপ্ত হওয়ায় অনেকে এখন বাংলা ভাষাতে যে সকল ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে সেগুলিকে বর্জ্জন করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা অসম্ভব। বিদেশীয় শব্দের সংযোগে পুষ্টিলাভ না করিলে কোন ভাষাই পরিপুষ্ট হইতে পারে না। পৃথিবীতে যে সকল ভাষা এখন উন্নত ভাষা বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত সেই সকল ভাষায়ও প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক শব্দ প্রবেশলাভ করিয়া বর্ত্তমান উন্নত ভাষারূপে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষায় ডেনিশ, ফরাসী প্রভৃতি শব্দ এত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত যে উহাদিগকে ইংরাজী ভাষা হইতে পৃথক করিতে গেলে বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষার সম্পদ বহুল পরিমাণে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। যখন একটা দেশ অপর দেশের সংস্পর্শ লাভ করে তখন সেই অপর দেশের শব্দনিচয়ও সেই দেশের ভাষায় স্থান লাভ করে। এই সংস্পর্শ ধর্ম্ম সম্বন্ধে, বাণিজ্য সম্বন্ধে বা রাজ্যজয় ব্যাপারে ঘটিয়া থাকে। উহাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারেন না। একটা সামান্য উদাহরণ দিয়া আমার কথা বুঝাইবার চেষ্টা করি।

বাংলার শহর হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর মফঃস্বলে কোথায় সাবানের ব্যবহার নাই? গায়ে মাখিতে, কাপড় কাচিতে, দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিতে সব কাজে সাবানের ব্যবহার অনিবার্য্য। কিন্তু এই সাবান শব্দ বাংলা ভাষায় আসিল কোথা হইতে? সাবানের ইংরাজী প্রতিশব্দ সোপ। অবশ্য ইংরেজের এদেশে আগমনের পূর্ব্বে বাঙালী সাবান ব্যবহার করিত না। যদি আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সাবান ব্যবহার করিতে শিখিতাম তাহা হইলে ঐ দ্রব্যকে সাবান না বলিয়া সোপ বলিতাম। সকলেই জানেন যে, মুসলমান নবাব বাদশাহেরা এবং ইউরোপে ফরাসীরা বিলাসিতার চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতেন। সেই নবাবী আমলে ফরাসী বণিকেরা এদেশে সাবান আমদানী করেন। তখন ধনবান মুসলমানেরা ফরাসীদের নিকট হইতেই সাবান ব্যবহার করিতে শেখেন। সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে চর্ব্বি লাগে। কিন্তু চর্ব্বি হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে অস্পৃশ্য। বাল্যকালে দেখিয়াছি বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ বিধবারা প্রাণান্তেও সাবান স্পর্শ করিতেন না। এই সাবান শব্দের ফরাসী প্রতিশব্দ 'সাভঁ' (savon)। এই সাভঁ ইংরাজী বানানে সাভন এবং তাহা হইতে বাংলায় সাবান হইয়াছে। উহা উত্তর ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে 'সাবুন' শব্দে পরিণত হইয়াছে।

আমরা বিদেশে কোথাও যাইতে হইলে 'পোঁটলা-পুঁটলি' 'বোঁচকা-বুঁচকি' বাঁধি। এই বোঁচকা শব্দ কোথা হইতে আসিল? পর্ত্তুগীজ ভাষায় একটা শব্দ আছে 'বুশ্‌কা' (Bouchka)। এই 'বুশ্‌কা' শব্দের মানে কাপড়চোপড়ের পুঁটুলি। আমি শুনিয়াছি আমার মাতামহ পর্ত্তুগীজ ভাষা জানিতেন। তিনিই আমার মাতাকে বলিয়াছিলেন, বোঁচকা শব্দ পর্ত্তুগীজদিগের কাছ হইতে আসিয়াছে। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য ব্যপদেশে বাংলায় আসিবার পূর্ব্বে ইউরোপের ডেনমার্কে ডেনিশ হল্যাণ্ডে ডাচ, ফ্রান্সের ফরাসী এবং পর্ত্তুগালের পর্ত্তুগীজ বণিকেরা বাংলায় আসিয়া কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সকল কুঠীর শেষ নিদর্শন ফরাসী চন্দননগর বা ফরাসডাঙ্গা মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল বিদেশী জাতির ব্যবহৃত অনেক শব্দ আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের সময় আমরা আগ্রহ সহকারে লিচু ও জামরুল খাইয়া থাকি। কিন্তু ঐ দুইটি ফলের জন্মভূমি ভারতবর্ষ নহে—চীন দেশ। 'লিচু' শব্দটি চীনা ভাষাতেও আছে। কিন্তু জামরুল শব্দটা চীনদেশীয় কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না।

বাঙালীর প্রায় সকল ইষ্টকালয়েই কক্ষমধ্যে প্রাচীরগাত্রে কুলুঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'কুলুঙ্গী' শব্দটি কোন্ ভাষা হইতে আসিয়াছে? তিব্বত পর্য্যটক শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, তিব্বতী ভাষায় পর্ব্বতকে বলে 'কুল' আর গহ্বরকে বলে 'ঙ্গী'। তিব্বতী ভাষায় কুলুঙ্গী মানে পর্ব্বতগহ্বর। তাহা হইতে আমাদের কক্ষ-প্রাচীর-গহ্বরের নামও কুলুঙ্গী হইয়াছে। আমরা যে চা পান করি সেই চা চীন দেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে চা শব্দই ব্যবহৃত হয়; এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, মহর্ষি বশিষ্ঠ চীন দেশ হইতে ভারতে চা আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতে উত্তর ভারতের হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে চা ব্যবহৃত

হইয়া আসিতেছে। এইরূপ অনেক শব্দ আমাদের ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে অথচ আমরা জানি না যে ঐ সকল শব্দ কোন্ সময় হইতে, কোন্ ভাষা হইতে আসিয়া বাংলা ভাষায় মিশিয়া গিয়াছে।

অনেকের ধারণা যে, সংস্কৃত ভাষায় কোন বৈদেশিক শব্দ নাই। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত-অধ্যাপক ভাগবত শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, সংস্কৃত 'উৎপল' শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃত প্রবেশলাভ করিয়াছে। এরূপ আরও অনেক শব্দ বিদেশী আর্য্য বা অনার্য্য ভাষা হইতে আসিয়া আমাদের দেবভাষায় মিশিয়া গিয়া থাকিবে—তাহা অসম্ভব নহে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে আর একটা কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা কথায় কথায় ভাল মন্দ সকল ক্ষেত্রে 'যোগদান' শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় 'যোগদান' শব্দটি মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হইত। চোরে যখন চুরি করিতে যায় তখন কেহ চুরি করিবার উদ্দেশ্যে সেই তস্করদলের সহিত মিলিত হইলে তাহাকেই যোগদান করা বলে।

গোরক্ষপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত-অধ্যাপক ললিতমোহন কর সংস্কৃত এবং পালিভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পাশ করেন। তিনি আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি বলিতেন, 'পাষণ্ড' শব্দটা আমরা নিষ্ঠুর, নির্ম্মম বা অধার্ম্মিক অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু পালিভাষায় 'পাষণ্ডি' শব্দ ধার্ম্মিককে বুঝায়। মহারাজ অশোকের শিলালিপিসমূহে 'পাষণ্ডি' শব্দ অশোকের গুণবাচক অর্থে বহুস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, দেখা যাইতেছে যে, একই শব্দ কালভেদে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হওয়াও বিচিত্র নহে।

ভারতবর্ষে মুসলমান আমল হইতে আরবী, ফারসী প্রভৃতি যাবনিক ভাষার এত অধিক শব্দ আমাদের ভাষায় মিশিয়া আছে যে তাহার সংখ্যা হয় না। আমরা 'আদালতে' 'মামলা-মোকদ্দমা' করিতে গিয়া 'উকিল' 'মোক্তার'এর সাহায্য লইয়া থাকি। তাঁহারা 'আদালত'এর 'নাজীর', 'পেশকার' ও 'কারকুন' প্রভৃতিকে ধরিয়া বিচারকের সম্মুখে আমাদের অভিযোগ 'দায়ের' করেন। 'আসামী' ও 'ফরিয়াদী'র উকিলেরা বিপক্ষ পক্ষের 'সওয়াল' 'জবাব' গ্রহণ করেন। সাক্ষীদিগকে 'জেরা' করিয়া 'নাস্তানাবুদ' ও 'নাজেহাল' করিয়া থাকেন। আমার এই বাক্যাংশে আমি কতগুলি আরবী, ফারসী বা উর্দু শব্দ ব্যবহার করিয়াছি তাহা দেখাইবার প্রয়োজন আছে কি? লোকে, বাদী কিংবা প্রতিবাদী, নিম্ন আদালতের বিচারে পরাজিত হইলে হাইকোর্টে 'আপীল' করে। আমি জিজ্ঞাসা করি, উচ্চতম বিচারালয়ে পুনর্বিচারের আবেদন করা অপেক্ষা 'হাইকোর্টে' 'আপীল' করা কি অনেক সহজ নহে?

সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য আমরা যদি বিদেশীয় শব্দ বর্জ্জন করি তাহা হইলে সেই বিশুদ্ধ ভাষাটাই কি আমাদের কর্ণে বিদেশীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না?

'শিশি', 'বোতল', 'গেলাস', 'মগ', 'বুরুশ', 'উল' প্রভৃতি শব্দ বিদেশী অথবা

বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ হইলেও ঐ সকল শব্দকে আমরা স্বচ্ছন্দে বর্জ্জন করিতে পারি কি? আমরা 'পেপার' না বলিয়া যদি 'কাগজ' বলি তাহা হইলে কি আমরা বিদেশী শব্দের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব? সুতরাং আমার মনে হয়, যে সকল শব্দ বিদেশী হইয়াও আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে সেগুলিকে বর্জ্জন করিবার চেষ্টা না করিয়া যেমন আছে তেমনই রাখাই ভাল। অকারণে ভাষাকে সরল করিতে গিয়া উহাকে জটিলতর করা হয় না কি? হিন্দী 'করণ' শব্দের অর্থ লেখক। পূর্ব্বে কায়স্থরাই আমাদের দেশে লেখকের কার্য্য করিতেন। সেইজন্য বিহার বা উত্তরপ্রদেশে কায়স্থের প্রতিশব্দ 'করণ'। এই করণ হইতে বাংলা কেরাণী শব্দ হইয়াছে। এখন যদি এই কেরাণী শব্দকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া 'কারণিক' করি তাহা হইলে সে বেচারা আমাদের সমাজভুক্ত থাকিবে, না সমাজচ্যুত হইবে?

বিদেশীয় শব্দ আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার একটা প্রমাণ দিতেছি। তিন-চারি মাস পূর্ব্বে আমি একদিন আমাদের প্রতিবেশী একজন ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময় দেখি এক বৃদ্ধা একটি রুগ্ন শিশুকে কোলে লইয়া ডাক্তারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল, সেই সময় আর একটি বৃদ্ধা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। এই শেষোক্ত বৃদ্ধা রুগ্ন শিশুটিকে দেখিয়া বলিল, "তোমার নাতি না? বড্ড রোগা হয়ে গেছে। কি হয়েছে?" তাহা শুনিয়া প্রথম বৃদ্ধা বলিল, "কি জানি দিদি। ডাক্তার বলছে ওর পেটে যক্ড়ি না কি হয়েছে। আমি ত শুনে ভয়ে মরি। পেটে পিলে হয়, নেবার হয় তা জানি। কিন্তু যক্ড়ি কি তা কখনও জানি না। যক্ড়ি শুনে অবধি আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি।" আমি ঐ কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবুকে গিয়া বলিলাম, "আপনি ঐ ছেলেটির পেটে যক্ড়ি হয়েছে বলাতে বুড়ী ত ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ও পিলে জানে, নেবার জানে। কিন্তু যক্ড়ি কাকে বলে বুঝতে পারে নি। ওকে ও রকম বিটকেল শব্দ একটা না বলে বাংলা করে লিভার বললেন না কেন? তা হলে ওর ভয় হ'ত না।" আমার কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

এ স্থলে একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার কল্যাণে আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকেরা 'ডাক্তার' বলিলে চিকিৎসককেই বুঝে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিশেষ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারীকে বুঝে না। চিকিৎসক আসিয়া বিরেচকের ব্যবস্থা করিলে তাহারা অবাক হইয়া ভাবে বিরেচক আবার কি? পেট পরিষ্কার করিবার জন্য ডাক্তারেরা 'জোলাপ' দিয়া থাকেন। কিন্তু বিরেচক কাহাকে বলে? এইরূপ শত শত বিদেশী শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় সর্ব্বস্তরের লোকের মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছে। ঐ সকল শব্দকে আমরা বর্জ্জন করিব কিরূপে?

আমাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, অত্যুচ্চ হিমালয়শৃঙ্গে তুষারস্তূপ গলিয়া নির্ঝরিণীমুখে যখন নির্গত হয় তখন উহা অতি ক্ষীণপ্রাণ সামান্য জলধারা থাকে, উহার গতি যতক্ষণ নিম্নাভিমুখে থাকে ততক্ষণ আরও শত শত জলধারা

উহার সহিত মিলিত হইয়া সেই ক্ষীণ স্রোতস্বিনীকে প্রবল নদীর আকারে পরিণত করে। হিমালয়ে গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গা যখন পাহাড়-পর্ব্বত ও নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হরিদ্বারের সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হয় তখনও তাহার বিস্তার বা গভীরতা একটা সামান্য খালের অপেক্ষা অধিক নহে। কিন্তু সেই গঙ্গা সাগরাভিমুখে আসিবার সময় সরস্বতী, যমুনা, শোণ, অজয়, কোশী প্রভৃতি নদনদীর সহিত মিলিত হইয়া যে প্রবল ও বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করে তাহা কে না জানে। যদি ঐ সকল উপনদী গঙ্গার সহিত মিলিত না হইত তাহা হইলে ভাগলপুর, মুঙ্গের, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে গঙ্গা কি এরূপ দুস্তর ও বিরাট কলেবর হইতে পারিত। ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে অগ্রে দেখা উচিত যে, ব্যাকরণবিরুদ্ধ কোন শব্দ বা কোন পদ ভাষাকে কলঙ্কিত করিতেছে কি না। আমি অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকারের পুস্তকে পড়িয়াছি তাঁহারা 'আবশ্যক' এই বিশেষণ শব্দকে 'আবশ্যকীয়' লিখিয়াছেন। লিখিবার সময় তাঁহাদের বোধ হয় মনে থাকে না যে আবশ্যক শব্দ নিজেই বিশেষণ। উহাতে 'ীয়' যোগ করিয়া আর বিশেষণ করা চলে না। ইংরাজীতে 'use' শব্দটা বিশেষ্য; উহার বিশেষণ 'useful'। সেই useful-কে আবার বিশেষণ করিয়া 'usefulable' করা চলে কি? রবীন্দ্রনাথ একটা প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন ভাষা দেবতা। তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে অগ্রে সাধনা করিতে হয়। বিনা সাধনায় কোন দেবতাকে আয়ত্ত করা যায় না।

আমাদের ভাষা (২)

আমাদের ভাষা সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি যে, অনেক বৈদেশিক শব্দ দেশীয় ভাষার মধ্যে প্রবেশ করায় ভাষার পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। অধুনা পৃথিবীতে যে সকল ভাষা বিশেষ উন্নত ও পরিপুষ্ট বলিয়া গণ্য, তাহাদের সকলেই অন্য ভাষার শব্দ আত্মসাৎ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছে। আবার, ইহাও সকলে লক্ষ্য করিতে পারেন যে, একই স্থানের ভাষা সাহিত্যে একরূপ—অর্থাৎ মার্জ্জিত ভাষা এবং চলিত কথায় অন্যরূপ—অর্থাৎ গ্রাম্য ভাষা। সাহিত্যে আমরা লিখি বা পড়ি 'আমরা বলিলাম'—এই বলিলাম শব্দ গ্রাম্য ভাষায় 'বল্লাম', 'বল্লেম', 'বল্লুম' এবং 'বল্‌নু'-তে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। আবার, এক জেলার গ্রাম্য ভাষার সহিত অন্য জেলার গ্রাম্য ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় 'হইল' শব্দ 'হৈল' এইরূপ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দক্ষিণ বা পশ্চিমবঙ্গে 'হইল' শব্দ অকারান্ত 'ল' দিয়া উচ্চারিত হয়। রাঢ় দেশের মেদিনীপুর জেলা বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। মেদিনীপুরের দক্ষিণে সুবর্ণরেখা নদীর পরপার হইতে উড়িষ্যা প্রদেশ আরম্ভ। উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলা মেদিনীপুরের পার্শ্বেই অবস্থিত। সেইজন্য মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশের ভাষায় বহুল পরিমাণে উড়িয়া শব্দ এবং বালেশ্বরের উত্তরাংশের উড়িয়া ভাষায় বহুল পরিমাণে বাংলা শব্দ মিশিয়া আছে। সেইজন্য মেদিনীপুরের লেখকের লিখিত সাহিত্যে খাঁটি বাংলা শব্দের মধ্যে উড়িয়া শব্দও

ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যে[১২৩] 'খুল্লনার অগ্নি-পরীক্ষা' বর্ণনায় লিখিয়াছেন :

"খুল্লনা বেড়িয়া নিয়া উঠিল আকাশে"

এই ছত্রে 'নিয়া' শব্দ পশ্চিমবঙ্গের টীকাকারগণের টীকাতে এক গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। 'খুল্লনা'কে চিতার উপরে বসাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইলে চিতার কাষ্ঠগুলি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কবি মুকুন্দরাম উল্লেখিত ছত্রে অগ্নির পরিবর্ত্তে 'নিয়া' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ উড়িয়া ভাষায় অগ্নিকে 'নিয়া' বলে। বঙ্কিম-যুগের প্রবীণ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এবং সারদাচরণ মিত্র [১৮৪৮-১৯১৭] মহাশয় 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'[১২৪] নামে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা এই 'নিয়া' শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহারা বাংলা ভাষার 'লইয়া' শব্দকে গ্রাম্য ভাষায় 'নিয়া' মনে করিয়া উল্লিখিত ছত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—খুল্লনাকে বেষ্টন করিয়া লইয়া আকাশে উঠিল। কিন্তু কে উঠিল তাহার উল্লেখ করেন নাই। যদি টীকাকারেরা জানিতেন যে, কবিবর অগ্নির পরিবর্ত্তে উড়িয়া শব্দ 'নিয়া' ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা এরূপ ভুল করিতেন না।

একই জেলার ভিতরে শহরের কথিত ভাষা এবং গ্রাম্য ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গার তীরবর্ত্তী নগরসমূহে হুগলী বা চব্বিশ পরগণার লোকেরা বলিয়া থাকেন 'ঐ দিকে যাও'। কিন্তু হুগলীর গ্রাম্যভাষায় অশিক্ষিত লোকেরা বলে 'ঐ বাগে যাও' অথবা 'ঐ বিগে যাও'। এরূপ অনেক শব্দ আছে যাহা একই জেলার মফঃস্বলে ব্যবহৃত কিন্তু শহরে অজ্ঞাত। সাধু ভাষার 'বৃক্ষ রোপণ', গ্রাম্য ভাষা 'গাছ পোঁতা' এবং 'গাছ আজ্জানো' রূপে ব্যবহৃত হয়। হুগলী জেলার গ্রাম্য ভাষায় 'গাছ আজ্জাব', বর্দ্ধমান জেলার গ্রাম্য ভাষায় 'গাছ এজ্জব'। শুধু যে ক্রিয়াপদে এই পরিবর্ত্তন তাহা নহে; অনেক বিশেষ্যপদেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। মনে আছে, আমার বাল্যকালে আমার পিতা যখন সিউড়ীতে (বীরভূম) ছিলেন সেই সময়ে আমার জননীর একবার জ্বর হইয়াছিল। জ্বরের সময় তাঁহার পেয়ারা খাইবার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি আমাদের ভৃত্যকে দুই একটা কাঁচা পেয়ারা আনিতে বলিলেন। তাহাতে ভৃত্য বলিল, "মা পেয়ারা ত এদেশে হয় না। সে আপনাদের হুগলী জেলায় হয়।" তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "কেন ঐ ত পথের ধারে পেয়ারা গাছ রয়েছে।"—বলিয়া পেয়ারা গাছ তাহাকে দেখাইয়া দিলে সে বলিল,. "তাই বলেন না কেনে আম-সুপুরী। ওকেই তোমরা পেয়ারা বল?" বলা বাহুল্য, আমাদের ভৃত্যটি বীরভূম জেলার পল্লীগ্রামবাসী।

এদেশে একটা প্রচলিত কথা আছে যে, যোজন-ভেদে ভাষা-ভেদ। যোজন অর্থে চারিক্রোশ। এক স্থান হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে গেলে গ্রাম্য শব্দে ঈষৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এই পরিবর্ত্তন শুধু যে বাংলাদেশেই পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। তবে শিক্ষিতসমাজে যে ভাষা

ব্যবহৃত হয় তাহা সেই দেশের সকলেই বুঝিতে পারে। তাহাই সাহিত্যের ভাষা। সাধারণতঃ রাজধানীর ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। গৌড় নগর যখন বাংলার রাজধানী ছিল তখন সেই গৌড়ের ভাষাকেই সমগ্র বাংলার লোক আদর্শ ভাষা বলিয়া মনে করিত। তখন লোকে বাংলা বা বঙ্গভাষাকে গৌড়ীয় ভাষা বলিত। তাহার পর নবদ্বীপ যখন বাংলার রাজধানী হইল তখন নবদ্বীপের প্রচলিত ভাষাই বাঙালীর আদর্শ ভাষা হইল। আমি বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা বাল্যকালে যে বর্ণমালা শিক্ষার জন্য পুস্তক পড়িতেন সেই পুস্তকের নাম ছিল 'গৌড়ীয় ভাষার বর্ণমালা'। তাহার স্বরবর্ণের তালিকায় দীর্ঘ 'ঋ' ও দীর্ঘ '৯' এবং ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় শেষ অক্ষর ছিল 'ক্ষ'। বিদ্যাসাগর মহাশয় একশত বৎসর পূর্ব্বে যখন 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ রচনা করেন তখন তিনি দীর্ঘ 'ঋ' ও দীর্ঘ '৯' পরিত্যাগ করেন এবং 'ক্ষ' অক্ষরকে প্রথম ভাগ হইতে দ্বিতীয় ভাগে প্রমোশন দেন।

লক্ষ্য করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সকল ভাষাই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত অথবা শহুরে ও গ্রাম্য। মার্জ্জিত বা শহুরে ভাষা একই প্রদেশের মধ্যে সকলেরই বোধগম্য হইয়া থাকে। কিন্তু অমার্জ্জিত ও গ্রাম্য ভাষায় প্রত্যেক জেলায় এমনকি প্রত্যেক মহকুমায় পার্থক্য আছে। আবার, ব্যবসায় বিশেষে গ্রাম্য ভাষাতেও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন [১৮৩১-১৮৯৪] মহাশয় রচিত 'গোষ্ঠীকথা'[125] নামক পুস্তকের এই অমার্জ্জিত ভাষার একটি সুন্দর উদাহরণ এখন আমার মনে পড়িতেছে। বহুকাল পূর্ব্বে বাংলার একজন ছোটলাট একবার হুগলীতে গিয়া একটা দরবার করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে ছোটলাট বাহাদুরকে দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র পল্লীগ্রামবাসীর হুগলীতে সমাগম হইয়াছিল। একজন গ্রাম্য জেলে দরবারের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহার প্রতিবেশীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল লাটসাহেবের দরবার কি রকম হইয়াছিল। উত্তরে সে বলিল, "ভাই, গিয়ে দেখলুম যেন পোনার ঝাঁক ভেসেছে। আমি কৈকানায় কৈকানায় (কৈমাছ কানকোর সাহায্যে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে যেমন অগ্রসর হয়) গিয়ে যেমন ঘরসোলা হুলুপ দিইচি (ঘরসোলা মাছ যেমন সহসা জলের উপর ভাসিয়া উঠে) অমনি চিতল পটকে দিলে (চিতল মাছ ক্ষুদ্র মাছকে যেরূপ তাড়া করে), আমিও অমনি গুঁতো সটকলুম (গুঁতো মাছ ভয় পাইয়া সহসা যেরূপ অদৃশ্য হয়)।" সম্ভবতঃ সেই ধীবর দূর হইতে লাটসাহেবকে দেখিতেই পায় নাই বলিয়া ভিড়ের মধ্যে একটু লাফাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পার্শ্বস্থিত একজন পুলিস কর্ম্মচারী শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাহাকে ধরিয়া ফেলিলে সে পুলিসের হাত ছাড়াইয়া সহসা অদৃশ্য হইয়াছিল। ঐ ধীবর যে ভাষায় তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিল সে ভাষার শব্দ কোন অভিধানে নাই। 'অগুণ নেই বগুণ আছে', 'ঝুরো লুসে কুপোকাত' এই সকল বাক্যাংশ অমার্জ্জিত ভাষাতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মার্জ্জিত ভাষায় ইহার অর্থ ভাত খাইয়া নিদ্রা যাওয়া, গুণ নাই দোষ আছে। কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণ মার্জ্জিত ভাষায় কথা

কহে না বলিয়াই এই প্রকার কথা বঙ্গভাষাভাষী অপর জেলার লোক সহসা বুঝিতে পারে না। মেদিনীপুর, রংপুর, ঢাকা বা ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের লোক যখন পরস্পরের মধ্যে এরূপ অমার্জ্জিত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে তখন আমরা তাহার অর্থবোধ করিতে পারি না। অথচ তাহারা বাংলা ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে।

সকল দেশের ভাষা সম্বন্ধেই এই একই কথা বলিতে পারা যায়। আমরা ইংরাজী বই পড়িয়া যে ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছি তাহা ইংল্যাণ্ডের মার্জ্জিত ভাষা। ইংল্যাণ্ডের এক এক কাউণ্টি বা জেলার লোকে যে অমার্জ্জিত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে তাহা আমরা সহসা বুঝিতে পারি না। ঐরূপ অমার্জ্জিত ভাষাকে ইংরাজীতে slang বলে। আমি দেখিয়াছি দুই জন ইংরেজ পরস্পরের সহিত কথা কহিবার সময় কোন দেশীয় শিক্ষিত লোক সেখানে উপস্থিত থাকিলে, যদি কোন গোপনীয় বিষয় উল্লেখ করিবার সময় slang ব্যবহার করেন তাহা হইলে ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয় ভদ্রলোক সহজে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না। ইংল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্তস্থিত নর্দ্দমিবারল্যাণ্ড বা ইয়র্কের অমার্জ্জিত ভাষা ঐ দেশের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত কেণ্ট বা কর্ণওয়াল জেলার লোক সহসা বুঝিতে পারে না। আমরা ফরাসী ভাষা বলিতে যাহা বুঝি তাহা ফ্রান্সের মার্জ্জিত বা সাহিত্যের ভাষা। প্যারিসের অমার্জ্জিত ভাষা এবং মার্সাই বা লিয়ঁর অমার্জ্জিত ভাষা একরূপ নহে। সকল দেশেরই ভাষা সম্বন্ধে এই একই ব্যবস্থা।

মার্জ্জিত ভাষাও কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হয়। রামমোহন রায় তাঁহার পুস্তকে যে বাংলা ব্যবহার করিয়াছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা করেন নাই। আবার বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [১৮৪৫-১৮৮৬] বা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসু [১৮৪৪-১৯১০] প্রভৃতি বঙ্কিমী যুগের সাহিত্যিকগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাসবহুল বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাসে' "এই গিরির শিখরদেশ সতত সঞ্চরমান নবজলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে।" এই ভাষা বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে একেবারে অচল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম রচিত উপন্যাস বা রচনাসমূহে কতকটা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তীকালে রচিত কোন গ্রন্থে এইরূপ ভাষা গ্রহণ করেন নাই। তিনি একবার তাঁহার বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রকে বলিয়াছিলেন, "অনেক সাধনার ফলে সরলতা দেবীর কৃপালাভ করিয়াছি। আর আমি নিজেকে সে কৃপা হইতে বঞ্চিত করিব না।"

আজকাল অনেক উপন্যাস লেখক তাঁহাদের নিজের জেলার বা মহকুমার গ্রাম্য ভাষায় পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ঐ প্রকার ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের সুবোধ্য নহে। যাহা সমগ্র বাংলার লোক সহজে বুঝিতে পারে এরূপ সরল ও মার্জ্জিত ভাষা ব্যবহার করা উচিত। নতুবা স্থানীয় গ্রাম্য ভাষায় পুস্তক রচনা করিলে তাহা সমস্ত বাঙালীর পক্ষে সুখবোধ্য বা সুখপাঠ্য হইবে না। উপন্যাসে ও নাটকে নায়ক-নায়িকার মুখেই গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করা উচিত।

আমাদের পরিচ্ছদ

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৮৪৪-১৯১৮] মতে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের সংসারে যত প্রকার পাপ প্রবেশ করিয়াছে, ভোজন-বিলাসিতা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। আমার এক এক সময় মনে হয় যে শুধু ভোজন-বিলাসিতা কেন, পরিচ্ছদ-বিলাসিতাও—বিশেষতঃ মহিলাসমাজে—বড় সামান্য পাপ নহে। আমি আমার এই সুদীর্ঘ জীবনকালে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ-বিলাসিতার কথা চিন্তা করিয়া থাকি। আমাদের বাল্যকালে, সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন তাহার সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান কালের পরিচ্ছদে ভূষিত সেকালের সেই বাঙ্গালীকে অবাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য আমি কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরের অধিবাসী বাঙ্গালীর কথাই বলিতেছি। সুদূর মফঃস্বলে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, দেখিলে মনে হয় তাঁহারা সেকালের সেই বাঙ্গালী-ই আছেন। পরিচ্ছদে তাঁহাদের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলেরা দশ-এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাটীতে নগ্ন অবস্থায় থাকিত। তখন বালক-বালিকাদের জন্য প্যাণ্ট অথবা হাফ প্যাণ্ট এবং ইজার প্রচলিত ছিল না। হাফ প্যাণ্টের প্রচলন হয় এখন হইতে পঞ্চাশ বা যাট বৎসর পূর্ব্বে। লর্ড কিচেনার যখন ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন তখন তিনি সৈনিকদিগের জন্য এই হাফ প্যাণ্টের প্রচল করেন। তিনি বোধ হয় মনে করিয়া থাকিবেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে সুদীর্ঘ আগুল্‌ফলম্বিত প্যাণ্টের পরিবর্ত্তে হাফ প্যাণ্ট ব্যবহার করিলে সৈনিক বিভাগে হাজার হাজার টাকার অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে। তৎপূর্ব্বে সকল ঋতুতেই কি ভারতীয় আর কি শ্বেতাঙ্গ উভয়বিধ সৈনিকেরাই ফুল প্যাণ্ট ব্যবহার করিত। সামরিক বিভাগ হইতে এই হাফ প্যাণ্টের ব্যবহার ক্রমশঃ শহরবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকেদের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত হয়। সেকালে বাঙ্গালী ধনবানেরা বিলাসিতা-প্রকাশের জন্য অতি সূক্ষ্ম—স্বচ্ছ বলিলেই হয়—বস্ত্র পরিধান করিতেন। প্রধানতঃ ঢাকা, শান্তিপুর ও চন্দননগর এবং তৎসন্নিহিত স্থানে তন্তুবায়েরা ঐ সকল বস্ত্র বয়ন করিত। আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি, চন্দননগরে প্রায় দুই হাজার তাঁত ছিল। এখন সেস্থলে দুই শত তাঁত আছে কিনা সন্দেহ। আমার বিশ্বাস ঢাকা এবং শান্তিপুরেও ঐরূপ তাঁতের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। আজকাল কলিকাতায় বড় বড় বস্ত্রালয়ে ফরাসডাঙ্গার ধুতি বা শাড়ী নামে যে সকল ধুতি বা শাড়ী বিক্রয় হয় তাহার শতকরা আশি বা পঁচাশিখানা চন্দননগরের তাঁতিদের দ্বারা বয়ন করানো হয় না। চন্দননগরের সন্নিহিত খরসরাই, বেগমপুর ও ধনেখালি প্রভৃতি স্থানের তাঁতিরা তাহা বয়ন করে। চন্দননগরের ব্যাপারীরা ঐ সকল তাঁতিকে অগ্রিম দাদন দিয়া বস্ত্র বয়ন করান। কোরা বস্ত্র চন্দননগরে আনিয়া স্থানীয় রজকদিগের দ্বারা ধৌত করাইয়া কলিকাতার বস্ত্রবিক্রেতারা বিক্রয় করিয়া থাকেন।

নগরের বিলাসী 'বাবু'রা সেকালে যেরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহাতে তাঁহাদের শ্লীলতা সম্যক রক্ষিত হইত বলিয়া মনে হয় না। তাই বোধ হয় সেকালের

সুরুচিসম্পন্ন 'বাবু'রা হাফ প্যাণ্ট বা জাঙ্গিয়া ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভবপূর্ব্বক হাফ প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি সুরুচিসম্পন্না ভদ্রমহিলারাও 'সেমিজ' এবং 'সায়া' ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। আমার মনে পড়ে ১৮৯১ বা ৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় আসিয়া প্রথম সেমিজ-পরিহিতা বাঙ্গালী মেয়েদিগকে দেখিতে পাই। তাহা দেখিয়া আমিও আমার স্ত্রীর জন্য এক জোড়া সেমিজ কিনিয়া বাড়ীতে লইয়া যাই। তখন আমার স্ত্রী কিশোরী মাত্র। যৌবনে পদার্পণ করেন নাই। আমার জননী সেই সেমিজ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এ ত বেশ জামা। এতে মেয়েদের আব্রু রক্ষে হয়।" তদবধি আমাদের বাটীতে সেমিজের ব্যবহার চলিতে লাগিল।

সেই সময় আমার জননী আমার পত্নীকে লইয়া কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান। আমি সঙ্গে ছিলাম। সেখানে আমার ঠাকুরমা সম্পর্কীয়া এক প্রৌঢ়া সেমিজ-পরিহিতা আমার স্ত্রীকে দেখিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "যোগিন, বৌকে ঘাগরা কিনে দিইছিস, এইবারে এক জোড়া জুতো কিনে দে, তাহলে পুরো মেমসাহেব হবে।" হায় রে, সেকালের প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধার দল। আজ যদি তাঁহারা জীবিত থাকিতেন তবে তাঁহারা স্কুল-কলেজের ছাত্রীদিগকে দেখিয়া কি ভাবিতেন?

বাঙ্গালী পুরুষের হাফ প্যাণ্ট এবং স্ত্রীলোকদিগের সেমিজ, সায়া যে তাঁহাদের রুচির উন্নতির পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বালক-বালিকাদিগের হাফ প্যাণ্ট অথবা ফ্রক ব্যবহারও সুরুচির পরিচায়ক। আমার জননীর মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের বাল্যকালে অল্পবয়স্কা বালিকাদের জন্য এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র গামছার ন্যায় বস্ত্র পাওয়া যাইত। তাহাকে 'ঠেঁটী' বলিত। তাহা দ্বারা কোমর এককের জড়ানো হইত এবং তাহা হাঁটুর নীচে নামিত না। এই ঠেঁটী বালিকারা ব্যবহার করিত, বালকেরা নহে। দশ-এগার বৎসর বয়সের বালকেরা কেবল স্কুলে যাইবার সময় পাঁচ হাত দীর্ঘ এবং সেই অনুপাতে প্রস্থ ধুতি ব্যবহার করিত। এখনকার বালকদিগের মধ্যে সেইরূপ ক্ষুদ্র ধুতির ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। এখন শতকরা নিরানব্বই জন ছাত্র হাফ প্যাণ্ট পরিয়া বিদ্যালয়ে গমন করে। আজকাল কলিকাতায় ও মফঃস্বলে কলেজের ছাত্ররাও অনেকে হাফ প্যাণ্ট ও পুরা প্যাণ্ট পরিয়া কলেজে যায়।

আমি বাল্যকালে যে স্কুলে পড়িতাম, সেই স্কুলে প্রধান শিক্ষক (হেডমাষ্টার) ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষক প্যাণ্ট ও চোগা-চোপকান ব্যবহার করিতেন না। হেড-মাষ্টার মহাশয় প্যাণ্ট এবং চাপকান পরিয়া স্কুলে আসিতেন। সেকালে চাপকান ব্যবহারকারীরা প্রায় সকলেই ধুতি পরিধান করিয়া তাহার উপর চাপকান পরিতেন এবং চাপকানের সঙ্গে উড়ানিও ব্যবহার করিতেন। সেই উড়ানি লম্বালম্বি পাক দিয়া দড়ির মত হইলে তাহাই বগলের নীচে দিয়া বুকের উপর ঢ্যারার মত করিয়া দুই কাঁধে ফেলিতেন। আমরা অনেককে ধুতি ও চাপকানের সঙ্গে চোগা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। আজকাল যেরূপ প্যাণ্টুলানের বহুল প্রচলন হইয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। যাত্রার দলে জুড়িরাই প্যাণ্টুলানের সঙ্গে চোগা-চাপকান ব্যবহার করিত এবং

মাথায় টুপি পরিত। বালক ও কিশোর গায়কেরা প্যাণ্ট পরিয়া আসরে নামিত। তাহাদের পোশাক জরিতে ঝলমল করিত।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আমি আমাদের শহরের স্কুল ছাড়িয়া যখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হই তখন দেখিলাম যে কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকেরা কেহ-বা প্যাণ্টুলানের সহিত আবার কেহ-বা ধুতির সহিত চাপকান পরিয়া স্কুলে আসিতেন। ইঁহারা সকলেই চাপকানের উপর ড্যারার আকারে চাদর ব্যবহার করিতেন, কেবল প্রধান শিক্ষক মহাশয় চোগার উপর চাপকান গায়ে দিয়া আসিতেন। আজকাল বোধ হয়, শহর অঞ্চলে কোন শিক্ষকই ধুতি পরিয়া স্কুলে যান না, হয়ত অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষকই ধুতি ব্যবহার করেন। আমার মনে হয় দেশ স্বাধীন হইবার পর ধুতি-পরিহিত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় [১৮৭৭-১৯৫৬] মহাশয় সভা-সমিতি ও দরবারে বাঙালী ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ ধুতি, জামা ও চাদর পরিধান করিয়া গমন করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরাও দেখিতে পাই, খাঁটি বাঙালী পরিচ্ছদই ব্যবহার করেন। সেকালে বাঙালী চিকিৎসক-গণের মধ্যে প্রায় সকলেই কোট-প্যাণ্ট ব্যবহার করিতেন। খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের মধ্যে একমাত্র সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার [১৮৩৩-১৯০৪] মহাশয় ধুতি পরিয়া সর্ব্বত্র গমন করিতেন। তিনি ধুতির সহিত চটিজুতাও ব্যবহার করিতেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন প্রথম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে যাই তখন দেখিলাম যে, ঠাকুর-পরিবারের বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলেই বাড়ীতে প্যাণ্ট বা পায়জামা পরিধান করিয়া থাকেন। আজকাল কলিকাতায় মনে হয়, এইরূপ প্যাণ্ট বা পায়জামা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আমি এক এক সময় ভাবি, ইংরেজ আমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও ইংরেজ পরিচ্ছদ এদেশে বাঙালী-পরিবারে পুরুষদের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে। বাংলার মহিলাসমাজে গাউনের প্রচলন হয় নাই বটে, তবে ১৬/১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছাত্রীদের মধ্যে অনেককে আজানুলম্বিত ফ্রক পরিধান করিয়া স্কুল-কলেজ যাইতে দেখিতে পাই।

আমাদের সমাজে এই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের দুইটি কারণ প্রধান বলিয়া মনে করি। প্রথম কারণ—আমাদের কাছে কোঁচযুক্ত ধুতি পরিধান ক্ষিপ্রতার অনুকূল নহে। হঠাৎ দৌড়াইতে হইলে বা দ্রুত পদে যাইতে হইলে আমরা শিথিল কাছাকোঁচা সামলাইবার জন্য মল্লকচ্ছ হই বা মল্লকচ্ছ মারিয়া কাপড় আঁটিয়া পরি। প্যাণ্ট, হাফ প্যাণ্ট বা ইজার পায়জামা পরা থাকিলে আমাদিগকে আর মালকোঁচা মারিবার হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। প্যাণ্ট ব্যবহারের দ্বিতীয় কারণ—ব্যয়সঙ্কোচ। আমরা বাঙালী ভদ্রলোকেরা সাধারণত সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিতে ভালবাসি। কিন্তু সূক্ষ্মবস্ত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অপেক্ষাকৃত স্থূল বস্ত্রে প্যাণ্ট তৈয়ারি হয়। একবার প্যাণ্ট তৈয়ারী হইলে তাহা অনেকদিন ধরিয়া ব্যবহার করা চলে। সুতরাং উহার জন্য অল্প অর্থ ব্যয় হয়।

দ্বিজেনদ্রলাল রায় [১৮৬৩-১৯১৩] আমাদের পরিচ্ছদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন :

> "আমাদের Dressটা হবে English কিংবা Greek
> তাহা আজও করতে পারিনে ঠিক।।"

আমার তাই সময় সময় মনে হয় আমাদের সমাজে সকল বিষয়ে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে পরিচ্ছদ-বিপ্লব অবশ্যসম্ভাবী। কিন্তু এজন্য আমাদের জাতীয়তাকে কোনরূপেই ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। আমাদের পরিচ্ছদ এইরকম হওয়া উচিত যাহাতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা কেবল আমাদের পরিচ্ছদ দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে আমরা বাঙ্গালী। পাঞ্জাবীরা পাগড়ি পরিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। পারসীকদিগেরও মস্তকাবরণ বা টুপি তাহাদের জাতীয়তার পরিচায়ক, কিন্তু আমাদের এমন কোন পোষাক নাই যাহা অন্য সমাজে পরিয়া গেলে লোকে আমাদিগকে বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারে। আমাদের সমাজে কোনরূপ মস্তকাবরণ প্রচলিত নাই। বহুকাল পূর্ব্বে কোনরূপ ছিল কিনা তাহা বলা কঠিন। এখন হইতে দেড় শত বা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভদ্র বাঙ্গালী হিন্দুরা ধুতি এবং উড়ানি বা চাদর মাত্র ব্যবহার করিতেন। কোনরূপ জামা ব্যবহার করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। ইহার অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি শীতকাল ব্যতীত অন্য কোন ঋতুতে জামা গায়ে দিতেন না। আমি একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কি কখনও ধুতি চাদর ছাড়া অন্য পোষাক পরেন না?" হাসিয়া তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "ওরে সেকথা বলিস কেন? একবার যে বিপদে পড়েছিলাম সে বলবার কথা নয়। একবার ছোটলাটের দরবারে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল। আমাকে সকলে পরামর্শ দিলেন দরবারে যেতে গেলে দরবারী পোষাক পরে যাওয়া উচিত, অর্থাৎ—ইজের চাপকান ও চোগা কিংবা সাহেবি পোষাক কোট-প্যাণ্ট পরে যেতে হয়। আমি ত মুশকিলে পড়লাম। সেই চোগা-চাপকান আর ইজের পরে দরবারে গেলাম, কিন্তু যতক্ষণ সেখানে ছিলাম ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। দরবারের শেষে আমি ছোটলাটকে বললাম, 'আমাকে আর কখনও দরবারে ডাকবেন না। দরবারী পোষাক আমার সহ্য হয় না।' শুনে ছোটলাট বাহাদুর বললেন, 'তুমি তোমার ইচ্ছামত পোষাক পরেই এসো, তবে শরীরটা যেন আবৃত থাকে'।" যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তিনি ধুতি ও চাদরে বার মাস কিরূপ শরীর আবৃত করিয়া রাখিতেন। তিনি বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে চাদরে গা ঢাকিয়া যাইতেন, কিন্তু বাটীতে সর্ব্বদা (শীতকাল ব্যতীত) কেবল ধুতি মাত্র পরিয়া থাকিতেন। চাদর গায়ে দিতেন না।

ইজের, চোগা, চাপকান আমরা মুসলমানদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তারপর ইংরেজের নিকট হইতে কোট-প্যাণ্ট, নেকটাই, কলার প্রভৃতির ব্যবহার শিখিয়াছি। আর ভুলিয়া গিয়াছি যে, এই বিদেশীয় পরিচ্ছদ আমাদের পরানুকরণের উৎকট মোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে অনেক ভদ্র বাঙ্গালী হিন্দু বাটীতে 'লুঙ্গি' ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ইদানীং অনেকে লুঙ্গি পরিয়া পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে বাহির হইয়া থাকেন। এই লুঙ্গি ব্রহ্মদেশীয় পরিচ্ছদ। উহা বর্ম্মীদিগের জাতীয় পরিচ্ছদ। ব্রহ্মদেশ ইংরেজের অধীন হইবার পূর্ব্বে রাজা-মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া পথের মুটে-মজুর পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই উহা একমাত্র পরিধেয় ছিল। লর্ড ডাফরিন ব্রহ্মদেশকে ইংরেজের রাজ্যভুক্ত করিলে তদানীন্তন রাজকুমার মেহন গুইন ও বহু উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ সপরিবারে ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া কিছুদিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমরা তখন দেখিয়াছি, রাজকুমার স্বয়ং এবং তাঁহার অনুচরেরা বহুমূল্য রেশমী লুঙ্গি পরিধানপূর্ব্বক পথে বাহির হইতেন। এখনও কলিকাতায় যে সকল বর্ম্মী বাস করেন তাঁহারা পরিধানে লুঙ্গি এবং মাথায় রুমাল বাঁধিয়া থাকেন। এই লুঙ্গি ব্রহ্মদেশ হইতে আরাকানের ভিতর দিয়া পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানসমাজে প্রচলিত হয়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, ইউরোপীয়, চীনা, আফগান প্রভৃতি অভারতীয় এবং ভারতের মধ্যে পাঞ্জাবী, পারসীক, নেপালী, ভুটানী প্রভৃতি জাতিকে তাহাদের পোষাক দেখিলেই আমরা চিনিতে পারি, কিন্তু বাঙ্গালীর এমন কোন জাতীয় পরিচ্ছদ এখন নাই যাহা দেখিলে সকলে তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারে। ইহা কি আমাদের লজ্জার কথা, না গৌরবের কথা?

আমাদের

আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী। সেইজন্য আমরা 'বাঙালী' নামে অভিহিত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে সকলেই আমরা বাঙালী। যাঁহারা হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণপূর্ব্বক অন্য সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ বংশগত পদবী পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সম্পূর্ণ মুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম শুনিলে বুঝিতে পারা যায় না যে, তাঁহারা বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, মাদ্রাজী বা অন্য কোন প্রদেশের লোক। তাঁহাদের নামগুলি তাঁহাদের ধর্ম্মের পরিচয় দেয়। কিন্তু তাঁহাদের জাতীয়তার (Nationality) পরিচয় পাওয়া যায় না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে বাঙালী খ্রীষ্টান তাহা তাঁহার নাম শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বর্ত্তমান রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বাঙালী নাম বা বাঙালী আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে দেখিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে, তিনি বাঙালী নহেন। কি পরিচ্ছদে, কি নামে বা আচার-ব্যবহারে তিনি ষোলআনা বাঙালী। সেকালের খ্যাতনামা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (K. M. Banerjee), কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন ঘোষ (গণিতজ্ঞ P. Ghosh), ডাক-বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হেমনাথ বোস—ইঁহারা সকলেই খ্রীষ্টান ছিলেন। কিন্তু

কেহই পিতৃদত্ত পুরাতন নাম পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করেন নাই। সেকালের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee) খ্রীষ্টান ছিলেন না। তিনি তাঁহার পদবীর সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া Bonerjee হইয়াছিলেন। আমার জানা দুই-একজন লোক আচার-ব্যবহারে বা পরিচ্ছদে সম্পূর্ণ বাঙালী হিন্দু হইলেও ইংরাজী নাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও দেখিয়াছি। সেকালের লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী রামগোপাল বিদ্যান্ত মহাশয়ের পৌত্র ভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত। এই ভিক্টর নারায়ণ খ্রীষ্টান নহেন। তিনি পুরা হিন্দু এবং লক্ষ্ণৌয়ের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন।

বাঙালীর পদবী ইংরাজীতে লিখিবার সময় অনেকে একটু বিকৃত করিয়া ব্যবহার করেন। যেমন বাঁড়ুজ্জ্যে Banerjee, চাটুজ্জ্যে Chatterjee, মুখুজ্জ্যে Mukherjee, দত্ত Dutta, বসু Vasu, সিংহ Sinha প্রভৃতি। যাঁহারা এইরূপ পদবী পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের পুত্র বা পৌত্রগণের অনেকেই এইরূপ পরিবর্ত্তিত উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামের বিখ্যাত জমিদারবংশীয় খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ [১৮৬৩-১৯২৮] এস্. পি. সিন্‌হা হইয়াছিলেন। পরে ইনি লর্ড উপাধি পাইয়া লর্ড সিন্‌হা নামে পরিচিত হন। ইংরেজের আমলে বিহার বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হইলে এই লর্ড সিন্‌হাই বিহারের অন্যতম গভর্ণর বা রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[১২৬] ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতবাসীকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা গভর্ণর করেন নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে একমাত্র লর্ড সিন্‌হাই ইংল্যাণ্ডে লর্ডশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কোন ভারতবাসী এই উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ইদানিং সিংহ উপাধিধারী অনেক লোক আপনাদিগকে সিন্‌হা উপাধিতে পরিচয় দিয়া থাকেন।

যে সকল বাঙালী হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সময় পূর্ব্বনাম সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া খাঁটি মুসলমানী নাম গ্রহণ করাতে তাঁহাদের বংশধরগণকে এখন বাঙালী বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'মোহম্মদী'[১২৭] নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৌলানা আক্রাম খাঁ [১৮৬৮-১৯৬৮] যে বাঙালী ব্রাহ্মণের বংশধর তাহা কেহ মনে করিতে পারেন কি? মৌলানা সাহেবের প্রপিতামহ গাঙ্গুলী পদবীধারী বাঙালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই মৌলানা সাহেব বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পর পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে অর্থাৎ পাকিস্থানে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গিয়া তিনি পূর্ব্ব-পাকিস্থান মুসলিম লীগের সভাপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার সহোদর কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার হিন্দু নাম হইয়াছে শশীভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। এইরূপ কত চাটুজ্জ্যে, মুখুজ্জ্যে, গাঙ্গুলী, সান্যাল, ভাদুড়ী, লাহিড়ী, চক্রবর্ত্তী, আচার্য্য, ঘোষ, বোস, মিত্র যে মুসলমান হইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। মুসলমানসমাজে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যে সকল ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া মুসলমানসমাজের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের এক জনকে আমি দেখিয়াছি এবং তাঁহার সম্বন্ধে একটা কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিলে

বোধ হয় অবান্তর হইবে না। ঢাকানিবাসী ব্রাহ্মণ যুবক মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এই ঘটনার নায়ক। আমি যখন 'হিতবাদী'তে কাজ করিতাম তখন ইনি মধ্যে মধ্যে আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগে আসিতেন। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার নাম দীন মহম্মদ। আমি তাঁহাকে মুসলমানের বংশধর বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। কিছুদিন পর তাঁহার প্রকৃত পরিচয় ঘটনাক্রমে আমার গোচর হইল। একদিন জনাব দীন মহম্মদ আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক আমাদের কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "নমস্কার গাঙ্গুলী সাহেব।" তখন দীন মহম্মদও বলিলেন, "নমস্কার, নমস্কার।"

ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি চুঁচুড়ায় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাটীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। কথায় কথায় এই দীন মহম্মদের কথা উঠিল। দীন মহম্মদের নাম শুনিবামাত্র অক্ষয়বাবু বলিলেন, "যোগিন, তুমি দীন মহম্মদকে জান নাকি?" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, তিনি আমার পরিচিত।" অক্ষয়বাবুর বৈঠকখানায় চুঁচুড়ার সুবিখ্যাত দীননাথ ধর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দীন মহম্মদের নাম শুনিয়াই বলিলেন, "ঢাকার সেই মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী? আরে তাকে নিয়ে এক বার যে বড় মজা হয়েছিল।" কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে দীনবাবু বলিলেন, আমি যখন ঢাকাতে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার বা উকীলসরকার ছিলাম, তখন একদিন এই মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী—তখন আর মনোরঞ্জন নহে, দীন মহম্মদ একটা মোকদ্দমায় আমাকে উকীল নিযুক্ত করিবার জন্য আমার কাছে আসিয়াছিল। আমি তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলাম, "আমি বিনা পারিশ্রমিকে তোমার মোকদ্দমা চালাইতে সম্মত আছি। কিন্তু তোমাকে দীন মহম্মদ নামের পরিবর্ত্তে ইব্রাহিম নাম গ্রহণ করিতে হইবে।" আমার কথা শুনিয়া দীন মহম্মদ চলিয়া গেল। অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইব্রাহিম নাম ধারণ করিতে বলিলে কেন?" দীনবাবু বলিলেন, "ওর ইতিহাস যে আমি জানি। মনোরঞ্জন ব্রাহ্মণের ছেলে, কেশব সেনের সংস্পর্শে আসিয়া পৈতা ফেলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে শুনিলাম সে খ্রীষ্টান হইয়াছে এবং শেষে কোরাণ পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিল! আমি তাই তাহার নাম ইব্রাহিম রাখিয়াছিলাম। ই অর্থাৎ ইঙ্গ, ব্রা অর্থাৎ ব্রাহ্ম, হি অর্থাৎ হিন্দু, ম অর্থাৎ মোসলেম। একাধারে এইরূপ চারটি ধর্ম্মের সমাবেশ আর কোন নামে পাওয়া যায় কি?

কালসহকারে লোকের রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন হয়, নামেরও সেই রকম পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ইহা বলা অনাবশ্যক। এই নামের পরিবর্ত্তন পুরুষসমাজের ন্যায় মহিলাসমাজেও ঘটিয়া থাকে। বঙ্গদেশে ঘটক মহাশয়দিগের নিকট যেসকল পাঁজি-পুঁথিতে বংশতালিকা আছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক নামের কোন অর্থ হয় না। ঘটকেরা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদিগের বংশতালিকাই রাখিতেন। কদাচিৎ অব্রাহ্মণ, রাজা বা ভূস্বামীর বংশতালিকাও তাঁহাদের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ আমাদের নাম তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে,

ডাকনাম, মধ্যনাম ও পদবী। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর), রামমোহন রায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নামের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ ঐ সকল নামধারীর আত্মীয়স্বজন প্রদত্ত নাম। অনেক স্থলেই নামের মধ্য অংশের বিশেষ কোন সার্থকতা থাকে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি নামের অধ্যাংশ 'চন্দ্র' 'মোহন' 'নাথ' প্রভৃতিরও সার্থকতা কিছুই নাই। অতি অল্পসংখ্যক নামই আছে যাহার প্রথম অংশ হইতে দ্বিতীয় অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল প্রথম অংশ বজায় রাখিলে নামের বিশেষ কোন অর্থ হয় না। 'ভূদেব', 'ভূপতি', 'ধরানাথ', 'ধরণীধর' প্রভৃতি নাম প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ একসঙ্গে জড়িত। অনেকে ভূদেববাবুর নাম লেখেন 'ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়'। ভূ অর্থে পৃথিবী, দেব অর্থে দেবতা। সাধারণতঃ ভূদেব শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। ভূদেববাবুর সময়ে শিক্ষা বিভাগে যে সকল রিপোর্ট বা বিবরণ প্রকাশিত হইত তাহাতে তাঁহার নাম সংক্ষেপে তিনি লিখিতেন B. D. M. অর্থাৎ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। নামের মধ্যভাগটা নিরর্থক বা অনাবশ্যক বলিয়া অনেকে নামের ঐ মধ্যাংশটা ব্যবহার করিতেন না। 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক আমার বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সাধারণতঃ 'সুরেশ সমাজপতি' নামে খ্যাত ছিলেন, যদিও তাঁহার নামের মধ্যাংশটা তাঁহার কাগজে লিখিত হইত। ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র 'মৃগেন মিত্র' নামেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মৃগেন শব্দের কোন অর্থ হয় না। সিংহের নাম মৃগেন্দ্র। এইরূপ 'দেবেন', 'যোগেন', 'হীরেন' 'রমেন' প্রভৃতি নামের 'ন্দ্র'-র পরিবর্ত্তে কেবল 'ন' ব্যবহার করা সমীচীন নহে। কিন্তু সাধারণতঃ 'ন্দ্র' ব্যবহৃত হয় না। তাহার পর 'নাথ', 'চন্দ্র' প্রভৃতি মধ্যনামের সহিত প্রথম নামের কোন সম্পর্ক নাই। 'দেবেন্দ্র' বলিলে দেবশ্রেষ্ঠ বুঝায়। 'ইন্দ্র' শব্দ শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়। 'নাথ' শব্দও শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং একই নামে 'ইন্দ্র' ও 'নাথ' ব্যবহারের সার্থকতা কি?

আমরা বাঙালী সাধারণতঃ অনুপ্রাস-ভক্ত। আমরা পুত্র কন্যার নাম রাখিবার সময় অনুপ্রাসের দিকে দৃষ্টি রাখি। এমনকি, অনেক সময় অনুপ্রাস বজায় রাখিবার জন্য অর্থহীন শব্দেও আমাদের অরুচি হয় না। আমার আত্মীয় ও পরিচিতগণের মধ্য হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা পাঁচ সহোদর ছিলাম। আমাদের নাম যথাক্রমে সত্যেন্দ্রকুমার, যোগেন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রকুমার এবং নগেন্দ্রকুমার। আমার পুত্রগণের নাম যথাক্রমে ধীরেন্দ্রকুমার, বীরেন্দ্রকুমার, হীরেন্দ্রকুমার, নৃপেন্দ্রকুমার, মণীন্দ্রকুমার, শৈলেন্দ্রকুমার, সুরেন্দ্রকুমার। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের নামেও এইরূপ অনুপ্রাসের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারী। এই শেষোক্ত নামের অর্থই বা কি স্বার্থকতাই বা কি?

আমরা সেকালে দেখিয়াছি বাঙালী মহিলাদের নাম চার-পাঁচটা অক্ষরযুক্ত হইত। সেকালে 'জগত্তারিণী' 'দয়াময়ী', 'মহামায়া', 'হরমোহিনী' প্রভৃতি নাম অনেক ছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনে আজকাল নাম সঙ্কুচিত হইয়াছে। আজকাল নীরা, ইরা, ধীরা, মীরা, মায়া, শোভা, ঊষা, সন্ধ্যা প্রভৃতি নামের ছড়াছড়ি। আমার অনেক সময় মনে হয়

হয়ত আর কিছুদিন পরে বাঙালী মেয়েদের নাম এক অক্ষরে পরিণত হইবে। বঙ্কিমবাবু তাহার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। দেবী চৌধুরাণীর নাম প্রফুল্ল। তাঁহার জননী তাঁহাকে ডাকিতেছেন, "—ও পি"। 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ শৈবলিনীকে ডাকিতেছেন, "—শৈ"। সুতরাং মনে হয় আর কিছুদিন পরে বাঙ্গালী সংসারে বাঙ্গালীদের নাম একাক্ষরে পরিণত হইবে।

আজকাল অনেক ইংরাজী নাম বাঙালী মেয়েদের দেখিতে পাই—'Opala', 'Happy', 'Dolly', 'Lucy', 'Dora', 'Baby', 'Mary', প্রভৃতি নাম বাঙ্গালী মেয়েদের আছে। পুরুষদের নামে যাবনিক নামেরও অভাব নাই। 'জহরলাল', 'মতিলাল', 'চুনীলাল', 'ফকির' প্রভৃতি নাম সংস্কৃত ভাষা হইতে আসে নাই। উহা আরবী, ফারসী হইতে আসিয়াছে। 'জহর' শব্দের অর্থ রত্ন। উহাতে 'লাল' শব্দ যোগ করিয়া বাঙালী নাম হইয়াছে 'জহরলাল' আর 'মল' শব্দ যোগ করিয়া হইয়াছে 'জহরমল' মাড়োয়ারীর নাম। এই সকল রত্নজ্ঞাপক নাম অর্থাৎ হীরা, মতি, চুণী, পান্না প্রভৃতির ব্যবহার সুবর্ণবণিক সমাজেই বোধ হয় সমধিক।

আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী অনেক সময় কাহারও নাম শুনিলে বুঝিতে পারি যে, সেই নামধারী ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গবাসী। সজনীকান্ত, চপলাকান্ত, প্রাণবল্লভ প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গে বড় দেখিতে পাই না। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় আসিয়া আমার এক মাতুলের পাটের ব্যবসায়ে কিছুদিন লিপ্ত ছিলাম। সে সময় এক ভদ্রলোক পাটের দালালী করিতেন। শুনিয়াছিলাম তাঁহার বাড়ী চট্টগ্রাম জেলায়। শুনিলাম তাঁহার নাম প্রাণনাথ সাহা। তাঁহার নিবাস নাগরপুর গ্রামে। তাঁহার নাম ও গ্রামের নাম শুনিয়া ভাবিলাম নাগরপুরের প্রাণনাথ। নামের সহিত বাসগ্রামের বেশ সামঞ্জস্য আছে।

নামে অনুপ্রাস বা মধ্যনামের একতা কোন কোন পরিবারে পাঁচ-ছয় পুরুষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নাম করিতে পারা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত 'নাথ' শব্দ ঐ পরিবারের মধ্যনামে ব্যবহৃত হইতেছে। দ্বারকানাথের পর হইতে ঐ পরিবারের সকল পুরুষের নাম 'ন্দ্র' আছে। ঐ পরিবারের আর একটা বিশেষত্ব দেখি যে, নামের ইংরাজী আদ্যক্ষর জ্যেষ্ঠ পুত্রক্রমে একই প্রকার। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথের পুত্র ক্ষেমেন্দ্রনাথ, এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। কারণ আদ্যক্ষরের সমতা রক্ষার জন্য অবশেষে হয়ত অভিধানের সাহায্য লইতে হইবে।

আমাদের নামের সহিত উৎকলবাসীদের নামের বিশেষ পার্থক্য নাই। তবে অনেক সময় উচ্চারণের পার্থক্য হেতু উঁহাদের নাম আমাদের নাম হইতে পৃথক বলিয়া মনে হয়। আমরা স্বরবর্ণ 'ঋ' অক্ষরকে উচ্চারণ করি 'রি'। আমরা উচ্চারণ করি 'ব্রিন্দাবন' উড়িয়ারা উচ্চারণ করেন 'ব্রুন্দাবন'। এই ব্রুন্দা ডাকনাম বরুণদা হইয়া

যায়। তবে উড়িয়াদের পদবী আমাদের পদবীর সহিত এক নয়। বিহারবাসীদের নামের সহিত আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের নামের পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। আমাদের নাম তিন অংশে বিভক্ত, তৃতীয় অংশ পদবী; বিহারীদের বোধ হয় আমাদের মত বংশগত উপাধি প্রচলিত নাই। উঁহাদের অনেকের নামই দুই ভাগে বিভক্ত। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারী, কিন্তু তাঁহার পদবী কি? আর একটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি। আজকাল আমাদের দেশে পার্থসারথি নামটার একটু বাহুল্য দেখিতেছি। আমার পরিচিত চার জন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পৌত্রের নাম শুনিলাম পার্থসারথি। এই নামটা বাংলায় বড় ব্যবহার হইত না। মাদ্রাজ অঞ্চলেই উহার ব্যবহার অধিক ছিল। সম্ভবতঃ মাদ্রাজ হইতেই ঐ নামটা আমরা লইয়াছি।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

আজকাল আমাদের দেশে সকলের মুখেই শুনিতে পাই যে, আমাদের সমাজে শিক্ষা-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষাব্যবস্থার ফলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থকে দারুণ অর্থসঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এই সঙ্কট হইতে কিরূপে উদ্ধার পাওয়া যায় সকলেই আজ এই কথা ভাবিতেছেন। কোন রোগ নিরাময় করিতে হইলে সুচিকিৎক রোগের নিদান অন্বেষণ করেন। যে কারণে রোগ হইয়াছে সেই কারণ দূর করিতে না পারিলে কেবল ঔষধ প্রয়োগে রোগ চিরতরে নিবারিত হয় না। এই প্রসঙ্গে গত ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগলের 'শিক্ষা-সঙ্কট'[১২৮] শীর্ষক সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ, ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক প্রবন্ধটি বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। ইংরেজ আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় যে রোগ প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধে দীর্ঘকালের নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এখানে কিছু বলিব।

ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাতে শিক্ষার্থীদিগকে কোনরূপ অর্থব্যয় করিতে হইত না। কি নিম্নশিক্ষা, আর কি উচ্চশিক্ষা শিক্ষার্থীরা বিনা ব্যয়ে সকল শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইতে পারিত। মুসলমান আমলের পূর্ব্বে আমাদের সমাজে সাধারণতঃ দুই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। নিম্নশিক্ষার ব্যবস্থা হইত পাঠশালায়, আর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হইত চতুষ্পাঠীতে। পাঠশালার ছাত্রগণকে কোন কোন স্থলে নামমাত্র বেতন দিতে হইত বটে, কিন্তু সেজন্য ছাত্রের অভিভাবকগণকে কখনও চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইত না। মাসিক দুই-এক আনার বেতন পুত্রকন্যার শিক্ষায় ব্যয় করা কোন অভিভাবকই কষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন না। অভিভাবকগণ কোন নির্দিষ্ট পর্ব্বাহে পাঠশালার শিক্ষকদিগকে 'সিধা' অর্থাৎ আহার্য্যদ্রব্য প্রদান করিতেন। সে সময় দেশে রাজা বা ধনবানেরা পাঠশালার শিক্ষকদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। পাঠশালার শিক্ষকেরাও তাঁহাদের সংসার খরচের জন্য কখনও চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইতেন না। তাহার প্রধান কারণ সমাজে তখন বিলাসিতারূপ পাপ প্রবেশ করে নাই। বিলাসিতা

তখন রাজপ্রাসাদে ও ধনবান ব্যবসায়ীদিগের অট্টালিকার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মধ্যবিত্তশালী লোকেরা কখনও ধনবানের অট্টালিকা দেখিয়া হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত না। এখনও বাংলার পল্লীগ্রামে এরূপ অনেক পাঠশালা দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাঠশালার শিক্ষক বা গুরুমহাশয়কে প্রতিপালন করা জমিদার বা ধনবানেরা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। গুরুমহাশয়েরা কখনও ছাত্রদিগের উপর নির্ভর করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন না।

এই সকল পাঠশালাতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর বালকেরাই প্রাথমিক বিদ্যা লাভ করিত। আমার মনে আছে, এখন হইতে প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পাড়ায় যে পাঠশালায় আমি পড়িতাম সেখানে আমার সতীর্থদের মধ্যে একজন রজকের পুত্র, একজন কর্ম্মকারের পুত্র, দুইজন ধীবরের পুত্র এবং দুই-তিন জন নিরক্ষর কৃষকের পুত্র ছিল। তিন-চারি জন মুসলমান শ্রমিকের পুত্রও আমাদিগের সহিত পড়িত। এই মুসলমান বালকদিগের মধ্যে দুইজন পরবর্ত্তীকালে রাজমিস্ত্রির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আমার প্রৌঢ় বয়সে আমারই বাটীতে উহারা নূতন গৃহ নির্ম্মাণ বা পুরাতন গৃহের জীর্ণসংস্কার করিয়াছিল। ঐ দুইজন রাজমিস্ত্রি লেখাপড়া জানিত। সামান্য হিসাবপত্রও করিতে পারিত। আমি প্রথমে তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই। একদিন তাহারা আমাকে বলিল, "বাবু, আপনি আমাদের চিনতে পারছেন না। আমার নাম মকবুল। আমি রামমশায়ের পাঠশালায় আপনার সঙ্গে পড়েছিলাম।"

সেকালে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা সকলেই যে উচ্চবংশজাত হইতেন, তাহা নহে। পল্লীগ্রামে ও মফঃস্বল শহরে অনেক পাঠশালায় 'বাগদীমশাই', 'চাঁড়ালমশাই' ও 'বাইতিমশাই' প্রভৃতিও শিক্ষকতা করিতেন। আমার মনে পড়ে আমাদের পাড়ায় একটা পাঠশালায় একজন বাগদী জাতীয় গুরুমশায় ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি অতি দ্রুতবেগে লিখিলেও তাঁহার লিখিত অক্ষরগুলি যেন মালাগ্রথিত মুক্তার মত সুদৃশ্য ছিল। আমি যখন বাল্যকালে স্কুলে পড়িতাম, তখন আমার একজন গৃহশিক্ষক বাইতি জাতীয় ছিলেন। বাইতিরা জাতিতে চর্ম্মকার বা মুচি। উৎসবের বাড়ীতে ঢাক-ঢোল বাজান তাহাদিগের পেশা। আমার গৃহশিক্ষক 'নবাই মাষ্টার' বা নবীনচন্দ্র বাইতি সুন্দর ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। আমি পাঠশালা ছাড়িয়া যখন বাংলা স্কুলে প্রবেশ করিলাম তখন যুধিষ্ঠির নামে একটি বালক আমার সহপাঠী ছিল। সে জাতিতে হাড়ি। অঙ্কে তাহার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা ছাত্রদিগের নিকট হইতে মাসিক বেতন লইতেন। সে বেতনের পরিমাণ আট পয়সা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত। সেকালে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদিগকে ইহার অধিক নগদ পয়সা ব্যয় করিতে হইত না। তবে অভিভাবকেরা মধ্যে মধ্যে পালপার্ব্বণে নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুসারে 'সিধা' দিতেন। পাঠশালায় ছাত্রদের বসিবার জন্য কোনরূপ কাষ্ঠাসনের ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রেরা বসিবার জন্য অতি ক্ষুদ্র মাদুর কিংবা খেজুরপাতার চাটাই বাটী হইতে প্রত্যহ পাঠশালায় আনিত। তাহারা প্রথমে তালপত্রে

লেখা আরম্ভ করিত। তালপাতায় লেখার 'হাত বসিলে' কদলীপত্র এবং সর্ব্বশেষ কাগজ ব্যবহার করিত। সুতরাং তাহাদিগকে হস্তাক্ষরের জন্য বা অঙ্ক করিবার জন্য 'এক্সারসাইজ বুক' কিনিতে হইত না। প্রথমে বোধ হয় এক আনা দামের কতকগুলো তালপত্র কিনিতে হইত। সেই তালপত্র অনেকে বিনামূল্যেই সংগ্রহ করিত। সুতরাং পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, পুত্রকন্যাগণের নিম্নশিক্ষার জন্য কত অল্প অর্থ ব্যয় করিতে হইত। পাঠশালার ছাত্রেরা কখনও লেখনীর জন্য বিদেশজাত ষ্টীল পেন প্রস্তুতকারীদের শরণ লইত না। কঞ্চি, শর, খাগড়া, পাহাড়ে কলমী ইহাই ছিল লেখনীর উপাদান। ইংরাজী লিখিবার জন্য হংসপুচ্ছ বা ময়ুরপুচ্ছ লেখনীরূপে ব্যবহৃত হইত। বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরাই উহা ব্যবহার করিত। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা-বিভাগের ব্যবস্থা অনুসারে অনেক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত বিনা বেতনে পড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ঐ সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণকে বিদ্যালয়ে মাসিক বেতন দিতে হয় না সত্য, কিন্তু এক্সারসাইজ বুক, পাঠ্য পুস্তক, কাগজ, কলম, কালি প্রভৃতির জন্য যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহা নিতান্ত কম নহে। সেকালে ছাত্রেরা প্রায় সকলেই বাটীতে কালি প্রস্তুত করিয়া লইত। চালভাজা হাঁড়িতে ভাজিতে ভাজিতে যখন পুড়িয়া কালো হইত তখন সেই চালের অঙ্গার, রন্ধনশালার হাঁড়ির তলার ভুষা এবং সামান্য হিরাকষ জলে দুই-তিন দিন ভিজাইয়া রাখিলে উত্তম কালি প্রস্তুত হইত। সে কালিতে অতি অল্প পরিমাণ বাবলার আঠা বা গঁদ মিশাইলে উহাতে লেখা অক্ষরগুলি চক্‌চক্ করিত। বাটীতে কালি প্রস্তুত করিবার আরও নানাপ্রকার উপায় ছিল। বাহুল্যভয়ে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

একটা ব্যাপার দেখিয়া আমার এই বৃদ্ধ বয়সে মনে বড় ক্ষোভ হয়। ক্ষোভের কারণ—কাগজের অপব্যয়। বর্ত্তমান কালে কোন ছাত্রকেই নিম্নশ্রেণীতে পড়িবার সময় কোন কাগজে মক্স করিতে দেখি না। আমি দেখিতে পাই বালকেরা যে সকল এক্সারসাইজ বুক কিংবা গৃহে নির্ম্মিত খাতায় কিছু লেখে সে সকল খাতায় প্রচুর স্থানের অপব্যয় হয়। অঙ্কের খাতা যে অঙ্ক করিবার পর হস্তাক্ষরের খাতারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে ইহা ছাত্র ত দূরের কথা ছাত্রের অভিভাবকেরাও মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখেন না। আমরা কিন্তু বাল্যকালে স্কুলে পড়িবার সময় অঙ্কের খাতাকে হস্তাক্ষরের খাতা রূপে ব্যবহার করিতাম। অভিভাবকেরা যদি এই দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে তাঁহাদের অনেক অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে।

বিদ্যাশিক্ষাকে আমরা চলিত কথায় লেখাপড়া শেখা বলি। কেহ পড়ালেখা শেখা বলে না। অর্থাৎ, অগ্রে লেখা ও পরে পড়া ইহাই ছিল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু ইংরেজ আমলের ব্যবস্থায় লেখাপড়ার বদলে 'reading and writing' হইয়াছে। হাতের লেখাটা বর্ত্তমান কালে অত্যন্ত অবহেলিত হইতেছে। কিন্তু আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন হাতের লেখা এরূপ অবহেলিত হইত না। এমনকি বাৎসরিক পরীক্ষাতেও সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য পরীক্ষার্থীরা অতিরিক্ত নম্বর পাইত। আজকাল এরূপ প্রথা কোনও বিদ্যালয়ে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। আমার বাসস্থান

চন্দননগর এই সেদিন পর্য্যন্ত ফরাসীদিগের একটি উপনিবেশ ছিল। ফরাসীরা বোধ হয় ইংরেজদের অপেক্ষা হস্তাক্ষরের প্রতি সমধিক মনযোগী। বর্ত্তমান কালে চন্দননগরে যে বিদ্যালয় গভর্ণমেন্টের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহা প্রথমে স্থাপন করেন ফরাসী পাদ্রী বা ধর্ম্মযাজকেরা। সেজন্য উহার নাম ছিল পাদ্রীর স্কুল। সেই পাদ্রীরা, ফ্রান্স হইতে হস্তাক্ষরের copy book আনাইয়া মাত্র এক আনা মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতেন। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্মযাজকদিগের হস্ত হইতে শিক্ষাব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিলে, চন্দননগরে পাদ্রীর স্কুলও পাদ্রীদিগের হাত হইতে গভর্ণমেন্টের হাতে আসে। পাদ্রীদের আমলে স্কুলের নাম ছিল সেণ্ট মেরিজ ইনষ্টিটিউশন। গভর্ণমেন্টের হাতে আসার পর উহার নাম হইল ডুপ্লে কলেজ। এখন চন্দননগর ফরাসী গভর্ণমেন্টের হস্তচ্যুত হইয়া ভারত গভর্ণমেন্টের অধীন হওয়াতে ঐ বিদ্যালয়ের নাম হইয়াছে "কানাইলাল বিদ্যালয়"। (পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে চন্দননগরের যুবক, ডুপ্লে কলেজের ছাত্র কানাইলাল দত্ত বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীকে হত্যা করিবার অপরাধে ইংরেজের বিচারে হাসিমুখে, তাঁহার 'পাপের' জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। চন্দননগরে গঙ্গাতীরে যেখানে পূর্ব্বে ডুপ্লের মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল এখন সেইখানে কানাইলালের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।) সেকালে সেই পাদ্রীদের আমলে যে সকল ছাত্র পাদ্রীর স্কুলে পড়িতেন তন্মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন তাঁহাদের সকলেরই হস্তাক্ষর এত সুন্দর যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সেকালে হস্তাক্ষর ভাল করিবার জন্য পাঠশালার গুরুমশায় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুলের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত সবিশেষ যত্ন লইতেন। অনেক বালক অভ্যাসদোষে লিখিবার সময় বামে বা দক্ষিণে মাথাটি ঈষৎ হেলাইয়া রাখে—তাহাদের হস্তাক্ষর সাধারণতঃ একটু বাঁকা হইয়া থাকে। সেজন্য সেকালের গুরুমহাশয়েরা ছাত্রদিগকে হস্তাক্ষর লেখাইবার সময় বলিতেন—

"ঘাড় বাঁকা হইলে অক্ষর হবে বাঁকা
এ যে না বুঝিতে পারে তারে বলি বোকা।"

চন্দননগরে ফরাসী ধর্ম্মযাজকদের সময় পাদ্রীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সেণ্ট মেরিজ স্কুলে দুই-একটি ব্যবস্থা বড় সুন্দর ছিল। কোন ছাত্র কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহারা কখনও শারীরিক দণ্ডে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত না। ফরাসী দেশে কোন বিদ্যালয়েই ছাত্রদিগকে শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় না। চন্দননগরে ধর্ম্মযাজকেরা মনে করিতেন যে, ছাত্রদিগকে কোন অপরাধে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলে সে দণ্ড তাহাদের অভিভাবকদিগের উপরেই প্রয়োগ করা হয়। বালক ও কিশোর ছাত্রগণ অর্থ উপার্জ্জন করে না। সুতরাং অর্থদণ্ড তাহাদের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। কোন কারণে ছাত্রগণের জরিমানা হইলে ছাত্রেরা অভিভাবকের অগোচরে সেই জরিমানার অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে। তাহাতে ছাত্রগণের প্রথম অপরাধের প্রতিকার ত হইবেই না, উপরন্তু আর একটি অপরাধের সহায়তা করা হইবে। সেইজন্য চন্দননগরের পাদ্রীর স্কুলে শিক্ষকেরা অপরাধী ছাত্রের প্রতি হস্তাক্ষর লিখিবার দণ্ড

প্রয়োগ করিতেন। বিদ্যালয়ে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আধ ঘণ্টা করিয়া 'টিফিন'এর ছুটি হইত। ছাত্রেরা ঐ সময় ক্লাসের বাহিরে গিয়া জলযোগ করিত ও খেলাধূলা করিত। কিন্তু অপরাধী ছাত্রগণ টিফিনের ছুটি পাইত না। তাহাদিগকে সেই সময় ক্লাসের ভিতরে বসিয়া আদর্শ হস্তাক্ষরের খাতায় ৫০ ছত্র বা ১০০ ছত্র লিখিতে হইত। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে লেখার দণ্ড বর্দ্ধিত হইত। যদি কাহারও লেখা এক দিনের টিফিনের সময়ে শেষ না হইত, তাহা হইলে দুই দিন, তিন দিন বা চারি দিন পর্য্যন্ত ছাত্রগণকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। যাহারা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্র তাহাদিগকে অনেক সময় অপরাহ্ণে বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পরেও আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা কয়েদ রাখা হইত। এই কয়েদের সময়টাও ছাত্রদিগকে বসিয়া লিখিতে হইত। দণ্ডভোগ কালে ছাত্রগণ যে লেখা লিখিত, তাহা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর না হইলে সে লেখা অগ্রাহ্য হইত।

পাদ্রীর স্কুলে আর একটি সুন্দর নিয়ম ছিল। প্রায় সকল স্কুল ও পাঠশালায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যালয়ে ছুটি হইবামাত্র বালকেরা হুড়াহুড়ি ও গোলমাল করিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু পাদ্রীর স্কুলে সেরূপ হইত না। ছুটির ঘণ্টা বাজিবামাত্র ছাত্রগণ দণ্ডায়মান হইয়া নিজ নিজ বই-খাতা-পেন্সিল প্রভৃতি গুছাইয়া লইত। সারিবদ্ধভাবে দুই জন দুই জন করিয়া সমবেত পদক্ষেপে অর্থাৎ ড্রিল করিবার সময় যেরূপ চলাফেরা করে সেইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া স্কুলের ফটক পর্য্যন্ত শান্তভাবে গমন করিত। তাহার পর ফটক পার হইয়া রাজপথে পড়িলে তাহারা যেদিকে ইচ্ছা যেমন করিয়া হউক চলিয়া যাইত। বিদ্যালয়ের শেষ ঘণ্টায় যে শিক্ষক ক্লাসে উপস্থিত থাকিতেন, তিনিই ছাত্রদিগকে ড্রিল করাইয়া ফটক পর্য্যন্ত লইয়া যাইতেন। এ ব্যবস্থা সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত ছিল। আজকাল এ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে কিনা জানি না। না থাকাই সম্ভব। তবে আমার মনে হয়, এ-ব্যবস্থা কি শহরে কি মফঃস্বলে প্রত্যেক বিদ্যালয়েই প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। টিফিনের ছুটির সময়েও ছাত্রেরা ঐরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে ক্লাস হইতে বাহির হইত। কোন ছাত্র শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে তাহার প্রতিও হস্তাক্ষর-দণ্ড প্রয়োগ করা হইত।

ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে, অর্থাৎ হিন্দু রাজত্বে অথবা মুসলমান রাজত্বে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল চতুষ্পাঠীতে ও মাদ্রাসায়। হিন্দুসমাজের উচ্চশিক্ষাদাতা ছিলেন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা আর মুসলমানসমাজের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল মাদ্রাসার মৌলবী ও মৌলানার হস্তে। সেকালের এই শিক্ষাব্যবস্থায় রাজা বা রাজপুরুষগণ কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না। এক বৎসরে কোন্ পুস্তকের কতটা পড়াইতে হইবে তাহা অধ্যাপকেরা ও মৌলবীরা নিজেরাই স্থির করিতেন। মাদ্রাসার ও চতুষ্পাঠীর এই স্বাধীনতা ব্রিটিশ আমলে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সরকারী শিক্ষাবিভাগের প্রতিষ্ঠা হইবার পর ঐ বিভাগে উচ্চতম কর্ম্মচারীরা নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন— বিদ্যালয়ের কোন্ শ্রেণীতে কোন্ পুস্তক পড়ান হইবে। বিদ্যালয়ের পরিদর্শকেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন যে, তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে পাঠের ব্যবস্থা হইতেছে কিনা। কিছুদিন এই ব্যবস্থা চলিবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল। এই

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্য ছিল ছাত্রদের বিদ্যা-বুদ্ধির পরীক্ষা গ্রহণ করা। প্রবেশিকা পরীক্ষাই উচ্চশিক্ষার একমাত্র প্রবেশপথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ দেখিলেন যে, ছলে বলে ও কৌশলে যেরূপেই হউক যখন ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ডের অধীন হইয়াছে তখন রাজকার্য্য ও ব্যবসাকার্য্য পরিচালনার জন্য যথেষ্টসংখ্যক ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ করিতেই হইবে। সেকালে খুব উচ্চ বেতন না পাইলে ইংল্যাণ্ড হইতে কোন শিক্ষিত ইংরেজ সন্তান ভারতে আসিতে চাহিত না। এই অসুবিধার একমাত্র প্রতিকার এদেশের লোককে যদি অন্ততঃ সরকারী কার্য্য ও বণিকদিগের কার্য্য চালাইবার জন্য প্রয়োজনমত ইংরাজী শিক্ষা দিতে পারা যায়। সেইরূপই ব্যবস্থা করা হইল। 'গোলদীঘির গোলামখানা' বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর 'গোলাম' প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হইল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত সার্টিফিকেট বা প্রতিষ্ঠাপত্র সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইবার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। বাঙ্গালী বালক ও যুবক ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট সংগ্রহই তাহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিল।

কিন্তু এই উচ্চশিক্ষালাভ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। স্কুল বা কলেজের ছাত্রগণকে প্রতি মাসে যে বেতন দিতে হইত তাহা অনেক সময় দরিদ্র গৃহস্থের ক্ষমতার অতীত হইয়া উঠিল। ইংরেজ সরকার এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়রূপ দোকান খুলিয়া বিদ্যা বিক্রয় করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, সার্টিফিকেট-লোভাতুর পরীক্ষার্থীদিগের নিকট হইতে Examination Fee বা সার্টিফিকেট বিক্রয়ের মাশুল হিসাবে অর্থশোষণ করিতে লাগিলেন। শেষে অবস্থা এমন হইল যে, দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে উচ্চশিক্ষার পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অথচ ব্রিটিশ আমলের পূর্ব্বে চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসার ছাত্রগণ বিনা বেতনে উচ্চশিক্ষা লাভ করিত। শুধু তাহাই নহে, চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ আচার্য্যের গৃহে বাস করিয়া সেখানেই আহারাদি করিত, সেজন্য ছাত্রের অভিভাবকদিগকে ছাত্রদের ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতে হইত না। সে ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে বহন করিতেন চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষেরা এবং পরোক্ষভাবে স্থানীয় ভূস্বামী ও ধনবান। সেকালে ধনবান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ বাটীতে পাঠশালা ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতেন। তাঁহারাই অধ্যাপকগণকে বৃত্তি দিতেন। এখন সেই অধ্যাপক প্রতিপালনের ভার গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই ব্যয়ভার বহনের জন্য ছাত্রের অভিভাবকদিগকে বাধ্য করিয়াছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন হইতে ৫০/৬০ বৎসর পূর্ব্বেও একখানি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত থাকিত। সেকালের সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া 'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা'[১২৯] পর্য্যন্ত এক-এক শ্রেণীতেই দীর্ঘকাল ছাত্রদিগের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেইরূপ প্যারীচরণ সরকারের *First book*[১৩০] ইংরাজী প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যরূপে একই পুস্তক প্রচলিত থাকায় ছাত্রগণকে অর্থাৎ ছাত্রের অভিভাবকদিগকে প্রতি বৎসর নূতন

পুস্তক কিনিবার দায়ে পড়িতে হইত না। জ্যেষ্ঠ সহোদর যে বই স্কুলে পড়িয়াছে কনিষ্ঠও সেই বই স্কুলে পাঠ করিত। এমনকি অনেক সময় পিতা-পুত্র উভয়েই 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী', 'পদ্যপাঠ',[১৩১] 'চারুপাঠ'[১৩২] *First book, Second book*[১৩৩] পাঠ করিবার সুযোগ পাইত। কিন্তু আজকাল আর সে ব্যবস্থা নাই। এখন প্রায় প্রতি বৎসরই নূতন পাঠ্যপুস্তক কিনিতে হয়। যে পাঠ্যপুস্তক বড় ভাই পড়িয়াছে, সে পাঠ্যপুস্তক ছোট ভাইয়ের বেলায় একেবারে অচল। প্রতি বৎসরই নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের জন্য ছাত্রের অভিভাবকদিগকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয়। এই পাঠ্যপুস্তক পরিবর্ত্তনের ফলে পাঠ্যপুস্তকের বাজারেও কিরূপ অসাধুতা প্রবেশ করিয়াছে তাহা আজিকার দিনে বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

আমাদের জাতিভেদ রহস্য

ভারতের হিন্দুসমাজ নানা জাতিতে বিভক্ত। বিদেশীরা আমাদের এই জাতিভেদ দেখিয়া বিস্মিত হয়। তাহারা বুঝিতে পারে না—এক ভাষাভাষী, এক দেশবাসী এবং একই ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যসমাজের মধ্যে এই জাতিগত পার্থক্য কেন? কিরূপে ইহা হইল?

আবার বঙ্গদেশে এই অসংখ্য জাতিভেদ দেখিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরাও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ বাংলার হিন্দুসমাজ যত অধিক সংখ্যক জাতি এবং উপজাতিতে বিভক্ত, বোধ হয় অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ নহে। আমাদের সমাজে এই জাতিগত প্রভেদ এত প্রবল হইল কিরূপে? কতদিন হইতে ইহার সূত্রপাত হয় এবং কেনই বা এই প্রথা নানা শাখা-উপশাখায় বৃদ্ধি পাইল আজ আমরা সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ যে যুগে আর্য্য-সভ্যতা ভারতে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে আপনার মহিমা প্রচার করিতেছিল, সে যুগে সেই আর্য্যসমাজে কোনরূপ জাতিভেদ ছিল না। তখন আর্য্যসমাজভুক্ত যে কোন লোক যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিত। কোন অ-সভ্য সমাজ যখন বুঝিতে পারে যে, কেবল মৃগয়ার দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদি পালন আর সম্ভব হইতেছে না, তখন উক্ত সমাজ মৃগয়ার অতিরিক্ত অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বনে সচেষ্ট হয়। এই চেষ্টার ফলে কৃষিকার্য্যের দিকে এবং পশুপালনের দিকে লোকের-দৃষ্টি পতিত হয়। ফলে মৃগয়া ত রহিলই, তাহার উপর কৃষিকার্য্য ও পশুপালনে লোক অগ্রসর হইল। কিন্তু এই দুই নূতন বৃত্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না। বন্য পশু ও আদিম জাতির আক্রমণে এই কৃষিকার্য্য এবং পশুপালন অনেক সময়ে ব্যাহত হইতে লাগিল। তখন এই আঘাত হইতে পরিত্রাণের জন্য নূতন বৃত্তিদ্বয়কে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইল; ফলে এক শ্রেণীর লোক বাহুবল, অস্ত্রবল এবং বুদ্ধিবলের দ্বারা এই নূতন বিপদ দূর করিবার জন্য নিযুক্ত হইল। সমাজে তখন জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন তত অনুভূত হয় নাই, সুতরাং অনুমান করা যায় যে, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় বর্ণ সভ্যতাশৃঙ্গের আরোহণে প্রথম পথিপ্রদর্শক হইয়াছিল। যাহারা পশুপালন

এবং কৃষিকার্য্য করিত তাহারা আর্য্যসমাজে 'বৈশ্য' নামে এবং যাহারা উপদ্রব নিবারণের জন্য ব্যাপৃত ছিল তাহারা 'ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত হইল।

ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবলে রক্ষিত সমাজ এইরূপে যখন শান্তিসুখ ভোগ করিতে লাগিল তখন সেই সমাজের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান ছিলেন তাঁহারা জ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। কারণ তাঁহারা দেখিলেন যে, কেবল বাহুবল বা পশুবলের দ্বারা কোন সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। সমাজের উন্নতির জন্য বুদ্ধিবলের আবশ্যক। আবার জ্ঞানচর্চ্চা না হইলে বুদ্ধিবলও সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। আবার অপর দিকে বাহুবলশালী একদল লোক না থাকিলে সমাজের সেবা হয় না। যাহারা এইরূপে কেবল শারীরিক শক্তির দ্বারা সমাজসেবায় নিযুক্ত হইল, তাহারা সমাজের সেবক বা দাস বলিয়া অভিহিত হইল। এই দাস শ্রেণীর অধিকাংশই অনার্য্য জাতি হইতে গৃহীত হইল। যে সকল অনার্য্য আর্য্যদিগের সংস্রবে আসিয়াছিল, তাহারা আর্য্যদিগের অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্রকায় ছিল। সেইজন্য তাহারা 'ক্ষুদ্র' বলিয়া কথিত হইত। এই ক্ষুদ্র শব্দ কালসহকারে 'শূদ্র' শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এইরূপে ভারতীয় আর্য্যসমাজে চারিটি পৃথক বর্ণের সৃষ্টি হইল। বাহুবল অপেক্ষা বুদ্ধিবল শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য বুদ্ধিজীবীরা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। সমাজ তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত হইল। কিন্তু তখন এমন কোন নিয়ম ছিল না যে, ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে বা ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের পুত্র হইলে তাহাকে ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য হইতে হইবে। তখন জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা লোকের বর্ণ নির্দ্ধারিত হইত। গীতাতেও আমরা দেখিতে পাই যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারাই আর্য্যসমাজ চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল; বর্ত্তমান কালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেরূপ জ্ঞান ও বিদ্যার পরিমাণ অনুসারে কাহাকেও বি-এ কাহাকেও এম-এ প্রভৃতি উপাধি প্রদান করে, কিন্তু বি-এ উপাধিধারীর পুত্রকে বি-এ বলিয়া বা এম-এ উপাধিধারীর পুত্রকে এম-এ বলিয়া অভিহিত করে না। সেকালের প্রাচীন আর্য্যসমাজেও বর্ণাশ্রমিগণ পৈত্রিক মর্য্যাদা পাইত না। সকলেই নিজের জ্ঞান ও বৃত্তি অনুসারে চতুর্বর্ণের অন্তর্গত হইত। ক্রমে ক্রমে এই বর্ণ বংশগত হইল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্রের পুত্রেরা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইল।

আর্য্যসমাজ চারি বর্ণে বিভক্ত হইবার পরে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সময় সময় বিবাদ-বিসংবাদ হইত এমনকি যুদ্ধবিগ্রহও হইত। ব্রাহ্মণ পরশুরাম কর্ত্তৃক এক সময় ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছিল তাহা রামায়ণের পাঠকগণ অবগত আছেন। এই বিবাদের ফলে শেষে বোধ হয় এরূপ একটা মীমাংসা হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণগণ ভোগস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাজ হইতে দূরে অবস্থান করিবেন এবং সমাজের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিবেন। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যশাসন করিবেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করিবেন। সে সময় বোধ হয় এই চতুর্বর্ণের ব্যবস্থা বংশগত হইয়া পড়িয়াছিল—কেননা আমরা

মহাভারতে দেখিতে পাই যে, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণসমাজভুক্তই ছিলেন।

এই চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজব্যবস্থা বুদ্ধদেবের সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেবই প্রথমে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—তিনি সমাজের এই বর্ণভেদ স্বীকার করিলেন না। তাঁহার মতে সকল মানুষই সমান। বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম যে কোন ব্যক্তি গ্রহণ করিলেই বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। এই বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে পূর্ব্ব-ভারত অর্থাৎ বর্ত্তমান বঙ্গদেশ, বিহার, আসাম, নেপাল, ভূটান এবং সিকিম প্রভৃতি দেশও প্লাবিত হইয়া গেল। আমাদের বঙ্গদেশে মাত্র কয়েক শত ঘর ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, কুলাচার্য্যদিগের মতে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের চর্চ্চা না থাকায় তাঁহারা নামেই ব্রাহ্মণ রহিলেন, বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি ও কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বঙ্গদেশে এই বৌদ্ধ-প্লাবন সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অব্যাহত ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধসমাজে জাতিভেদ ছিল না, এখনও নাই। সেইজন্য বৌদ্ধযুগে সর্ব্বত্র আন্তঃবিবাহ বিশেষ প্রবল ছিল। পাত্র বা কন্যা যে বর্ণেরই হউক না কেন, তাহাদের বিবাহে কোন বাধানিষেধ ছিল না; ফলে বঙ্গদেশে বহু বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছিল। এক-দেশবাসী, এক-ভাষাভাষী এবং এক-ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে সমাজে উচ্চনীচ ভেদবৈষম্য ছিল না। প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাংলার হিন্দু রাজা আদিশূর বঙ্গদেশে পুনরায় বর্ণাশ্রমাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ-প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাহার কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ-ভারতে শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যুক্তিবলে বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে পরাস্ত করায় তথায় পুনরায় বৈদিকধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যকে বিশেষ বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশের অবস্থা সেরূপ ছিল না। বঙ্গের পালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধ ছিলেন। সেনবংশীয় নৃপতিদিগের মধ্যেও অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন। বঙ্গদেশে আদিশূর বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রচারের জন্য বাহুবলের আশ্রয় লইতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল বীরসেন। বাহুবলে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করায় তিনি 'আদিশূর' এই গৌরবজনক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তদবধি ইতিহাসে তিনি আদিশূর নামেই পরিচিত।

আদিশূর অপুত্রক ছিলেন। সেইজন্য তিনি পুত্রলাভের আশায় বেদোক্ত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সে সময় বঙ্গদেশে যে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাহার মধ্যে কেহই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা যজ্ঞাদিতে অভিজ্ঞ ছিলেন না। তখন আদিশূর অনুপায় হইয়া তাঁহার আত্মীয় কান্যকুব্জের অধীশ্বরকে পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। আত্মীয়ের অনুরোধে কান্যকুব্জের রাজা পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে বাংলায় পাঠাইয়া দেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ আদিশূর ঐ পঞ্চব্রাহ্মণকে বরেন্দ্রভূমিতে বাস করাইয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমিতে তাঁহারা বিবাহাদি করিয়া বাস করিতে

লাগিলেন। ওদিকে কান্যকুব্জেও ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের যে সকল সন্তানাদি ছিলেন, তাঁহারাও পিতৃগণের কোনও সংবাদ না পাইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আদিশূর তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া সসম্মানে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য রাঢ়দেশে বাস করাইলেন। এই রাঢ়দেশবাসী পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরগণ রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। এই আদি পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত পাঁচ জন কায়স্থ-সন্তানও কান্যকুব্জ হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বঙ্গদেশে ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ও দত্ত উপাধিধারী কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষেরাও বাংলার আদি অধিবাসী নহেন।

যাহা হউক, বাংলায় বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়ায় বাংলার বৌদ্ধসমাজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। তখন সকলেই হিন্দুসমাজভুক্ত হইল। কিন্তু একটা বিষয়ে গোল বাধিল। তাহারা হিন্দুসমাজে কোন্ বর্ণের অন্তর্গত হইবে? বৌদ্ধ যুগে চতুর্বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক কার্য্যের দ্বারা বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় ইহাদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিবার সময় যাহাদের শরীরে শূদ্রশোণিত ছিল না তাহারা নবশাখ বা সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইল। আর যাহাদের শরীরে শূদ্রশোণিত ছিল, তাহারা নবশাখশ্রেণীভুক্ত শূদ্র অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত হইল। সদ্‌ব্রাহ্মণগণ তাহাদের পৌরোহিত্য করিতে বা তাহাদের দান গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন যে সকল ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া বা দারিদ্র্যবশতঃ ঐ নিম্নস্তরস্থ শূদ্রের যজন, যাজন বা দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণের বংশধরগণ বর্ত্তমান কালে বাংলার ব্রাহ্মণসমাজে 'বর্ণের ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত।

আমার বন্ধু ও সহকর্ম্মী পরলোকগত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনাদের বাংলায় শুনিতে পাই, বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। কুলীন বা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ত দূরের কথা তাঁহাদের অন্ন পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না ইহার কারণ কি?" উত্তরে আমি বলিলাম, তাঁহারা নবশাখ শ্রেণীভুক্ত শূদ্র অপেক্ষাও নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত শূদ্রদের যজন-যাজনে বা দানগ্রহণে ব্রাহ্মণসমাজে পতিত হইয়াছেন। উত্তরে সখারামবাবু বলিলেন, "বেশ কথা, কিন্তু মনে করুন, নিম্নশ্রেণীভুক্ত একজন শূদ্র কোন পাপকার্য্য করিয়াছে। সে স্মার্ত্তপণ্ডিতের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইল যে, তাহাকে আশি কাহন কড়ি উৎসর্গ করিতে হইবে এবং বারটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। কিন্তু কোনও সদ্‌ব্রাহ্মণ যদি তাহার দান গ্রহণ না করেন, বা সে নিম্নবর্ণীয় বলিয়া তাহার বাড়ীতে ভোজন না করেন, তাহা হইলে ত সে বেচারার প্রায়শ্চিত্ত করাই হয় না। ঐ প্রায়শ্চিত্ত না করার দরুন যে পাপ, সে পাপের ভার কাহার স্কন্ধে অর্পিত হইবে?" বলা বাহুল্য, সখারামবাবুর এই যুক্তি আমি খণ্ডন করিতে পারি নাই। এস্থলে আর একটি কথাও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মনে করুন, একজন ব্রাহ্মণ গৃহনির্ম্মাণের জন্য রাজমিস্ত্রি লাগাইলেন। তখন একজন নবশাখ সেই মিস্ত্রিকে নিজের বাড়ীতে কাজ করিতে বলিলে সেই মিস্ত্রিও ত উত্তর দিতে পারে যে, "আমি ব্রাহ্মণের

মিস্ত্রি, নবশাখের মিস্ত্রি নই।" ঐরূপ একজন সূত্রধরও ত বলিতে পারে, "আমি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সূত্রধর, আপনি সুবর্ণবণিক, আমি আপনার বাড়ীতে কাজ করিলে আমার জাতি যাইবে, আমাকে আমার স্বসমাজে পতিত হইতে হইবে।" এইরূপ একজন নাপিত বা রজক কোন নির্দ্দিষ্ট জাতিকে ক্ষৌরকার্য্য করিবার জন্য বা বস্ত্র ধৌত করিবার নিমিত্ত যদি স্বসমাজে পতিত হয়, তাহা হইলে দেশের অবস্থাটা কিরূপ হইবে? এইরূপ যদি কর্ম্মকার, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি শিল্পীরা অবাধে সকল জাতির কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণরাই বা কেন সকল জাতির যজন-যাজন করিয়া ব্রাহ্মণসমাজ কর্ত্তৃক জাতিচ্যুত হইবেন? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর পুত্রের সহিত নিজের একটি কন্যার বিবাহ[১৩৪] দিয়াছিলেন। বিহারীলাল সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি এই বিবাহের কথা শুনিয়া একদিন রবীন্দ্রনাথকে বলিলাম, "আপনি বেনের বামুনের সহিত কুটুম্বিতা করিলেন, ইহাতে আপনাকে সামাজিক মর্য্যাদায় ছোট হইতে হইল না?" হাসিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি ত জান আমরা পিরালী, আমার মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমার জামাতার জাতি গেল, না, সোনার বেনের বামুনের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়া আমার জাতি গেল?" অর্থাৎ তাঁহার বক্তব্য এই, ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে এই যে শাখা-উপশাখা, জাতি-উপজাতি প্রভৃতি রহিয়াছে, ইহার কোন অর্থ হয় কি?

ফলতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গদেশ বৌদ্ধ-প্লাবন হইতে আবার বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে নানা জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এই সকল জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে বৌদ্ধমতে বিবাহের ফলে যে সঙ্করজাতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহারাই হিন্দুসমাজে নবশাখ বা সৎশূদ্র রূপে পরিগণিত হইল। আর যে সকল সঙ্করজাতির শরীরে অনার্য্য বা শূদ্রের রক্ত ছিল, তাহারা নিম্নশ্রেণীর শূদ্র বলিয়া গণ্য হইল। ইহারাই বর্ত্তমান কালে 'তপশীলী জাতি' বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে এইরূপ যে সঙ্করজাতি শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে বিবাহিত দম্পতির বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা সমাজে পতিত হয় নাই। এদেশে এরূপ একটা জনপ্রবাদ আছে যে, ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার গর্ভজাত সন্তানেরাই 'বৈদ্য-জাতি' বলিয়া পরিগণিত। তবে তাহাদের উদ্ভবকাল বৌদ্ধ-প্লাবনের পূর্ব্বে এবং তাহাদের আদি জনকজননী হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহিত হইয়াছিলেন। তখন সমাজে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। সেইজন্য বৈদ্যেরা দ্বিজ-মর্য্যাদার চিহ্নস্বরূপ উপবীত-ধারণের অধিকারী। এইরূপ বিবাহ সমাজে পূর্ব্বে অনেক ঘটিত। আরও পূর্ব্বকালে অনুলোম বিবাহজাত সন্তানেরা পিতৃমর্য্যাদা বা পিতার জাতি প্রাপ্ত হইতেন। মহর্ষি বেদব্যাসের জননী মৎস্যগন্ধা শূদ্রজাতীয়া। কিন্তু বেদব্যাস শুধু যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি মহর্ষিও হইয়াছিলেন।

কিন্তু বৌদ্ধ যুগে যখন সকলেই একজাতি হইল, দ্বিজে ও অ-দ্বিজে কোন প্রভেদ

রহিল না, তখন পরস্পরের বিবাহে উৎপন্ন সন্তান সকলেই একজাতি হইয়া গেল। পুরাণে উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয়া জননীর গর্ভে তন্তুবায় এবং কুম্ভকারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আদিপুরুষের বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে না হইয়া বৌদ্ধমতে হইয়াছিল। সেকালের সমাজব্যবস্থায় দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রথম, ক্ষত্রিয় দ্বিতীয় এবং বৈশ্য তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াও সমাজে শূদ্রশ্রেণীতে পরিণত হয় নাই। ইহার কারণ কি? অথচ আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়র সম্মিলনে উৎপন্ন তন্তুবায় এবং কুম্ভকারগণ নবশাখ বা সৎশূদ্র রূপে গণ্য হইয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বৈদ্যদের আদিপুরুষের বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদন অনুসারে হইয়াছিল, আর নবশাখগণের আদিপুরুষের বিবাহ বৌদ্ধমতে হইয়াছিল। সেই জন্যই নবশাখেরা শূদ্র হইল।

এই নবশাখগণ প্রথমে নয়টি শাখায় বিভক্ত ছিল, যথা—

তিলি, মালী, তাম্বুলী,
কামার, কুমার, পুটুলী,
গোপ, নাপিত, গোছালী।

এই শ্লোকে 'পুটুলী' বলিয়া যাহাদিগকে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা বণিক এবং 'গোছালী'গণ বর্ত্তমান বারুজীবী বা বারুই। কিছুদিন পরে এই বণিক-জাতি আবার চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। যথা—(১) গন্ধবণিক, (২) সুবর্ণবণিক, (৩) কাংস্যবণিক এবং (৪) শঙ্খবণিক।

প্রথমে এই বণিকগণ নবশাখ, সুতরাং সৎশূদ্র বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজা বল্লালসেনের কোপে পড়িয়া সুবর্ণবণিকগণ সমাজে পতিত হইল। তাহাদের যজন-যাজনের জন্য একশ্রেণীর ব্রাহ্মণও 'বর্ণের ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ বেনের বামুন বলিয়া গণ্য হইলেন। কিন্তু গন্ধবণিক, কাংস্যবণিক বা কাঁসারি এবং শঙ্খবণিক বা শাঁখারি পূর্ব্ববৎ নবশাখই বনিয়া গেল। সদ্‌ব্রাহ্মণেরাই তাহাদের যজন-যাজন করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধদেবের পর বোধ হয় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গই জাতিভেদ অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতানুবর্ত্তীরা ও তাঁহার ভক্তগণ সমাজে 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হইল। নিম্নশ্রেণীস্থ শূদ্রগণও অবাধে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমাদের পল্লীতে কৈলাস নামে একজন কর্ম্মকার বাস করিত। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে কৈলাস বা তাহার পরিবারবর্গ উঠানের একপার্শ্বে বসিয়া ভোজন করিত। কিছুদিন পরে কৈলাস সপরিবারে 'ভেক' লইয়া বৈষ্ণব হইল। মাংস-ভোজন ত্যাগ করিল। আমাদের পাড়ায় আরও দুই-তিন ঘর বৈষ্ণবের বাস ছিল এবং এখনও আছে। কৈলাস মুচি যখন উঠানে বসিয়া খাইত, তখন অন্যান্য বৈষ্ণবগণ রোয়াকের উপর বসিয়া খাইত। কৈলাস 'ভেক' লইয়া বৈষ্ণব হইল এবং উঠান হইতে রোয়াকে তাহার প্রমোশন হইল। অন্যান্য বৈষ্ণবগণের তাহাতে কোন আপত্তি দেখা যায় নাই। গৌরাঙ্গের প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম জাতিভেদের মূলোৎপাটন করিতে গিয়া এক নূতন 'বৈষ্ণব' জাতির সৃষ্টি করিল। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

আর একটি নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। তিনি যখন সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, মধুসূদন নামক একজন নাপিত তাঁহার ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করে। মস্তকমুণ্ডনের পর সেই নাপিত মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভো, আমি আপনার মস্তক স্পর্শ করিয়াছি। যে হাতে আপনার মস্তক স্পর্শ করিয়াছি, আশীর্ব্বাদ করুন সেই হাতে যেন অপর কাহারও চরণ স্পর্শ করিয়া পদাঙ্গুলির নখ ছেদন করিতে না হয়।" উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমার নাম মধু, তোমার ভক্তিও সেইরূপ মধুর। তোমার মিষ্ট কথায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এবং তোমার আত্মীয়কুটুম্বগণ মিষ্টান্নের ব্যবসা কর, তোমাদের বংশধরগণ সমাজে 'মধুনাপিত' বলিয়া পরিচিত হইবে।" এই মধুনাপিতগণই বর্ত্তমানকালে 'মোদক' বা 'ময়রা' নামে পরিচিত।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়া সকল অনুবর্ত্তীকেই একজাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। ইঁহারা সাধারণতঃ 'ব্রাহ্ম' বলিয়া পরিচিত। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মে জাতিভেদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা ছিল না। কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ও নববিধান সমাজে জাতিভেদ নাই। গুরুগোবিন্দের প্রচারিত 'শিখধর্ম্মে' বা দয়ানন্দ সরস্বতী প্রচারিত 'আর্য্যসমাজে'ও[১৩৫] জাতিভেদ নাই। আর্য্যসমাজে অনেক মুসলমান, খ্রীষ্টান, এমনকি শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়াছে। শিখসমাজেও মুসলমান-বংশধরের অভাব নাই। তবে বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ সমগ্র পূর্ব্ব-ভারতকে এক সময়ে গ্রাস করিয়াছিল, শিখ, ব্রাহ্ম বা আর্য্যসমাজ সেরূপ করিতে পারে নাই। শিখগণ পাঞ্জাব প্রদেশে এবং আর্য্যসমাজীরা পশ্চিম ভারতের কিয়দংশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ব্রাহ্মগণের প্রভাবও বঙ্গদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে—পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। সনাতন হিন্দুসমাজের অন্তর্গত থাকিয়াও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেরই অন্য জাতির অন্নগ্রহণে, এমনকি অন্য জাতির সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে আর আপত্তি দেখা যায় না। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করেন লোকেরা তাহারই অনুবর্ত্তন করে। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তিরাই আমাদের সমাজে আদর্শ বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকেন। এই শিক্ষিত-সমাজে যেরূপ আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদ, পান-আহার প্রচলিত আছে, তাহাই ধীরে ধীরে সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ ও বিস্তারলাভ করিতেছে। সুতরাং কিছুদিন পরে রাজধানী ও নগরীর এই সভ্যতা সুদূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামে প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর কোন শক্তিই ইহাতে বাধা দিতে পারে না এবং পারিবেও না। মুসলমান শাসনকালে ভারতের শ্রেষ্ঠ সমাজে মুসলমানী আদবকায়দা, বেশভূষা এবং ভাষা প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাহার পর ইংরেজ আমলেও ইউরোপীয় আচার-ব্যবহার বেশভূষা এবং 'এটিকেট' বাংলার শিক্ষিতসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা একেবারে নির্ম্মূল হইবে না,

কতকটা থাকিয়া যাইবে। তবে আশার কথা এই যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ায় আর কোনও বিদেশীয় জাতি মুসলমান বা ইংরেজের ন্যায় ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। শিক্ষিত ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মনে আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী জাতি নিজ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর বাঙ্গালীর এই আত্মমর্য্যাদাবোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা।

আমাদের সাহিত্য (১)

সাহিত্য শব্দটা 'সহিত' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সাহিত্যের ভাব 'সাহিত্য', সহিত শব্দের অর্থ সঙ্গ। 'হরি রামের সঙ্গে যাইতেছে' আর 'হরি রামের সহিত যাইতেছে', এই দুটি বাক্যই একার্থবাচক। যাহা আমাদের সমাজে, আমাদের জীবনে বা আমাদের ধর্ম্মের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত তাহাই আমাদের সাহিত্য। আমাদের সমাজের বা জীবনের চিত্র দুই প্রকারে প্রকাশ করিতে পারা যায়। এই দুই প্রকার হইতেছে—'চিত্রশিল্প' এবং 'ভাষাশিল্প'। চিত্রশিল্পের সাহায্যে শিল্পীরা সমাজের, ব্যক্তির বা ঘটনাবিশেষের বাহ্যরূপ প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু চিত্রের দ্বারা অন্তরের রূপ প্রকাশ করিতে পারা যায় না। অন্তরের রূপ প্রকাশ করিতে হইলে ভাষার সাহায্য লইতে হয়।

একজন সুদক্ষ চিত্রকর তুলিকার সাহায্যে কোন ব্যক্তির ক্রোধ, হিংসা, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি চিত্রের চোখে, মুখে ও ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু সেই ক্রুদ্ধ বা দয়াবান ব্যক্তির অন্তরে কোন ক্রোধ অথবা দয়ার উদ্রেক হইল, তাহা ভাষার সাহায্য ব্যতীত প্রকাশ করিতে পারা যায় না। চিত্রের মুখের ভঙ্গী দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, চিত্রাঙ্কিত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ক্রোধের কারণ কি তাহা ভাষায় ব্যক্ত না করিলে বুঝিতে পারা যায় না।

পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজেই সেইজন্য ভাষা-সাহিত্য সমাদৃত হইয়া থাকে। আমরা রামায়ণ পড়িয়া বুঝিতে পারি—রামায়ণের যুগে সমাজ কিরূপ ছিল। রাজারা কিরূপে রাজ্যশাসন ও পালন করিতেন, প্রজারা কেন রাজাকে নররূপী দেবতা বলিয়া ভক্তি করিত, আবার অনেক সময় সেই নররূপী দেবতারা সন্তানবৎ স্নেহাস্পদ প্রজাদের দ্বারা কেন সিংহাসনচ্যুত, এমনকি নিহত পর্য্যন্ত হইয়াছেন, তাহা তৎকালীন ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি। তুলিকা ও রঙের সাহায্যে সে কারণ প্রকাশ করা যায় না। যে গ্রন্থে সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, গার্হস্থ্যনীতি প্রভৃতি এককালীন বহুলাংশে বর্ণিত আছে, সেই সব গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই সকল গ্রন্থকার মহাকবিরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়া থাকেন। বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, শেক্সপীয়র, মিল্টন এবং রবীন্দ্রনাথ এইজন্যই মহাকবি রূপে গণনীয় হইয়াছেন।

আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের নাম দিয়াছি, 'আমাদের সাহিত্য'। অর্থাৎ আমি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মনোভাব পাঠকবর্গকে জানাইতে ইচ্ছা করি। আমার মনে

আজকাল মধ্যে মধ্যে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমাদের বাংলা সাহিত্যের গতি বর্ত্তমান কালে 'ঊর্দ্ধমুখী' না 'নিম্নমুখী'। আমাদের কৈশোরে এবং যৌবনকালে আমরা যে সকল পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় এখনকার ঐ শ্রেণীর পুস্তক আমার মতে যথেষ্ট অবনত হইয়াছে। অবশ্য আমি সকল পাঠ্যপুস্তককেই অবনত শ্রেণীতে ফেলিতেছি না। মধ্যে মধ্যে এমন দুই-চারিখানি পাঠ্যপুস্তক আমার দৃষ্টিগোচর হয়, যাহা পাঠে ছাত্রগণ প্রকৃত উপকারলাভে সমর্থ হইতে পারে। আমি বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেকালের অর্থাৎ ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বেকার লেখকেরা ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিতেন, বর্ত্তমান কালের পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতারা সেরূপ দৃষ্টি রাখেন না। হয়ত সেরূপ দৃষ্টি দিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন পুস্তকের নাম উল্লেখ না করিয়া মাত্র কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করিতেছি। অনেক পাঠ্যপুস্তকে দেখিয়াছি, গ্রন্থকার অকারণে বহুবচনে বাহুল্য দেখাইয়া থাকেন। অনেকে বহুবচনবোধক পদ বিশিষ্ট শব্দের পূর্ব্বে এবং পরে একসঙ্গেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'ঐসকল বালকগণ', 'এই সমস্ত বক্তারা' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ বা লেখেন, 'বালকগণেরা'। সংস্কৃত এবং ইংরাজীতে এইরূপ double plural অবশ্য ব্যবহার্য। ব্যবহার না করিলে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। ইংরাজীতে 'all those boys' বা সংস্কৃতে 'তে দ্বৌ নরৌ' না লিখিয়া this boys বা সঃ দ্বৌ নরঃ লিখিলে ব্যাকরণ শুদ্ধ হয় না। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে সে নিয়ম নহে। সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী বা মাতামহী হইলেও উহা সংস্কৃত হইতে পৃথক। এই পার্থক্য কিছুতেই লঙ্ঘন করা উচিত নহে।

লেখকদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, খাঁটি বাংলা শব্দে ব্যাকরণে সন্ধি হয় না। সন্ধিটা সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই হইয়া থাকে। সংস্কৃত দুইটা শব্দ পাশাপাশি থাকিলে তাহাদের মধ্যে সন্ধি হইতে পারে, যথা—রাম + অভিধান = রামাভিধান, কিন্তু বাংলা ভাষায় পাকা + আমড়া সন্ধি করিয়া 'পাকামড়া' হয় না। একটা বাংলা বা সংস্কৃত শব্দের সহিত কোন বিদেশীয় শব্দেরও সন্ধি হয় না। তবে বর্ত্তমান বাংলা ভাষায় এরূপ সঙ্কর সন্ধি দু'একটা হইয়াছে। যথা : 'ইংল্যাণ্ডেশ্বর'। তবে 'ইংল্যাণ্ড' শব্দটা দেশের নাম বলিয়া এবং উহা আকারান্ত বলিয়া এই সন্ধি চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু রুশিয়া + ঈশ্বর = 'রুশিয়েশ্বর' অথবা জার্ম্মানী + ঈশ্বর = 'জার্ম্মানীশ্বর'—বাংলা ভাষায় এরূপ ব্যবহার হয় না। আমরা বাল্যকালে যখন প্রথম বাংলা ব্যাকরণে সন্ধিসূত্র পাঠ করিয়াছিলাম, তখন আমরা কৌতূহলবশে ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার জন্য বলিতাম, 'এ বৎসর যদ্যপ্যাটচালা (যদ্যপি + আটচালা) করিতে নাও পার, তথাপ্যেকচালা (তথাপি + একচালা) খানা করিতেই হইবে। দুঃখের বিষয় এরূপ অদ্ভুত সন্ধি অনেক সময় আজকাল আমার নয়নগোচর হয়। আর একটা ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ আজকাল অনেক পুস্তকে ও সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, অনেকে লিখেন, 'আবশ্যকীয়'। তাঁহারা মনে করেন যে, 'প্রয়োজন' হইতে যখন 'প্রয়োজনীয়' হয়, তখন 'আবশ্যক' হইতে 'আবশ্যকীয়' হইবে না কেন? তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, 'প্রয়োজন' শব্দ বিশেষ্য,

উহা হইতে বিশেষণ হইয়াছে 'প্রয়োজনীয়'। কিন্তু 'আবশ্যক' শব্দ বিশেষ্য নহে, বিশেষণ। উহা 'অবশ্য' হইতে হইয়াছে। একটা বিশেষ্যকে উপর্য্যুপরি দুইবার বিশেষণ করা অসঙ্গত। ইংরাজী 'use' হইতে বিশেষণ হইয়াছে 'useful'। কিন্তু 'আবশ্যকীয়' শব্দকে ইংরাজী করিতে হইলে লিখিতে হয় 'usefulable'।

ব্যাকরণ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়া ব্যাকরণের পালা শেষ করিব। আজকাল অনেক লেখকের লেখায় দেখিতে পাই, তাঁহারা লেখেন, 'না বলিয়া পারি না', 'না দেখিয়া পারি না'। এইরূপ অসমাপিকা 'বলিয়া'-র পর 'পারি না' লিখিলে তাহার কোন অর্থ হয় কি? ইংরাজীতে হয়ত এরূপ লেখা চলে। 'I could not but hear' ইংরাজী ভাষার ভঙ্গী। বাংলায় উহা চলে না। 'না বলিয়া যাইতে পারি না', 'না দেখিয়া খাইতে পারি না'—এইরূপ লেখা উচিত। তাহা না লিখিলে ব্যাকরণে নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনেক খ্যাতনামা লেখকও এইরূপ ব্যাকরণদুষ্ট বাক্য লিখিয়া থাকেন। একটু সাবধান হইয়া লিখিলে ভাষার এই অশুদ্ধতা অনায়াসে দূর করিতে পারা যায়।

অনেক দিন পূর্ব্বে আমি যখন 'হিতবাদী'র সেবায় নিযুক্ত ছিলাম তখন একজন খ্যাতনামা গ্রন্থকারের পুস্তকে দেখিয়াছিলাম, 'বদান্যবতী মহিলা'। এই লেখক বাংলা সাহিত্য চর্চ্চার জন্য 'রায়সাহেব' উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তিনি উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলা ভাষার পরীক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় এই লেখকের ধারণা ছিল যে, যদি 'লাবণ্যবতী' শব্দ চলে তবে 'বদান্যবতী' চলিবে না কেন? 'লাবণ্য' শব্দ বিশেষ্য আর 'বদান্য' শব্দ বিশেষণ। 'জ্ঞানবান ব্যক্তি' বলা চলে, কিন্তু 'জ্ঞানীবান' লেখা চলে কি? আর একজন বিখ্যাত লেখকের কথা বলি ইনিও সাহিত্যচর্চ্চার জন্য সরকারের নিকট হইতে 'রায়বাহাদুর' উপাধি পাইয়ছিলেন। তাঁহার লেখা একখানি পুস্তকে দেখিয়াছিলাম, 'ভগবতী কালীর বরাভয়প্রদ হাতখানি'। আমরা সকলেই জানি 'খানি' 'খানা' শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হয়। কালী চতুর্ভুজা, তাঁহার উপরের দুই হস্তের একটিতে 'অসি' একটিতে 'অভয়'। আর নীচের দুই হস্তের একটিতে 'নরমুণ্ড', আর একটিতে 'বর'। অভয় দিবার সময় হাত তুলিয়া হাতের তালু দেখাইতে হয়। কিন্তু বর দিবার সময় বা আশীর্ব্বাদ করিবার সময় হাত নীচু করিয়া এবং সেই হস্তের তালু নিম্নে রাখিয়া বর দিতে হয়। সুতরাং একখানি হাত একই সময়ে 'বর' এবং 'অভয়' দিতে পারে না। এই দুইজন গ্রন্থকারই অধুনা-পরলোকগত। আমার বক্তব্য এই যে, যে সকল খ্যাতিমান লেখকের পুস্তক ছাত্রদিগের পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাঁহারা ছাত্রদের উপকার করিয়াছেন, কি অপকার করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

অলঙ্কারশাস্ত্রে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' একটা গুরুতর দোষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 'গুরুচণ্ডালী' অর্থে বিশুদ্ধ সাধুভাষার সহিত কথিত প্রাকৃত ভাষা যোগ করিয়া একটি বাক্য গঠন করা। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন আমাদের শিক্ষক মহাশয় এই দোষের যে উপমা আমাদিগকে দিয়াছিলেন তাহা আমার এখনও মনে আছে। তিনি

বলিয়াছিলেন, ''রুদ্ধশ্বাসে ধাবমান মহেশচন্দ্র সহসা পদস্খলিত হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ধপাৎ কোরে পোড়ে গিয়ে কাদায় মাখামাখি হোলো''। এই বিশুদ্ধ ভাষার সহিত কথিত ভাষার সংযোগ 'গুরুচণ্ডালী' বলিয়া অভিহিত হয়। নাটক বা উপন্যাসে ব্যক্তিবিশেষের কথোপকথনে এইরূপ ভাষা মার্জ্জনীয় হইতে পারে। কিন্তু লেখক যেখানে সাধুভাষায় লেখনী-মুখে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, সেখানে কিছুতেই 'গুরুচণ্ডালী'' দোষ থাকা সমীচীন নহে। যে যেরূপ স্তরের লোক, তাহার মুখ সেই স্তরের ভাষাই শোভনীয়। বহুকাল পূর্ব্বে আমি একখানি নাটক পড়িয়াছিলাম, রাণী তাঁহার দাসীকে আহ্বান করিল—দাসী রাণীর সম্মুখে গিয়া করজোড়ে বলিল, 'অয়ি ভর্ত্তৃদারিকে, দাসী উপস্থিতা'। আর এক স্থলে রাজার গুরু রাজার নিকট কোন বহু-সন্তানবতী মহিলার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, 'মাগীর একপাল ছেলে দেখে মনে হয়—মাগীর যেন ছারপোকার বিয়ান'। দাসীর মুখের ভাষা এবং রাজগুরুর মুখের ভাষার এই পার্থক্য দেখিয়া লেখকের বিচারশক্তির প্রশংসা করিতে হয় কি? কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল অনেক পুস্তকেই এইরূপ অদ্ভুত বিচারশক্তির পরিচয় পাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার শিশু পৌত্রদের জন্য একখানি শিশুপাঠ্য ছবির বই কিনিয়াছিলাম। সেই পুস্তকে গল্পে দেখিলাম, লেখক ভূতের রূপবর্ণনাকালে বলিতেছেন ''ভূতের গায়ের রং যেন ধানসেদ্ধ হাঁড়ি—''। লেখকের বক্তব্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু 'হাঁড়ির তলা' না বলিয়া তিনি যে শব্দটা ব্যবহার করিয়াছেন, সেরূপ শব্দ কোন বালক-বালিকার মুখে শুনিলে তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে কঠোর শাসন করিয়া বলিয়া থাকেন, 'ও কথা মুখে আনিতে নাই। ওরূপ অশ্লীল শব্দ ইতর লোকের মুখে শুনা যায়, খবরদার ওকথা মুখে আনিতে নাই।'

আজকাল গুরুচণ্ডালী দোষের এতই বাহুল্য হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, এদিকে কোন কোন লেখকের দৃষ্টির বড়ই অভাব। আমি আজই প্রাতঃকালে একখানি শিশুপাঠ্যপুস্তক পড়িতেছিলাম। সেই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, লেখক 'সত্য'র পরিবর্ত্তে 'সত্যি', 'মিথ্যা'র পরিবর্ত্তে 'মিথ্যে' 'বাহির'এর পরিবর্ত্তে 'বাইরে', 'ভিতর'এর পরিবর্ত্তে 'ভেতরে' এইরূপ অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য গল্পে বর্ণিত কোন লোকের মুখে এরূপ ভাষা চলিতে পারে, কিন্তু পুস্তকের বিজ্ঞাপনে কেন? বালক-বালিকাদিগকে এইরূপ ভাষা শিখাইলে কি তাহাদের ভাষাজ্ঞানের সাহায্য করা হয়? আমি অবশ্য একথা বলি না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস'এ লিখিত ''এই গিরির শিখরদেশ সতত সঞ্চরমান নবজলধরপটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত হইয়া আছে'' চালু হউক। এককালে এইরূপ সংস্কৃতবহুল, সমাস-সন্ধিতে সমাকীর্ণ ভাষার আদর ছিল। হয়ত কতকটা প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগ বহুকাল হইল অতীতের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম-যুগের প্রথম অবস্থায়ও কিছুকাল এইরূপ ভাষার প্রভাব ছিল। বঙ্কিমবাবুর রচিত প্রথমকালের পুস্তকগুলির সহিত তাঁহার শেষ বয়সের পুস্তকের ভাষার তুলনা করিলে উভয়প্রকার ভাষার পার্থক্য বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

সমাজের গতির সহিত ভাষার গতি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। রামমোহন রায়ের গদ্য এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য এক নহে। আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য এবং বঙ্কিমবাবুর গদ্য একরূপ নহে। কালক্রমে জটিল ভাষা ক্রমশঃ সরল ভাষায় পরিণত হয়। ভাষার এই গতি অনিবার্য্য। ইংরাজী সাহিত্যে, ফরাসী সাহিত্যে ও যাবতীয় সভ্যদেশের সাহিত্যে এইরূপ পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, সে ভাষাকে 'জীবিত ভাষা' বলা চলে না। তাহা 'Dead Language' বা মৃত ভাষা। সংস্কৃত, জেন্দ, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন এ সমস্তই মৃত ভাষা। ঐ সকল ভাষার সাহিত্যে অমূল্য ও অপূর্ব্ব রত্নরাজি আছে সত্য, কিন্তু সেই সকল রত্ন প্রাচীন মৃত ভাষাকে জীবন্ত ভাষায় পরিণত করিতে পারে না। সংস্কৃত ভাষা সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত বদলাইয়া প্রাকৃত ও পালি ভাষার মধ্য দিয়া অবশেষে বর্ত্তমান বাংলা, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

আজকাল অনেকের মুখে শুনিতে পাই, 'প্রগতি-সাহিত্য' বলিয়া একটা কথা প্রচলিত হইয়াছে। যখন ভাষামাত্রেই গতিশীল, তখন ভাষার পূর্ব্বে 'প্রগতি' বিশেষণ ব্যবহারের সার্থকতা কি? আমরা কি কখনও বলি, 'নদীতে তরল জল আছে'? জল বলিলেই ত তাহার তরলতা সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়। আজ যাহা 'প্রগতি সাহিত্য', শত বৎসর পরেও কি তাহা 'প্রগতি-সাহিত্য' বলিয়া বিবেচিত হইবে? তবে একটা কথা আমার মনে হয় যে, 'প্রগতি-সাহিত্য'-ওয়ালাদের মধ্যে অনেকে আপনাদের অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য ব্যাকরণদুষ্ট শব্দকে প্রগতি-সাহিত্যের ভাষা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বহুকাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, ভাষা-সরস্বতী দেবতা, কঠোর সাধন ভিন্ন কোন দেবতার অনুগ্রহ লাভ হয় না। সুতরাং ভাষাশিক্ষার জন্যও কঠোর সাধনার প্রয়োজন। আমি যাহা লিখিব, তাহাই সাহিত্যে স্থান পাইবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। যাহার অক্ষরপরিচয় হইয়াছে সে অনায়াসে সকল কথা লিখিতে পারে, কিন্তু তাহার লিখিত সকল কথাই কি সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য? দেবী সরস্বতী কেবল যে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নহে; তিনি সঙ্গীতেরও দেবতা। তাই তিনি 'বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তা'। তাঁহার এক হস্তে পুস্তক, অন্য হস্তে বীণা। বীণার তারে অঙ্গুলি স্পর্শ করিবামাত্রই একটা ঝঙ্কার উঠে। কিন্তু যিনি বীণাবাদনে দক্ষ নহেন, তিনি বীণার তার স্পর্শ করিয়া ঝঙ্কার তুলিতে পারেন, কিন্তু তাহা সঙ্গীত নহে—তাহাতে রাগরাগিণীর চিহ্নমাত্রও থাকে না। বীণাবাদন শিখিতে হইলে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করিতে হয়। সেইরূপ সাদা কাগজে কালীর আঁচড় কাটিয়া কিছু লিখিলেই তাহা সাহিত্য হয় না, ইহার জন্যও কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা চাই।

আমাদের সাহিত্য (২)

আমাদের বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের বাহ্যরূপ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে কিছু আলোচনা করিয়াছি। ভাষাই সাহিত্যের বাহ্যরূপ। এবারে আমি সাহিত্যের বর্ত্তমান

অবস্থা সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। সমাজের রুচি ও নীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বিদ্যাসাগর-যুগের সাহিত্য আর বঙ্কিম-যুগের সাহিত্য এই উভয়ের মধ্যে যেমন পার্থক্য বিদ্যমান, সেইরূপ বঙ্কিম-যুগের সাহিত্যের সহিত বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের পার্থক্য থাকিবেই। আমি বলিয়াছি যে বর্ত্তমান যুগের অনেক লেখক অজ্ঞতাবশতঃই হোক, আর ইচ্ছা করিয়াই হোক ভাষাকে নানা দোষে দুষ্ট করিতেছে। সেই দোষের উল্লেখ করিলে তাঁহাদের একমাত্র যুক্তি এই যে, এটা প্রগতি সাহিত্যের যুগ। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সাহিত্যমাত্রই প্রগতিশীল অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং 'সাহিত্য' শব্দের পূর্ব্বে 'প্রগতি' শব্দ ব্যবহার করা সমীচীন বলিয়া আমি মনে করি না। কেহ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল চাহিবার সময় ত বলে না 'আমাকে এক গ্লাস তরল জল দাও'। কারণ জলমাত্রেই তরল। জলের সহিত তরলতার সম্বন্ধ যেরূপ অবিচ্ছেদ্য, সাহিত্যের সহিত প্রগতির সম্বন্ধও সেইরূপ অচ্ছেদ্য।

গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে 'আমাদের সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে আমি 'প্রগতি-সাহিত্যে'র উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রগতি-সাহিত্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি আরও দু'একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রগতি-সাহিত্য-লেখকগণের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ—তাঁহারা যেন ব্যাকরণদুষ্ট, অশুদ্ধ বাক্য ব্যবহার করিয়া ভাষা-শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি না করেন। অল্পবয়স্ক এবং অপরিণত বুদ্ধি পাঠক-পাঠিকারা ছাপার অক্ষরে ঐ রকম ভাষা দেখিলে সহজেই মনে করিতে পারে—এইরূপ ভাষাই বুঝি আদর্শ ভাষা। তাহাতে ভাষার উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতিই হইয়া থাকে। প্রগতির দোহাই দিয়া কোন কোন লেখক এরূপ ভাষা ব্যবহার করেন যে, দু'তিন বার না পড়িলে লেখকের বক্তব্য বুঝিতে পারা যায় না। উহাতে ভাষার স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়া আবিলতারই প্রাদুর্ভাব হয়। আমাদের মতে ভাষা যত স্বচ্ছ হয়, ততই ভাল। কয়েক মাস পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলের কোন মহকুমার-শহর হইতে প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেখিয়াছিলাম, সম্পাদক মহাশয় অতিবৃষ্টির বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—সমস্ত মগ্নময় হইয়া গেল। আমার মুখে সেই কথা শুনিয়া আমার কোন লেখক-বন্ধু মন্তব্য করিলেন, 'জলময়', 'অগ্নিময়', এসব সেকেলে ভাষা; প্রগতি-সাহিত্যের ভাষায় হইবে—'মগ্নময়', 'দগ্ধময়'।

অনেক সময় আমার মনে হয় যে, বর্ত্তমান কালে আমাদের সাহিত্যে অসার ও আবর্জ্জনার স্তূপ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন হইতে ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা আমাদের সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অত্যধিক ছিল না। একালে গ্রন্থকার ও লেখকের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের লেখকদের মধ্যে কয়জনের লেখায় আমরা এমন কিছু দেখিতে পাই যাহাতে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের সাহিত্যের সত্যসত্যই উন্নতি হইতেছে? বর্ত্তমান লেখকদের মধ্যে কয়জনের লেখা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীআসন প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইবে? সেকালের অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র

সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি লেখকগণ যে প্রবন্ধাদি লিখিতেন, আজকাল কয়জন লেখকের লেখনী হইতে সেইরূপ সুচিন্তিত লেখা বাহির হইতেছে? আমি ইচ্ছা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিতেছি, কারণ তাঁহারা অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের লেখনী-নিঃসৃত অনেক কথা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু এখন বাংলার, বিশেষতঃ কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া যে সকল লেখকের পুস্তক প্রকাশকদের সাহায্যে বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়জনের লেখা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইবে? গ্রন্থকারেরা নিজেদের কাল ও নিজেদের সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রন্থ রচনা করেন। সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠকেরা বুঝিতে পারেন যে, সেই লেখকের সময়ে সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা-দীক্ষা কিরূপ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তীকালের কালিদাস, মাঘ, ভারবি প্রভৃতির রচনায় আমরা তাঁহাদের সময়ের সামাজিক চিত্র বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে দীনবন্ধু মিত্র যে সকল নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সমসাময়িক দেশের অবস্থা ও সমাজের নানা দিকের চিত্র যেরূপ সুন্দররূপে আমরা জানিতে পারি, বর্ত্তমান লেখকদের মধ্যে কয়জনের গ্রন্থে আমরা সেরূপ জানিতে সমর্থ হই?

সেকালের লেখকেরা অর্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া দেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য লেখনী চালনা করিতেন। কিন্তু মনে হয়, এখনকার অনেক গ্রন্থাকারেরই দৃষ্টি যাহাতে সমাজের কল্যাণ হইতে পারে সেই দিকে নাই, ইঁহাদের দৃষ্টি অর্থের দিকে নিবদ্ধ। গ্রন্থ-প্রকাশকেরাও অনেকে ঠিক এইভাবে পরার্থ অপেক্ষা স্বার্থের প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখিতেছেন। সাময়িকপত্রের সম্পাদকেরাও এ দোষ হইতে সকলে মুক্ত নহেন। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমার এই মন্তব্যের সমর্থন করিতেছি। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু একটি প্রবন্ধ লিখিয়া কোন সাময়িকপত্রের আপিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চার-পাঁচ দিন পরে সেই প্রবন্ধটি আমার লেখক-বন্ধুর কাছে ফেরত আসিল। উক্ত সাময়িকপত্রের সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধের সহিত একখানি পত্রও পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "আপনার প্রত্যেকটি রচনাই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পড়িলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনি যে সকল বিষয়বস্তু লইয়া লিখিয়াছেন, তাহা আজকালকার পাঠকেরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইহা আপনার লেখার দোষ নহে, ইহা পাঠকদের দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল রুচিরই দোষ। আমাদের পত্রিকা যখন সাময়িক পত্রিকা, তখন সেই রুচির সহিত তাল রাখিয়া আমাদের চলিতে হয়। আজকালকার পাঠকদের মনোভাব বুঝিয়া অন্য কোন রচনা যদি পাঠান, অনুগৃহীত হইবে।"

যদি উক্ত সম্পাদক মহাশয় পত্রে জানাইতেন যে লেখাটি তাঁহাদের মনোনীত হয় নাই, তাহা হইলে আমি বিস্মিত বা দুঃখিত হইতাম না। কারণ ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। আমার যাহা ভাল লাগিল, তাহা অপরের ভাল না-ও লাগিতে পারে। কিন্তু

প্রবন্ধটি প্রকাশ না করিবার জন্য তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাতেই আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। সংবাদপত্র সকল সভ্যসমাজেই লোকশিক্ষার বাহন বলিয়া বিবেচিত হয়। যিনি সেই লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, পাঠকগণের রুচি উন্নত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।

সেকালের 'হিতবাদী'র একটি বিখ্যাত মোকদ্দমার বিষয় এখনও হয়ত অনেকের সুবিদিত। অধুনালুপ্ত 'হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় তৎকালীন হিন্দুসমাজে প্রচলিত যে সকল প্রথাকে সমাজের অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন, তাহারই প্রতিকারের জন্য 'হিতবাদী'তে 'রুচি-বিকার'[১৩৬] নামে কয়েকটি ব্যঙ্গ-কবিতা প্রকাশ করেন। সেই সময়কার উন্নতিশীল সমাজ ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মোকদ্দমা আনয়ন করেন। আদালতে মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইলে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ব্যারিষ্টার তাঁহাকে বলেন, "আপনি ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে ব্যাপারটি সহজেই মিটিয়া যায়। আমার মতে আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা করাই ভাল।" এই কথা শুনিয়া কাব্যবিশারদ মহাশয় দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমি যাহা আমার সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি, তাহার প্রতিকার-চেষ্টা যদি অপরাধ হয়, আমি সেই অপরাধে অপরাধী,—ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? বিচারক যদি আমাকে দণ্ড দেন, আমি সে দণ্ড হাসিমুখে গ্রহণ করিব।" সেকালের লোকেরা জানেন যে ঐ মোকদ্দমায় কাব্যবিশারদ মহাশয়ের নয় মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। তিনি দণ্ডাদেশ শুনিয়া বিচারপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং আদালতে সমবেত তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত হাসিমুখে করমর্দ্দন করিয়া কারাগারে গমন করেন।

তখনকার দিনে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা যে জনসাধারণের নিকটে লোক-শিক্ষক বলিয়া সম্মানলাভ করিতেন, তাহার একটা উদাহরণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে পাঠকগণের গোচরীভূত করিতেছি। 'হিতবাদী'র সম্পাদকীয় বিভাগের ভার আমার হাতে থাকাকালে, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিদ্যাভূষণ মহাশয় শতাধিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়ের ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে 'হিতবাদী'র সম্পাদকরূপে আমাকেও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের প্রাপ্য একখানি নিমন্ত্রণপত্র দিয়াছিলেন। আমি শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, "আপনি ভুল করিয়া আমাকে পত্র দিয়াছেন। আমি ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত বা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নই। সুতরাং ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রাপ্য সম্মান বা বিদায় আমি লইতে পারি না।" আমার কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভুল করিয়া আপনার নামে পত্র দিই নাই, আমি ইচ্ছা করিয়াই আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। অধ্যাপক পণ্ডিত মানে কি? যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, সমাজে শিক্ষাবিস্তারে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সাহায্য করাই ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। আপনি ব্রাহ্মণসন্তান এবং সমাজে শিক্ষাবিস্তারের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সুতরাং আপনি ব্রাহ্মণসন্তান এবং সমাজে

শিক্ষাবিস্তারের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সুতরাং আপনি কেন বিদায় লইবেন না?" অগত্যা আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম। ইহার পর কলিকাতা বড়বাজারের রাজবাড়ীতে 'অধ্যাপক-বিদায়ের নিমন্ত্রণপত্র এবং বিদায়'ও পাইয়াছিলাম। সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরা সমাজে কেন সম্মানলাভ করেন, তাহার কারণ বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন।

আর একটা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সাময়িকপত্রের সম্পাদক, পরিচালক ও স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে অনেকেই কেবল ব্যবসাবুদ্ধি লইয়া—পত্রিকাদি প্রকাশ করেন, অর্থাৎ লাভ লোকসানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই আপনাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। ইহার ফলে অনেক সাময়িকপত্রের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। তখনকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদিত '*বঙ্গদর্শন*'[১৩৭] দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' এবং 'আর্য্যদর্শন'[১৩৮] 'কল্পদ্রুম'[১৩৯] প্রভৃতি মাসিকপত্রে যেরূপ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, মৌলিক অথচ সরল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত এখন অতি অল্পসংখ্যক মাসিকপত্রেই সেইরূপ দেখিতে পাই।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে যে অবনতি হইতেছে তাহার আর একটা প্রধান কারণ, গ্রন্থ-প্রকাশকদিগের স্বার্থবুদ্ধি। কলিকাতায় পুস্তক-প্রকাশকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপনাদিগকে গ্রন্থ-সমালোচকের আসনে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, যেরূপ লেখা থাকিলে পুস্তক অধিক বিক্রয় হইবে, সেইরূপ পুস্তক, নিকৃষ্ট হইলেও তাঁহারা প্রকাশ করিবেন। গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্তশালী গৃহস্থ। এখনকার এই দুর্মূল্যতার দিনে কয়জন লেখক নিজ ব্যয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারেন? কাজেই তাঁহাদিগকে প্রকাশকদের শরণাপন্ন হইতে হয়। শুনা যায় প্রকাশকদের কেহ কেহ কখনও কখনও বিধিবহির্ভূত পন্থা গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই ব্যাপার পুস্তক-ব্যবসায়ের বাজারে হয়ত নূতন নহে। আমার যতদূর মনে পড়ে, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে পুস্তকের বাজারে এইরূপ বিধিবহির্ভূত পন্থা অনুসরণের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জীবিতকালের শেষদিগের সংস্করণগুলিতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত 'B. C. Chatterjee' পুস্তকের প্রচ্ছদপটে আমি দেখিয়াছি।

যেদিন হইতে পুস্তক-প্রকাশকগণ সমালোচকের আসন গ্রহণ করিয়া পুস্তকের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই দিন হইতেই বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের সে গৌরবময় যুগ আর নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় কবি আজকাল কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর বসু, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় প্রবন্ধলেখক আজকাল কয়জন আছেন? দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতির মত নাট্যকার ও প্রহসনকার

আজকাল কোথায়? সেকালের সহিত একালের তুলনা করিলে আমার মত অশীতিপর বৃদ্ধদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, এখনও যে দুই-চারি জন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বাংলার সাহিত্যাকাশে দীপ্যমান আছেন, তাঁহারা অস্তাচলে গমন করিলে আমাদের সাহিত্যগগন কি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে?

আমাদের দেশের আচার-বিচার

পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজে এবং সর্ব্বকালে নানা প্রকার আচার-বিচার প্রচলিত ছিল ও আছে, সময়ের পরিবর্ত্তনে জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি বা অবনতিতে আচার-বিচারেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুসমাজে পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে প্রকার আচার-বিচার দেখিয়াছি, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে এবং এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া শত বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ আচার-বিচার ছিল, তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি।

আমার বাল্যকালে আমাদের প্রতিবেশী বহু বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মাথায় শিখা (টিকি) দেখিয়াছি। কিন্তু এখন বোধ হয় গুরু পুরোহিত ছাড়া কোন ব্রাহ্মণের মাথাতে শিখা দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতা অঞ্চলের কথা ছাড়িয়া দিলে সুদূর মফঃস্বলেও শিখাধারী ব্রাহ্মণ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার জননীর মুখে গল্প শুনিয়াছি, তাঁহাদের বাল্যকালে তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ মাত্রেই মাথায় শিখা ত রাখিতেনই, উপরন্তু তাঁহারা মস্তকের চারিদিক ক্ষৌরকার্য্য দ্বারা কেশশূন্য করিতেন। সেই মুণ্ডিত মস্তকের মধ্যস্থলে খানিকটা স্থানে ছোট ছোট কেশ থাকিত এবং সেই কেশের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি স্থূল ও সুদীর্ঘ শিখা থাকিত। যাঁহারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিকল উৎকলবাসীদের মত মস্তকের চতুর্দ্দিক মুণ্ডিত করিতেন। তবে তাঁহার শিখাটি সূক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র ছিল। সহজে উহা দৃষ্টিপথে পতিত হইত না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্র দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে সেকালের ব্রাহ্মণদের কেশবিন্যাস কিরূপ ছিল।

আমার পিতার মুখে গল্প শুনিয়াছি যে, তাঁহার বয়স যখন ১৭/১৮ বৎসর তখন একবার তিনি বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ অঞ্চলে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন যে, ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ বালকেরা উপনয়নের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত মাথায় 'পঞ্চ শিখা' ধারণ করিত, অর্থাৎ কপালের ঠিক উপরে, দুই পার্শ্বে, দুই রগে, মস্তকের শীর্ষস্থানে এবং ঘাড়ে, এই পাঁচ জায়গায় পাঁচটি শিখা রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিত। এই পঞ্চ শিখাধারী ব্রাহ্মণকুমারগণ সাধারণতঃ 'পঞ্চশিখ' নামে অভিহিত হইত। আমার পিতা 'পঞ্চশিখ' ব্রাহ্মণকুমার দেখিয়া তাঁহার শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট গল্প করিলে ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি 'পঞ্চশিখ' ব্রাহ্মণকুমার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ, কিন্তু মনে রাখিও, তোমার বা আমার

পিতৃ-পিতামহগণ তাঁহাদের বাল্যকালে ও কৈশোরে সকলেই 'পঞ্চশিখ' ছিলেন।" এখন বঙ্গদেশে কোন 'পঞ্চশিখ' ব্রাহ্মণ কেহ দেখিতে পান কি?

সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বিধবা, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা আহারে নানাপ্রকার বাছবিচার করিয়া থাকেন। মুড়ি, চালভাজা বা চিঁড়াভাজা জলস্পৃষ্ট হইলে উহা সক্‌ড়ি হইয়া যায়। সেইজন্য উচ্চবর্ণের বিধবারা তাহা অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করেন। আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি, আমাদের প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ বিধবা রাত্রিকালে জলযোগের সময় 'গালফলার' করিতেন। অর্থাৎ তিনি একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ মুড়ি এবং অন্য এক পাত্রে কিছু দুধ ও গুড় লইয়া জলযোগে বসিতেন। তিনি এক মুঠা মুড়ি প্রথমে মুখে দিতেন এবং তাহার পর এক চুমুক দুধ ও একটু গুড় খাইতেন। আমি আমার জননীকে এইভাবে খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "ওকে বলে গালফলার"। মুড়ির সঙ্গে দুধ গুড় একত্রে মাখিলে উহা 'সক্‌ড়ি' হইয়া যায়। উনি মধ্যাহ্নে আলোচালের ভাত খান, সন্ধ্যার পর আবার সক্‌ড়ি খাইবেন কি করিয়া?

আজকালকার তুলনায় সেকালে উচ্চজাতীয়া বিধবাদিগের অন্ন-বিচার অনেক সূক্ষ্ম ছিল। আমাদের প্রতিবেশী এক সৎ শূদ্র ভদ্রলোকের সহিত আমাদের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহার পুত্র আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতাম। আমার বয়স যখন ১৬/১৭ বৎসর, তখন একদিন আমি আমার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া শুনিলাম যে বন্ধুটি বাড়ীতে নাই, কোথায় বাহিরে গিয়াছেন। আমি বন্ধুর শয়নকক্ষে বসিয়া বই দেখিতেছিলাম, এমন সময় সেই বাটীর পাকশালাতে স্ত্রীলোকদিগের একটা গোলমাল উঠিল। সহসা কোন বিপদ ঘটিয়াছে মনে করিয়া আমি পাকশালাতে গিয়া দেখিলাম, বাটীর তিন-চারজন মহিলা একটা দেওয়ালের দিকে চাহিয়া গোলমাল করিতেছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় একজন বলিলেন, "দেখ না, বাবা, সব দেওয়ালময় সক্‌ড়ি দিলে।" আমি ত দেওয়ালে সক্‌ড়ির লক্ষণ কিছু দেখিতে পাইলাম না। কে সক্‌ড়ি করিয়া দিল জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে শুনিলাম, একটা ক্ষুদে পিঁপড়ে একটি ভাতের কণা মুখে করিয়া দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিতেছে তাহা দেখিবামাত্র আমি গিয়া সেই পিঁপড়েকে ঘরের মেঝেয় ফেলিয়া দিলাম, তাহা দেখিয়া একজন মহিলা আমার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তোমার কাপড়খানা ছেড়ে দাও, আমি কেচে দিই।" আমি কাপড় ছাড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তুমি বামুন, আমরা শূদ্দুর, শূদ্দুরের সক্‌ড়ি ছুঁলে, তুমি কাপড় ছাড়বে না?" আমি বলিলাম, "আমি ত ভাত ছুঁই নাই, আমি পিঁপড়েটাকে ছুঁয়েছিলাম।" বলা বাহুল্য, আমি কাপড় ছাড়িলাম না। দেখিলাম, একজন স্ত্রীলোক এক বালতি জলে একটি ছোট্ট ঘুঁটের টুকরা ফেলিয়া সেই জল দিয়া সমস্ত দেওয়ালটা ধুইয়া ফেলিলেন। আমি ভাবিলাম, সকলে মিলিয়া সেই দেওয়ালটাকে ধরিয়া পুকুরে চুবাইয়া আনিলে ভাল হইত।

আমাদের আর একজন সদ্‌গোপ জাতীয়া প্রতিবেশিনী অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্তা

ছিলেন। শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীদিগকে মেয়েলী ভাষায় বলে 'শুচিবেয়ে'। ঐ সদ্‌গোপ মহিলা রন্ধনশালাতে রন্ধন করিবার জন্য যে এক ঘড়া জল রাখিতেন, তাহার মধ্যে একটুকরা ঘুঁটে ফেলিয়া রাখিতেন। তিনি বলিতেন, পুষ্করিণী হইতে জল আনিবার সময় কত কীটপতঙ্গের বিষ্ঠা অজ্ঞাতসারে পদদলিত করিয়া আসিয়াছেন। সেজন্য জলটা গোময় স্পর্শে শুদ্ধ করিয়া লইতেন। এজন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে ভীষণ তাড়না সহ্য করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার শুচিবায়ু কমে নাই। ঐ স্ত্রীলোকটি স্নান করিবার সময় একটি ছোট ছেলেকে ঘাটের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিতেন। তাহাকে বলিতেন, "আমি যখন ডুব দিব, তখন মাথার সব চুল জলে ডুবিয়া যায় কিনা একটু দেখিস ত?" বালকেরা অনেক সময় দুষ্টামি করিয়া বলিত, "তোমার দু'গাছা চুল বোধ হয় জলের উপর ভাসিতেছিল।" তাহা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোক আবার চার পাঁচ বার ডুব দিতেন। এরূপ শুচিবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোক বাস্তবিকই বিরল।

আমাদের প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা বিধবা এক ব্রাহ্মণী প্রত্যহ ভোরবেলা একটি ছোট ঘড়া লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। তিনি স্নানান্তে এক ঘড়া জল লইয়া সিক্ত বস্ত্রে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু যখন বাটীতে প্রবেশ করিতেন তখন দেখা যাইত, সেই ঘড়াটির জল শূন্য। আমরা একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই ঘড়ার জল লইয়া তিনি পথে ছিটাইতে ছিটাইতে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি কেন জল ছিটাইয়া আসেন জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, "কত হাড়ি, মেথর, মুদ্দফরাস এই রাস্তা মাড়িয়ে চলে গিয়েছে, তাই আমি গঙ্গাজল ছিটিয়ে এই পথে চলি।" চাল সিদ্ধ হইয়া উহা অন্নে পরিণত হইলে যে অস্পৃশ্য হয়, তাহা কোন স্মৃতিতে লিখিত নাই।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে যে কাহিনী শুনিয়াছিলাম, তাহা এই : তিনি এক বৎসর চন্দননগর প্রবর্ত্তক সংঘের এক সভায় সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াছিলেন। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল 'বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ'। তর্কভূষণ মহাশয়ের নিবাস ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী। এই ভাটপাড়া পশ্চিমবঙ্গে স্মৃতি অধ্যাপনার প্রধান কেন্দ্র। সেই ভাটপাড়ার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত্য এই তর্কভূষণ মহাশয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, একবার পূর্ব্ববঙ্গের রাজা উপাধিধারী কোন ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর আদ্যশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকেরাও নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীও ছিলেন। এই লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় মদ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। রাজবাটীতে সমাগত অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্বপাকে আহার করিলেন। প্রত্যেক অধ্যাপকের জন্য পৃথক পৃথক রন্ধনের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। একটা প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে ব্রাহ্মণদের রন্ধনের পঁচিশ-ত্রিশটি স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইরূপ তিন-চারটি হলঘরে অধ্যাপকগণের পাকের স্থান করা হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে তর্কভূষণ মহাশয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের পার্শ্বেই লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের রন্ধনের স্থান হইয়াছিল। রন্ধনকালে তর্কভূষণ মহাশয় দেখিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া সেই হাত মাথায় দিলেন। দেখিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বিস্মিত হইয়া সংস্কৃত

ভাষায় শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ও কি করিলেন? সক্‌ড়ি হাত না ধুইয়া সেই হাত মাথায় দিলেন?" শাস্ত্রী মহাশয় সক্‌ড়ি কথার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। কারণ উহা সংস্কৃত শব্দ নহে। তাহা শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, 'উচ্ছিষ্ট' অর্থে সক্‌ড়ি শব্দ বাংলায় প্রচলিত। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "কোন দ্রব্য মুখে না দিলে তাহা উচ্ছিষ্ট কিরূপে হইবে?" তাহা শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "অন্নটা কি অস্পৃশ্য নহে?" শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "তণ্ডুল সিদ্ধ করিলে যে অন্ন হয় তাহা যে অস্পৃশ্য, তাহা কোন্ সংহিতা বা স্মৃতিতে আছে?" এই কথা শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় একটু অপ্রস্তুত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি আপনাকে পরে জানাইব।" কিন্তু জানাইবার সুযোগ তিনি আর পান নাই। কারণ তিনি কলিকাতা আসিয়া সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরী ও অন্যান্য পুস্তকাগারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কিন্তু অন্ন যে অস্পৃশ্য, প্রাচীন বা নব্য স্মৃতিতে কোথাও তাহা খুঁজিয়া পান নাই।

যাঁহারা দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, উড়িষ্যার দক্ষিণে সর্ব্বত্র ভাত, তরকারি দোকানে বিক্রয় হয়। বঙ্গদেশে বা উত্তর-ভারতে যেমন রেল-ষ্টেশনে ফেরিওয়ালারা লুচি ও মিষ্টান্ন বিক্রয় করে, দক্ষিণ-ভারতে তেমনি রেল ষ্টেশনে ফেরিওয়ালারা ঠোঙ্গায় করিয়া ভাত, তরকারি বিক্রয় করে। যাত্রীরা গাড়ীতে বসিয়া সেই ভাত, তরকারি কিনিয়া খায়। সহযাত্রীদের মধ্যে সকল জাতিই থাকে। সেখানে ভোজনকালে স্পর্শদোষ নাই। অথচ এই মাদ্রাজ প্রদেশের লোকেরাই বলিয়া থাকে যে বাঙালীরা, বিশেষ করিয়া বাঙালী-ব্রাহ্মণেরা পঞ্চমের অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতির ছায়া স্পর্শ করিলে স্নান করেন না, তাঁহারা আবার হিন্দুয়ানির বড়াই করেন কিরূপে?

আমরা তো অন্নকে অশুদ্ধ বলিয়া মনে করি, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা মনে করেন, বাঙালীরা সক্‌ড়ি বিচার করেন না। মহারাষ্ট্র-সমাজে অন্নের অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, অথবা সেদিন পর্য্যন্ত যে ধারণা প্রচলিত ছিল, তাহা শুনিলে পাঠকগণ বিস্মিত হইবেন। 'হিতবাদী' পত্রের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি হিতবাদীর সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া বহু বৎসর তাঁহার সহিত এক টেবিলে বসিয়া কাজ করিয়াছি। সেই সময়ে একদিন আমার একটি পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আমাদের বাটীতে ভোজনের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "আমরা অর্থাৎ মারহাট্টারা অন্য সমাজের ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করি না, ইহা আপনি জানেন। আপনি আমাকে নিশ্চয়ই 'লুচি' খাওয়াইবেন। তবে আমার জন্য যে কয়খানা 'লুচি' করাইবেন, তাহার ময়দায় জল না দিয়া দুধ দিয়া মাখিবেন। আপনারা ভাতকে সক্‌ড়ি মনে করেন, আমাদের এই সক্‌ড়ি বিচার কিন্তু অন্যরূপ। আমাদের মতে কোন শস্যে জল লাগিলে তাহা সক্‌ড়ি হইয়া যায়। তবে চাল যদি দুধে সিদ্ধ হয়, বা আটা ময়দা যদি দুধ দিয়া মাখা যায়, তবে তাহা সক্‌ড়ি হয় না।" তিনি আরও আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "আপনাদের হেঁসেলে রান্না নিরামিষ তরকারি খাইতে আমার আপত্তি নাই।" আমি সখারামবাবুর কথামত দুধে ময়দা মাখিয়া লুচি

ভাজাইয়াছিলাম। ইহার পর আরও চার-পাঁচ বার সখারামবাবু আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া আহার করিয়াছিলেন। আমি প্রতিবারই তাঁহার জন্য ময়দা দুধে মাখিয়া লুচি ভাজাইতাম। তিনি আমাদের হেঁসেলের ভাত, ডাল ও আমিষ তরকারি ছাড়া সকলপ্রকার তরকারিই খাইতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, চাল, ডাল, গম, আটা, ময়দা প্রভৃতিতে জল ঠেকিলেই তাহা সক্‌ড়ি হইয়া যায়, ইহাই তাঁহাদিগের সমাজে প্রচলিত সংস্কার। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, "আপনাদের দেশে মিষ্টান্নের দোকানে কি লুচি, কচুরী সিঙ্গাড়া বিক্রী হয় না?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, সেই আটা বা ময়দা দুধে মাখা হয়, জলে নয়। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, এক বস্তা চাউল বা এক বস্তা ছোলায় যদি একটু জলের স্পর্শ লাগে তাহা হইলে সে সমস্তই সক্‌ড়ি হইয়া যায়।

মহারাষ্ট্র-সমাজের আচার-বিচার সংক্রান্ত আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিব। অনেকের জানা আছে যে, মারাঠা সমাজে স্ত্রীলোকদের অবরোধ-প্রথা নাই। মারাঠা রমণীরা স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া থাকেন। কোন বাটীতে কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে স্ত্রীলোকদিগের নিমন্ত্রণ হইলে নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকেরা ভোজের একদিন বা দুই দিন পূর্ব্বে নিজের একখানা পরিধেয় বস্ত্র নিমন্ত্রণকারীর বাটীতে পাঠাইয়া দেন। নিমন্ত্রণকারী সেই বস্ত্র জলে কাচিয়া একটা পৃথক ঘরে রাখিয়া দেন। নিমন্ত্রিতা মহিলারা যে বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নিমন্ত্রণকর্ত্তার বাটীতে গমন করেন, পথে ব্যবহৃত সেই বস্ত্র পরিয়া তাঁহারা ভোজন করিতে পারেন না। কারণ সেই বস্ত্র রেশমী বা পশমী হইলেও পথে আসিবার সময় কত জাতির ছোঁয়া লাগে। সুতরাং সেই অশুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া কিরূপে ভোজন করা চলিতে পারে? যে ঘরে তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রেরিত বস্ত্র রক্ষিত থাকে, একে একে সেই ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহারা পূর্ব্বপ্রেরিত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভোজনস্থানে গমন করেন এবং আহারান্তে আবার পথে বাহির হইবার কাপড় পরিয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সখারামবাবুর মুখে আরও শুনিয়াছি যে, মহারাষ্ট্রে ভোজে 'পলাণ্ডু' ব্যবহার অবাধে প্রচলিত আছে। এই পলাণ্ডু ব্যবহার সম্বন্ধে একটা গল্প বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমি একবার পুরীধামে গিয়া আমাদের পাণ্ডার মুখে এই বিবরণটি শুনিয়াছিলাম : তিনি বলেন, কাশ্মীরের একজন রাজা সপরিবারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য একটা বড় বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। পুরীর কয়েকজন পাণ্ডা কৌতূহলপরবশ হইয়া রাজার পাকশালাতে গমন করেন। তাঁহারা দেখিয়া অবাক হইলেন যে, রন্ধনশালার একপাশে প্রায় আধ মণ 'পলাণ্ডু' রহিয়াছে। কাশ্মীরের রাজা ক্ষত্রিয়, হিন্দুকুলচূড়ামণি! তাঁহার পাকশালায় 'পলাণ্ডু'! তাঁহারা কথায় কথায় পলাণ্ডুর বিষয় রাজার কর্ণগোচর করিলে রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার পাকশালায় পলাণ্ডু! আমায় দেখাইতে পারেন? যে আনিয়াছে আমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিব। পাণ্ডারা রাজাকে লইয়া পাকশালায় গিয়া পলাণ্ডু দেখাইলে রাজা তদ্দৃষ্টে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, আপনারা ভুল করিয়াছেন, উহা 'পলাণ্ডু' নহে 'পেঁয়াজ'। পলাণ্ডু অত বড় হয় না, সেগুলো ছোট ছোট হয়। পেঁয়াজ অভক্ষ্য নহে, পলাণ্ডুই অভক্ষ্য।

মারাঠা সমাজে সম্ভবতঃ পলাণ্ডু এবং পেঁয়াজ পৃথক বলিয়া গণ্য হয়। একথাটা অবশ্য সখারামবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

আমাদের সমাজে বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। কারণ আমাদের ধারণা সগোত্র হইলেই একবংশজাত হয়। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের এই ধারণা অভ্রান্ত নহে। 'গোত্র' শব্দের মৌলিক অর্থ অনুসন্ধান করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 'গোত্র' শব্দের অর্থ যে স্থানে গো প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ত্রাণ পায় অর্থাৎ রক্ষা পায়। অতি প্রাচীনকালে যখন আর্য্য সভ্যতা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রসারলাভ করিতেছিল, তখন সমস্ত দেশ গভীর অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অরণ্যের মাঝে মাঝে সশিষ্য ঋষিরা তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রধান সম্বল ছিল কৃষিকার্য্য ও গোপালন। তাঁহারা সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এবং বন্য মৃগ প্রভৃতি উদ্ভিদভোজী পশুর আক্রমণ হইতে গো-ধন এবং শস্য-রক্ষার জন্য আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া অনেকটা স্থান বেষ্টনী দ্বারা ঘিরিয়া রাখিতেন। সেই বেষ্টনীর মধ্যে বন্য হিংস্র পশু প্রবেশ করিতে পারিত না। সুতরাং আশ্রমসন্নিহিত গোচারণ ভূমিতে গো, মহিষাদি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিত। যে ঋষি এইরূপ গোত্রের অধিপতি হইতেন, তাঁহারই নাম অনুসারে সেই গোত্র অভিহিত হইত। কাশ্যপ গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র, বাৎস্য গোত্র, মৌদ্গল্য গোত্র প্রভৃতি গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নাম এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু সকল ঋষিই গোত্রপ্রবর্ত্তক ছিলেন না। মনু, অত্রি, নারদ, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণের নামে কোন গোত্র আছে কিনা আমি জানি না, বোধ হয় নাই। এক-একটি গোত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকল জাতিরই বাস ছিল। সেইজন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে একই গোত্রের নাম দেখিতে পাই। অনেকে বলেন যে, নিম্নশ্রেণী শূদ্রদের গুরু বা পুরোহিতের গোত্রই সেই শূদ্রজাতির গোত্র হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে। যাহা হউক, গোত্র বলিলেই যে একবংশসম্ভূত লোক হইবে, তাহার কোন মানে নাই। মনে করুন ভরদ্বাজ ঋষির বহু ছাত্র বা শিষ্য উক্ত মুনির আশ্রমে থাকিয়া দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিত। তাহারা সকলেই যে একবংশজাত ছিল, তাহা সম্ভবপর নহে। অর্থাৎ, আজকাল আমরা 'গ্রাম' বলিতে যাহা বুঝি, অতি প্রাচীন কালে 'গোত্র' বলিলে লোকে তাহাই বুঝিত।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে গোত্রের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। আজকাল স্বগোত্রে বিবাহ অনেক দেখিতে পাইতেছি। জ্ঞাতিকন্যাকে বিবাহ আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ হইলেও মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজে উহা অবাধে প্রচলিত। এমনকি মুসলমান সমাজে ভ্রাতুষ্পুত্রকে জামাতৃরূপে পাইলে পাত্রীর পিতামাতা গৌরব বোধ করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান সমাজে জ্ঞাতিকন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু মৃতা পত্নীর ভগ্নীকে বিবাহ একান্ত নিষিদ্ধ। এই নিষেধের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে বহুকাল হইতে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত সে আন্দোলনে কোনও ফল হয় নাই।

আমাদের সমাজের এমন অনেক আচার-বিচার প্রচলিত আছে, যাহা কোন যুক্তি

দ্বারা সমর্থিত নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:—পিতা বর্ত্তমান থাকিলে পুত্রের দক্ষিণমুখ হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ। আমি দু'এক জন পুরোহিতকে এই নিষেধের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা যে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, পিতৃশ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে দক্ষিণমুখ হইয়া পিণ্ডদান করিতে হয়। সেইজন্য পিতা বিদ্যমানে পুত্রকে দক্ষিণমুখে বসিয়া ভাত খাইতে নাই। কিন্তু মৃত পিতার প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান এবং নিজে দক্ষিণমুখ হইয়া অন্নগ্রহণ কি এক কথা? এই ব্যবস্থা হইতে অনেক প্রাচীন গৃহিণী নিজ নিজ সংসারে অনুরূপ আর একটি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রকে যখন দক্ষিণমুখে বসিয়া খাইতে নাই, তখন 'পুত্তুর' বিদ্যমানে পিতার 'উত্তুর' মুখে বসিয়া খাওয়া নিষেধ। এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই যুক্তিহীন—'নারী সংহিতা'য় আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাদেব দুর্গাকে বলিয়াছেন :

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥

আমাদের সমাজে কিন্তু অনেক যুক্তিহীন আচার-বিচার সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া

আমাদের আত্মীয়কুটুম্ব

আমাদের সমাজে বহুকাল হইতে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা প্রচলিত আছে। আজকাল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং পাশ্চাত্ত্য অনুকরণে এই প্রথা লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে। এই প্রথা ভাল কি মন্দ—সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব। কোন সংসারে উপার্জ্জনশীল পুরুষের মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির পোষ্যবর্গকে অকূল পাথারে পড়িতে হয়, অন্নবস্ত্রের জন্য নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিন্তু একান্নভুক্ত পরিবারের কোন পুরুষের মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির পোষ্যবর্গকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্নবস্ত্রের জন্য ভাবিতে হয় না। ঐ পরিবারের যিনি কর্ত্তা, সে ভাবনা তাঁহারই এবং তিনি অপক্ষপাত বিচারে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি—এক ব্যক্তির চার-পাঁচটি উপযুক্ত পুত্র অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন; কাহারও উপার্জ্জন অধিক, কাহারও-বা অল্প, কিন্তু উপার্জ্জনের তারতম্যের জন্য ইহাদের পুত্রকন্যাদের মধ্যে আহারে বা পরিচ্ছদে কোনরূপ ইতরবিশেষ হইত না। যাহার উপার্জ্জন যেরূপই হউক না কেন, সকলকার আহার্য্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদ একই প্রকার হইত। সুতরাং কোন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পোষ্যবর্গের ভার গৃহস্বামী অর্থাৎ সংসারের কর্ত্তা গ্রহণ করিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের এই সুবিধা বড় সামান্য সুবিধা নহে।

কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারের একদিকে যেমন এই সব গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যদিকে আবার ইহার দোষও আছে। কোন ব্যক্তির যদি পাঁচটি উপার্জ্জনশীল পুত্র থাকে, তবে তাহাদের সকলেরই উপার্জ্জন যে সমান হইবে, তাহা নহে। কাহারও

উপার্জ্জন অধিক, কাহারও উপার্জ্জন অল্প হইয়া থাকে। কেননা ঐ পাঁচটি পুত্রেরই বিদ্যা-বুদ্ধি ঠিক একই স্তরের হইতে পারে না। সাধারণতঃ ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহার উপার্জ্জন অল্প সে স্বভাবতঃই উপার্জ্জনবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয় না। কারণ সে জানে যে, তাহার উপার্জ্জন অধিক হইলে তাহার পুত্রকন্যারা পরিবারের অন্যান্য বালক-বালিকাদিগের অপেক্ষা বিশেষ সুবিধা কিছুই পাইবে না। এই মনোভাববশতঃ সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া নিজের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করে না।

একান্নবর্ত্তী পরিবার উপযুক্ত কর্ত্তৃত্বাধীনে কিরূপ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনচরিত[১৪০] পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। ভূদেববাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দদেববাবু মুন্সেফ্ ছিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দদেব প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। মুকুন্দবাবুর আয় গোবিন্দবাবু অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু তাঁহারা দুই ভ্রাতাই নিজ নিজ উপার্জ্জিত অর্থ ভূদেববাবুর নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যাহা ব্যয় করিতেন, তাহার হিসাবও পাঠাইয়া দিতেন। ভূদেববাবু সেই হিসাব দেখিয়া পুত্রদিগকে লিখিতেন—কোন্ বিষয়ে আরও কিছু ব্যয় করা উচিত ছিল, অথবা কোন্ বিষয়ে ব্যয় কিছু কমাইতে পারিলে ভাল হইত।

কিন্তু এ ত গেল চাকরির কথা। এদেশে ইংরেজের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা মুখ্যতঃ চাকরিজীবী ছিলেন না। তাঁহারা প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের দ্বারাই সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার উপর দোল-দুর্গোৎসব, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা নির্ম্মাণ ও নানাপ্রকার দানে তাঁহারা খ্যাতিলাভ করিতেন। ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে উকিল ব্যারিষ্টার ডাক্তার এই তিন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। উকিল-ব্যারিষ্টারের কাজ করিতেন মোক্তারেরা এবং চিকিৎসার ভার ছিল কবিরাজদের উপর। ইঁহাদের বৃত্তিগত আয়ও খুব বেশী ছিল না। অল্প আয়েই ইঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। তখন ব্যবসায়ে প্রচুর ধনাগম হইত।

সমাজের যখন এইরূপ অবস্থা ছিল তখন লোকে আত্মীয়স্বজনকে প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। অতি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়গণকেও তাহারা স্বীয় পরিবারভুক্ত করিয়া লইত। পাশ্চাত্ত্য সমাজে এইরূপ আত্মীয়-পোষণপ্রথা আগেও ছিল না, এখনও নাই। ইহার একটি প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই, আত্মীয়গণের সহিত আত্মীয়তাজ্ঞাপক শব্দের ব্যবহারে। ইংরাজী ভাষায় 'আঙ্কল' শব্দে পিতা বা মাতার ভ্রাতাকে বুঝায়। কিন্তু পিতা বা মাতার কিরূপ ভ্রাতা তাহা বুঝাইবার কোন শব্দ নাই। পিতার ভ্রাতা—আঙ্কল, কিন্তু আঙ্কল শব্দে পিতার মামাতো, পিসতুতো, জ্যাঠতুতো কি খুড়তুতো কিরূপ ভ্রাতা বুঝিতে পারা যায় না। 'নেফিউ' শব্দের দ্বারা ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভগিনীপুত্রকে বুঝাইয়া থাকে। 'আঙ্কল' এবং 'নেফিউ' এই দুইটি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'আণ্ট' এবং 'নীস' হইয়া থাকে। 'ব্রাদার-ইন্-ল' বলিলে ভগিনীপতি ও শ্যালক দুই-ই বুঝায়। কিন্তু 'হি ইজ মাই ব্রাদার-ইন্-ল' একথা বলিলে অপরে কিরূপে বুঝিবে—সেই ব্যক্তি আমার ভগ্নীপতি, কি শ্যালক? কিন্তু আমাদের সমাজে আত্মীয়কুটুম্বগণ একত্র বাস করে

বলিয়া প্রত্যেকের সহিত কি সম্পর্ক তাহা ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। এক সংসারে অনেকে একত্রে বাস করিলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার অনিবার্য্য।

বঙ্গের হিন্দুসমাজে পুত্র বা কন্যার শ্বশুরকে 'বৈবাহিক' বলে, অর্থাৎ—এই আত্মীয়তাসূচক শব্দটির দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, বিবাহসূত্রে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই বৈবাহিক শব্দের অপভ্রংশে হইয়াছে 'বেয়াই' এবং উহার স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে 'বেয়ান'। ভ্রাতা বা ভগিনীর শ্বশুরকে বলে 'তালুই' এবং তাঁহার স্ত্রীকে বলে 'আবুই মা' বা 'মাউই মা'; শাশুড়ীর ভগিনী 'মাসশাশুড়ী' এবং শ্বশুরের ভগিনী 'পিস-শাশুড়ী'। ঐ দুইটি শব্দের প্রচলিত রূপ 'মাসাস' ও 'পিসেস'। ভগিনীপতি শব্দের প্রচলিত রূপ 'বোনাই' এবং শ্যালকের প্রচলিত রূপ 'শালা'। 'সম্বন্ধী' শব্দটি অতি প্রাচীনকালে 'বৈবাহিক' শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও কোন কোন অঞ্চলে ইহার এইরূপ ব্যবহার আছে। গীতায় এই 'সম্বন্ধী' শব্দ বৈবাহিকের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ের ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে আছে :

'মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।'

এখানে শ্যালক ও সম্বন্ধী এক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বিভিন্ন লোককে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

আমরা পুত্রের পুত্রকে বলি 'পৌত্র'; কন্যার পুত্রকে বলি 'দৌহিত্র'। পিতার পিতাকে বলি 'পিতামহ' এবং মাতার পিতাকে বলি 'মাতামহ'। কিন্তু ইংরেজদের সমাজে এক গ্র্যাণ্ডফাদার বলিলে পিতামহ ও মাতামহ উভয়কে বুঝায় এবং পৌত্র ও দৌহিত্র উভয়েই 'গ্র্যাণ্ডসন'। পৌত্রের পুত্র 'প্রপৌত্র' এবং কন্যার পৌত্র, 'প্র-দৌহিত্র'। প্রপৌত্র ও প্র-দৌহিত্রের পুত্রেরা 'বৃদ্ধ প্রপৌত্র' ও 'বৃদ্ধ প্র-দৌহিত্র'। কিন্তু এ স্থলে একটি অসামঞ্জস্য আছে। যে পৌত্র অপেক্ষাও ছোট, তাহার সম্বন্ধে 'বৃদ্ধ' শব্দটা ব্যবহার করা কি সঙ্গত? ফরাসী ভাষায় এ অসঙ্গতি নাই। ঐ ভাষায় পৌত্রকে petit (পেতি) অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র' শব্দটি দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ, ফরাসীরা পৌত্র শব্দে 'Grand'-এর পরিবর্ত্তে petit শব্দ ব্যবহার করে উহার অর্থ 'ক্ষুদ্র'। পৌত্রকে 'বৃহৎ পুত্র' না বলিয়া 'ক্ষুদ্র পুত্র' বলাই কি সঙ্গত নহে?

আমাদের এই যে আত্মীয়কুটুম্বগণের সম্পর্ক-নির্দ্ধারিণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার ইহা একান্নবর্ত্তী পরিবারের একটি নিদর্শন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেকালে একান্নভুক্ত পরিবারের উপার্জ্জনশীল পুরুষেরা যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত না। তাহাদের সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন গৃহের কর্ত্তা এবং কর্ত্তার মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তিতে তাঁহার পুত্রদের সমান অধিকার অর্শাইত। যে ভ্রাতার রোজগার অধিক সে কখনও স্বল্প উপার্জ্জনশীল ভ্রাতাকে স্বীয় সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত করিত না। যাহার উপার্জ্জন ছিল বৎসরে দশ হাজার টাকা তাহার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হইত না যে, আমার ভ্রাতা দুই হাজার টাকার অধিক উপার্জ্জন করে না, সুতরাং আমার সম্পত্তির অংশ পাইবার

অধিকার তাহার নাই। একালের অনেকের পক্ষে এ উদারতার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সেকালের কোন বিখ্যাত একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা বলিতেছি। উক্ত পরিবারে ঊনত্রিশ জন পুরুষ—ইহাদের মধ্যে সহোদর এবং জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো ভ্রাতারাও ছিল, সকলে একসঙ্গে এবং একস্থানে আহার করিতে বসিত। সেকালে ধনবানদের বাটীতেও সাধারণতঃ বেতনভোগী পাচক বা পাচিকা থাকিত না। বাটীর স্ত্রীলোকেরাই পালা করিয়া রান্না করিতেন। পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাই স্বহস্তে পরিবেশন করিতেন, অথবা অন্য মহিলাদিগের দ্বারা পরিবেশন করাইতেন।

আমি সেকালের আর একটি পরিবারের কথা উল্লেখ করিতেছি। ঐ পরিবারের একজন ভদ্রলোক তখনকার দিনের একজন খ্যাতনামা লেখক এবং আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের পরিবারে বহুপুরুষ পূর্ব্ব হইতে এরূপ একটা প্রথা প্রচলিত ছিল যে পরিবারভুক্ত কোন কোন ব্যক্তিকে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গমন করিতে হইলে পত্নীকে দেশের বাটীতে রাখিয়া একলা কর্ম্মস্থলে যাইতে হইত। যদি কেহ এই প্রথা লঙ্ঘন করিতেন, তবে তিনি পৃথগন্ন বলিয়া গণ্য হইতেন। তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির কোন অংশ পাইতেন না। অবশ্য এ প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা বিচারসাপেক্ষ। তবে একটা কথা বিবেচ্য। তাহা এই যে, আজকাল শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই অর্থ উপার্জ্জনের লোভে পৈতৃক নিবাস পরিত্যাগ করিয়া নগরে গিয়া সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। ফলে গ্রামগুলি লোকবিরল ও হতশ্রী হইয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইউরোপে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা না থাকাতে সেখানে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বা আত্মীয়াদের সম্বন্ধনির্দ্দেশক কোন শব্দের প্রচলন নাই। তাহাদের সমাজে পিতা, পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন পুরুষদের সম্বন্ধজ্ঞাপক যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, তাহা চার-পুরুষের পূর্ব্বে পাওয়া যায় না। ফাদার, গ্র্যাণ্ডফাদার, গ্রেট গ্র্যাণ্ডফাদার, এই তিনটি সম্বন্ধনির্দ্দেশক শব্দই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের সমাজে অধিকাংশ ধর্ম্মকার্য্যে পূর্ব্বপুরুষগণের উল্লেখ করিতে হয় বলিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, বৃদ্ধাতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি শব্দ পিতৃপক্ষে; এবং মাতৃপক্ষে বৃদ্ধাতি-বৃদ্ধ প্রমাতামহ শব্দ প্রচলিত আছে।

আমি এতদূর পর্য্যন্ত কেবল আত্মীয়গণের সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম; কিন্তু যাঁহারা রক্তের সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় নহেন, আমাদের স্বশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের সহিতও একটা সম্পর্ক পাতাইয়া আমরা তাঁহাদিগকে আত্মীয়, এমনকি পরমাত্মীয় করিয়া লই। এইপ্রকার সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারীরাই অধিকতর আগ্রহশীলা। 'মহাপ্রসাদ', 'গঙ্গাজল', 'সাগর', 'সৈ' (সখি), 'মনের কথা', 'দেখনহাসি' প্রভৃতি শব্দ আমাদের দেশের নারীসমাজে বহুপ্রচলিত। এই সকল সম্বন্ধ পাতাইবার সময় বর্ণভেদ বা জাতিভেদের প্রতি দৃক্‌পাত করা হয় না। আমাদের বাংলা

দেশে এইরূপ পাতানো সম্পর্ক নারীসমাজেই সীমাবদ্ধ। পুরুষসমাজে ইহার প্রচলন নাই। উড়িষ্যাতে কিন্তু পুরুষদিগের মধ্যেও যে সেকালে পাতানো সম্পর্কের রেওয়াজ ছিল সে বিষয়ে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সেই প্রথা হয়ত এখনও সেখানে প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ উহা আর নাই। সে সম্পর্কটির নাম 'সাঙ্গাৎ'। এখন বাংলার পল্লীগ্রামে সাঙ্গাতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিনা জানি না, কিন্তু শহর হইতে ত উহা সম্পূর্ণরূপেই নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আমার শৈশবকাল কটকে অতিবাহিত হইয়াছিল। আমার মনে আছে, এক এক দিন আমাদের বাটীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে এক-একটা শোভাযাত্রা যাইত। শোভাযাত্রার মধ্যে একটি বালক চন্দনচর্চ্চিত ও পুষ্পমাল্যশোভিত হইয়া পদব্রজে অথবা পাল্কীতে গমন করিত। শোভাযাত্রার কারণ সম্বন্ধে আমার জননী কৌতূহলী হইলে আমাদের উড়িয়া দাসী বলিয়াছিল 'সঙ্গাত বসাইবপু যাউছি', অর্থাৎ, সাঙ্গাৎ পাতাইবার জন্য যাইতেছে। সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশের মহিলাগণের মধ্যে যে সকল সম্পর্ক পাতানো হয়, তন্মধ্যে দুই-একটা ইংরাজী শব্দও প্রবেশলাভ করিয়াছে। 'ল্যাভেণ্ডার', 'ও-ডি-কলোন', 'পাউডার' প্রভৃতি শব্দ কিশোরী ও তরুণীদের মধ্যে শহর অঞ্চলে প্রচলিত হইতেছে।

আগেকার দিনে আমাদের সমাজে সময়ে সময়ে এরূপ অদ্ভুত সম্পর্ক পাতানো হইত যে, শুনিলে কৌতুক বোধ হয়। আমাদের পাড়ার এক ব্রাহ্মণ মহিলা তাঁহার সমবয়স্কা এক সদ্‌গোপ মহিলার সহিত 'মুখে আগুন' পাতাইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পরকে এই অদ্ভুত সম্বোধনে সম্বোধিত করিতেন। আমাদেরই পাড়াতে এক তিলি জাতীয়া স্ত্রীলোক এক ব্রাহ্মণ-মহিলার সহিত 'না দেখলে মরি' পাতাইয়াছিলেন। তাঁহারাও পরস্পরকে এই অদ্ভুত সম্বোধনে সম্ভাষিত করিতেন। কিশোরী ও যুবতীগণের মধ্যে 'বন্ধু' সম্পর্কও পাতানো হইত—ইহা বাল্যকালে আমরা দেখিয়াছি। এই সকল পাতানো সম্পর্কের জের তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণের মধ্যেও চলিত এবং 'দাদা' ও 'দিদি'তে পরিণত হইত। এই সকল পাতানো সম্পর্ক কেবল শব্দমাত্রেই পর্য্যবসিত হইত না, সম্বন্ধ পাতাইয়া সকলেই পরকে একান্ত আপনার করিয়া লইত। তাহারা পরস্পরের আপদে-বিপদে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিত। ইহাদের মধ্যে একজনের বাড়ীতে কেহ পীড়িত হইলে 'সৈ' বা 'গঙ্গাজল' আসিয়া পীড়িতের সেবাশুশ্রূষা করিত। অনেক ক্ষেত্রে দুর্গোৎসব, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে যে নূতন বস্ত্র ও মিষ্টান্নের আদান-প্রদান হইত তাহাও আমরা দেখিয়াছি। এই যে পরকে আপন করিয়া লওয়া, নিঃসম্পর্কীয়দের মধ্যে অন্তরঙ্গতা এসকল আজকাল বিরল হইয়া উঠিতেছে। আজকালকার মানুষ ত ক্রমে ক্রমে আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়।

আমাদের খাদ্য ও স্বাস্থ্য

অনেকের ধারণা যে, বাঙালীরা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, ভীরু এবং অতি নির্ব্বিরোধ। এই দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ আমরা অন্নভোজী। যাহারা অন্নকেই প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার

করে, তাহারা বলবান হয় না। উত্তর ভারতের লোকেরা প্রধানতঃ গোধূমকেই তাঁহাদের খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করেন। সেইজন্যই পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, এবং ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমান্তবাসীরা বলশালী, দীর্ঘকায় এবং সাহসী হইয়া থাকেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে। বাংলাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব দিকে উড়িয়া, মাদ্রাজী, ব্রহ্মবাসী, শ্যাম এবং পূর্ব্ব-উপদ্বীপবাসী, সমগ্র চীন-সাম্রাজ্যবাসী, জাপানী প্রভৃতি সকলেই অন্নভোজী অর্থাৎ এককথায় এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দেশসমূহের সমস্ত অধিবাসীরই প্রধান খাদ্য তণ্ডুল। এই তণ্ডুল সিদ্ধকে সাধু বাংলায় বা সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় 'অন্ন' এবং প্রচলিত বাংলায় ইহারই নাম 'ভাত'। এই অন্নভোজী বঙ্গবাসী বা 'ভেতো বাঙালী' এক সময়ে বাহুবলে সিংহল হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। এখনকার দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের ইংল্যাণ্ডের কার্য্যালয়ে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ প্রেরণ করিতেন, তাহাতেও বঙ্গবাসীদিগকে শারীরিক এবং মানসিক শক্তির জন্য যথোচিত প্রশংসা করিতেন। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে 'ভেতো বাঙালী' পূর্ব্বে এরূপ দুর্ব্বল ভীরু এবং কঙ্কালসার ছিল না।

তবে বাঙালীর এখন এ দুরবস্থা হইল কেন? আমাদের এই দুর্ব্বলতার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এ দায় অন্যের উপর চাপাইলে আমাদের কলঙ্কমোচন হইবে না। আমরা কেন দায়ী, আমি আজ তাহাই আলোচনা করিব। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন 'হিতবাদী'র সেবায় প্রবৃত্ত হই, তখন এক খর্ব্বকায় বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের আপিসে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ইন্দ্রনারায়ণ অধিকারী। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার এক পল্লীগ্রামে। তিনি শারীরিক শক্তির কিছু পরিচয় দিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। তখন আমরা কৌতূহলী হইয়া তাঁহার শক্তির নিদর্শন দেখিতে চাহিলে তিনি ঘরের মেঝেতে চিৎ হইয়া শয়ন করিলেন এবং তাঁহার হস্তস্থিত তৈলপক্ক বাঁশের লাঠি নিজের গলদেশে স্থাপন করিয়া বলিলেন, আপনারা ৫/৬ জন লোক এই লাঠির উপর আসিয়া দাঁড়ান। কিন্তু ব্রাহ্মণের কণ্ঠলগ্ন যষ্টিতে কেহই দাঁড়াইতে সম্মত না হওয়াতে তিনি বলিলেন, "আপনারা আপনাদের আপিসের দরোয়ান ও বেহারাদিগকে ডাকুন।" চার-পাঁচ জন দরোয়ান ও বেহারা আসিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এই লাঠিটা আমার গলায় চাপিয়া ধর, আমি যেন উঠিতে না পারি।" তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে লাঠি চাপিয়া ধরিলে তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং দরোয়ান, বেহারারা চারদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের মাথায় সুদীর্ঘ কেশ ছিল। কেশের ডগায় একটি গ্রন্থি বাঁধা। তিনি নিজে এই লাঠিগাছটা নিজের দীর্ঘ চুলের ভিতর দিয়া চালাইয়া দরোয়ানদিগকে বলিলেন, "আমি উবু হইয়া বসি, তোমরা আমার দুই পাশে বসিয়া এই লাঠি নীচের দিকে টানিয়া রাখ, আমায় উঠিতে দিও না।" তাহারা সেইরূপ করিলে তিনি সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। দরোয়ান, বেহারারা পড়িয়া গেল। তাঁহার তৃতীয় প্রক্রিয়া দেখিলাম, "দুই রগের দুই গোছা চুল লইয়া টানিয়া আমাকে মাটিতে বসাইয়া দাও"—ইহা দরোয়ানদিগকে বলিলেন।

তাহারা কিছুতেই বসাইতে পারিল না। তিনি প্রথম দুই প্রক্রিয়ায় হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করেন নাই। এই তিনটি প্রক্রিয়া দেখাইলে সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে বসিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি প্রত্যহ কি খাইয়া থাকেন? তিনি উত্তর করিলেন, "আপনারা যা খান, আমিও তাই খাই, তবে দুধ কিছু বেশী খাই। দুই বেলায় বাড়ীর খাঁটি দুধ খাই। সে দুধ আপনারা কলিকাতায় চোখেও দেখিতে পান না—খাওয়া ত দূরের কথা।" কি পরিমাণে দুধ খান জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "বেশী আর কি, ওই দুই সের থেকে আড়াই সের পর্য্যন্ত।" তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "দেখিতে পাই, লোকে কাটারি লইয়া কলাগাছ কাটিতে যায়। আমার বাপ কখনও কলাগাছ কাটারি দিয়া কাটিতেন না, আমিও কাটি না। কলাগাছের শিকড় কোথায়? আমরা তো কাঁদিসুদ্ধ গাছ মূলার মত টানিয়া উপড়াইয়া ফেলি।" তিনি আরও গল্প করিলেন, তাঁহার পিতার সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "শুনিয়াছি আপনি শক্তিশালী পুরুষ। আমাকে কিছু নিদর্শন দেখান।" তাহাতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কি দেখাইব আদেশ করুন।" মহারাজ বলিলেন, "আপনি ঘাড় না তুলিয়া দীর্ঘে কতটা জমি খুঁড়িয়া যাইতে পারেন?" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বিরুক্ত না করিয়া কোদালী দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজা বলিলেন, আর খুঁড়িতে হইবে না। রাজার একজন কর্ম্মচারী মাপিয়া দেখিলেন. ব্রাহ্মণ প্রায় ৯০ হাত দীর্ঘ জমি খুঁড়িয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর সেই ব্রাহ্মণকে ৯০ হাত দীর্ঘ ও ৯০ হাত প্রস্থ জমি দান করিয়াছিলেন।

আমি যে ব্রাহ্মণের কথা বলিলাম, তিনি হয়ত সাধারণের মধ্যে ব্যতিক্রম। কিন্তু তাহা হইলেও সেকালের লোকে যে এখনকার অপেক্ষা অনেক বলশালী এবং সাহসী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটে ডুমুরদহ গ্রামে আশানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি নাকি লাঠি ঘুরাইবার মত একটা ঢেঁকি ঘুরাইয়া একবার একদল ডাকাতকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেকালের লোকের শারীরিক শক্তিও যেরূপ ছিল, মানসিক শক্তি এবং স্মৃতিশক্তি তদনুরূপ ছিল। সে শক্তি বাঙালী হারাইল কেন? একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, ইংরেজ এদেশে ব্যবসা করিতে আসিলেও তাহারা বীরের জাতি। সেকালের ইংরেজ রাজপুরুষগণ বাঙালীকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহারা উপেক্ষণীয় নহে। ছলে, বলে, কৌশলে ইহাদিগকে শক্তিহীন করিতে না পারিলে নিশ্চিন্তভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিতে পারা যাইবে না। তাই তাহারা এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, হিন্দু আমলে এবং মুসলমান আমলে রাজারা কখনও লোকশিক্ষায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। সে ভার ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক এবং মুসলমান মৌলবীদিগের উপর ছিল। সেকালের রাজপুরুষগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যেই বাঙালীকে দুর্ব্বল করিতে হইবে।

ইংরেজ রাজপুরুষেরা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিজের হাতে ধীরে ধীরে তুলিয়া লইলেন। ইহার জন্য তাঁহারা প্রচুর অর্থব্যয়ে অগ্রসর হইলেন। লর্ড ক্লাইভ উমিচাঁদকে

বিশ লক্ষ টাকা উৎকোচের প্রলোভন দেখাইয়া এবং মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসন উৎকোচ দিয়া বাংলাদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। বাংলার অধীশ্বর হইয়া তাঁহারা সেই উৎকোচের স্রোত অব্যাহত রাখিলেন। কোন বাঙালী কুড়ি-পঁচিশটা ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলে তাহাকে উচ্চহারে কমিশনের লোভ দেখাইয়া, বা উচ্চহারে বেতন দিয়া আপনাদের কার্য্যের সহকারী করিয়া লইতে লাগিলেন। তখন সকলেই ইংরাজী শিখিয়া বড় মানুষ হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইল। বাংলার শিক্ষার স্রোত ফিরিয়া গেল। ইংরেজ রাজপুরুষগণ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীকে উচ্চবেতনে বাংলার বাহিরেও অধ্যাপক শিক্ষক বা বিচারকের পদে নিযুক্ত করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইতে লাগিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইংরেজ সৈনিকদিগের সাহায্যে ভারত জয় করেন নাই। জয় করিয়াছেন ভারতীয় সৈনিকের এবং ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীর সাহায্যে। তখনকার ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরা বুঝিতে পারেন নাই যে ইংরাজের কূটকৌশল প্রত্যেক ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীকে মীরজাফর ও উমিচাঁদের দলভুক্ত করিয়া লইতেছে। এই ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রাজপুরুষগণ বাঙালী যুবকদিগকে শিখাইতে লাগিলেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী বাঙালী শিখ, পাঞ্জাবী, মারাঠা বা গুর্খাদের ন্যায় সামরিক জাতি নহে। বাঙালী জাতি অসামরিক। সাধারণ সৈনিকদিগের মত তাহারা মারামারি কাটাকাটিতে দক্ষ নহে। তাহারা বুদ্ধিমান। সেইজন্য তাহারা উচ্চতর রাজকার্য্যের।

দশচক্রে ভগবান ভূত হইল। ইংরেজ রাজপুরুষগণের দুর্নীতির চক্রান্তের ফল ফলিল। বাঙালীদের মনে ধারণা হইল যে, তাহারা সামরিক জাতি নহে। তাহাদের বাহুবল নাই, সাহস নাই, তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে জানে না। তাহারা বুদ্ধিমান হইলেও সে বুদ্ধি কেরাণীগিরি ভিন্ন অন্য কোন খাদে প্রবাহিত হয় না। বাঙালীর এই শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ—তাহারা অন্নভোজী ‘ভেতো বাঙালী’। এই ধারণা বাঙালীর মনে বদ্ধমূল হওয়াতে তাহারা শরীরচর্চ্চার প্রতি বিমুখ হইল। শিক্ষিত বাঙালীরা অর্থোপার্জ্জনের জন্য পল্লীগ্রামে নিজ নিজ পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া রাজধানী কলিকাতা এবং মফঃস্বলের শহরগুলির দিকে ধাবিত হইল। ফলে পল্লীগ্রামগুলি ধ্বংস হইতে লাগিল এবং নগরগুলি ক্রমশঃ স্ফীত কলেবর হইতে লাগিল। রাজধানীর আয়তন বর্দ্ধিত হওয়াতে সন্নিহিত বহু গ্রাম রাজধানীর সহিত মিলিত হইতে লাগিল।

পল্লীগ্রাম হইতে আগত লোকেরা রাজধানীতে আসিয়া দেখিল যে, কলিকাতায় থাকিলে তাহাদিগকে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইবে না। দশটা-পাঁচটা আপিসে চাকরি করিলে তাহারা স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। ইহা তাহাদের পক্ষে বড় সামান্য প্রলোভন নহে। বাঙালী ধনবানদিগের অট্টালিকা দেখিয়া গ্রাম হইতে আগত ব্যক্তিরা ঈর্ষান্বিত হইল। তাহারা রাজধানীবাসী ধনবানদিগের আচার-ব্যবহার এবং বিলাসিতা দেখিয়া তাহাই কাম্য বলিয়া স্থির করিল। ফলে ধনবানের বিলাসিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাটীতেও ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিল। বহুমূল্য গৃহশয্যা, জুড়িগাড়ী প্রভৃতি বহু ব্যয়সাধ্য, কিন্তু উহা অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে ধনবানের আহার্য্য

জনসাধারণও পাইতে পারে। আমি পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে ('আমাদের পরিচ্ছদ') স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা অভিমতের উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিতেন, বাঙ্গালীর সংসারে যতপ্রকার পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তন্মধ্যে ভোজন-বিলাসিতাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট পাপ। তাঁহার এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমরা আজকাল স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া রসনার তৃপ্তির জন্যই বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছি। এখনকার ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ভোজের নিমন্ত্রণে যে সকল ভোজ্য পদার্থ খাইয়াছি, তাহা বর্ত্তমান কালে সম্পূর্ণ অচল। সেকালে ভোজের বাড়ী ব্যতীত লুচি-সন্দেশের দর্শনলাভ অনেকের ভাগ্যেই ঘটিত না। আর আজকাল দেখিতে পাই, অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতেই জলযোগের জন্য প্রত্যহ লুচি, পরোটা ও মোহনভোগ প্রস্তুত হয়। সেকালের ভোজে লুচির সহিত একটা তরকারি, পটল বা বেগুন ভাজা এবং শেষে দধি ও সন্দেশ হইলেই লোকে কর্ম্মকর্ত্তার যথেষ্ট প্রশংসা করিত। যে সকল দ্রব্য আমাদের শরীরের পক্ষে উপকারী নহে, তাহা আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিত না। মাছের সহিত দুগ্ধ খাইলে শরীরে বিষক্রিয়া হয়। কবিরাজী শাস্ত্রমতে উহা বিরুদ্ধভোজন। আর আজকাল 'দই-মাছ' বিলাসীদের একটা উপাদেয় খাদ্য।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের শহর অঞ্চলে সাধারণতঃ সিদ্ধ চাউলের ভাত খাই। কিন্তু সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউলের ভাত সমধিক পুষ্টিকর ও শক্তিপ্রদ। আমাদের এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতীয়া বিধবারা সিদ্ধ চাউলের অন্ন ভক্ষণ করেন না। তাঁহারা প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে একবার মাত্র আলোচালের অন্ন ভক্ষণ করেন। রাত্রিতে অনেকেই সামান্য পরিমাণ ফলমূল ও দুগ্ধ খাইয়া থাকেন। সকলেই জানেন যে ঐ সকল বিধবার স্বাস্থ্য সধবাদিগের স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। এই স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান কারণ ব্রহ্মচর্য্য এবং অল্প ভোজন। আমরা সাধারণতঃ ভাতের ফেন অর্থাৎ মাড় ফেলিয়া দিই। যাঁহাদের বাড়ীতে গরু আছে, তাঁহারা ভাতের ফেন গরুকে দিয়া থাকেন। কারণ আমরা জানি না যে, ভাত অপেক্ষা ফেন অধিকতর পুষ্টিকর। ইতিহাস পাঠকগণ অবগত আছেন যে, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে টিপু সুলতানের সহিত ইংরেজের যুদ্ধকালে একসময়ে ইংরেজের শিবিরে অন্নাভাব হইয়াছিল। ইংরেজ সেনাপতি মহাবিপদে পড়িলেন। ইংরেজের ভারতীয় সেনারা না খাইয়া কিরূপে যুদ্ধ করিবে? তাঁহার অধীন ভারতীয় সৈনিকেরা এ সঙ্কটের প্রতিকার দেখাইয়া দিল। তাহারা বলিল, "আমরা ভাত খাইব না, আমরা ভাতের ফেন খাইয়া থাকিব। শ্বেতাঙ্গ সৈনিকেরা ভাত খাইয়া যুদ্ধ করুক।" এই ব্যবস্থার ফলে ইংরেজ সৈন্যের অন্নাভাব ঘুচিল। এই যুদ্ধে দেশী সিপাহীরা শ্বেতাঙ্গগণের অপেক্ষা কণামাত্রও ন্যূন বিক্রম প্রকাশ করে নাই। শ্বেতাঙ্গ ঐতিহাসিকগণ এবং ইংরেজ সেনাপতিরা দেশীয় সৈনিকদের এই স্বার্থত্যাগের জন্য অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন না যে, ভারতীয় সিপাহীরা অন্নের সার অংশ অর্থাৎ ফেন নিজেরা খাইয়া অবশিষ্ট অপেক্ষাকৃত অসার ভাগ, অর্থাৎ ভাত শ্বেতাঙ্গদিগকে খাইতে দিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার এক নিকট আত্মীয় খুলনায় বাস করিতেন।

পাকিস্তান হইবার পর তাঁহারা খুলনা ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা আমার অবস্থা অপেক্ষা অনেক উন্নত। আমি তাঁহাদের বাড়ীতে দেখিয়াছি, প্রত্যহ প্রাতঃকালে একহাঁড়ি আলোচালের ভাত সিদ্ধ করা হইত। বাড়ীর প্রত্যেকে বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে, প্রত্যহ সকালে সেই ফেনসুদ্ধ ভাত বা 'ফেন-ভাত' ঘৃত ও একটু লবণ সহযোগে ভোজন করিত। উহাই ছিল তাঁহাদের প্রাতরাশ অর্থাৎ জলখাবার। এ দেশের কারাগারে ঐরূপ 'ফেন-ভাত' খাওয়াইয়া জলযোগের কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। কারাগারের ভাষায় ঐ ভাতের নাম 'লপসি'।

বৎসর আষ্টেক পূর্ব্বে আমি একবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমি তখন চন্দননগরের বাটীতে থাকিতাম। জ্বর ছাড়িয়া জ্বর আসিত। চিকিৎসক আমায় কুইনাইন ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু জ্বর বন্ধ হইল না অধিকন্তু উদরাময় দেখা দিল। কোন পথ্যই হজম হইত না। দুইটা পায়ে শোথ দেখা দিল। আমার পুত্র চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার অবস্থা কি রকম মনে করেন?" উত্তরে ডাক্তার বলিলেন, "আগামী পূর্ণিমা পার না হইলে কিছু বলিতে পারি না।" আমার এক নিকট আত্মীয় কলিকাতায় চিকিৎসা করিতেন। তিনি আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আমাকে তাঁহার কলিকাতার বাসায় লইয়া আসিলেন। তিনি আমার রোগের ইতিহাস শুনিয়া আমার সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে প্রথমেই আপনার শরীরে যাহাতে শক্তিসঞ্চার হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" তিনি ব্যবস্থা করিলেন, আমাকে প্রত্যহ দুই কাপ বা তিন কাপ করিয়া ফেন খাইতে হইবে। লেবুর রস বা লবণমিশ্রিত ফেন তিন-চারি দিন খাইবার পর তিনি ফেনের সহিত অল্প পরিমাণ দুগ্ধ সেবনের ব্যবস্থা করিলেন। এই দুধ ফেনের সহিত লবণ বা লেবুর রস না দিয়া চিনি সহযোগে খাইতে বলিলেন। তাঁহার ব্যবস্থায় আমি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম। তদবধি আজ পর্য্যন্ত আমি প্রত্যহ ভাত খাইবার সময় একবাটি করিয়া ফেন খাই। আমার এই আত্মীয় চিকিৎসকের বাটীতে কোনদিন ফেন ফেলিয়া দেওয়া হয় না। পরিবারস্থ সকলেই অন্নাহারের পূর্ব্বে এক বাটি বা দুই বাটি করিয়া ফেন খাইয়া থাকেন।

আমরা সাধারণতঃ ভদ্রসমাজে সরু চাউলের ব্যবহারই দেখিতে পাই। কিন্তু বাংলার মফঃস্বলে কৃষক এবং শ্রমজীবীরা সরু চালের ভাত খায় না। তাহারা মোটা মোটা লাল রঙের চালই খাইয়া থাকে। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের রেশন ব্যবস্থার কল্যাণে আমরাও মাঝে মাঝে ওরূপ মোটা ও লাল চালের আস্বাদ পাইয়াছি। অধিকন্তু তাহার সহিত কিছু কিছু ধান-কাঁকরও উদরস্থ করিয়াছি।

পশ্চিমবঙ্গের শহর অঞ্চলে আজকাল যেরূপ মিষ্টান্নবাহুল্য দেখিতে পাই, এখন হইতে পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে অবাঙালী মিষ্টান্ন বিক্রেতারা নানাপ্রকার ক্ষীরের খাবার এবং নানাপ্রকার লাড্ডু ও বরফি বিক্রয় করিত। বাঙালী ধনবানেরা প্রীতিভোজে বড়বাজার হইতে ঐ সকল খাবার আনাইতেন। আজকাল আর কাহাকেও বড়বাজারে ছুটিতে হয় না। কলিকাতার

যে কোন পল্লীতে বাঙালীর মিষ্টান্নের দোকানে বড়বাজারের মত নানা প্রকার মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বিজয়া দশমী, দেওয়ালী এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে মিষ্টান্নের দোকানগুলি যেরূপ সাজানো হয়, তাহা দেখিয়া ক্রেতাকে নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে হয়, কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা কিনি। আমরা যে অর্থব্যয় করিয়া একরূপ বিষ কিনিয়া খাই, তাহা একবারও ভাবি না। আমার নিজের অভিজ্ঞতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমি কলিকাতার একটি মেসে কয়েক বৎসর বাস করিতেছিলাম। সেই সময়ে একদিন অপরাহ্নে বাসার দাসীকে দোকান হইতে কিছু টাটকা খাবার আনিতে বলিলাম। সে আমার কথামত দুইটি গরম সিঙ্গাড়া এবং একটি মিষ্টি আনিয়া আমাকে দিল। সিঙ্গাড়াগুলো অত্যন্ত গরম দেখিয়া একেবারে মুখে না পুরিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। সেই ভাঙ্গা সিঙ্গাড়ার ভিতরে দেখিলাম, ভিতরের আলুগুলো ছাতায় পরিপূর্ণ। দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে সেগুলো অন্ততঃ চার-পাঁচ দিনের পুরাতন। দোকানদার সেই সব বাসি, পচা মাল ফেলিয়া না দিয়া রোজ একবার করিয়া গরম ঘৃতে ভাজিয়া টাটকা বলিয়া খরিদ্দারকে বিক্রী করে। খরিদ্দারও গরম খাদ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হয়। অতিশয় গরম বলিয়া সিঙ্গাড়াগুলি যদি না ভাঙ্গিতাম ত আমিও খাইয়া ফেলিতাম। এইরূপ পচা খাবার উদরস্থ করিলে উহাতে আমাদের পাকস্থলীতে বিষের কার্য্য করে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

আমার এই পচা খাবার সম্বন্ধে জ্ঞান পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বেকার অভিজ্ঞতালব্ধ। তাহার পর এই সুদীর্ঘকালে বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতায় ভেজাল খাদ্যের ধীরে ধীরে কিরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ়গণের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় একটা জনরব প্রচারিত হইয়াছিল যে, কোন কোন অসাধু ঘৃত-ব্যবসায়ী অতিরিক্ত লাভের আশায় ঘৃতের সহিত চর্ব্বি ভেজাল মিশাইতেছে। এই জনরব প্রচারিত হইবামাত্র কলিকাতার শত শত অবাঙালী ব্যবসায়ী চর্ব্বি-ভেজাল রূপ পাপ হইতে মুক্তিলাভের আশায় নিজ নিজ মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। বিস্ময়ের বিষয়, এই ঘটনার পর হইতে কলিকাতার বাজারে বিশুদ্ধ গব্য বা ভঁয়সা ঘৃত অদৃশ্য হইতে লাগিল। আমি ইহার পূর্ব্বে প্রতি মাসে সংসারে ব্যবহারের জন্য কলিকাতা হইতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা মণ হিসাবে ভঁয়সা ঘৃত কিনিয়া লইয়া যাইতাম। সেই ঘৃতের মূল্য দেখিতে দেখিতে বৎসরখানেকের মধ্যে এক শত টাকায় উঠিল আর ঘৃতে ভেজালও তত বাড়িতে লাগিল। আমাদের বাড়ীতে চিরকালই গরু থাকিত। আমার জননী গৃহজাত দুগ্ধ হইতে বাটীতেই গব্যঘৃত প্রস্তুত করিতেন। উহা আমরা ভাতের সঙ্গে খাইতাম। আমরা কখনও গব্যঘৃত কিনিয়া খাই নাই। যে সময়ে ঘৃতে চর্ব্বি মেশান সংবাদ প্রচারিত হইল, আমি তখন 'হিতবাদী'র সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। এই ঘৃতে ভেজালের মূল ব্যাপারটা কি, অনুসন্ধান করিবার জন্য বড়বাজারে গিয়াছিলাম। অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিলাম, যে সকল অবাঙালী ঘৃত-ব্যবসায়ী ঘৃতে ভেজাল দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এখন সাধু সাজিয়া অবাধে ঘৃতে

ভেজাল মিশাইতেছে এবং নিজেরা বিশুদ্ধ ঘৃত বিক্রয় করে বলিয়া ঘৃতের মূল্য বাড়াইয়া দিতেছে। অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত অসাধু ব্যবসায়ীরা, 'লোটা-কম্বল' সম্বল করিয়া কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক 'বুদ্ধিমান' বাঙালীকে ঠকাইয়া তিন-চার বৎসরের মধ্যেই কলিকাতায় চার-পাঁচ তলা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে। আর আমরা 'শিক্ষিত' বাঙালী বি-এ, এম-এ পাস করিয়া চাকরীর জন্য তাহাদের দয়া ভিক্ষা করিতেছি।

যখন ঘৃতে ভেজাল অবাধে চলিতে লাগিল, তখন নারিকেল তৈল, সর্ষপ তৈল, আটা, ময়দা, গুড় এবং চিনিই বা বিশুদ্ধ থাকিবে কেন? এখন অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে শাক-সব্জী, ফল-মূল ও চাউল-ডাইল ব্যতীত কোন খাদ্যদ্রব্যই বিশুদ্ধ পাওয়া যায় না। আমার একজন বন্ধু একদিন আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার কিছু ভেজাল সরিষার তৈলের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি শ্যামবাজার হইতে বালীগঞ্জ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ভেজাল তৈল কোথাও কিনিতে পারেন নাই। তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তুমি ভুল করিয়াছ। যে দোকানে লেখা আছে 'খাঁটী সরিষার তৈল' সেই দোকানে তৈল কিনিলেই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইত।" আমি একবার আমাদের বাসাতেই দেখিয়া-ছিলাম, স্নানের পূর্ব্বে তেল মাখিবার জন্য একটা বাটিতে নারিকেল তৈল, আর একটা বাটিতে সরিষার তৈল লইয়াছি, কিন্তু উহার ঘ্রাণ লইয়া বুঝিতে পারিলাম না যে কোন্‌টা নারিকেল তৈল, আর কোন্‌টা সরিষার তৈল; তবে ঈষৎ পীতাভ বর্ণ দেখিয়া সেইটাই সরিষার তৈল বলিয়া অনুমান করিলাম। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিবেন, আমরা অর্থাৎ শহরবাসী বাঙালীরা কেন ক্রমে ক্রমে কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছি।

দৈনিক পত্রের পাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আজকাল কলিকাতার মিউনিসিপাল করপোরেশন পুলিসের সহযোগিতায় শহরে ভেজাল খাদ্য এবং ভেজাল ঔষধ বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। করপোরেশনের কর্ম্মচারীরা প্রত্যহ ত্রিশ-চল্লিশ জন ভেজাল বিক্রেতার দোকান অনুসন্ধান করিয়া দোকানদারকে গ্রেপ্তার করিতেছে ও তাহাদিগকে হাজতে চালান দিতেছে। যাহারা শহরের শান্তি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দায়ী, তাহাদের কর্ত্তব্য এখানেই শেষ হইতেছে। কিন্তু তাহার পর ধৃত অপরাধীদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইয়াছে বা হইতেছে? কদাচিৎ দুই-এক দিন কাগজে দেখিতে পাই যে, দুই-একজন ক্ষুদ্র মুদীর দোকানে দুই বা আড়াই সের সরিষার তৈল বা নারিকেলের তৈল রাসায়নিক পরীক্ষায় ভেজাল প্রমাণিত হওয়াতে অপরাধীদিগের পাঁচ, দশ বা কুড়ি টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। কিন্তু যে সকল আড়তদার বা তেল-কলওয়ালাদের দোকানে শত শত মণ ভেজাল তৈল, ভেজাল আটা-ময়দা, ভেজাল চিনি গুদামজাত হইয়া আছে, তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইয়াছে বা হইতেছে? আমি যখন 'হিতবাদী'তে কার্য্য করিতাম তখন আমার সুপরিচিত এক ভদ্রলোক আমাদের আপিসে আসিয়া আমাকে একটা কাগজের মোড়ক দিলেন এবং বলিলেন, "এ জিনিসটা কি বলুন দেখি?" আমি মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে দুই তোলা বা আড়াই তোলা চিনি রহিয়াছে। 'উহা চিনি' আমি এই

কথা বলাতে তিনি বলিলেন, "একটু জিভে দিয়ে দেখুন না?" আমি সেই চিনি অত্যল্প পরিমাণে লইয়া জিহ্বাতে দিলাম, কিন্তু কোন স্বাদ পাইলাম না এবং উহা জিহ্বার লালাস্পর্শে গলিয়াও গেল না। তখন তিনি বলিলেন—উহা চিনি নহে, খুব সূক্ষ্ম বালির কণা। তাঁহার বাড়ীতে খাবার প্রস্তুতের জন্য চিনির রস প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সেই রসের পাত্রের তলদেশে ঐগুলি জমিয়াছিল। উহা ছাঁকিয়া লইয়া একবাটি জলে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু উহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা আপিস হইতে সেই 'চিনি' এবং তৎসহ একখানি পত্র করপোরেশনের তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। করপোরেশন আপিসের কর্ম্মচারীরা আমাদের আপিসের পিওন বুকে স্বাক্ষর করিয়া সেই পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকারও করিয়াছিলেন। কিন্তু তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে আমরা কিছুই জানিতে না পারায় পুনরায় করপোরেশন আপিসে পত্র লিখিলাম। তাহার উত্তর পাইলাম—অনুসন্ধান চলিতেছে। এটা ১৯১০ কি ১৯১১ সনের কথা। সে অনুসন্ধান বোধহয় এখনও শেষ হয় নাই।

যদি কোন দুর্বৃত্ত অর্থের লোভে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি করে এবং গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, গৃহবাসিগণকে আঘাত করে, তাহার পর সেই দুর্বৃত্ত ধরা পড়িলে বিচারে তাহার দীর্ঘকাল কারাদণ্ড, দ্বীপান্তরবাস, এমনকি প্রাণদণ্ডেরও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল স্বার্থপর ব্যক্তি অর্থের লোভে দেশের লোককে ভেজাল খাদ্য ও ভেজাল ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে ও তাহাদিগকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতেছে, তাহারা কি দস্যুদলের অপরাধ অপেক্ষা কম অপরাধে অপরাধী? এ প্রশ্ন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? কে ইহার সদুত্তর দিবে?

আমরা স্বাধীন হইয়াছি। বিদেশী অর্থলোভী বণিকেরা এখন আর আমাদের ভাগ্য-বিধাতা নহে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর কোন্ স্বাধীন ও সুসভ্য দেশে অর্থলোভে এইরূপ দুষ্কার্য্য চলিতেছে? ইহা কি আমাদের ভাগ্যলিপি?

আমাদের শিষ্টাচার

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই নানাপ্রকার শিষ্টাচার প্রচলিত আছে। সুসভ্য উন্নত সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকথিত অসভ্য অনুন্নত সমাজও একেবারে শিষ্টাচারবর্জিত নহে। বলা বাহুল্য, সকল সমাজের শিষ্টাচার একই প্রকার নহে। অনেক স্থলে আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সমাজের লোক যাহাকে শিষ্টাচার বলিয়া মনে করে, অপর সমাজের লোক তাহাকেই চরম অশিষ্ট আচরণ বলিয়া গণ্য করে। আমাদের এই বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজে গুরুজনের সহিত কথা কহিবার সময় অবনতমস্তকে বা নত-নয়নে কথা বলা শিষ্টাচার বলিয়া গণনীয়। কিন্তু ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংরেজ বা ফরাসী সমাজে কোন গুরুজনের সহিত কথা কহিবার সময় তাঁহার চোখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথা কহিতে হয়। ইহার অন্যথা হইলে তাহা অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য হয়।

আমাদের সমাজে গুরুজনের পার্শ্বে থাকিয়া পথ অতিবাহন করা অশিষ্টতা। গুরুজনের সহিত পথে চলিবার সময় তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে থাকাই আমরা শিষ্টতা বলিয়া মনে করি। তাহাতে গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। কিন্তু ইংরেজ-সমাজে এইরূপ পশ্চাতে থাকা শিষ্টাচার বলিয়া গণ্য নহে।

ফরাসী-সমাজে যুবক পুত্র পিতামাতার সহিত এরূপ বিষয় লইয়া আলোচনা করে যাহা আমরা অভব্যতার নিদর্শন বলিয়া মনে করি। এমনকি অনেক সময় মনে হয় যে উহা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে। ইউরোপীয় সমাজে পিতাপুত্রে কথোপকথন-কালে পিতাপুত্র পরস্পরকে সিগার, সিগারেট ও দিয়াশলাই প্রদান করা শিষ্টাচার-বহির্ভূত নহে। কিন্তু আমাদের সমাজে গুরুজনের সম্মুখে ধূমপান করা যৎপরোনাস্তি অশিষ্ট বলিয়া গণনীয়। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ধূমপায়ী যুবক বা প্রৌঢ় গুরুজনের হাত হইতে হুঁকা লইয়া কিঞ্চিৎ অন্তরালে গিয়া ধূমপান করে; তাহাতে কোন দোষ হয় না। এই অন্তরালে ধূমপান এমন এক হাস্যকর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমি দেখিয়াছি, অনেক বয়োবৃদ্ধ প্রতিবেশীর হাত হইতে হুঁকা লইয়া নিজের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উত্তোলনপূর্ব্বক ধূমপান করেন। ওরূপ তর্জ্জনী উত্তোলনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলেন যে, উহা অন্তরালের নিদর্শন। ধূমপান-কালে এইরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু নস্যগ্রহণ-কালে এইরূপ শিষ্টতা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। যেন ধূমপানটাই নেশা, আর নস্য ব্যবহার নেশা নহে।

আমাদের পারিবারিক ব্যাপারেও এককালে যে সকল শিষ্টাচার প্রচলিত ছিল, এখন তাহার বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেকালে পুত্রবধূ শ্বশুরের সহিত এবং পরিবারস্থ অন্যান্য পুরুষ গুরুজনের সহিত কখনও কথা কহিত না। তাঁহাদের সম্মুখে অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া থাকিত। শ্বশুর বা ভাসুর কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাহার উত্তর দিত। ভাশুর বা মামাশ্বশুর যদি দৈবাৎ ভ্রাতৃবধূ বা ভাগিনেয়-বধূকে স্পর্শ করিয়া ফেলিতেন, এমনকি বধূর অঞ্চলের সহিত স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের সংস্পর্শ ঘটিত, তাহা হইলে তাঁহারা স্নান করিতেন। ইহা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বহুকাল পূর্ব্বে আমি একদিন শীতকালে অপরাহ্ণে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেখানে পাঁচ-সাত মিনিট থাকিবার পর দেখিলাম, আমার বড় শ্যালক পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া উপস্থিত। অসময়ে স্নানের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আপিস হইতে আসিয়া ধূমপান করিতেছি, এমন সময় ছোট বৌমা (অর্থাৎ, তাঁহার ভ্রাতৃবধূ—তের বৎসরের বালিকা) নিকট দিয়া যাইবার সময় আঁচল দ্বারা আমাকে স্পর্শ করিয়াছেন, তাই এই সন্ধ্যাবেলা আবার পুকুরে ডুব দিয়া আসিলাম।" অবশ্য, কলিকাতা অঞ্চলে বা মফঃস্বলের শহরে এইরূপ শিষ্টাচার আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সেকালে স্বামীর বন্ধুদের সহিত কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। আমার পিতা আমাদের পরিবার-মধ্যে শ্বশুরের সহিত ও ভাসুরের সহিত নববধূদিগকে কথা বলিতে আদেশ করেন। তিনি বলিয়া

দিয়াছিলেন, শ্বশুরকে 'বাবা' বলিয়া এবং ভাসুরকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিও এবং তাঁহারই আদেশে বধূরা নিকট-বন্ধুদের সহিতও কথা কহিতে আরম্ভ করে। আমাদের বাটীর এই 'অদ্ভুত' প্রথা দেখিয়া পাড়ার বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা আমার পিতাকে 'বেহ্ম', 'ক্রিটান' বলিয়া মনে করিতেন। আজকাল বোধ হয়, সুদূর মফঃস্বলে অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিকসমাজে বধূর ঐরূপ স্বাধীনতা এখনও হয় নাই। তবে শিক্ষিত এবং ভদ্রসমাজে বধূদের এই স্বাধীনতা হইয়াছে।

কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে হাজার হাজার মাড়োয়ারী ও অবাঙালী ব্যবসায়ীর বাস। যাঁহারা কর্ম্মোপলক্ষে ওই মাড়োয়ারী মহলে সর্ব্বদা যাতায়াত করেন তাঁহারা জানেন যে, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী মহিলারা সর্ব্বদাই আবক্ষলম্বিত অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া রাজপথে পুরুষ-জনতার মধ্যে বেশ স্বচ্ছন্দে, অসঙ্কোচে যাতায়াত করেন এবং ঐ মহিলারা বেশ উচ্চকণ্ঠে পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের শিষ্টাচার ব্যাহত হয় না। কিন্তু অবগুণ্ঠনটা আবক্ষলম্বিত হওয়া চাই। আমি দেখিয়াছি, বিবাহ প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে রাজপথে অবগুণ্ঠিতা মাড়ায়ারী মহিলারা বেশ উচ্চ কণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে যাতায়াত করেন। উহাদের সমাজের এই শিষ্টাচার আমাদের বাঙালী সম্ভ্রান্ত সমাজে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বলিয়া মনে হয় না কি?

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, পৃথিবীর সকল দেশে সকল সমাজেই অল্পাধিক শিষ্টাচার প্রচলিত আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে, মুসলমানসমাজে শিষ্টাচারের যেরূপ প্রবলতা, সেরূপ অন্য কোন সমাজে নাই। তুরস্কদেশবাসী মুসলমানগণ ইউরোপের অন্যান্য দেশে 'Gentlemen of Europe' অর্থাৎ ইউরোপের ভদ্রলোক বলিয়া অভিহিত হইতেন। মুসলমান শিষ্টাচার প্রদর্শনে কাহারও নিকট ন্যূনতা-স্বীকারে সম্মত নহেন। কোটিপতি মুসলমান তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মুসলমানকে আহ্বান করিবার সময় বলেন, 'আইয়ে মেরি গরীব-খানামে', অর্থাৎ গরীবের কুটীরে আসুন। আবার অন্য লোকের আবাসের উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহারা বলেন, 'আপকা দৌলতখানা', অর্থাৎ আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। পথ চলিবার সময় যদি দুইজন শিক্ষিত মুসলমান একসঙ্গে অগ্রসর হন তাহা হইলে প্রত্যেকেই অপরকে অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্য অনুরোধ করেন। এই ভদ্রতার একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের গল্প আমরা কৈশোরে ও যৌবনে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে এবং কলেজে পড়িবার সময় অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। যাঁহারা হুগলী কলেজ-ভবন দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, কলেজের দ্বিতলে উঠিবার জন্য গাড়ীবারান্দা হইতে একটি দক্ষিণে অপরটি উত্তরে— এই দুইটি প্রশস্ত সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দুইটি দ্বিতলে একই স্থানে মিলিত হইয়াছে। কলেজভবনে দুইটি পৃথক বিদ্যায়তন আছে। একটি ইংরাজী বিভাগ অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত, অপরটি মাদ্রাসা। মাদ্রাসায় উর্দ্দু, ফারসী ও আরবী পড়ানো হয়। এই উভয় বিভাগই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষের অধীন। আরবী ও ফারসী বিভাগের মৌলবী দুইজন সমবেতনভোগী ও সমপদমর্য্যাদাসম্পন্ন এবং প্রায়

সমবয়স্ক। একদিন আরবী মৌলবী ও ফারসী মৌলবী ঠিক একই সময়ে কলেজের ফটকে উপস্থিত হইলেন এবং গল্প করিতে করিতে গাড়ীবারান্দা পার হইয়া সিঁড়ির নিকটে উপস্থিত হইলেন। এইখানে গোল বাধিল, কে অগ্রে সিঁড়িতে পদার্পণ করিবেন। আরবী মৌলবী ফারসী মৌলবীকে বলেন, "জনাব, আপ উঠিয়ে।" ফারসী মৌলবী সাহেবও বলেন, "নেহি, নেহি জনাব, আপ উঠিয়ে।" পাছে শিষ্টাচার ক্ষুণ্ণ হয়, সেইজন্য কেহই প্রথমে সিঁড়িতে পদার্পণ করিতে সম্মত নহেন। কলেজ বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকেরা এবং ছাত্রগণ নিজ নিজ ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। পাঠ আরম্ভের ঘণ্টা বাজিল। কলেজ বিভাগ নিস্তব্ধ হইল। কিন্তু মাদ্রাসা বিভাগে আরবী ও ফারসী শ্রেণীর মৌলবীরা অনুপস্থিত থাকাতে ছেলেরা পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা ও গোলমাল করিতে লাগিল। সেই গোলমাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল থোয়েটস সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি বেয়ারাকে বলিলেন, "মাদ্রাসায় গোলমাল হইতেছে কেন জানিয়া আইস।" ক্ষণকাল পরে বেয়ারা গিয়া খবর দিল, আরবী ও ফারসী মৌলবী সাহেবেরা সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কেহই ক্লাসে প্রবেশ করেন নাই। ব্যাপার কি জানিবার জন্য মিঃ থোয়েটস স্বয়ং সিঁড়ির নীচে গিয়া দেখিলেন, মৌলবী সাহেবেরা তখনও "আপ উঠিয়ে, আপ উঠিয়ে" বলিয়া পরস্পরকে আপ্যায়িত করিতেছেন। তখন মিঃ থোয়েটস একজন মৌলবীকে উত্তর দিকের সিঁড়ি দিয়া এবং অন্যজনকে দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে বলিলেন। মৌলবীদের শিষ্টাচার অক্ষুণ্ণ রহিল, তাঁহারা উপরে উঠিয়া গেলেন।

উল্লিখিত বিবরণের মধ্যে হয়ত কিছু অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মুসলমান-সমাজে এই শিষ্টাচারপ্রদর্শনের একটু আতিশয্য আছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। শিষ্টাচারটা হইল সভ্যতার বাহ্যরূপ ও বহিঃপ্রকাশ। যে সমাজ যত সভ্য ও উন্নত, তাহার শিষ্টাচার প্রকাশও তত বেশী। আমি লক্ষ্ণৌ নগরের রাজপথে দেখিয়াছি, দরিদ্র শ্রমজীবী এমনকি কুলীমজুর পর্য্যন্ত সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পথে বেড়াইতে বাহির হয়। তাহার নিকট দিয়া চলিয়া গেলে আতর ও হেনার গন্ধ পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখিয়াছি, তাহাদের বাম হস্ত চাপকানের বামদিকের পকেটের মধ্যে প্রবিষ্ট। আর দক্ষিণ হস্তে কয়েকটা পেস্তা বা বাদাম। গলায় একখানি রেশমী রুমাল বাঁধা। তাহারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলে পরস্পরকে 'আলেকম্ সেলাম' বলিয়া অভিবাদন করে এবং নিজ নিজ দক্ষিণ হস্ত পরস্পরের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন উভয়েই পরস্পরের হাত হইতে একটিমাত্র পেস্তা বা বাদাম তুলিয়া লইয়া অপরকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় এবং একাকী পথে চলিবার সময় বাম পকেট হইতে ছোলা বাহির করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে যায়। অথচ তাহারা সকলেই জানে যে, তাহাদের বাম পকেটে ছোলা ও দক্ষিণ পকেটে পেস্তা বা বাদাম আছে। কিছুদিন তাহাদিগকে দেখিবার পর তাহাদের একজনের মুখ আমার নিকট পরিচিত বলিয়া মনে হইল। সে সময় আমাদের বাসার নিকটে একটা ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইতেছিল। আমি একদিন মধ্যাহ্নে দেখিলাম, আমার সেই পরিচিত মুখ মুসলমান 'ভদ্রলোক'টি চুন-

সুরকি মাখা বালতি মাথায় করিয়া অনাবৃত শরীরে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে রাজমিস্ত্রিদের নিকট যাইতেছে, অর্থাৎ, সে রাজমিস্ত্রিদের নিকট যোগান দিতেছে।

শিষ্টাচারের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য পরস্পরকে অভিবাদন। এই অভিবাদন বিভিন্ন সমাজে কোন-না-কোন ভাবে প্রচলিত আছে। তিব্বতের লোকেরা কোন পরিচিত লোককে পথে দেখিলে জিহ্বা বাহির করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশের নিদর্শন। শুনিয়াছি, আসামে কোন কোন পার্ব্বত্য জাতি অভ্যাগতের সহিত দেখা হইলে তাহার মস্তক বা গাল হইতে নাসিকা দ্বারা নিঃশ্বাস টানিয়া লয়। ফরাসী দেশে প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত পরস্পরের মুখচুম্বন করে। দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গুম্ফযুক্ত লোককে পরস্পরের মুখচুম্বন করিতে দেখিলে আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। অবশ্য, এই চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের করমর্দ্দনও চলিতে থাকে। আমাদের বাংলার হিন্দুসমাজে নানাপ্রকার অভিবাদন-প্রণালী প্রচলিত আছে। কোন গুরুজনের সহিত দেখা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকি। এই প্রণাম করিবার প্রথারও বিভিন্নতা আছে। আমরা 'দণ্ডবৎ' প্রণাম করি অথবা নতজানু হইয়া প্রণাম করি। ইহাতে গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা হয়। দণ্ডবৎ প্রণামের রীতি—ভক্তিভাজন ব্যক্তির সম্মুখে একগাছা লাঠির মত অধোমুখ হইয়া একবার শয়ন করা। ইহাই ভক্তিপ্রকাশের চরম নিদর্শন। ইহার নিম্নতর পর্য্যায় হইতেছে দুই পদের অঙ্গুলি, জানু বা হাঁটু, দুই করতল, নাসিকা এবং কপাল এই অষ্ট অঙ্গ দ্বারা প্রণাম করা, ইহারই নাম অষ্টাঙ্গ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। সন্ধ্যার সময় বা সন্ধ্যার পর শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে 'প্রাতঃপ্রণাম' বলিয়া প্রণাম করে। ব্রাহ্মণেরাও প্রত্যুত্তরে বলেন, 'প্রাতঃজয়স্তু'। এই সন্ধ্যার সময় 'প্রাতঃ' শব্দ উচ্চারণ করা হয় কেন তাহা আমি বলিতে পারি না। প্রণত ব্যক্তির শির চুম্বন করিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করা হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। শ্রদ্ধাভাজন মহিলাদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারা প্রণত ব্যক্তির চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের করাঙ্গুলি চুম্বন করেন। ইহা শিরশ্চুম্বনের নিদর্শন। মুসলমানেরা ভক্তিভাজন ব্যক্তির চরণচুম্বন করিয়া থাকেন। ইহাকে বলে 'কদমবুসি'। কদম অর্থে চরণ, আর 'বুসি' অর্থে 'চুম্বন'। উহা ফারসী শব্দ। বিহারী এবং উত্তরপ্রদেশের লোকেরা ব্রাহ্মণকে দেখিলে 'পাঁও লাগে' বলিয়া ঈষৎ নত হইয়া করজোড়ে নমস্কার করে। উড়িষ্যাবাসীরা প্রণাম করিবার সময় মুখে বলেন, 'দণ্ডবত'। এইরূপ সকল সমাজেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ অভিবাদন-প্রথা প্রচলিত আছে।

আমি এই প্রসঙ্গে একটা প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার পূর্ব্বক্ষণে কোন্ কথা বলিতে হয়, তাহার কোন স্থিরতা নাই। আমার মনে হয়, এস্থলে 'নমস্কার' শব্দের প্রচলন হওয়া উচিত। কোন শূদ্র ভদ্রলোক ব্রাহ্মণকে 'নমস্কার' বলিতে পারেন; আবার ব্রাহ্মণও যদি শূদ্রকে 'নমস্কার' বলেন, তাহাতেই বা আপত্তি কি? মানুষ ত দেবতাকেও 'নমস্কার' বলিয়া অভিবাদন করে। তাহার প্রমাণ, 'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্' অর্থাৎ, নরোত্তম নারায়ণ এবং নরকে নমস্কার করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। আমাদের

সমাজে কোন ব্রাহ্মণের সভায় আগন্তুক কোন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বলিয়া থাকেন,—'ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ'। প্রত্যভিবাদনে সভাস্থ ব্রাহ্মণেরা বলেন,—'নমস্তুভ্যাম্ নমো নমঃ'। আমার মনে হয় এই 'নমস্কার' শব্দ মুখে বলিয়া কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র সকলেরই পরস্পরকে অভিবাদন করা চলিতে পারে। ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না।

ইউরোপীয় সমাজে, বিশেষতঃ ইংরেজ-সমাজে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সময়ের উল্লেখ করিবার রীতি আছে। ইউরোপে রাত্রি ১২টা হইতে নূতন দিবস গণনা করা হয়, অর্থাৎ মধ্যরাত্রি শেষ হইলেই নূতন দিনের প্রভাত আরম্ভ হয়। সেইজন্য মধ্য রাত্রি হইতে বেলা নয়টা-দশটা পর্য্যন্ত ইংরেজরা পরস্পরকে 'good morning' বা 'সুপ্রভাত' বলিয়া অভিবাদন করেন। তাহার পরই ইংরেজদের মতে বেলা তিনটা-চারিটা পর্য্যন্ত 'noon' বা 'মধ্যাহ্ন'। সে সময়ে অভিবাদনে 'good noon' বা 'সু-মধ্যাহ্ন' এবং তৎপরে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত ইঁহাদের মতে 'evening' বা 'অপরাহ্ণ'। অপরাহ্ণের পর ইহাদের মতে রাত্রি। সে সময়ের অভিবাদন-বাক্য, 'good night'। আর একটা অভিবাদন-বাক্য উঁহারা যে কোন সময়ে বিদায়গ্রহণকালে ব্যবহার করেন, 'good-bye'। ইহা 'God be with you'—এই বাক্যের সংক্ষিপ্তরূপ। ইহার অর্থ, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন। ইহা ব্যতীত কোন সমুদ্রগামী ব্যক্তিকে বিদায় দিবার সময় আত্মীয়বন্ধুরা বলেন, 'I wish you a good voyage'। ফরাসীরাও এই বাক্যটি নিজেদের ভাষায় ব্যবহার করেন। বিদায়-অভিনন্দনে ফরাসীরা আর একটি শব্দ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করেন। তাহা হইল—'ও রে ভোয়া'। ইহার অর্থ হইল—'আবার যতক্ষণ না দেখা হয়'। আমাদের সমাজে, প্রথম সাক্ষাতে বা বিদায়কালে এতগুলি পৃথক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পরস্পরকে একই রূপ কথা বলিয়া অভিবাদন করিতে পারেন, এরূপ কথার প্রচলন নাই। ব্রাহ্মণসন্তান শূদ্রকে 'নমস্কার' বলিলে অনেকে তাহাতে আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে 'নমস্কার' বলিবেন কেন? তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া যান যে, নারায়ণ সর্ব্বভূতেই অবস্থিত। হিন্দু যখন প্রস্তর, কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রতিমাকে দেবতা কল্পনা করিয়া প্রণাম করিতে পারে, তখন সেই কল্পিত দেবতা কি অন্য মানুষের শরীরেও বিরাজ করেন না? না, সে দেবতা ব্রাহ্মণের প্রণম্য নহেন? তবে পরস্পরকে নমস্কার বলিতে দোষ কি?

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে পরস্পরকে 'বন্দে মাতরম' বলিয়া নমস্কার করিতে অনেককেই দেখিয়াছি। অনেকে পত্র লিখিবার সময় যেখানে দেবতার নাম লিখিতে হয়, সেই স্থানেও 'বন্দে মাতরম' লিখিয়া পত্র আরম্ভ করিতেন। আজকাল দেখিতে পাই অনেকে 'জয় হিন্দ' শব্দ 'বন্দে মাতরম'এর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করেন।

আমি প্রত্যহ প্রভাতে এবং সন্ধ্যার সময় আমার বাসার সন্নিহিত একটা পার্কে বেড়াইতে যাই। সেখানে দশ-পনের জন ভদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা, এমনকি প্রগাঢ় বন্ধুত্বও হইয়াছে। সেই পার্কে প্রথম দর্শনে আমরা পরস্পরকে 'নমস্কার' করি। কিন্তু বিদয়গ্রহণ-কালে দেখিতে পাই, সকলেই কাহাকেও কিছু না

বলিয়া নিজের খুশী বা সময়মত স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অর্থাৎ, তাঁহারা অভিবাদনের প্রথমটা পালন করিয়া শেষ অংশটাকে অবহেলা করেন। ইহাতে কি শিষ্টাচার ক্ষুন্ন হয় না?

উপসংহারে আর একটি কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের সমাজে দরিদ্র ভিক্ষুকের প্রতিও শিষ্টাচার করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্চা করি। আমাদের সমাজে দরিদ্র ভিক্ষুকের প্রতিও শিষ্টাচার প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। কোন ভিক্ষুক গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী বা গৃহিণী কখনও বলেন না, "ভিক্ষা দিব না" বা "ভিক্ষা পাবে না"। তাঁহারা ভিক্ষুককে বলেন, "মাপ করো", অথবা বলেন, 'ফিরে দেখতে হবে"। বাটীতে যদি ভিক্ষা দিবার মত চাল না থাকে, তাহা হইলে বলেন, "চাল বাড়ন্ত'। আমরা কখনও ভিক্ষুককে হেয় বা হীন বলিয়া মনে করিতাম না। 'ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়া গৃহস্থ কৃতার্থ হন, ভিখারী ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া দাতাকে ধন্য করেন'— এই ধারণা অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের সমাজে বদ্ধমূল আছে। এমনকি, গ্রহীতার চরণ ধারণ করিয়া দাতা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, ইহার নিদর্শন এখনও বাংলার হিন্দুসমাজে বিদ্যামান আছে। আমাদের বিবাহ ব্যাপারে ভাবী জমাতার উরু স্পর্শ করিয়া কন্যাদাতা বলেন, "আমি এই সালঙ্কারা সবস্ত্রা কন্যাকে দান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।" পাত্রও উত্তরে বলেন— "অহং গৃহ্ণামি", অর্থাৎ আমি গ্রহণ করিলাম। উপনয়নের পর উপনীত ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দেওয়া সকলেই পুণ্যকার্য্যে বলিয়া মনে করেন। এমনকি মহিলারা ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিবার জন্য উপবাসী থাকেন। ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিয়া তাঁহারা জলগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্মেও ভিক্ষুগণ জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সন্ন্যাসী, ভিক্ষোপজীবী— জনসাধারণই তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করে এবং উহা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে জাতিভেদ না থাকায় তাঁহারা গৃহস্থের বাটী হইতে ভাত, তরকারি ভিক্ষা পাইয়া থাকেন। আজকাল ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডে ভিক্ষুক-সমস্যা একটি অতি জটিল এবং গুরুতর সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। ইংরেজ সমাজে ভিক্ষাপ্রার্থনা বা ভিক্ষাগ্রহণ একটি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া রাজবিধানে গণ্য। কিন্তু আমাদের সমাজে মুষ্টিভিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকায় এই সমস্যা অতি সহজে সুমীমাংসিত হইয়াছে। এ দেশের বিধানকর্ত্তারাও ইংরেজদিগের অনুকরণে ভিক্ষা করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা প্রায়ই দৈনিক সংবাদপত্রে দেখিতে পাই পুলিস কত জন ভিক্ষুককে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছে, সেই খবর। কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে তাহাদের প্রতিপালনের সুব্যবস্থা হয় কি? এই ভিক্ষুক 'ধরিবার' ব্যবস্থা কলিকাতা এবং হাওড়া প্রভৃতি বড় বড় শহরেই প্রচলিত আছে। কিন্তু মফঃস্বলে ইহা দেখিতে পাই না। আমরা মধ্যে মধ্যে অবাঙালী ভিক্ষুকদের জোরজবরদস্তির কথা শুনিতে পাই। অবাঙালী অর্থাৎ হিন্দুস্তানী ভিখারীরা বলে, "যো দেতাহি নেহি, ও দেতাহি নেহি... লেকিন্ যো দেতা, ও কাহে নেহি দেগা।" অর্থাৎ, যে ভিক্ষা দেয়, তাহার সহিত একটা মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে।

আমাদের আয়, ব্যয় ও অপব্যয়

আমরা আজকাল যে দারুণ অর্থসঙ্কটে পতিত হইয়াছি, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্তশালী গৃহস্থ ভদ্রলোকেরা কিরূপে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। যাঁহার মাসিক আয় এক শত টাকা, অন্ততঃ দুই শত টাকা না হইলে তাঁহার পক্ষে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। এই যে আর্থিক সঙ্কট, এ সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন যাঁহারা চাকুরিজীবী, অর্থাৎ যাঁহারা ইচ্ছা করিলেই নিজের আয় বাড়াইতে পারেন না। দশ টাকা আয় বাড়াইতে হইলে যাঁহাদিগকে প্রভুর, অর্থাৎ বেতনদাতার করুণার উপর নির্ভর করিতে হয়। শ্রমিক, কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা এই অর্থাভাবে কাতর হন নাই। তাঁহারা দেশের অবস্থা দেখিয়া অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরাই নিজেদের আয় বাড়াইয়া লইয়াছেন।

আমরা এই অর্থসঙ্কট সম্বন্ধে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এখন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমার নিজের বাড়ীতে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ এবং পুরাতন জীর্ণ গৃহের সংস্কারের জন্যে কয়েক মাস ধরিয়া রাজমিস্ত্রি ও ছুতার মিস্ত্রি লাগাইতে হইয়াছিল। তখন তাহাদিগকে যে পারিশ্রমিক দিয়াছিলাম, তাহা এইরূপ : রাজমিস্ত্রির দৈনিক পারিশ্রমিক আট আনা, রাজ ছ'আনা এবং মজুরি পুরুষের চার আনা এবং স্ত্রীলোকের তিন আনা। ছুতার মিস্ত্রি আট আনা, সহকারী চার আনা; সম্প্রতি অর্থাৎ গত পৌষ মাসে বাড়িতে গিয়া দেখিলাম, কয়েকটা কাষ্ঠের দ্রব্য মেরামত করিবার জন্য একজন ছুতার মিস্ত্রি লাগাইলে ভাল হয়। আমার এক প্রতিবেশীর গৃহে রাজমিস্ত্রির ও ছুতার মিস্ত্রির কাজ হইতেছিল। আমি এক দিন তাহাদের পারিশ্রমিকের কথা জিজ্ঞাসা করায় ছুতার মিস্ত্রি বলিল, তাহার রোজ সাড়ে তিনটাকা, রাজমিস্ত্রিও বলিল, তাহার রোজ সাড়ে তিন টাকা। আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রোজ এত বাড়াইয়াছ কেন, বাপু?" তাহারা উত্তর করিল, "বাজারদরটা কি রকম একবার ভেবে দেখুন। আমার বাবা যখন আপনার বাড়ীতে কাজ করিয়াছিল, তখন চাউলের দর ছিল তিন টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা। সরিষার তেল এক সের চারআনা, আর এখনকার দর দেখুন দেখি। এক সের চাউল দশ আনা বা বার আনা, সরিষার তেল এক টাকা বার আনা থেকে দু'টাকা। সুতরাং আমাদের রোজ আট আনা থেকে সাড়ে তিন টাকা না করিলে আমরা খাইব কি?" মিস্ত্রি সত্য কথাই বলিয়াছিল। আমাদের ব্যবহার্য্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রের মূল্য যখন আট-দশ গুণ বাড়িয়াছে, তখন তাহাদের পারিশ্রমিক অন্ততঃ সাত গুণ না বাড়াইলে তাহাদেরই বা চলিবে কি করিয়া? মিস্ত্রিরা ত অন্যায় কথা বলে নাই।

আমার প্রথম যৌবনে আমি কলিকাতা আসিয়া যে কাপড়-চোপড় কিনিতাম, অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে যখন অবাধে ম্যানচেষ্টারের কাপড়, জার্ম্মানীর র‍্যাপার ও জাপানের মোজা কিনিতাম, তখন এক জোড়া লাট্টু মার্কা বিলাতী কাপড়ের দর ছিল এক টাকা সাত আনা, জার্ম্মানীর র‍্যাপার একখানা সাড়ে তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকা, আর জাপানী উলটপ মোজা ছ'আনা জোড়া। আর সে দিন—

মাসতিনেক পূর্ব্বে একখানা গামছা কিনিলাম এক টাকা তিন আনা দামে। অর্থাৎ, যে মূল্যে পূর্ব্বে এক জোড়া লাট্টু মার্কা ধুতি কিনিয়াছি, এখন সেই মূল্যে এক খানা গামছা কিনিতে হইতেছে, সুতরাং যাহাদের হাতে আয় বাড়াইবার ক্ষমতা আছে, তাহারা তাহাদের পারিশ্রমিক বাড়াইবে না কেন? আমাদের বাড়ীতে বাগান এবং গোয়ালের কাজ করিবার জন্য যে ভৃত্য ছিল, তাহার মাসিক বেতন সাড়ে তিন টাকা এবং দুই বেলা আহার্য্য পাইত। ইহার উপর ছিল বৎসরে দুইখানা ধুতি, আর দুইখানা গামছা। আর এখন! চাকরকে যদি অন্ন দিতে না হয়, তাহা হইলে ৩০ টাকার কমে কোন লোকই আমার কাছে চাকরি স্বীকার করিবে না। এখানে আর একটা কথা বলি। দুগ্ধ প্রত্যেক বাঙালীর সংসারে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। যাহাদের বাড়ীতে শিশু, বালক-বালিকা, রোগী বা বৃদ্ধ আছে, তাহাদের দুধ না হইলে চলে না। কলিকাতায় আজকাল দুগ্ধের দাম এক সের ১ টাকা; এবার বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, এক টাকায় ১ পোয়া দরে দুগ্ধ কেনা হইতেছে। আমাদের বাড়ীতে কখনও দুধ কেনা হইত না। আমার যত দূর মনে পড়ে, আমরা আশৈশব বাড়ীর গরুর দুধ খাইয়াই মানুষ হইয়াছি। আমার পিতা কর্ম্মোপলক্ষে যখন বিদেশে থাকিতেন, তখনও আমাদের বাসাতে গরু থাকিত। আমার মনে পড়ে, বাল্যকালে আমাদের বাসস্থান চন্দননগরে এক টাকায় এগার সের দুগ্ধ বিক্রয় হইত। তখন দুগ্ধের ক্রেতা কোথায়? সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই গরু, দুধ কিনিবে কে? যাহাদের গরু ছিল না, তাহারাই দুগ্ধ কিনিত। সে সময়ে আর একটা প্রথা ছিল; তাহার নাম 'দুগ্ধ গচ্ছিত রাখা'। আমাদের বাড়ীতে সাধারণতঃ দুই-তিনটা করিয়া গরু থাকিত। গড়ে প্রত্যেক গাভীর দৈনিক তিন সের দুগ্ধ হইত। যদি একসঙ্গে দুই-তিনটা গাভী প্রসব হইত, তাহা হইলে প্রত্যহ ৮/১০ সের দুগ্ধ হইত। কিন্তু আমাদের অত দুগ্ধের প্রয়োজন ছিল না। আমাদের যে প্রতিবেশীর বাড়ীতে দুগ্ধ কম হইত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুগ্ধটা তাহারা লইয়া যাইত। ইহার কোন মূল্য ছিল না। আমরা আবার যখন দুগ্ধাভাবে প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হইতাম, তখন তাহারা সেই গচ্ছিত দুগ্ধ ঋণ-পরিশোধ হিসাবে আমাদিগকে দিত। এইজন্য প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে কখনও দুগ্ধের অভাব হইত না। আমার জননী বাড়ীতে দুগ্ধের সর তুলিয়া তাহা হইতে মাখন ও ঘৃত প্রস্তুত করিতেন। আমরা কখনও গব্য ঘৃত কিনিয়া খাই নাই। আজকাল আমাদের বাড়ীতে আর গরু নাই। সুতরাং ভাতের সঙ্গে খাইবার জন্য সাত টাকা বা আট টাকা সের দরে ভেজাল গব্য ঘৃত কিনিতে হইতেছে। আজকাল আমাদের প্রতিবেশীদের বাড়ীতে আমাদের ন্যায় অনেকেরই গোয়াল শূন্য। প্রায় সকলকেই দুগ্ধ কিনিয়া খাইতে হয়। সে দুগ্ধ পান করিবার সময় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে উহা জলমিশ্রিত দুগ্ধ নহে, উহা 'দুগ্ধমিশ্রিত জল'। আমরা বাল্যকাল হইতে বাড়ীর খাঁটি দুগ্ধ খাইয়া আসিয়াছি বলিয়া এখন এই অষ্টাশি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চলাফেরা করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমাদের পৌত্র-প্রপৌত্ররা কত বৎসর পরমায়ু পাইবে? অথবা পঞ্চাশ বৎসর বয়সেই কি সংসারের ভারস্বরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে না?

আমাদের শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "আয়ুর্বৈ হবিঃ"। হবি অর্থাৎ গব্য ঘৃতই পরমায়ু।

আজকাল অনেককেই বাধ্য হইয়া হবিষ্য করিতে হয়, কিন্তু আমার মনে হয়, কথাটাকে হবিষ্যান্ন না বলিয়া 'দাল্দান্ন' বলিলেই শোভা পায়। দেশে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ত দূরের কথা, ধর্ম্মরক্ষার জন্যও দাল্দা দিয়া হোম করিতে হয়। সুতরাং আমাদের বংশধরগণের, অর্থাৎ পৌত্র, প্রপৌত্রাদির পরমায়ু যে সুদীর্ঘ হইবে না তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

কৃষক, শ্রমিক ও ভৃত্য প্রভৃতি যখন অভাবপূরণের জন্য আয় বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে, তখন উকিল, ডাক্তার, ব্যরিষ্টার আয় না বাড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন কেন? আমরা দেখিয়াছি, চন্দননগরে পাস করা ডাক্তারদের ভিজিট ছিল দুই টাকা, আর 'নেটিভ' ডাক্তারের ভিজিট ছিল এক টাকা। তাঁহারা হয়ত উদারতাবশতঃই যথাক্রমে ষোল টাকা ও আট টাকা ভিজিট করেন নাই। মাত্র দ্বিগুণ বাড়াইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কবিরাজেরাও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন কেন? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগরে একটি আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে কলিকাতা হইতে একজন খ্যাতনামা কবিরাজ সভাপতিরূপে গমন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, কলিকাতার কবিরাজেরা ডাক্তারদের দেখাদেখি ভিজেটের মাত্রা চার গুণ এমনকি ষোল গুণ পর্য্যন্ত বাড়াইয়াছেন। কবিরাজদের পক্ষে এই অর্থলোভ সংবরণ করা কি উচিত নহে? তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, ডাক্তারদের মত কবিরাজেরাও ব্যবসায়ী। কেহ তাঁহাদিগকে যাচিয়া টাকা দিলে তাঁহারা লইবেন না কেন? তিনি বলিলেন যে, যখন তাঁহার ভিজিট চারি টাকা ছিল তখন দৈনিক মাত্র চার-পাঁচটা বাড়ী হইতে তাঁহার 'ডাক' হইত। যেই তিনি ভিজিট আট টাকা করিলেন, অমনি তাঁহার দৈনিক 'ডাক' আট-দশটা হইতে লাগিল। এখন তিনি ষোল টাকা করিয়া ভিজিট লন। আজকাল তাঁহার 'ডাক' এত বাড়িয়াছে যে, তিনি বাড়ীতে আহার করিবার সময় পান না। তাঁহার স্বজাতীয় কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রোগী দেখিতে গিয়া মধ্যাহ্নভোজনটা সেই রোগীর গৃহেই শেষ করিতে বাধ্য হন।

কলিকাতার ধনগর্ব্বিত লোকেদের ধারণা, যে ডাক্তার বা কবিরাজের ভিজিট যত বেশী, তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যও তত অধিক বাড়িয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার কোন বন্ধুর একটি ছয় মাস বয়স্কা পৌত্রীর প্রবল জ্বর হওয়ায় আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, একজন ভাল হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ডাকিলে হয় না? তিনি তাহাতে সম্মত হইলে আমি আমার সুপরিচিত একজন চিকিৎসকের নাম করিয়া বলিলাম, "ঐ ডাক্তারবাবুর একটি ছেলে আজ পাঁচ-ছয় বৎসর হইল এম-বি পাস করিয়া এলোপ্যাথির পরিবর্ত্তে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেছে। আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি সেই যুবক হোমিওপ্যাথকে আনতে পারি।" আমি সেই ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া হোমিওপ্যাথের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অমুকবাবুর পৌত্রীর প্রবল জ্বর হইয়াছে দেখিলাম। আপনার পুত্রকে একবার পাঠাইলে ভাল হয়।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমার ছেলের ভিজিট আট টাকা। অমুকবাবু তাহা দিতে পারিবেন কি?" শুনিয়া আমি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। কয়েক ঘণ্টা পরে আমি আমার প্রথমোক্ত বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া

শুনিলাম যে, সেই শিশুর সুশিক্ষিতা জননী নিজেই কন্যাকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়াছেন এবং তাহাতেই শিশুটির জ্বর কিছু কমিয়াছে। তাঁহাদের বাড়ীতেও একখানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পুস্তক এবং এক বাক্স হোমিওপ্যাথি ঔষধ আছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি বলিলে বুঝিতে হইবে যে, টাকার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। টাকার এই মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি বেশ বুঝিতে পারা যায় বিদেশীয় স্বর্ণমুদ্রার মূল্যের সহিত তুলনা করিলে। আমরা বাল্যকালে যখন স্কুলে পড়িতাম তখন জানিতাম, ইংল্যাণ্ডের এক ষ্টার্লিং বা পাউণ্ডের মূল্য দশ টাকা, আর শিলিঙের মূল্য আট আনা মাত্র। ইহার অনেক দিন পরে পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া হইল পনের টাকা এবং শিলিঙের মূল্য হইল বার আনা। আর আজকাল পাউণ্ডের মূল্য হইয়াছে ৬০ টাকা। আমাদের ভারতে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা বা মোহরের মূল্য ছিল ষোল টাকা হইতে সতের টাকা। আমরা শুনিতাম হাইকোর্টের উকিল ব্যরিষ্টারেরা তাঁহাদের পারিশ্রমিক মোহর হিসাবে লইতেন, অর্থাৎ সেকালে উকিল ব্যারিষ্টারেরা তাঁহাদের মক্কেলের নিকট হইতে তিন মোহর বা চারি মোহর হিসাবে দৈনিক পারিশ্রমিক লইতেন। এখন আর সেরূপ মোহরের কথা শুনিতে পাই না। দেশীয় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য যে ততোধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ টাকার ক্রয়শক্তির হ্রাস। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে যে কৃষক এক মণ চাউল লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত, সে সেই এক মণ চাউলের পরিবর্ত্তে তিন টাকা হইতে চারি টাকা পর্য্যন্ত মূল্য পাইত। এখন সে সেই এক মণ চাউল বাজারে লইয়া গিয়া তাহার মূল্যস্বরূপ কুড়ি-বাইশ টাকা পাইয়া থাকে। চাউলের যে অভাব হইয়াছে, তাহা নহে, টাকার ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা, তাঁহারা বাজারের অবস্থা দেখিয়া নিজ নিজ আয় বাড়াইয়া লইয়াছেন; অর্থাৎ যাঁহারা স্বাধীন বা ব্যবসায়ী, তাঁহারা নিজেদের আয় বাড়াইয়াছেন, কিন্তু যাঁহাদের সে স্বাধীনতা নাই, তাঁহারাই অর্থাৎ ছোট-বড় কেরাণী এবং শিক্ষকের দল বিপদে পড়িয়াছেন। দ্রব্যাদির মূল্য ছয়-সাত গুণ বৃদ্ধি পাইলেও তাঁহাদের আয় ছয়-সাত গুণ বাড়ে নাই। কোন কোন বিভাগে কর্ম্মচারীদিগকে মাগ্‌গিভাতা হিসাবে কিছু কিছু টাকা দেওয়া হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা বেতনের তুলনায় অতি নগণ্য।

গভর্ণমেণ্ট আপিসে যাঁহাদিগের মাসিক বেতন হাজার টাকার উপর, তাঁহারা মাগ্‌গিভাতা পাইবেন না। হাজার টাকা বেতনওয়ালারা মাগ্‌গিভাতা হিসাবে মাসিক ১৭৫ টাকা পাইতেন, কিন্তু তাঁহার বেতন যদি বৃদ্ধি পাইয়া ১১০০ টাকা হয় তাহা হইলে তাঁহার মাগ্‌গিভাতা বন্ধ হইয়া যায়। আমার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পুত্র কোন সরকারী বিভাগে হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বেতন ও মাগ্‌গিভাতা হিসাবে মোটের উপর ১১৫ টাকা করিয়া পাইতেন। গত জানুয়ারী মাসে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি পাইয়া ১১০০ টাকা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাগ্‌গিভাতাও বন্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ মোটের উপর তাঁহার মাসিক ৭৫ টাকা হিসাবে লোকসান হইল। তবে এ কথা ঠিক যে যাঁহারা সাত-আটশ বা হাজার টাকা মাসিক বেতন পান, তাঁহাদের মাসিক ৭০/৭৫ টাকা আয় কমিয়া গেলেও অর্থসঙ্কটে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে চক্ষে

অন্ধকার দেখিতে হয় না। বিপদ হইয়াছে অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের। পূর্ব্বে সস্তাগণ্ডার বাজারে তাঁহাদের সাংসারিক ব্যয় যেরূপ ছিল তাহাতে তাঁহারা কোনরূপে আপনাদের পদমর্য্যাদা বজার রাখিতে পারিতেন। কিন্তু টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় তাঁহারাই বিপদে পড়িয়াছেন।

এইবার আমাদের অপব্যয় সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, "many farthings make a pound"। ঐ ভাবব্যঞ্জক বাংলাতেও একটা প্রচলন আছে, "তিল কুড়িয়ে তাল হয়"। আমি সেই 'তিল' হইতে আরম্ভ করিয়া 'তালের' দিকে অগ্রসর হইব। আমাদের কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে, অর্থাৎ এখনকার পঁচাত্তর বা আশি বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন ছয় পয়সা হইতে দশ পয়সা পর্য্যন্ত এক দিস্তা ফুলিস্ক্যাপ কাগজের দাম ছিল। আর এখন সেই কাগজের দাম হইয়াছে এক দিস্তা ছয় আনা, অর্থাৎ কাগজের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা সেই সস্তার বাজারে কাগজ কিনিয়াও তাহার ভগ্নাংশ মাত্রও কখনও অপব্যয় করিতাম না। হস্তাক্ষরের উন্নতির জন্য আমরা কাগজে মক্‌শ করিতাম। কিন্তু এখনকার ছাত্রেরা অর্থাৎ কিশোর ও যুবকেরা বোধহয় 'মক্‌শ' কথার অর্থই জানে না। মক্‌শ কথার মানে লেখার উপরে আবার লেখা। সেকালে সকল স্কুলেই ছাত্রদের হস্তাক্ষরের প্রতি শিক্ষকদের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাঁহারা প্রত্যেক ছাত্রকে হস্তাক্ষরের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। প্রত্যেক ছাত্রেরই হস্তাক্ষরের জন্য একখানি করিয়া বাংলা বা ইংরাজী খাতা থাকিত। শিক্ষকেরা পাঠ্যপুস্তক হইতে কয়েক ছত্র বাড়ীতে লিখিবার জন্য নির্দ্দেশ দিতেন। ছাত্রেরা নির্দ্দিষ্ট অংশ খাতায় লিখিয়া পরদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে শিক্ষক মহাশয় লেখার তারতম্য বিচার করিয়া প্রত্যেক লেখার জন্য নম্বর দিতেন। আর সে হস্তাক্ষর ছোট ছোট অক্ষর নহে। এক একটা অক্ষর প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ও তদনুরূপ প্রস্থ হইত। অর্থাৎ এখনকার ছাপাখানার ভাষায় যাহাকে 'ডবল গ্রেড' বলে, সে অক্ষরগুলা তাহা অপেক্ষাও বৃহৎ হইত। ছাত্রদের হস্তাক্ষরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের লিখিত অক্ষরও তত ছোট হইত। আমরা যখন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে পড়িতাম তখন সেকালে থার্ড ক্লাস (এখনকার Clsss VIII) পর্য্যন্ত আমাদিগকে এইরূপ হস্তাক্ষর লিখিতে হইত। ইহা ত ছিল স্কুলের লেখা। কিন্তু বাড়ীতে আমাদের অভিভাবকেরা সেই লেখার উপরে খাতাখানা উল্টাইয়া ধরিয়া আবার লিখিতে বলিতেন। ইহারই নাম 'মক্‌শ' করা বা লেখার উপর লেখা। এইরূপে এক পৃষ্ঠাতে চার-পাঁচ বার লেখা হইত। ফলে এই দাঁড়াইত যে মক্‌শ-করা পৃষ্ঠা আগাগোড়া মসীলিপ্ত হইয়া যাইত। এইরূপে মক্‌শ-করা পৃষ্ঠায় যখন আর তিলধারণের স্থান থাকিত না, তখন আমরা দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় হস্তক্ষেপ করিতাম। বারংবার এইরূপ লেখায় আমরা অতি দ্রুতগতিতে লিখিতে পারিতাম।

'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা' নামক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে, সেকালের গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রথমে তালপত্রে, তাহার পর কদলীপত্রে এবং শেষে কাগজে

লিখিবার প্রথা ছিল। বাংলা লেখা লিখিবার জন্য প্রধানতঃ কঞ্চি, শর, এবং খাগ্ড়ার লেখনী বা কলম ব্যবহৃত হইত। সেজন্য ষ্টীল পেন্ নিব বা পেন্সিল কিনিতে হইত না। আমরাই আমাদের লেখনী বাঁশঝাড় বা শরবন হইতে সংগ্রহ করিতাম। ইংরাজী লিখিবার জন্য হংসপুচ্ছ ও ময়ূরপুচ্ছের লেখনী ব্যবহার করিতাম। তখন আর একটা নিয়ম ছিল, স্কুলে থার্ড ক্লাস, এমনকি সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত আমরা অঙ্ক কষিবার জন্য এবং শ্রুতিলিখনের জন্য স্কুলে শ্লেট ও পেন্সিল লইয়া যাইতাম। এজন্য আমাদের অভিভাবক-দিগকে কাগজ ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে হইত না। প্রত্যেক ছাত্রই স্কুলে যাইবার সময় শ্লেট ও পেন্সিল পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে লইয়া যাইত। কলিকাতার আমার বাসার নিকটে অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। প্রত্যহ শত শত ছাত্রকে আমার বাসার সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখি। কিন্তু কোন ছাত্রকেই শ্লেট লইয়া যাইতে দেখি না।

অভিভাবকদিগের উপেক্ষার জন্য কত কাগজ যে অপব্যয়িত হয়, তাহার শেষ নাই। আমারই পৌত্র বা পৌত্রীরা বিদ্যালয়ে যে খাতায় অঙ্ক করে, তাহার প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই দেখিতে পাই, এক পৃষ্ঠায় হয়ত একটা অঙ্ক করিয়া সে পৃষ্ঠা ছাড়িয়া দিয়াছে, অথচ সেই পৃষ্ঠাতে আরও ৪/৫টি অঙ্ক কষিবার স্থান যথেষ্ট আছে। এ বিষয়ে অভিভাবকেরা যদি একটু মনোযোগ দেন, তাহা হইলে আমার মনে হয় প্রত্যেক ছাত্রের কাগজ কিনিবার জন্য বার্ষিক ৮/১০ টাকা অপব্যয় করিতে হয় না। ইহারই নাম "তিল কুড়াইয়া তাল"।

এ ত গেল তিল কুড়াইবার কথা। এইবার 'তাল'এর কথা বলি। আমি পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে[১৪১] স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি কথার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিতেন, বাঙালীর সংসারে যতরূপ পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে ভোজন-বিলাসিতাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা আমরা অর্থাৎ বৃদ্ধেরা চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি। আমাদের বাল্যাবস্থায় আমরা কখনও ভোজের বাড়ী ব্যতীত লুচির আস্বাদন পাইতাম না। আজকাল ত অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রত্যহ জলযোগের জন্য লুচি, পরটা ও মোহনভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যত বৃদ্ধি পাইতেছে, আমাদের ভোজনবিলাসিতাও সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ বাড়িয়া যাইতেছে। ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী হইতে মুড়ি, মুড়কি নির্ব্বাসিত হইয়া ইতর লোকের ব্যবহার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, ভোজের নিমন্ত্রণে অন্নের ব্যবস্থা হইলে ভাত, ডাল, দুই-তিনটা আমিষ ও নিরামিষ ব্যঞ্জন, একটা অম্বল এবং শেষে দধি ও সন্দেশ হইলে লোকে ধন্য ধন্য করিত। আর আজকালকার ভোজের বাড়ীতে ব্যঞ্জনের সংখ্যা দেখিলে মনে হয়, যেন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের বায়ান্ন ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছে। পোলাও, ঘি-ভাত, ভুনিখিচুড়ি প্রধান খাদ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। আর তাহার উপকরণ অসংখ্যপ্রকার দেশী, বিলাতী, মোগলাই ব্যঞ্জন সেই পোলাও বা ঘি-ভাতকে বেষ্টন করিয়া আছে। আজকাল কলিকাতায় ভোজ উপলক্ষে মধ্যবিত্তশালী ও দরিদ্র গৃহস্থেরাও অর্থের কিরূপ শ্রাদ্ধ বা অপব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 'পাকাদেখা'র ভোজে। পূর্ব্বে কলিকাতায় যাহা আশীর্ব্বাদরূপে পরিচিত

ছিল, এখন তাহারই নাম হইয়াছে, 'পাকাদেখা'। আমাদের বিবাহের কথা ছাড়িয়া দিন, সে ত সত্তর-বাহাত্তর বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার পুত্রকন্যাদির বিবাহ উপলক্ষেও 'পাকাদেখা'র ভোজের আড়ম্বর ছিল না। কন্যাকর্ত্তা নিজ পরিবারস্থিত দুই-তিন জন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতেন এবং আশীর্ব্বাদের পর কন্যাপক্ষ আশীর্ব্বাদকদিগকে যৎসামান্য 'মিষ্টিমুখ' করাইয়া, অর্থাৎ চারি আনা কি আট আনার মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া আগন্তুকদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। আর এখন, পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদের পর কন্যাপক্ষকে লুচি, পোলাও আর তাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপ ২০/২৫ প্রকার দেশী ও বিলাতী খাদ্য এবং কলিকাতায় যত প্রকার মিষ্টান্ন কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা থরে থরে সাজাইয়া কন্যাকর্ত্তার সহিত সমাগত দশ-পনের জন অভ্যাগত এবং নিজের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী ভদ্রলোকদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন।

কন্যাকর্ত্তাই বা ঠকিবেন কেন? তিনি বলেন, বরপক্ষ পঁচিশ প্রকার তরকারি খাওয়াইয়াছেন, আমরাও তাঁহাদিগকে ৩০, ৩২ প্রকার তরকারি ও তদনুরূপ মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া দেখাইব যে, আমরাও পয়সার অপব্যয় করিতে জানি। অর্থাৎ, বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা এই দু'জনের মধ্যে অর্থের অপব্যয় করিয়া কে কত নির্ব্বুদ্ধির প্রকাশ করিতে পারেন, তাহার প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই পাকাদেখার ভোজে অনেক সময় শতাধিক ব্যক্তিরও নিমন্ত্রণ হয়। এইরূপ ভোজে যে সকল দ্রব্য পরিবেশন করা হয় তাহা যে-কোন এক ব্যক্তি, তা তিনি যত বড় ভোক্তাই হউন না কেন, নিঃশেষে খাইতে পারেন না। সুতরাং ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যাদি দরিদ্র বাঙালীদিগকে বিতরণ করা হয়। তাহাতে দরিদ্রগণেরই কি কোন উপকার হয়? মাত্র একদিনের জন্য দেবভোগ্য খাদ্যের অংশ পাইয়া তাহাদের কি দারিদ্র্য হ্রাস পায়?

আমরা শুধু পাকাদেখারই উল্লেখ করিলাম। বিবাহ উপলক্ষে গাত্রহরিদ্রা এবং ফুলশয্যায় যে সকল দ্রব্যাদি নূতন কুটুম্বের বাড়ীতে প্রেরিত হয়, বাহুল্যভয়ে তাহার আর উল্লেখ করিব না। আমাদের প্রাত্যহিক সংসারযাত্রায় যে সকল ছোটখাট অপব্যয় করি, তাহার দুই-একটা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

আজকাল শহর অঞ্চলে, এমনকি দূর মফঃস্বলেও এমন গৃহস্থ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় যাহার বাড়ীতে প্রত্যহ দুই বেলা 'চা' পানের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু এই 'চা' পানটা কি অপরিহার্য্য? শীতপ্রধান দেশের লোকে উত্তাপটাই ভালবাসে। তাই ঐ সকল স্থানে আগন্তুককে অভ্যর্থনার জন্য উষ্ণ চা পান করিতে দেওয়া হয়। ইংল্যাণ্ডে অভ্যর্থনার আন্তরিকতা প্রকাশ করিবার জন্য বলা হয়—warm reception, আর আমাদের দেশে ডাবের জল, সরবৎ প্রভৃতি শীতল পানীয় এবং চরণ ধৌত করিবার জন্য শীতল জল দিলে লোকে বলিয়া থাকে—অমুকের অভ্যর্থনায় প্রাণ 'জুড়াইয়া' গেল। আমি পাঠকগণকে জিব-পোড়ানো উষ্ণ চা এবং প্রাণজুড়ানো ডাবের জল, সরবৎ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। তাঁহারা একবার মনে মনে তুলনা করিয়া দেখুন, কিরূপ অভ্যর্থনা তাঁহাদের প্রিয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুর (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮ ব.) আগে কয়েক মাস চন্দননগরে বিশ্রামের জন্য এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "...১২৯৭ সালের শেষভাগে তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বাস্থ্যোন্নতির মানসে শীতের সময়ে ফরাসডাঙ্গার বিশ্রামভবনে বাস করিতে গেলেন। কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষে বুঝিলেন যে, তথায় শরীর ভাল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইতস্ততঃ করিতে করিতে চৈত্র বৈশাখ কাটিয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় আসিয়া রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন।" (বিদ্যাসাগর, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯২৩, ৫৪৫)

২. 'বর্ণপরিচয়', ১ম ভাগ, সংস্কৃত যন্ত্র, কলকাতা, এপ্রিল ১৮৫৫ খ্রি.।

৩. 'বোধোদয়', (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ), সংস্কৃত যন্ত্র, কলকাতা, এপ্রিল ১৮৫১ খ্রি.।

৪. 'কথামালা', সংস্কৃত যন্ত্র, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ খ্রি.।

৫. 'চরিতাবলী', সংস্কৃত যন্ত্র, কলকাতা, জুলাই ১৮৫৬ খ্রি.।

৬. 'সীতার বনবাসয, সংস্কৃত যন্ত্র, কলকাতা, এপ্রিল ১৮৬০ খ্রি.।

৭. 'ব্যাকরণ কৌমুদী', ১ম ভাগ, ১৮৫৩ খ্রি.। ২য় ভাগ, ১৮৫৩ খ্রি.। ৩য় ভাগ, ১৮৫৪ খ্রি.। ৪র্থ ভাগ ১৮৬২ খ্রি.। চারটি ভাগই সংস্কৃত যন্ত্র, কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

৮. 'ঋজুপাঠ', ১ম ভাগ, নভেম্বর ১৮৫১ খ্রি.। ২য় ভাগ, মার্চ ১৮৫২ খ্রি.। ৩য় ভাগ, ডিসেম্বর ১৮৫২ খ্রি.। তিনটি ভাগই সংস্কৃত যন্ত্র, কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

৯. ১৮৫২-৫৩ খ্রি. নাগাদ বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় আইনের আবশ্যকতা বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেন। অনেক বাদানুবাদ, আবেদন-নিবেদন এবং ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্কের পর ১৮৫৫ খ্রি. ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। এই বছরই ৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথম বিধবাবিবাহ করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক খাটুরা গ্রামনিবাসী বিখ্যাত কথক বামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী হলেন বর্ধমান জেলার পলাশডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবী।

১০. সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, সংস্কৃত যন্ত্র, কলকাতা, নভেম্বর ১৮৫১ খ্রি.।

১১. 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ খ্রি.। প্রতিষ্ঠাতা হলেন সেকালের পাশ্চাত্য-রীতিতে প্রতিকৃতি অঙ্কনে পারদর্শী অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। এই স্টুডিওর সাদাকালো লিথোগ্রাফ, বিখ্যাত লোকেদের রঙিন প্রতিকৃতি ও পৌরাণিক ছবি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের ঘরে বিশেষ সমাদর পেয়েছিল।

১২. মাসিক পত্রিকা 'সাহিত্য' ১২৯৭ ব. বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সুরেশচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭ পৌষ ১৩২৭ ব.) পর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২৭ ব. পৌষ-মাঘ সংখ্যা থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৩৩০ ব. বৈশাখ পর্যন্ত 'সাহিত্য' চলেছিল।

১৩. 'মেট্রপলিটান ইনস্টিটিউশন'এর আগে নাম ছিল 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল'। ১৮৫৯ খ্রি. এ-টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৪ খ্রি. এই স্কুলের দায়িত্বভার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে আসে। তিনি এর নাম বদলে রাখেন 'মেট্রপলিটান ইনস্টিটিউশন।'

১৪. দাশু রায় বা দাশরথি রায়ের (১৮০৬-১৮৫৭) জীবদ্দশায় তাঁর কবিগানের সংগ্রহ 'দাশুরায়ের পাঁচালি', ১ম-৫ম খণ্ড, কলকাতা, আশ্বিন ১২৫৫-চৈত্র ১২৫৭ বই আকারে প্রকাশিত হয়।

১৫. ১৮৯১ খ্রি. সহবাস সম্মতি আইন পাশ হয়। নাবালিকা বধূ ফুলমণির মৃত্যুর পর নাবালিকা-বধূ-সহবাস, গর্ভাধান ইত্যাদি নিয়ে সমাজে তীব্র বিতর্ক হয়। রক্ষণশীল মতের সমর্থনে এগিয়ে আসেন শশধর তর্কচূড়ামণি ও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে এই বিতর্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

১৬. হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮) উনিশ শতকের শেষদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব দেন। 'সহবাস-সম্মতি আইন' চালু করার বিপক্ষে আন্দোলন পরিচালনা করেন। কাশিমবাজারের রাজসভার সভাপণ্ডিত ছিলেন। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা হিন্দুধর্মের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়।

১৭. কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১২৫৮-১৩০৯ ব.) ১২৭৯ ব. 'আর্য-ধর্ম প্রচারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা ও ১২৮২ ব. 'ধর্ম প্রচারক পত্র' প্রকাশ করেন। বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করে বেড়াতেন বলে 'পরিব্রাজক' নামে খ্যাত ছিলেন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হন।

১৮. শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) পারিবারিক পদবী ভট্টাচার্য। ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৭৮) স্থাপনে তিনি বিশেষ ভূমিকা নেন। বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন। 'সোমপ্রকাশ', 'সখা', 'মুকুল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনা প্রভৃতি কর্মে যুক্ত ছিলেন। বহু প্রবন্ধ ও উপন্যাসের রচয়িতা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (১৯১৮) এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৪) মূল্যবান আকর গ্রন্থ।

১৯. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৯১৩) ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। 'ভারতসভা'র মুখপাত্র হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (১৮৮১) প্রামাণিক বই বলে স্বীকৃত।

২০. যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর উদ্যোগে এবং উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের সহায়তায় ১০ ডিসেম্বর ১৮৮১ খ্রি. (২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮ ব.) 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। কম দামের এই সুবৃহৎ পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক হলেন জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

২১. সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সঞ্জীবনী' ৩ বৈশাখ ১২৯০ ব. প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে পত্রিকাটি সম্পাদনার মূল দায়িত্ব নেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

২২. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) ১৮৭৬ খ্রি. এন্ট্রান্স পাশ করে এফ.এ পড়ার সময় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং 'কাব্যবিশারদ' উপাধি পান। 'হিতবাদী', 'প্রকৃতি', 'অ্যান্টি-খ্রীষ্টিয়ান', 'দি কস্‌মো-পলিটান' প্রভৃতি নানা পত্রিকা সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন। কবিতা, প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গ রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রি. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর লেখা গান গাওয়া হত। তাঁর সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি', 'প্রসাদ-পদাবলী', 'বঙ্গীয় পদাবলী', 'স্বদেশ-সঙ্গীত' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২৩. 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে ৩০ মে ১৮৯১ খ্রি. প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রধান সম্পাদক হন। সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদনায় ২১ মে ১৮৯৪ খ্রি. 'হিতবাদী'র প্রথম দৈনিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

২৪. রাজনৈতিকভাবে সচেতন বাঙালিকে দুর্বল করে সারা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জনের আমলে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯ জুলাই ১৯০৫ খ্রি. সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষিত হয়।

২৫. কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৌরোহিত্যে ৭ আগস্ট ১৯০৫ খ্রি. কলকাতার টাউন হলে বিশাল জনসমাবেশ হয়। সভাতে বিদেশী দ্রব্য 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

২৬. কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬) ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আজীবন জড়িত ছিলেন। দীর্ঘদিন কলকাতা সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন (১৮৭৯-১৯০৮)। 'সঞ্জীবনী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশে তিনি ছিলেন অন্যতম। এই পত্রিকাতে আসামের চা বাগানে শ্রমিকদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। প্রথমদিকে 'ভারতসভা' এবং পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

২৭. জাতিতে অবাঙালি, মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২) শৈশবেই বাংলাভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। তরুণ বয়সে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখে খ্যাত হন। 'সাহিত্য', 'হিতবাদী'তে রচনা প্রকাশিত হয়। প্রথমে কিছুকাল দেওঘর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আসেন। 'হিতবাদী'র প্রুফ-সংশোধকের চাকরি পান। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যুর পর 'হিতবাদী'র স্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিলকের বিরুদ্ধে 'হিতবাদী'তে লেখার দায়িত্ব অস্বীকার করে 'হিতবাদী'র চাকরি ছেড়ে দেন এবং ন্যাশনাল স্কুল বা জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'দেশের কথা', 'ঝাঁসীর রাজকুমার', 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত', 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?' উল্লেখ্য।

২৮. ইংরেজি ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বেঙ্গলী' (Bengalee) ১৮৬২ খ্রি. প্রকাশিত

হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১ জানুয়ারি ১৮৭৯ খ্রি. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গলী'র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন।

২৯. কলকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গীষ্পতি কাব্যতীর্থ (?—১৩৩৩ ব.) ছিলেন জাতীয়তাবাদী। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সহকর্মী হিসেবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক বক্তৃতাদি দ্বারা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

৩০. আবুল হোসেন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ খ্রি. ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ধর্মঘটের অন্যতম প্রধান সংগঠক।

৩১. 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', চুঁচুড়া, ১৩০২ ব. (৫ অক্টোবর, ১৮৯৫)।

৩২. 'আনন্দমঠ', ১২৮৯ ব. (১৫ ডিসেম্বর, ১৮৮২)।

৩৩. 'পুষ্পাঞ্জলি', প্রথম ভাগ, ১৮৭৬ খ্রি.।

৩৪. 'পোষ্যপুত্র', চুঁচুড়া, ১৩১৯ ব.।

৩৫. 'মন্ত্রশক্তি', কলকাতা, ১৩২২ ব.।

৩৬. 'সম্বন্ধ-নির্ণয়', কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ১৮৭৫ খ্রি.।

৩৭. কালীময় ঘটক (১২৪৭-১৩০৭ ব.) এন্ট্রান্স পাশের পর গ্রামের বাংলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে জমিদারের সাহায্যে নিজের গ্রামে স্কুল স্থাপন করেন। এইভাবে বালিকা বিদ্যালয়, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। সাহিত্য চর্চা ছিল নেশা। 'চরিতাষ্টক', 'ছিন্নমস্তা', 'কৃষিপ্রবেশ', 'সুরেন্দ্রজীবনী', 'মেলা' প্রভৃতি তাঁর লেখা বই।

৩৮. *চরিতাষ্টক* ১ম ভাগ, কলকাতা ১২৯৫ ব. এবং ২য় ভাগ, কলকাতা ১২৯৬ ব.।

৩৯. ১৮৩৫ খ্রি. জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮৮) হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় জমিদারির পত্তন করেন। ১৮৫৯ খ্রি. তিনি উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরপাড়া হাইস্কুল এবং উত্তরপাড়া কলেজ প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। তিনি প্রায় ৩১টি স্কুলে অর্থ সাহায্য করতেন। দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সমর্থক।

৪০. বিশিষ্ট উপন্যাস লেখক ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) জীবনের প্রায় শুরু থেকেই প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১২৮৫ ব. মাসিক পত্রিকা 'বীণা' এবং ১২৮৭ ব. 'বীণা যন্ত্র' স্থাপন করেন। তাঁর লেখা 'তরণী সেন বধ', 'লায়লা-মজনু', 'নাট্যসম্ভব', 'দ্বাদশ-গোপাল', 'অবসর-সরোজিনী' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

৪১. পৌরাণিক নাটক 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' রাজকৃষ্ণ গ্রন্থাবলীর ২য় ভাগে (কলকাতা, ১২৯২ ব.) ছাপা হয়। নাটকটি ১১ অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রি. বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়েছিল।

৪২. 'প্রভাস' নামে রাজকৃষ্ণ রায়ের কোনও রচনা নেই। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত 'প্রভাস-মিলন' বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। স্টার থিয়েটারে অভিনীত 'প্রভাস যজ্ঞ' নাটকটির রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

৪৩. গীতি-নাটিকা 'লায়লা-মজ্‌নু' বই আকারে ২২ ডিসেম্বর ১৮৯১ খ্রি. প্রকাশিত হয়। স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৫ ডিসেম্বর ১৮৯১ খ্রি.।

৪৪. বাংলার তৃতীয় সাধারণ রঙ্গালয় 'বেঙ্গল থিয়েটার' কলকাতার ৯, বিডন স্ট্রিটে ১৮৭৩ খ্রি. চালু হয়। ধনকুবের আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই সর্বপ্রথম নাটকে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বারাঙ্গনাদের মধ্য থেকে অভিনেত্রী নেওয়া হয়। ১৬ আগস্ট ১৮৭৩ খ্রি. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়েছিল।

৪৫. ৩৮, মেছুয়াবাজার রোডে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাট্যশালা 'বীণা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০ ডিসেম্বর ১৮৮৭ খ্রি. রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক 'চন্দ্রহাস' অথবা দ্বিতীয় 'প্রহ্লাদ' দিয়ে বীণা থিয়েটারের উদ্বোধন হয়েছিল।

৪৬. বীণা থিয়েটারে 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৮ ডিসেম্বর ১৮৮৭ খ্রি.। অভিনয়ে ছিলেন যথাক্রমে : হিরণ্যকশিপু—রাজকৃষ্ণ রায়, প্রহ্লাদ—শরৎ কর্মকার, ষণ্ড—অক্ষয়কালী কোঁয়ার।

৪৭. দেশের কথা, ১ম ভাগ, কলকাতা ১৩১১ সাল (১৬ জুন ১৯০৪)। পরিশিষ্ট ভাগ, ১৩১৪ ব. (২৩ অক্টোবর ১৯০৭)।

৪৮. 'দেশের কথা' বইটি ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৯১০ খ্রি. ২২ সেপ্টেম্বরের গেজেটে। বইটিতে ব্রিটিশ আমলে ভারতের আর্থ-সামাজিক দুর্দশার কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনতার ঠিক আগে ১৯৪৭ খ্রি. ১৭ মার্চ বইটির বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহৃত হয়।

৪৯. 'ঝাঁসীর রাজকুমার', কলকাতা, ১৩০৮ ব. (২৭ ডিসেম্বর ১৯০১)।

৫০. খ্রিস্টিয় আঠারো শতকের খ্যাতনামা 'মঙ্গলকাব্য' রচয়িতা কবি ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০)। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ছিলেন। রাজার আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য লিখে 'রায়গুণাকর' উপাধি পান। 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসমঞ্জরী', 'সত্যপীরের কথা' প্রভৃতি তাঁর লেখা বিখ্যাত বই।

৫১. ২৬-২৭ ডিসেম্বর ১৯০৭ খ্রি. সুরাটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তেইশতম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে তীব্র সংঘাত ঘটে। এরপর থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব আবার পুরোপুরি নরমপন্থীদের হাতে চলে আসে।

৫২. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় ১৯০৬ খ্রি. আগস্ট মাসে 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল' স্থাপিত হয়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন অরবিন্দ ঘোষ।

৫৩. কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ১৮৫৭ খ্রি. ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ১৮৬২ খ্রি. 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি সহ সমাজের আচার্য পদ লাভ করেন। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৮৫৯), 'সঙ্গতসভা' (১৮৬০) গঠন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৮৬৬ খ্রি. কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'এলবার্ট হল'-এরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তাঁর সম্পাদনায় 'বালক বন্ধু' (১৮৭৮) সাপ্তাহিক ছাড়াও 'ইন্ডিয়ান মিরর' (১৮৬১) এবং 'সানডে মিরর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাঁরই উদ্যোগে মেয়েদের জন্য 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৩) প্রকাশ ও 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' স্থাপিত হয়।

৫৪. 'দ্য রিভিউ অফ রিভিউস্' মাসিক পত্রিকা হিসেবে ১৮৯০ খ্রি. লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ থেকে ১৯৩৬ খ্রি. পর্যন্ত সব সমেত সাতাশিটি খণ্ড বেরিয়েছিল। এরপর পত্রিকাটি 'ওয়ার্ল্ড রিভিউ' নামে প্রকাশিত হতে থাকে।

৫৫. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র (১৮৩৯) মুখপত্র হিসেবে ১৬ আগস্ট ১৮৪৩ খ্রি. (১ ভাদ্র, ১৭৬৫ শকাব্দ) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৯২৩ খ্রি. জানুয়ারি মাস পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল।

৫৬. ১৫ শ্রাবণ ১২৮৪ (২৯ জুলাই ১৮৭৭) তারিখে 'ভারতী' প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকাটি প্রথমে সম্পাদনা করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৩৩-এর কার্তিক মাস পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল।

৫৭. সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫) ছিলেন জাতীয়তাবাদী এবং সাহিত্য সঙ্গীতের অনুরাগী। 'ভারতী' পত্রিকা এবং লাহোরে থাকাকালীন উর্দু পত্রিকা 'হিন্দুস্থান' সম্পাদনা করেন। ১৯০৩ খ্রি. কলকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' এবং 'বীরাষ্টমী ব্রত' পালন করেন। তাঁর চেষ্টাতেই স্থাপিত হয় 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল'। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতীয়তাবাদী গানের সংকলন 'শতগান' এবং স্মৃতিকথা 'জীবনের ঝরাপাতা'।

৫৮. কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) কবি, ঔপন্যাসিক ও সমাজসেবিকা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১২৯১ ব. থেকে ১৩০২ ব. পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। কিশোরদের উপযোগী 'বালক' নামে পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন। নারীকল্যাণের উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন 'সখি সমিতি' (১২৯৩ ব.)। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথমটি 'দীপ নির্বাণ' (১৮৭৬) জাতীয়তাবাদী ভাব প্রচারে সহায়ক হয়েছিল।

৫৯. রুবায়ৎ, ভারতী, ২৫ বর্ষ, বৈশাখ ১৩০৮, ৮৯-৯২।

৬০. হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদকরূপে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৪৯-১৮৬৮ খ্রি. পর্যন্ত সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি ছিলেন 'হিন্দুমেলা'র উদ্বোধক এবং 'সঞ্জীবনী সভা'র সভাপতি। তাঁর রচিত 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪), 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' (১৮৭৬), 'বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৮) এবং 'আত্মচরিত' (১৯০৯) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

৬১. সাহিত্যিক ও কবি রায়বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকারের পুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) জন্ম হুগলির চুঁচুড়ায়। চুঁচুড়াতে ওকালতি করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথমে লেখেন। পরে নিজে 'সাধারণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। 'নবজীবন' পত্রিকাটিও প্রকাশ করেছিলেন। সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় সংকলিত করে প্রকাশ করেন 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে আত্মকথা 'পিতাপুত্র' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৬২. 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস', ১ম—৫ম ভাগ, কলকাতা, ১৮৭৯-১৯০০ খ্রি.।

৬৩. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) বাংলা সাহিত্যে 'পাঁচুঠাকুর' বা 'পঞ্চানন্দ' নামে পরিচিত। প্রথম জীবনে বি. এ. পাশ করে বীরভূম ও বর্ধমানে শিক্ষকতা করেন। ১৮৭১ খ্রি. বি. এল. পাশ করে ওকালতিকে পেশা হিসেবে নেন। ছদ্মনামে ব্যঙ্গাত্মক রচনায় প্রসিদ্ধ হন। ইংরেজি কেতা এবং বিলাতী আচারের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ করতেন 'পঞ্চানন্দ'। পাঁচটি সর্গে অমিতাক্ষর ছন্দে লেখা তাঁর 'ভারত-উদ্ধার' অন্যতম ব্যঙ্গকাব্য। 'পঞ্চানন্দ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় 'পাঁচুঠাকুর' নামে চুট্‌কি লিখতেন। ব্যঙ্গ রচনাগুলি পরে 'পাঁচুঠাকুর গ্রন্থাবলী'তে সংকলিত হয়।

৬৪. স্কটিশচার্চ কলেজ ১৮৩০ খ্রি. ১৩ জুলাই স্কটিশ মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফ দ্বারা 'জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এটি ফিরিঙ্গি কমল বসুর আপার চিৎপুর রোডের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে স্থাপিত হয়। ১৮৩৬ খ্রি. বর্তমান বিডন স্ট্রিট লাগোয়া আরকুহার্ট স্কোয়ারের (urquhart square) বাড়িতে উঠে আসে।

৬৫. কলকাতার বিডন স্ট্রিটের ধনীব্যক্তি গঙ্গানারায়ণ দত্তের অর্থ সাহায্যে এবং গৌরহরি সেন প্রমুখ স্থানীয় যুবকদের প্রচেষ্টায় ১৮৮৯ খ্রি. ৫ ফেব্রুয়ারি চৈতন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ৮৩ বিডন স্ট্রিটের গঙ্গানারায়ণ দত্তের বাড়িতে লাইব্রেরির কাজ শুরু হয়। ১৮৯৩ খ্রি. শেষের দিকে লাইব্রেরি বর্তমান নিজস্ব বাড়ি ৪/১ বিডন স্ট্রিটে উঠে আসে।

৬৬. 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি ৬ ভাদ্র ১৩০০ ব. (২১ আগস্ট ১৮৯৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈতন্য লাইব্রেরি ও বিডন স্কোয়ার লিটারারি ক্লাবের অধিবেশন উপলক্ষে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের হলে পাঠ করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৬৭. ১৮৮৭ খ্রি. জানুয়ারি মাসে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনের প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বাড়ি কিনে বসবাস করতে থাকেন। তখন তিনি ছিলেন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

৬৮. এ নেশন ইন মেকিং, ১৯২৫ খ্রি.।

৬৯. 'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা। কবিতাটির নাম 'কোন্ দেশে'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংকলন 'কাব্য-সঞ্চয়ন'এ কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

৭০. ২৬-২৯ ডিসেম্বর ১৯০৬ খ্রি. দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাইশতম অধিবেশন হয়েছিল।

৭১. পান্তির মাঠ হল বিংশ শতকের গোড়ায় কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট সংলগ্ন মাঠ। এই মাঠের মালিক ছিলেন রানাঘাটের বিখ্যাত জমিদার কৃষ্ণদাস পাল বা তাঁর কোনো বংশধর। প্রথম জীবনে পান বিক্রি করতেন বলে লোকে তাঁকে বলত কৃষ্ণ পান্তি। স্বদেশী আন্দোলনের নানা মেলা ও উৎসব এই মাঠেই হত। এখন বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেল এই মাঠে।

৭২. ডবলিউ. সি. বোনার্জি ওরফে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬) ১৮৬৮ খ্রি.

লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ভারত সরকার দ্বারা চারবার স্টান্ডিং কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। ১৮৮৫ খ্রি. বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। সাহেবি কায়দায় চলতেন বলে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা তাঁর তীব্র সমালোচনা করে। ১৮৭১ খ্রি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ফ্যাকাল্টির প্রথম সভাপতি এবং সেনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন।

৭৩. দৈনিক 'নায়ক' পত্রিকা সম্পাদনায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন। পত্রিকাটি কার্টুন প্রকাশের জন্য বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রায়ই এতে মতিলাল ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কার্টুন থাকত।

৭৪. ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ খ্রি. (৭ পৌষ ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সূচনা হয়।

৭৫. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পরিচালনায় ১৯৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট থেকে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশের তারিখ ১ পৌষ ১৩১১ (১৬ ডিসেম্বর ১৯০৪)।

৭৬. বর্তমান হুগলি জেলার চন্দননগরের বাগবাজার, জি.টি. রোডে অবস্থিত চন্দননগর পুস্তকাগার স্থাপিত হয় ১ অক্টোবর ১৮৭৩ খ্রি.। প্রতিষ্ঠাতা যদুনাথ পালিত অন্যান্যদের সহায়তায় প্রথমে উর্দিবাজারের একটি বাড়িতে লাইব্রেরির কাজ শুরু করেন। ১৯২০ খ্রি. মে মাসে হরিহর শেঠের প্রচেষ্টায় বর্তমান 'নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির ভবন' গড়ে ওঠে। এই বাড়ির একটি অংশে পুস্তকাগার স্থাপিত হয়।

৭৭. লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) ১৮৪৩ খ্রি. খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং ১৮৫৫ খ্রি. 'রেভারেন্ড' হন। ১৮৬৭ খ্রি. থেকে সরকারি শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৭-৮৯ পর্যন্ত হুগলি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে অবসর নেন। ১৮৫৬ খ্রি. 'অরুণোদয়' নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭২-৮১ খ্রি. পর্যন্ত সম্পাদনা করেন 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'। ১৮৭৭ খ্রি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। তাঁর রচিত 'গোবিন্দ সামন্ত' বা 'দ্য হিস্ট্রি অব এ বেঙ্গল রায়ত' এবং 'ফোক টেলস অব বেঙ্গল' বিখ্যাত বই।

৭৮. ইংরেজি ভাষায় লেখা 'গোবিন্দ সামন্ত' ১৮৭৪ খ্রি. প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ (?) খ্রি. নতুন সংস্করণে বইটির নাম হয় 'বেঙ্গল পেজ্যান্ট লাইফ'। বইটির বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। 'গোবিন্দ সামন্ত বা বঙ্গীয়-কৃষি-জীবন' (প্রথম খণ্ড) নামে অনুবাদ-বইটি কলকাতার ভূকৈলাস রাজবাটী থেকে ১২৯০ ব. প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন সত্যবাদী ঘোষাল।

৭৯. 'ফোক টেল্‌স অফ বেঙ্গল' ১৮৭৫-১৮৭৮ খ্রি. পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ খ্রি.।

৮০. 'হিন্টস্ অন্ দি স্টাডি অফ ইংলিশ', ১৮৭৪ খ্রি.।

৮১. ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকা 'বেঙ্গল মিস্‌লেনি' জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চুঁচুড়ার বুড়শিবতলা থেকে প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশের তারিখ জুন ১৮৮১ খ্রি.।

৮২. ১৮৬২ খ্রি. ফাদার বার্থে (Father Magloire Barthet) চন্দননগরে 'সেন্ট মেরিজ

ইনস্টিটিউশন' স্কুল স্থাপন করেন। ১৯০১ খ্রি. চন্দননগরের প্রাক্তন শাসক দুপ্লের (Joseph Francois Dupleix) নামে স্কুলটির নাম হয় 'কলেজ দুপ্লে'। চন্দননগর ফরাসি শাসন মুক্ত হলে ১৯৪৮ খ্রি. ১৭ মে শহিদ কানাইলাল দত্তের নামে বর্তমান 'কানাইলাল বিদ্যামন্দির' হয়েছে।

৮৩. এই ছত্রটির উল্লেখ আমরা একটি অপ্রকাশিত পুঁথিতে পাই। 'গঙ্গাবন্দনা', 'অজ্ঞাত', ১২১৬ ব.। (পঞ্চানন মণ্ডল, 'পুঁথি-পরিচয়', তৃতীয় খণ্ড, শান্তিনিকেতন, ১৯৬৩, ৩৭১)। ১৩০৫ ব. কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'শিশুবোধক অর্থাৎ বালক শিক্ষার্থ' বইটিতে 'গঙ্গার বন্দনা' শিরোনামে ছত্রটির উল্লেখ রয়েছে। (আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত, বাংলা প্রাইমারি সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬, ৩৫।

৮৪. এই বিশেষ সভাটির উল্লেখ সমসাময়িক কোনো নথিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৮ অক্রুর দত্ত লেনে প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী লাইব্রেরির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই সাবিত্রী লাইব্রেরির অন্তর্গত সাবিত্রী সভার উদ্যোগে আয়োজিত সভায় (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭) রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু বিবাহ' নামে প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

৮৫. ১৮৯৭ খ্রি. 'প্লেগ কমিশন' কলকাতার কয়েকটি এলাকাকে সন্দেহপ্রবণ বলে চিহ্নিত করে, ১৮৯৮ খ্রি. প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দেয়।

৮৬. মদন মাস্টার উনিশ শতকের যাত্রা সাহিত্যের বিকাশে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। পুরাণ অনুসারী পালা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সময়ে যাত্রাগানের বহু সংস্কার ঘটেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দল 'বউ মাস্টার' নামে চালিত হয়েছিল।

৮৭. গোবিন্দ অধিকারীর (১৮০০?-১৮৭২) হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম। ছোটবেলায় কীর্তন শিখে প্রথমে কীর্তনের দল এবং পরে 'কালীয় দমন' যাত্রাদল তৈরি করে অভিনয় শুরু করেন। 'রাধাকৃষ্ণের লীলা' অভিনয়ে খ্যাতি পান। বহু যাত্রাপালা, পদাবলী রচনা করেন।

৮৮. গোপাল উড়ের (উনিশ শতক) জন্ম কটকের জাজপুরে এক চাষির পরিবারে। তরুণ বয়েসে জীবিকার চেষ্টায় কলকাতায় আসেন এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদলে যোগ দেন। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালায় মালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর দল 'গোপাল উড়ের যাত্রাদল' নামে খ্যাত ছিল।

৮৯. 'গোপাল উড়ের টপ্পা : বিদ্যাসুন্দর যাত্রার গান', হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, ১৩১৭ ব.।

৯০. 'সতীনাটক', কলকাতা, ১৮ মাঘ ১২৯৭ ব. (১৮৭৩ খ্রি.)।

৯১. 'হরিশ্চন্দ্র নাটক', কলকাতা, পৌষ ১২৮১ ব. (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ খ্রি.)।

৯২. 'দেবী চৌধুরাণী', কলকাতা, ১২৯১ ব. (২০ মে ১৮৮৪)।

৯৩. ভারতে প্রথম রেলগাড়ি চলেছিল বোম্বাই শহরে ১৬ এপ্রিল ১৮৫৩ খ্রি.। বাংলাদেশে হাওড়া থেকে হুগলির চুঁচুড়া পর্যন্ত রেলগাড়ি ১১ আগস্ট ১৮৫৪ খ্রি. চালু হয়। রাণিগঞ্জ পর্যন্ত গাড়ি চলেছিল ১৮৫৫ খ্রি.।

৯৪. 'প্রবর্ত্তক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ খ্রি.। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হলেন মতিলাল রায়। ফরাসি চন্দননগরের এই বিপ্লবী সংঘ সারা বাংলার বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও

যোগাযোগ রক্ষার কাজ করত। প্রবর্ত্তক সংঘ থেকে 'প্রবর্ত্তক' 'নবসংঘ' ও 'The Standard Bearer' নামে সাময়িক পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হত।

৯৫. 'প্রবর্ত্তক' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে মাঘ ১৩২২ বঙ্গাব্দে চন্দননগরের বোড়াইচণ্ডীতলাস্থ প্রবর্ত্তক কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ১৬ পাতার এই কাগজটির প্রকাশক রামেশ্বর দে এবং সম্পাদক ছিলেন মণীন্দ্রনাথ নায়েক। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে 'প্রবর্ত্তক' মতিলাল রায়ের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক থেকে মাসিকে পরিণত হয়।

৯৬. মতিলাল রায়ের (১৮৮৩-১৯৫৯) জন্ম ফরাসি চন্দননগরের বোড়াইচণ্ডীতলায়। ১৯০৫ খ্রি. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর তিনি চন্দননগরের বিপ্লবী সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৪ খ্রি. 'প্রবর্ত্তক সংঘ' তাঁরই প্রচেষ্টার ফল। 'স্বদেশী যুগের স্মৃতি', 'ভারতীয় সংঘ-তত্ত্ব', 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' প্রভৃতি তাঁর লেখা বই।

৯৭ 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটি জুলাই ১৮৭২ খ্রি. ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ছাপা হয়।

৯৮ 'সুলভ সমাচার' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ ব. কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সংস্কার সভা' (ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৭১) থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

৯৯. 'পদ্যপাঠ', যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় রচিত। ১ম ভাগ, ১৮৬০, ২য় ভাগ, ১৮৬২ এবং ৩য় ভাগ ১৮৬৫ খ্রি. কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১০০. 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', লোহারাম শিরোরত্ন, সংস্কৃত যন্ত্র, কলকাতা, ১৮৬০ খ্রি.। এছাড়া লোহারামের আর একটি ব্যাকরণ বই রয়েছে : শিশুবোধ ব্যাকরণ, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা ১৮৬৩ খ্রি.।

১০১. 'ভূগোলসূত্র', বিদ্যারত্ন যন্ত্র, কলকাতা, ১৮৬২ খ্রি.। বইটিতে লেখকের নাম নেই।

১০২. 'পাটীগণিত', কলকাতা, ১৮৫৫ খ্রি.।

১০৩. ২ এপ্রিল ১৮৮৩ খ্রি. 'বেঙ্গলী' পত্রিকার 'সম্পাদকীয়' কলামে সুরেন্দ্রনাথ বিচারপতি নরিসের আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করায় ২ মে ১৮৮৩ খ্রি. আদালত তাঁর বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করে। ৫ মে-র বিচারে ২ মাস কারাদণ্ড হয়।

১০৪. 'বিবাহ বিভ্রাট', ১২৯১ ব. (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৪ খ্রি.)।

১০৫. 'লীলাবতী', ১২৭৪ ব. (১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৭ খ্রি.)।

১০৬. 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার', প্রথম ভাগ, কলকাতা, ১০ আগস্ট ১৮৭১।

১০৭. 'মেল' অর্থাৎ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলসম্বন্ধভেদ। দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের মেলবন্ধনকর্তা দেবীবর ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাজা বল্লাল সেন প্রবর্তিত নয়টি গুণের অভাব লক্ষ করে সমাজ সংস্কারে সচেষ্ট হন। দেবীবর এক-একটি দোষযুক্ত কুলীনদের নিয়ে এক-একটি মেল সমেত মোট ছত্রিশটি মেল গঠন করেন।

১০৮. 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবাহ', সংক্ষেপে 'এডুকেশন গেজেট' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে ৪ জুলাই ১৮৫৬ খ্রি. আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সম্পাদক হলেন রেভারেন্ড ও'ব্রায়ান স্মিথ।

১০৯. 'সাধারণী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১১ কার্তিক ১২৮০ ব. প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার হুগলির চুঁচুড়া থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন।

১১০. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' তিনটি খণ্ডে যথাক্রমে ১৮৫৯, ডিসেম্বর ১৮৫৯ এবং সেপ্টেম্বর ১৮৬০ খ্রি. কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

১১১. 'মেজ বৌ', কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০ খ্রি.।

১১২. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিতাবলী'র (২১ নভেম্বর ১৮৭০ খ্রি.) 'রহস্য বিষয়ক' অংশে 'বাঙ্গালীর মেয়ে' কবিতাটি ছাপা হয়েছে।

১১৩. অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় ১২৯১ ব. শ্রাবণ মাসে মাসিক পত্রিকা 'নবজীবন' আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটি মাত্র পাঁচ বছর চলেছিল।

১১৪. ১৮৭৩ খ্রি. হুগলির তারকেশ্বর মন্দিরের মহান্ত মাধবগিরি কুমরুল গ্রামের জনৈক নবীন বাঁড়ুয্যের ষোলো বছরের স্ত্রী এলোকেশীর সতীত্ব নাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। নবীন নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেন। বিচারে নবীনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং মহান্ত মাধবগিরির তিনবছর কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়। এই মামলা সেই সময়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে।

১১৫. বাংলার প্রথম রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'এর সূচনা হয় ৩৬৫, আপার চিৎপুর রোডে জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ খ্রি.। সেই দিন মঞ্চস্থ হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক।

১১৬. গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'নলদয়মন্তী' ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৩ খ্রি. স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

১১৭. কুঞ্জবিহারী বসুর লেখা 'শ্রীবৎসচিন্তা' ২ এপ্রিল ১৮৮৭ খ্রি. বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা 'শ্রীবৎসচিন্তা' অভিনীত হয় ৭ জুন ১৮৮৪ খ্রি. স্টার থিয়েটারে।

১১৮. বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পৌরাণিক নাটক 'প্রভাস-মিলন'এর বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৯ অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রি.।

১১৯. বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'নন্দবিদায়' নাটকটি ৩০ জুন ১৮৮৮ খ্রি. বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়েছিল।

১২০. গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা 'চৈতন্যলীলা'র স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২ আগস্ট ১৮৮৪ খ্রি.।

১২১. ৬৮, বিডন স্ট্রিটে ২১ জুলাই ১৮৮৩ খ্রি. 'স্টার থিয়েটার'এর উদ্‌বোধন হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

১২২. এই নামে কোনো বইয়ের সন্ধান মেলেনি। ১৮৫২ খ্রি. কলকাতা থেকে 'গৌড়িয় ভাষার ব্যাকরণ' নামে একটি বই প্রকাশের কথা জানা যায়।

১২৩. ষোলো শতকে লেখা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য কবিত্বগুণে বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে অনন্য। 'চণ্ডীমঙ্গল' লিখে মুকুন্দরাম 'কবিকঙ্কণ' উপাধি পান।

১২৪. অগ্রহায়ণ ১২৮১-১২৮৪ ব. পর্যন্ত যথাক্রমে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামেশ্বরের 'সত্যনারায়ণ', মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্য কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১২৯১ ব. সবকটি একসঙ্গে 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' নামে দুটি খণ্ডে

পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। কাব্যগুলি প্রকাশে অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে সহায়তা করেন বন্ধু সারদাচরণ মিত্র এবং শোভাবাজারের বরদাকান্ত মিত্র।

১২৫. 'গোষ্ঠীকথা' (মজলিসি গল্প), জুন ১৮৭৭ খ্রি.।

১২৬. লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ ১৯২০ খ্রি. বিহার ও ওড়িশার প্রথম ভারতীয় গভর্নর হন।

১২৭. 'মোহাম্মদী' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে শ্রাবণ (?) ১৩১০ ব. (১৮ আগস্ট ১৯০৩ খ্রি.) প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আকরম খান। প্রকাশক হলেন আব্বাস আলী। কলকাতার মুনশী করিম হক লেন, তাঁতিবাগান থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে।

১২৮. 'শিক্ষা-সঙ্কট', প্রবাসী, ৫৩/২/৫, ফাল্গুন ১৩৬০ ব., ৫৭০-৫৭৫।

১২৯. 'শকুন্তলা', ডিসেম্বর ১৮৫৪ খ্রি.।

১৩০. 'ফার্স্ট বুক অফ রিডিং', ১৮৫০ খ্রি.।

১৩১. 'চারুপাঠ'। অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত। ১ম ভাগ, ১৮৫৩। ২য় ভাগ, ১৮৫৪। ৩য় ভাগ, ১৮৫৯ খ্রি.।

১৩২. 'সেকেন্ড বুক অফ রিডিং', ১৮৫১ খ্রি.।

১৩৩. ১ আষাঢ় ১৩০৮ ব. কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র শরৎকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার বিবাহ হয়।

১৩৪. ১০ এপ্রিল ১৮৭৫ খ্রি. বোম্বাই শহরে 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩৫. 'রুচিবিকার' কবিতাটি ২৪ জুলাই ১৮৯৬ খ্রি. 'হিতবাদী' পত্রিকায় ছাপা হয়।

১৩৬. 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা হিসেবে বৈশাখ ১২৭৯ ব. প্রকাশিত হয়। ১ম—৪র্থ খণ্ড (১২৭৯-১২৮২ ব.) পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৫ম—৯ম খণ্ড (১২৮৪-১২৮৫, ১২৮৭, ১২৮৮ বৈশাখ-আশ্বিন, ১২৮৯ বৈশাখ-চৈত্র) সম্পাদক ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শেষ সংখ্যাটির (কার্তিক-মাঘ ১২৯০ ব.) সম্পাদনা করেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

১৩৭. মাসিক পত্রিকা 'আর্য্যদর্শন' আত্মপ্রকাশ করে বৈশাখ ১২৮১ ব.। সম্পাদক ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। পত্রিকাটি এগারো বছর (১২৮৫-১২৯২) চলেছিল।

১৩৮. 'কল্পদ্রুম' প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১২৮৫ সালে। মাসিক কল্পদ্রুমের সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। পত্রিকাটি চলেছিল মাত্র পাঁচ বছর (১২৮৪-১২৮৯)।

১৩৯. 'ভূদেব চরিত', মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, ৩টি খণ্ড, চুঁচুড়া, (১৯১৭-১৯২৭)।

১৪০. বর্তমান সংকলনের 'আমাদের পরিচ্ছদ' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

প রি শি ষ্ট

চিঠি : হরিহর শেঠকে লেখা

[শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চন্দননগরে অবস্থিতি সম্বন্ধে জানিতে চাওয়ায় সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু জানাইয়াছিলেন। অদ্য এই পত্রখানি পাই। তাঁহার বার্দ্ধক্য হেতু বিস্মৃতি বশতঃ হয়ত সামান্য কিছু কিছু ভুল থাকিলেও, যেমন স্বর্গীয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নীর নাম অবলা বসুর পরিবর্তে উর্মিলা এবং বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় "জাহ্নবী-নিবাস" বাটীতে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন, লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি মাত্র এক দিন এক রাত্রি ও এক বেলা ছিলেন— যোগেন্দ্রবাবুর পর আর এসব কথা শুনাইবার কেহ না থাকায়, আমি এই পত্রখানি মূল্যবান বিবেচনা করিয়া মাসিক বসুমতীতে প্রকাশের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। শ্রীহরিহর শেঠ, ৫ই অক্টোবর ১৯৫৫]

প্রিয় হরিহর বাবু,

আমার আশীর্ব্বাদ ও সাদর সম্ভাষণ জানিবেন। আপনি অসুস্থ হইয়াছেন জানিয়া চিন্তিত হইলাম। ঈশ্বরের নিকট আপনার আরোগ্য কামনা করি। বর্ষার অবসানে আপনার বাত ভাল হইবে বলিয়া আশা করি।

আপনি চন্দননগরের অতীত কালের কথা কিছু জানিতে চাহেন। আমি যাহা জানি, তাহা আপনাকে জানাইতেছি।

রাধানাথ সিকদার

ইনি সেকালের হিন্দু কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। ভূদেব বাবু, মাইকেল মধুসূদন, রাজনারায়ণ প্রভৃতি হিন্দু কলেজে তাঁহার ছাত্র ছিলেন। পরে ইনি ভারত সরকারের জরীপ বিভাগের অধিকর্ত্তা এভারেষ্টের অধীনে কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ "গৌরীশঙ্করের" উচ্চতা পরিমাপ করেন। ঐ উচ্চতা ২৯০০২ ফিট, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ চূড়া। ইনি তাঁহার উপরওয়ালার নামে ইংরাজীতে "Mount Everest" নামকরণ করেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি কিছু কাল চন্দননগরে বাস করিয়াছিলেন। কুঠীর মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে বাড়ীটা দয়াল ডাক্তার কিনিয়াছিলেন, সিকদার মহাশয় সেই

বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি ইউরোপীয় আচার-ব্যবহারে প্রিয় ছিলেন। আমি আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি, ভূদেব বাবু বাবাকে সঙ্গে লইয়া একদিন রাধানাথ বাবুর কাছে গিয়াছিলেন। তিনি পুরাতন ছাত্রকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। কথায় কথায় ভূদেব বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "শুনিলাম আপনি বিলাত যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন? বিলাত যাইলে সমাজ আপনাকে জাতে ঠেলিবে না কি?" উত্তরে রাধানাথ বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "লোকে ঠেলে তো ফেলিবার জন্য। আমি তো কাত হইয়া আছি। আমাকে ঠেলিয়া আর লাভ কি?" তাঁহার কথা শুনিয়া ভূদেব বাবু হাসিয়া উঠিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যে বাটীতে রাধানাথ সিকদার থাকিতেন তাহার ঠিক পশ্চিমে লিচুবাগানের বাটীতে মহাকবি মাইকেল কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ইহা বোধ হয় আপনিও জানেন।

নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনি কলিকাতা বহুবাজারের হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র। লোকে তাঁহাকে বলিত হিদেরাম বাঁড়ুজ্জ্যে; তাঁহারই নামে কলিকাতায় হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেন বিদ্যমান আছে। শুনিয়াছি, নীলকমল বাবু দুর্দ্ধর্ষ মাতাল ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে ছোট দুই জন ভূপেন ও নগেন বাল্যকালে আমাদের খেলার সঙ্গী ছিল। নীলকমল বাবুর পাঁচ ছয়টি পুত্র ছিল। সকলেই ভয়ানক মাতাল ও দুশ্চরিত্র ছিল। সে জন্য সকলেই অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও ষ্টেশন-রোডের চৌমাথার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে দ্বিতল অট্টালিকা আছে অর্থাৎ মাইকেলের বাসার ঠিক উত্তরে নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। চন্দননগর বড়বাজারে নীলকমল বাবুর আরও দুই-তিনখানা বাড়ী ছিল। শুনিয়াছি নীলকমল বাবু কলিকাতার কোন সরকারী অফিসের মুৎসুদ্দি ছিলেন।

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ইনি কিছু দিন গঙ্গার ধারে আপনার "জাহ্নবী নিবাস" অট্টালিকায় বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং আমা অপেক্ষা আপনি তাঁহার বিষয় বেশী জানেন। আমি এবং আমার বন্ধু বিনোদ ভড় প্রায় প্রত্যহই তাঁহার নিকট যাইতাম। রায় মহাশয় সর্ব্বদাই নগ্ন পদে চলাফেরা করিতেন। এমন কি ষ্ট্রাণ্ডে ভ্রমণের সময়ও নগ্ন পদে ভ্রমণ করিতেন। তিনি জুতা পায়ে দেন না কেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "জুতা পায়ে দেওয়াটা স্বাস্থ্যহানিকর। জুতা যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভালে।"

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুর

"বঙ্কিম বাবুর অগ্রজ" সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান রাজপরিবারের প্রতাপচাঁদের জীবনী অবলম্বনে "জাল প্রতাপচাঁদ" নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রতাপচাঁদ বাহাদুর জালিয়াত নহেন। তিনি সত্যই মহারাজা। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবং উৎকোচের প্রভাবে তিনি ইংরাজের আদালতে জাল বলিয়া

সপ্রমাণ হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল। তিনি তখন গ্রেপ্তারের ভয়ে ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি যে বাটীতে ছিলেন তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। তাহা নিত্যগোপল স্মৃতি মন্দিরের দক্ষিণে চৌমাথার উপরে দ্বিতীয় বাটী। তিনি চন্দননগর হইতে চলিয়া যাইবার সময় কয়েকটি আসবাবপত্র ঐ বাটীর তৎকালীন স্বত্বাধিকারী নীলকণ্ঠ সরকারকে দিয়া যান। তাঁহার প্রদত্ত একটি সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট কৌচ আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। এখনও উহা আছে কি না জানি না।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি। সরকার মহাশয়দের যে বাড়ীর কথা বলিলাম, তাহা ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ফরাসী সরকারের হাসপাতাল ছিল। তাহার একটা প্রমাণ এই যে, উহার নিম্নতলের বা দ্বিতলের জানালা-দরজাগুলি নয় ফুট দীর্ঘ ও পাঁচ ফুট প্রস্থ। এইরূপ সুবৃহৎ জানালা-দরজা বাঙ্গালীর বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। উপর-নীচের কক্ষগুলিও খুব বড়। ঐ বাটীর পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী বাগানের মধ্যে আছে। বাগানের দক্ষিণ দিকের পাঁচীল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে রাস্তা হইতে সেই পুকুরটি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে ঐ ভবনে হাসপাতাল ছিল সে সময় আমার প্রপিতামহ নেড়োরবনের শিবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ফরাসী কুঠির দেওয়ান ছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যু হইলে আমার প্রপিতামহের খুল্লতাত রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ফরাসী কুঠির দেওয়ান হন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার প্রপিতামহ শিবানন্দ দেওয়ান হন। তিনি দেওয়ান থাকা কালে ফরাসী সরকারের ব্যয়ে হাসপাতাল-ভবনের পশ্চিমে উল্লিখিত পুষ্করিণী খনন করান। তাঁহার আর একটি প্রাচীন কীর্ত্তি কুঠির ঘাট। প্রাচীন ফরাসী দুর্গ "দে অরল্যাঁ"র দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নিজ ব্যয়ে গঙ্গায় ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ ঘাটের ঠিক দক্ষিণে দুর্গের বাহিরে ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল গঙ্গাগর্ভে বাস করিবার জন্য একটি সুন্দর বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করান। সে বাড়ী এখনও বর্ত্তমান আছে। উহা এখনও "ভূকৈলাসের রাজবাড়ী" বলিয়া খ্যাত। রাজা জয়নারায়ণের পুত্রবধূই হউন বা পৌত্রবধূই হউন, রাণী তারাসুন্দরী ঐ বাটীতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। রাজবাটীর ঠিক দক্ষিণে দত্তর-ঘাট নামে যে ঘাট আছে, রাণী তারাসুন্দীর তাহার একটি সুন্দর চাঁদনী প্রস্তুত করাইয়া দেন। সেই জন্য ঐ ঘাটকে অনেকে রাণীর-ঘাট বলে। চাঁদনীর উপরে কার্নিশের নীচে রাণী তারাসুন্দরীর নাম এবং চাঁদনী নির্ম্মাণের তারিখ লেখা আছে। কিন্তু ঐ ঘাটটি রাণীর নির্ম্মিত নহে।

এই প্রসঙ্গে দত্তর ঘাটের কথাও আমার পিতার মুখে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করিতেছি, আমার পিতা জীবিত থাকিলে তাঁহার বয়স ১২১ বৎসর হইত। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চন্দননগরের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি বাল্যকালে ৮০/৮৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সদুত্তর পান নাই। তিনি এ পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন যে, দত্ত উপাধিধারী কোন ধনবান ঐ স্থানে গঙ্গার তীরে ঘাট নির্মাণের জন্য ভিত্তি খনন আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রায় ৩ হাত গভীর মাটির নীচে একটা পুরাতন ঘাটের ধ্বংসাবশেষ বাহির হয়। তখন তিনি সেই স্থানের সমস্ত মাটি উঠাইয়া ফেলেন। মাটির নীচে খুব ছোট ছোট ইটের গাঁথুনি একটা বড় ঘাট ভগ্ন অবস্থায় বাহির হয়। ওই ঘাট গঙ্গার জল হইতে বেশী দূরে ছিল না। দত্ত মহাশয় তখন সেই পুরাতন ঘাট বজায় রাখিয়া তাহার নীচের দিকে আরও বাড়াইয়া জলের কিনারা পর্যন্ত লইয়া যান। দত্ত মহাশয়ের সময়ে প্রচলিত ৯ ইঞ্চি ইটেই ঘাট নির্মাণ করেন। পুরাতন ঘাট যেরূপ ছোট ইটের

গাঁথুনি, সেরূপ ছোট ইট তাঁহার সময় ব্যবহৃত হইত না। এই তো গেল দ্বিতীয় স্তরের-কথা। তারপর বাল্যকালে আমি যখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতাম, তখন গবর্ণমেন্ট বা মিউনিসিপ্যালিটী ওই ঘাটকে আরও বাড়াইয়া জলের কিনারা পর্য্যন্ত লইয়া যায়। এই নবনির্মিত অংশটা এখনকার প্রচলিত দশ ইঞ্চি ইটে গাঁথা। সুতরাং দত্তর-ঘাটে তিন যুগের তিন প্রকার ইটের গাঁথুনি দেখিতে পাওয়া যায়। শেষ যুগের অংশটা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। বর্ষার জলস্রোতে ভিতরের মাটি বাহির হইয়া যাওয়াতে ঘাটটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং এখনও সেই অবস্থাতেই আছে। মধ্যস্তর নির্মাতা দত্ত মহাশয় কায়স্থ, সুবর্ণ বণিক কি তন্তুবায় ছিলেন, তাহা সে কালের অতিবৃদ্ধেরাও বলিতে পারেন নাই।

জগদীশচন্দ্র বসু

বাল্যকালে যখন আমরা কলেজিয়েট-স্কুলে পড়িতাম, তখন আমরা প্রায় দেখিতাম, কোট-প্যান্ট পরিহিত গৌরবর্ণ এক সুশ্রী যুবক সপত্নীক একটা ভাউলের ছাদে বসিয়া বিচরণ করিতেন। ভাউলের নাম লিখা ছিল— "উর্মিলা"। পরে আমরা শুনিয়াছিলাম যে সেই যুবক ইংলণ্ড হইতে সদ্য প্রত্যাগত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু। ভাউলেটি তাঁহার নিজের। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের জড়-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁহার পত্নীর নাম উর্মিলা। তিনি পত্নীর নামেই তরণীর নামকরণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ হাটখোলা অথবা গোঁদলপাড়া গঙ্গার ধারে কোন বাটীতে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়কার একটা ঘটনা আমার মনে আছে। এক দিন তাঁহাদের জলভ্রমণ কালে একটা ষ্টীমারের ঢেউ লাগিয়া নৌকাখানি সহসা অত্যন্ত দুলিয়া উঠে। তাহাতে বসুপত্নী ভাউলিয়া হইতে জলে নিক্ষিপ্ত হন। তাহা দেখিয়া এক জন মাঝি বা দাঁড়ি সঙ্গে সঙ্গে জলে লাফাইয়া বসুপত্নীকে উদ্ধার করে। সেজন্য বসু মহাশয় মাঝিকে ১০০ টাকা বক্‌সিস্ দিয়াছিলেন। হাটখোলা ও গোঁদলপাড়া ব্যতীত চন্দননগরের অন্য পল্লী গঙ্গার ধারে অবস্থিত নহে। সুতরাং অধ্যাপক মহাশয়ের এই দুই পল্লীর যে কোন এক পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কিছু দিনের জন্য চন্দননগরে থাকিয়া হাটখোলায় দয়েরধার নামক পল্লীতে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। হাটখোলার গঙ্গার ধারের যে অংশটায় ষ্ট্যাণ্ড এর মত অনেকটা রেলিং দেওয়া আছে, সেই রেলিং-এর পশ্চিম পার্শ্বে রাজপথ এবং পূর্বদিকে গঙ্গ াঘাট। সেই স্থানে গঙ্গাতে একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে। নিকটেই ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজার মণ্ডপ আছে। ঐ দেবতার নাম অনুসারে ঘূর্ণাবর্ত্তের নাম হইয়াছে, 'ভুবনেশ্বরী দহ' এই দহ হইতেই পাড়ার নাম হইয়াছে, 'দহের ঘাট'। গঙ্গার ধারে যে রাস্তা ছিল, এই দহ হইতেই পাড়ার নাম হইয়াছে, 'দহের ঘাট'। গঙ্গার ধারে যে রাস্তা ছিল, তাহার কিয়দংশ গঙ্গাগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়াতে সে রাস্তায় আর এখন গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে না। দহের নিকটেই রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বের বাড়ীতে শাস্ত্রী মহাশয় সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। আমি অবসর পাইলেই গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতাম। আমার পিতার সহিতও তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের বাড়ীতে ২/১ বার আসিয়াছিলেন। সেটা বোধ হয় ১৮৮৬/৮৭ খৃষ্টাব্দে হইবে।

মহেশচন্দ্র চৌধুরী

সেকালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকিল বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার আমদপুর গ্রামে,— মেমারী ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী। তিনি একবার অসুস্থ হওয়াতে চিকিৎসকের পরামর্শে গঙ্গাগর্ভে বাস করিবার জন্য ষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে পাতাল বাড়ীতে আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতে পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং আরও পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাস করিয়াছিলেন। মহেশবাবু যখন চন্দননগরে ছিলেন, সে সময়ে এক অপরাহ্নে আমি গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম, একটা জুড়িগাড়ীতে দুই জন ভদ্রলোক ষ্ট্যাণ্ড রোড ধরিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছেন। তখন এদেশে মোটর গাড়ী আসে নাই। আমার নিকটে এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন,— "যোগেন, তুমি ইহাদিগকে চেন?" আমি "চিনি না" বলাতে তিনি আমাকে বলিলেন— "হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঁহারা মহেশবাবুকে দেখিতে আসিয়াছেন।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে

লালবিহারী দে মহাশয় দীর্ঘকাল হুগলী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া আমি যখন হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হই, তখনও দে সাহেব হুগলী কলেজেই ছিলেন। তাঁহার কাছে ৮/৯ মাস পড়িবার পর তিনি পেন্‌সান গ্রহণ করেন। দে সাহেব এক পারসিক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দে সাহেব ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাঁহার পুত্রকন্যারা কেহই কৃষ্ণকায় হয়েন নাই। তাঁহার তৃতীয় পুত্র হরমদী টেগোর দে আমার সহপাঠী ছিল। তিনি অনেকদিন চন্দননগরে বাস করিয়াছিলেন। বড় আদালতের ঠিক পশ্চিম পার্শ্বে যে স্থানটা আজকাল আকন্দ জঙ্গলে পরিণত হইয়া আছে, সেইখানে গাড়ী বারান্দাওয়ালা একটি দ্বিতল বাড়ী ছিল। দে সাহেব সেই বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি ধর্মে-খৃষ্টান এবং চালচলনে সম্পূর্ণ সাহেব হইলেও কখনও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন না। সাদা প্যাণ্টুলান, কালো চাপকান্ এবং মাথায় টারকিস্ ক্যাপের ন্যায় একটি উচ্চ টুপি ব্যবহার করিতেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

চন্দননগর আদালতের ঠিক দক্ষিণে যে বাড়ীটা আছে— তাহা প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তখন ঐ বাড়ীর দোতলা অংশটা ছিল না।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়ার স্কলারসিপ নামক বৃত্তি লইয়া হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন এবং ভাগীরথীর ধারে ধারে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ছিলেন। প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় চন্দননগরে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে দত্তর-ঘাটে যাইবার যে পথ আছে, যাহা এখন ভূদেব মুখোপাধ্যায় রোড নামে অভিহিত। সেই পথের দক্ষিণে পুরাতন কালেক্টরীর ঠিক সম্মুখে যে একটি প্রাচীন ভবনের ভগ্নাবশেষ বিদ্যামান আছে, উহাই ভূদেববাবুর প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের স্মৃতিচিহ্ন। ভূদেববাবু চন্দননগরে কখনও বাস করেন নাই। তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়া তথা হইতে নৌকাযোগে চন্দননগর যাতায়াত করিতেন।

চন্দননগর সম্বন্ধে আমি অনুসন্ধান করিয়া যে সকল প্রবাহ বা আখ্যায়িকা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই উপলক্ষ্যে করিয়া কয়েকটি ছোট গল্প, সেকালের কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম।

(১) "তৈলবট"। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সম্বন্ধে লেখা। (২) "কাশীনাথ প্রতিষ্ঠা" ইন্দ্রনারায়ণের পৌত্র কাশীনাথ চৌধুরীর সমাজে উঠিবার কথা। (৩) "যাদু ঘোষের রথ"। (৪) "কিঙ্কর সেনের গড়"। (৫) "মজুমদারের গড়"। (৬) কনে বৌয়ের মন্দির"। (৭) "সরকার দীঘি'।

প্রভৃতি গল্পগুলি আপনি বোধ হয় মাসিকপত্রে পড়িয়াছেন। আমাদের পাড়ার সাহেব-পুকুর নামক পুষ্করিণীর কে খননকর্তা, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। বাল্যকালে কোন কোন বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি যে, ঐ পুষ্করিণীর নাম "মাণিক সাহেব পুকুর"। লালবাগানে "বিশালক্ষ্মী বেণেপুকুর" এবং কলু পুকুরের রাস্তার দক্ষিণে "চাদনী বেনেপুকুর" নিশ্চয়ই কোন সুবর্ণ বণিকের দ্বারা খনিত হইয়াছিল। "বিশালক্ষ্মী বেণেপুকুরের" চারি দিকে যে বৃহৎ বাগান আছে, তাহা "বাবাজীর বাগান" নামে খ্যাত। আমি শুধু এইটুকু জানিতে পারিয়াছি যে, সরিষা পাড়ায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম দিকে "বাবাজীর রথ" নামে যে রথ আছে, তাহা লালবাগানের এক আখড়ার রথ। আমার গবেষণার ফল এই পর্য্যন্ত। আপনাদের প্রতিবেশী মহাভারত পাল এবং রূপনাথ দে মহাশয়দের সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা আপনিই বেশী জানেন। আজ এইখানেই ইতি।

ভবদীয়
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

একটি সাক্ষাৎকার

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন প্রবীণ সাংবাদিক একথা শুনেছিলাম লোকপরম্পরায়। কিন্তু তিনি যে 'হিতবাদী'র সাংবাদিক ও সম্পাদক ছিলেন একসময়ে, সেকথা আগে জানতাম না। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপে বুঝেছি তিনি সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, দুই-ই ছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা, সেকালের অনেক মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর ছিল সাক্ষাৎ পরিচয়। অনেকের সঙ্গে ছিল রীতিমত বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য। বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু থেকে সুভাষচন্দ্র, সেকাল ও একালের মাঝামাঝি সকলের সঙ্গেই যোগাযোগ ঘটেছে তাঁর।

বয়স প্রথম সঠিক অনুমান করতে পারি নি। ভেবেছিলাম, অনেক বয়সের মানুষ, নিশ্চয়ই বসে বসে কাল কাটাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাসভবনে যখন গেলাম দেখা করতে, শুনলাম বেড়াতে গেছেন। একটু অবাকই হলাম। তখন সন্ধ্যাকাল। অন্ধকার এসেছে নেমে। অদূরেই একটি কলেজে সন্ধ্যাকালীন ক্লাস আরম্ভ হয়েছে। একটু পরেই উনি এলেন ঠুক্ ঠুক্ করে। রীতিমত দীর্ঘপুরুষ। চোখের দৃষ্টি পুরোমাত্রায় সজাগ সপ্রশ্ন। পরিচয় নিয়ে বসলেন। কানে শুনতে পান না ভাল।

পাশ ঘেঁষে বসে বললেন, 'কি বলতে পারি তোমাদের!' আমার জন্ম-কর্ম-নাম ধাম? বলতে পারি অনেক কথা, অনেকের কথা। কিন্তু এতকথা লেখবার তোমার জায়গা কোথায়।

'বয়স? তা' ধরো, সিপাহী বিদ্রোহের দশ বছর পরে জন্মেছি। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এই সময়েই হবে। বাংলা ১২৭৪ সালের ২১শে ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেছি চন্দননগরে। এক বছর বয়সে বাবার সঙ্গে যাই কটকে। ছ'বছর বয়স পর্য্যন্ত সেখানে ছিলাম। সেজন্যে হাতেখড়িটা উড়িয়া অক্ষরেই হয়েছিল। তা' পারি বইকি উড়িয়া ভাষা পড়তে। লিখতে তেমন অভ্যস্ত নই।

"আরো দু'জায়গায় ঘুরে, ১২৮২ সাল থেকে চন্দননগরে স্থায়িভাবে থাকতে আরম্ভ করি। চন্দননগরে এখন যেটা কানাইলাল বিদ্যামন্দির হয়েছে, তখন সেটা ছিল ফরাসী মিশনারীদের স্কুল। নাম ছিল, সেন্ট মেরীজ ইনস্টিটিউশন। ওরই পাঠশালা বিভাগে পড়তাম। গরবাটি স্কুলে আরম্ভ হয়েছিল পুরোমাত্রায় ইংরাজী বাংলা শিক্ষা। ফোর্থ ক্লাশ অবধি এখানে পড়ে তারপরে যাই হুগলীর কলেজিয়েট স্কুলে পড়তে। তখনকার বাংলাদেশে, সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক শিবচন্দ্র সোম ছিলেন আমাদের হেডমাস্টার। আমাদের পড়াতেন তখন রায়বাহাদুর রসময় মিত্র মশাই।

'সম্ভবতঃ আর একটু আর্লি-স্টেজে হবে, আমরা পড়তাম ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত এডুকেশন গেজেট। ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল দাদু-নাতীর। আমার বাবা পড়েছেন যে ওঁর কাছে। বাবা ওঁর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বাবার নাম ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাবা ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন বলে উনি বাবাকে সরকারী চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেন। তারপর একদিন বলেছিলেন, ইন্দ্র, তোমার তো কোন কুলগুরু নেই। এবার করে ফেল। বাবা বললেন, কাকে করব? উনি বললেন, যাঁকে ভক্তি হয়। বাবা বললেন, 'তা' হলে আপনি ছাড়া আর কার পায়ে মাথা নোয়াব'। তখন উনি বাবাকে মন্ত্র দেন।

'হ্যাঁ, আমার এই স্কুল জীবনেই পত্রপত্রিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্কুলে পড়ার সময়েই, ভূদেববাবুর ভাগ্নে বাবু তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগর থেকে প্রকাশ করেন 'প্রজাবন্ধু'। ইনি চাকরী করতেন কলকাতার ডি পি আই অফিসে।

'চন্দননগর তো ফরাসডাঙা, ফরাসীদের উপনিবেশ। ইংরাজ সরকারের যে সমস্ত অন্যায় অবিচারের কথা কলকাতার কাগজগুলো লিখতে পারতেন না, চন্দননগরে বসে সে বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করা যেত। আর প্রজাবন্ধুর আবির্ভাব তো সেইজন্যেই হয়েছিল। সিডিশনের ভয় তো ছিল না। প্রজাবন্ধুতে তখন ইংরাজকে 'দানব ইংরাজ' ইত্যাদি বিশেষণযোগে লেখা হত। কাগজটা চন্দননগরের, কিন্তু চাকরীটা তো কলকাতায়। তিনকড়িবাবুর চাকরীটি গেল। শেষদিকে তাঁর বড় অর্থাভাব গেছে। প্রজাবন্ধু বন্ধ হয়ে গেছে। যতদূর মনে আছে, প্রজাবন্ধুতেই আমি প্রথম লিখি, আমার ছাত্রজীবনে।

'হ্যাঁ, এডুকেশন গেজেট ছাড়াও, তখনও আমরা আরো কাগজ পড়তাম। যেমন ধরো, যোগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গবাসী' কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী'।

'এরপরে চন্দননগর থেকে আর একটি কাগজ বেরোয়, 'ধূমকেতু'। এটি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। উদ্দেশ্যে একটিই, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সেই সঙ্গে সাহিত্যের তৃষ্ণা মেটানো।

'লেখাপড়ার শেষ হলো অর্থাভাবে। এন্ট্রান্স পাশ করেছিলাম ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। তারপর হুগলী কলেজেই শিক্ষা চলে। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ গ্রিফিথ্। সারা বাংলায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল তিনটি। হুগলী, প্রেসিডেন্সী কলেজ, আর ঢাকা জগন্নাথ কলেজ। আই এ-কে বলত এফ এ, পরে হয়েছে এল এ।

প্রথম শ্রেণীতে যখন পড়ি, তখন বিদ্যাসাগর এসেছেন চন্দননগরে। চন্দননগর ষ্ট্রান্ডের দক্ষিণে, বাঁধানো ফুটপাথের শেষে যে বাড়িটি রয়েছে, সেই বাড়িতে ছিলেন। বাবা বললেন, চল, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে আসি। গেলুম। নানান রকমে, অদর্শনেও পরিচয় ছিল। বিধবা বিবাহ আইন পাশ করিয়ে অনেক আগেই কুখ্যাতি ও সুখ্যাতি লাভ করেছেন। বাবার সঙ্গে আমাকে দেখে বললেন, 'এই ছেলেটি কে?' বাবা বললেন, 'আমার ছেলে'। নমস্কার করলুম। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, নাম কি তোমার'। নাম বললুম। কিন্তু তখন আমার নবীন মন। খাতির আপ্যায়ন কিছু নেই, একেবারে তুমি তুমি। ভারী বেয়াড়া লোক তো!

বলে হাসলেন শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়। বললেন, 'জানো বোধ হয় উনি দেড় বছর প্রায় চন্দননগরে ছিলেন। তখন প্রায়ই গেছি ওঁর কাছে। কত কথা যে শুনেছি। কত সব বিচিত্র কাহিনী আর গল্প, বলবার অবকাশ নেই। অবকাশ থাকলেও লিখবে কোথায়?

'হ্যাঁ, তারপর কাগজের কথায় ফিরে আসা যাক। চন্দননগর থেকে এবার কাগজ বের করলাম সিডিশন্ প্রীচ্ করবার জন্যে। সাপ্তাহিক কাগজ, নাম হল 'বঙ্গবন্ধু'। আমি হলাম সম্পাদক, বন্ধু চারুচন্দ্র রায় হলেন সহকারী সম্পাদক। এই চারু রায় পরে মুরারিপুকুর মামলার আসামী হন। চন্দননগরের ওপারে, আতপুরের তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য তখন চন্দননগরে প্রেস খুলেছেন। ওই প্রেসেই 'বঙ্গবন্ধু' ছাপা হত। কিন্তু তারাপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে নানান কারণে তখন আমাদের গোলযোগ হতে লাগল। কথা নেই বার্তা নেই, উনি আমাকে না জানিয়েই, ওঁর লেখা কাগজে ছাপিয়ে দিতেন। ওঁর সে সব লেখারও তেমন মূল্য ছিল না। শেষ পর্যন্ত অমি বঙ্গবন্ধু ছেড়েই দিলুম। তারপরে আর খুব বেশীদিন কাগজ চলেনি।

'চাকরী পেলুম আর স্টীল অ্যান্ড কোম্পানীতে বুক-কীপারের। সেটা হবে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ। চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসাধনা চলল পুরোপুরি। এ সময়ে অনেক কাগজে গল্প লিখেছি।

'তারপরেই 'হিতবাদী'। হিতবাদী দৈনিকে একটি বিজ্ঞাপন দেখলুম, তাঁরা একজন লোক চান। বাবা বললেন, গিয়ে দেখা কর, হয় কি না। তখন সহকারী সম্পাদক ছিলেন সখারাম গনেশ দেউস্কর। ওঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল আগেই। সেইদিনই লেগে গেলাম কাজে।

'তখন হিতবাদীর প্রতি আমাদের বড় টান। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বেরোয় দৈনিক। এর জন্ম হয়েছিল সাপ্তাহিক আকারে। জন্ম-তারিখ তো ঠিক বলতে পারব না। হিতবাদীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা এটর্নী প্রেমচাঁদ বড়াল। হ্যাঁ, কলকাতার ওই রাস্তাটা ওঁর নামেই। সম্পাদক ছিলেন এক নামকরা পণ্ডিত। নামটা মনে করতে পারছিনে।

মস্ত বড় কাগজ, তা প্রায় এই টেবিলটার (3´×2.5´ এর কম নয়) সমান, গোলাপী বর্ণের কাগজ ছিল। বেশীদিন চালাতে পারলেন না উনি। স্বত্ব কিনে নিলেন ঝামাপুকুরের যোগেন্দ্রনাথ বসু। ইনিও বেশীদিন রাখতে পারলেন না। কিনে নিলেন কলুটোলার উপেন্দ্রনাথ সেন। ইনি বিখ্যাত সি কে সেনের ছেলে।

'তখন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এলাহাবাদ থেকে একটি ছোট সাপ্তাহিক চালাচ্ছিলেন। উপেনবাবু অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন, হিতবাদীর দায়িত্ব নিতে। যোগ দিলেন এসে কাব্যবিশারদ, উনিই হলেন সম্পাদক।

'তখনকার কাগজে সম্পাদকের নামোল্লেখ অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মুদ্রাকরের নাম থাকতেই হবে।

'তখন তিনটি সাপ্তাহিকের মধ্যে লড়াই চলত খুব। হিতবাদী, বঙ্গবাসী ও বসুমতী। এ ওকে একটু খোঁচা, ও একে একটু টিপ্পনী, সে লিখেই হোক আর কার্টুন এঁকেই হোক, নরম গরম চলত ভাল।

'বঙ্গবাসী খুব শক্তিশালী ছিল। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের লেখনীও খুব শক্তিশালী ছিল। জাতীয় জীবনে তখন নতুন চেতনার উন্মেষ হচ্ছে। কাব্যবিশারদের কলমেও সেই চেতনারই বাস্তবরূপ ফুটেছিল কঠোরভাবে। অবশ্য অন্যান্য বিষয়েও, সমাজ সামাজিকতার ত্রুটি সহ্য করতে পারতেন না।

'একটা গল্প বলছি : কুসুমকুমারী নামে এক ব্রাহ্মিকা ছিলেন। ব্রাহ্মরা একটু আলোকপ্রাপ্ত তো তখন। সিটি কলেজের হেরম্ব মৈত্রও ব্রাহ্ম। তাঁর সঙ্গেই কুসুমকুমারীর বিয়ের সব ঠিকঠাক। অনেকদিন থেকে কোর্টশিপ্‌ও চলেছে। কিন্তু হঠাৎ উপেন মজুমদার বলে এক ব্রাহ্মের সঙ্গে কুসুমকুমারীর বিয়ে হয়। বিষয়টা গেল সহ্যের সীমা অতিক্রম করে।

'ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন কাব্যবিশারদ : কোকিল, বসন্ত, এমনি সব নামে। সেবারে লিখলেন, 'কুসুম' নামে কবিতা। তার এক জায়গায় লিখলেন,

আজি গণপতি গলে
কাল বিষ্টু পদতলে।

তোমরা মানেটা বুঝলে? হেরম্ব মানে গণপতি আর উপেন্দ্র মানে বিষ্ণু। আর এক জায়গায় লিখলেন,

আজি হেরম্বের ভোগ্য
কাল উপেন্দ্রর যোগ্য।

আর যায় কোথায়! কুসুমকুমারীরা রেগে মানহানির মামলা করলেন হাইকোর্টে। বিচারে কাব্যবিশারদের ন' মাস জেল হয়ে গেল। অনেকে বললেন, ক্ষমা চাইলেই ব্যাপারটা যখন মিটে যায়, তখন জেলে যাওয়ার কি দরকার। কিন্তু, কাব্যবিশারদ ক্ষমা চাইলেন না। পাঁচ মাস জেল ভোগের পর, সে সময় সম্ভবতঃ সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে অনেক বন্দীর সঙ্গে মুক্ত হয়ে আসলেন। এর ফলটা অবশ্য আর একদিক থেকে ভাল হয়ে গেলে। হিতবাদীর প্রচার গেল বেড়ে।

'তোমরা শুনলে অবাক হবে; হিতবাদী তখন পঁচিশ হাজারে উঠল। দাম ছিল দু'পয়সা। তখনকার দিনে দুটো পয়সা দুটো পয়সা-ই। এখন তার মূল্য অনেক। হিতবাদীর সর্বাধিক প্রচার পঁয়ষট্টি হাজার পর্যন্ত উঠেছিল।

'একবার ছোটলাট স্যার এণ্ড্রুজ ফ্রেজার গেলেন নবদ্বীপ দর্শনে। নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজ তাঁকে উপাধি দিলেন 'ন্যায়সিন্ধু'। হিতবাদী লিখলেন ব্যঙ্গ করে :

এবার গৌর এসে গোল বাঁধালে নদীয়ায়,
বিনা ন্যায়ের বিন্দু হলেন সিন্ধু
হিন্দু-সুতের পেটের দায়,
এবার গোরা এসে গোল বাঁধালে নদীয়ায়।

'কাব্যবিশারদের কথাই তাহলে শেষ করি। ওঁর অসুখ হল। ডাক্তার বললেন, 'সী ভয়েজে যেতে। উনি গেলেন জাপানে। পথে হংকং-এ দেখলেন শিখ সৈন্য। সেখানে তাদের নিয়ে একটি সভা করে বলেন, আপনারা রণজিৎ সিংহের দেশের লোক,

আপনাদের এ কাজ সাজে না। তাঁর কথায় রীতিমত সাড়া পড়েছিল প্রবাসের শিখদের মধ্যে। ফেরবার পথে অসুস্থাবস্থায় এক শিখের আতিথ্য নিয়েছিলেন। পেটের অসুখের মধ্যেও খাওয়া দাওয়া করেন প্রচুর। তারপর চীনা সমুদ্রে, জাহাজের কেবিনেই লিখতে লিখতে হার্টফেল্‌ করেন। সী গ্রেভ হয় ওঁর অর্থাৎ বাক্সে পুরে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

'হিতবাদী'তে আমি এসে লিখতুম, 'বৃদ্ধের বচন', 'শ্রী বৃদ্ধ' ছন্দনামে। টিকাটিপ্পনী, ব্যঙ্গ সমালোচনাই ছিল শ্রী বৃদ্ধের রচনার মূল। পরে বাংলাদেশের কাগজগুলিতে এই শ্রেণীর রচনা রীতিমত চলে আসছে। বৃদ্ধের বচন বেরুত প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত রীতিমত লিখে গিয়েছি। বাদ পড়েনি কখনো। একবার লিখতে পারলুম না। বৃদ্ধের বচন লিখলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। নীচে লিখলেন 'ব-কলম শ্রীবৃদ্ধ'।

কাব্যবিশারদের পর অনেকে সম্পাদক হয়েছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, কবি মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ। তারপর আমি। অবশ্য কাজ গ্রহণের পরে, ১৯১৯ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত।

'এই সময়ে আমার সাহিত্য সাধনাও চলে পুরোদমে। এই দেখ রবীন্দ্রনাথের চিঠি, গল্প পড়ে লিখেছিলেন : "... সাহিত্যে তোমার 'আগন্তুক' গল্পটি আমার বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। তাহা কৌতুকে সরস ও পল্লী-বর্ণনা মাধুর্যে মনোরম হইয়াছে। গল্পের আখ্যানভাগ সরল অথচ ঔৎসুক্যজনক। ভাষাটি স্বচ্ছ।"

'রবীন্দ্রনাথ আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু কত কথা তোমাকে আর বলব। ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত ছিল খুবই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সকলের সঙ্গেই আলাপে কৃতার্থ হয়েছি।

'সেকালের শান্তিনিকেতনে গিয়ে অনেকবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছি। আমার বড় ছেলেকে রেখেছিলাম সেখানে। ভোরে বেড়াতে গেছি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

'রাজনারায়ণ বসু, রামগতি ন্যায়তীর্থ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, সকলের সঙ্গেই কমবেশী কথাবার্তা ওঠাবসা করেছি। তাঁদের কথা ও গল্পের কথা যদি বলি, তোমার ঝুলিতে তো ধরবে না। জগদীশচন্দ্র এক্সরে আবিষ্কার করেছিলেন জান বোধ হয়। এক্সরে যন্ত্রও তৈরী করেছিলেন। প্রথমে তো কাঠের বাক্সে কাঁচি পুরে আর পয়সা রেখে দেখা গেল, experiment করে। একদিন আমি রয়েছি ল্যাবরেটরীতে। আমার হাতের একটি হাড় ভাঙ্গা। বললাম। খুব খুসি হয়ে হাতের এক্সরে নিলেন। দেখা গেল হাতের মণিবন্ধের কাছে এক জায়গায় সত্যি ভাঙ্গা। আমিই ভারতের প্রথম মানুষ, যার ভাঙ্গা হাড় এক্সরে প্রথম করা হয়। এ সময়ে কিছু গল্প ও ছোট উপন্যাস লিখেছিলাম। আশুতোষ মুখার্জির উপদেশে লিখেছিলুম শ্রীমন্ত সওদাগর। সেটি উনি পাঠ্য পুস্তকের তালিকায় দিয়েছিলেন।

'সংবাদ প্রতিষ্ঠান? না, তখনকার দিনে কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ছিল না। বাইরের সংবাদ ছাপতুম আমরা চিঠিপত্র থেকে। কেউ বিলেত গেলে, তিনি চিঠি লিখতেন।

সাহেবদের আত্মীয়স্বজনদের মারফৎ সংগ্রহ হত বিদেশের বিশেষ বিশেষ খবর।

'প্রথম সাংবাদিকদের সংঘ যতদূর মনে পড়ে, মৃণালকান্তি বসুর উৎসাহে হয়। সেই সংঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মৃণালবাবু-ই। আমি ছিলাম একসিকিউটিভ কমিটির একজন সহকারী সভাপতি।

'১৯৪৩ সালে শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকারের সভানেতৃত্বে, 'ভারতীয় সংবাদপত্র সংঘের' একটি সভায় প্রথম তিনজন সাংবাদিক ও সম্পাদককে মানপত্র দেওয়া হয়। তার মধ্যে একজন কৃষ্ণকুমার মিত্র, আর একজন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর আমাকে।

'এ যুগের বিষয়ে বলতে গিয়ে বললেন, 'এ যুগের রুচিবিচার আলাদা। আমাদের কালের ছিল অন্যরকম। 'হিতবাদী' প্রধানতঃ কংগ্রেসেরই কথা বলত। মন্ত্র তার বন্দে মাতরম্। আলাপ হয়নি, কিন্তু দাদাভাই নৌরজী, সারোজিনী নাইডু এঁদের সবাইকেই দেখেছি।

'আজ সবই বদলে গেছে। আমার কালের সেই বিচিত্র সম্ভারপূর্ণ ঐতিহাসিক কথা ও কাহিনী তোমার এ পাতায় ধরবে না। সেইজন্য নীরব হলাম।'

র চ না - প্র স ঙ্গ

স্মৃতিতে সেকাল

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথাটির বিভিন্ন অংশ সাময়িক পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে পূর্ব প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হল। বর্তমান সংকলনে প্রকাশের ক্রম অনুযায়ী 'প্রসঙ্গনাম' এবং 'সূত্র' অংশে সাময়িক পত্রিকার নাম, বর্ষ/খন্ড/সংখ্যা, পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ নাম	*সূত্র*
বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ	বাসনা, ২/১১-১২, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০২, ৩৩৩-৩৩৬
বিদ্যাসাগর কথা (১)	বঙ্গশ্রী, ১/৬, আষাঢ় ১৩৪০, ৬৯২-৬৯৭
বিদ্যাসাগর কথা (২)	বঙ্গশ্রী, ১/২/১, শ্রাবণ ১৩৪০, ৮৩-৮৮
*কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ	প্রবর্ত্তক, ৭/৩, চৈত্র ১৩২৮, ১৬৯-১৭৪
ভূদেব প্রসঙ্গ	বঙ্গশ্রী, ১/২/২, ভাদ্র ১৩৪০, ২৪৫-২৫০
আমার দেখা লোক (১)	প্রবাসী, ৩৫/১/৪, শ্রাবণ ১৩৪২, ৪৬০-৪৬৭
আমার দেখা লোক (২)	প্রবাসী, ৩৫/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২, ১৬১-১৬৯
আমার দেখা লোক (৩)	প্রবাসী, ৩৫/১/৩, আষাঢ় ১৩৪২, ৩৮০-৩৮৮
আমার দেখা লোক (৪)	প্রবাসী, ৩৫/১/৫, ভাদ্র ১৩৪২, ৬১৯-৬২৫
স্কুলের স্মৃতি	বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), ২/৪, শ্রাবণ ১৩০৯, ১৮০-১৮৯
সেকালের পরিচ্ছদ	বঙ্গশ্রী, ১/২/৬, পৌষ ১৩৪০, ৭৬১-৭৬৬
সেকালের ভোজ	বঙ্গশ্রী, ২/১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, ৬১৭-৬২৪
সেকালের যাত্রা	বঙ্গশ্রী, ২/২/১, শ্রাবণ ১৩৪১, ৮৯-৯৭
সেকালের যানবাহন	প্রবাসী, ৩৫/২/৪, মাঘ ১৩৪২, ৪৭৬-৪৮৬
সেকালের ছাত্রসমাজ	প্রবাসী, ৩৭/১/১, বৈশাখ, ১৩৪৪, ২১-২৬
সেকালের বিবাহ	প্রবাসী, ৩৮/১/১, বৈশাখ ১৩৪৫, ২৫-৩৩
সেকালের বঙ্গমহিলা	প্রবাসী, ৩৮/২/৩, পৌষ ১৩৪৫, ৩৪৭-৩৫৪
বিশ্বভারতীর অঙ্কুর	প্রবাসী, ৩৯/২/৪, মাঘ ১৩৪৬, ৫১০-৫২০
সেকালের লোকশিক্ষা	প্রবর্ত্তক, ২৫/২/১, কার্তিক ১৩৪৭, ৩৪-৩৯
সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ	প্রবাসী, ৫৩/২/১, কার্তিক ১৩৬০, ১০০-১০২
আমাদের ভাষা (১)	প্রবাসী, ৫৩/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৬০, ১৫৯-১৬১
আমাদের ভাষা (২)	প্রবাসী, ৫৩/২/৩, পৌষ, ১৩৬০, ৩৫৫-৩৫৭
আমাদের পরিচ্ছদ	প্রবাসী, ৫৩/২/৫, ফাল্গুন ১৩৬০, ৫৬৭-৫৬৯